এ.এফ.এম. আবদুল জলিল

সুন্দরবনের ইতিহাস

নয়া উদ্যোগ
কলকাতা

SUNDARBANER ITIHAS

History of Sundarban by A.F.M. Abdul Jalil

HISTORY : LOCAL-BENGAL

প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০

হরফবিন্যাস
অ্যালায়েড প্রিন্ট সিস্টেমস
১৯৭-বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রণ
নিউ সারদা প্রেস
৯ সি শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

পার্থশঙ্কর বসু কর্তৃক নয়া উদ্যোগ,
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত।

ভূমিকা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
এম-এ বি. এল (ক্যাল) -ডি-লিট (প্যারিস)
বিদ্যাবাচস্পতি

ফোন ৪২৮৪৯
পেয়ারা ভবন
৭৯ বেগম বাজার রোড
ঢাকা-১

১৪।১।১৯১৭ ইং

"সুন্দরবনের ইতিহাস" (দুই খন্ডে সমাপ্ত)। সুসাহিত্যিক জনাব এ এফ এম আবদুল জলিল, এম, এ বি. এল এডভোকেট কর্ত্তৃক রচিত। গ্রন্থকার একজন প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবী হইয়াও যে বহুবিষয়ক ইসালামী-সাহিত্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সাহিত্যানুরাগই স্ফুরিত হয়, বিশেষত : যখন আমরা মনে করি যে, "Law is a jealous mistress". তাঁহার এই সুন্দরবনের ইতিহাস কেবল সুন্দরবনেরই ইতিহাস নহে। ইহাকে প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিকতম কাল পর্য্যন্ত সুন্দরবনের ইতিহাসের সঙ্গে সুন্দরবনের উদ্ভিদ্, জীবজন্তু, লোকগাথা, সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন পদ্ধতি এমন কি আধুনিক শিকারী মেহের, নিজামদ্দী, পচাবদী এবং ডাক বাহের প্রভৃতির রোমাঞ্চকর জীবনলেখা এবং বাঘে মানুষের যুদ্ধের লোমহর্ষক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তক খানি একাধারে জীবনচরিত, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব এবং ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে হয্রত খান জাহান আলী সুলতান হুমায়ুন শাহ, যবন হরিদাস, গাজী কালু ও চম্পাবতী এবং অনেক পীর ফকিরের জীবনীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করিতে বহুল গবেষণা করিয়াছেন ইহাতে যশোর, খুলনা ও বাকের গঞ্জের ইতিহাসের অনেক প্রত্নতত্ত্ব, সামাজিক ও রাজনীতিক তথ্যাবলী নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে গ্রন্থকারের বহুল পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে। আমি ইহা পাঠে যে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আশাকরি সকল পাঠকই তাহা লাভ করিবেন। পুস্তকের ভাষা সাবলীল এবং চিত্তের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। আশা করি তাঁহার এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা সাহিত্যে এবং ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পাঠ্যরূপে সমাদৃত হইবে। আমি গ্রন্থকারের সাফল্যমন্ডিত দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

ইতি
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

লেখকের কথা

ইতিহাস মানব জাতির বহুমুখী অভিজ্ঞতার রেকর্ড। সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি, নৃকুলতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় হইতে ইতিহাস উপকরণ সংগ্রহ করে। এক কথায় ইহার বিষয়বস্তু মানুষ, মন নামক এক আশ্চর্য বস্তুর অধিকারী, যাহার সীমারেখা নির্দেশ করা সম্ভব নহে।

দেশের গবেষণারত বিদ্বৎ সমাজকে মাতৃভূমির পবিত্র মাটি, জলবায়ু, নদনদী, পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে নীচের তলার মানুষের সুখ-দুঃখের কথাও জানিতে হইবে। গ্রন্থ প্রণয়নে আমি সামাজিকভাবে গণ-জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিয়াছি। —"যে দেশের মাটির রসে এ দেহ লালিত, যার রঙে ও রূপ বৈচিত্র্যে হৃদয়-মন বিকশিত তার ইতিহাস আমার অজ্ঞাত থাকবে এর চেয়ে মারাত্মক অপরাধ আর হতে পারে না।

ইতিহাস নিজ প্রয়োজনে সঠিক ছবি অঙ্কন করিবে। ঐতিহাসিক বিচারকের সহিত তুলনীয়। বিচারক বিচার করেন মানুষের অধিকার ও অপরাধের, ঐতিহাসিক বিচার করেন ব্যাষ্টি, দেশ কাল ও জাতির, নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ ও উহার সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

প্রাচীন ঐতিহ্য, কিংবদন্তী ও গল্প গাথাকে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে বিশ্লেষণকরত বুদ্ধিগ্রাহ্য, উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। অতীতের মৃত কঙ্কালের স্মৃতিরেখার সহিত বিজড়িত আছে প্রাণবন্ত বর্তমান। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সম্ভব অতীতের সহিত বর্তমানের সংযোগ এবং ভবিষ্যতের প্রতি বাহু সম্প্রসারণ। অতীতের উপলব্ধি এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত উদ্ভাসন।

আধুনিক যুগের ন্যায় পুরাকালেও দেশ সমস্যাবহুল ছিল। কিভাবে সে যুগের মানুষ ঐসব সমস্যার সমাধান করিত তাহা জানার আকাঙ্ক্ষা মানব মনে জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য ইতিহাসের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শাসক সমাজ 'দেওয়ালের লিখন' হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস চর্চা করা সামাজিক আত্মচেতনার লক্ষণ। যে জাতির ইতিহাস নাই, সেই জাতি নিঃস্ব ও হতভাগা—আর যে জাতির ইতিহাস আছে অথচ খোঁজ রাখে না সে জাতিও তদরূপ। আমরা শেষোক্ত জাতির সহিত তুলনীয়।

মানব জ্ঞানের তিনটি প্রধান শাখা—বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য। ইতিহাস ইহার কোন্‌টি? কোন কোন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন ইতিহাস বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত নহে। যুক্তি-তর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে তথ্য উদঘাটিত হয় তাহাই ইতিহাস। সেজন্য যুক্তি প্রমাণ নির্ভর জিজ্ঞাসা যদি বিজ্ঞান হয়, তবে ইতিহাসও বিজ্ঞান। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণকে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া তথ্যের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করা ইতিহাসেরও কাজ। সুপণ্ডিত জে, বি, বিউরী বলিয়াছেন : "ইতিহাস বিজ্ঞান বই আর কিছুই নহে।"

বাংলাদেশের ইতিহাস পুনর্লিখনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আজাদী উত্তর যুগের মুক্তমন ও পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ হইতে উদার ঐতিহাসিক চেতনার আলোকে নব-নিরীক্ষার মাধ্যমে অত্র গ্রন্থ প্রণয়নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি। ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়নে যে-সব গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করা হয় আমি আমার পূর্বসূরীদের সেইসব পথ হইতে কিছুটা বিচ্যুৎ হইয়া ভিন্ন পথ ধরিয়াছি। আমি ইতিহাসের একটি নূতন দিক উন্মোচনের চেষ্টা করিয়াছি। আমার বিষয়বস্তু বহুলাংশে অভিনব ও ভিন্নধরনের।

পণ্ডিত সমাজ ও নিয়মিত গবেষকদের পক্ষে গ্রন্থ প্রণয়নে যে সুযোগ সুবিধা আমার পক্ষে তার বহু অন্তরায় ছিল। রাজধানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং গবেষণার ক্ষেত্র আমার পক্ষে সীমাবদ্ধ। প্রতিকূল পরিবেশের আওতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাকে কার্য করিতে হইয়াছে। তবে আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়নে বাস্তব অভিজ্ঞতা লইয়া চাক্ষুস প্রমাণের সাহায্যে সরেজমিনে গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যের সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছি।

দেশ-বিদেশের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ ও দলিলপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে বহুল পরিশ্রম ও সময় ব্যয়িত হইয়াছে। আমার কর্মব্যস্ত জীবনের সাধনা ও সুদীর্ঘ দিনের আকাঙক্ষার ফল এই সুন্দরবনের ইতিহাস।

আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গ তথা সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার কিছু না কিছু তথ্য প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়ায় উহার বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। সেদিক দিয়া এই গ্রন্থকে বাংলাদেশের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস ভূয়া প্রবাদ ও কুসংস্কারের স্তুপিকৃত আবর্জনারাশির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উহার উদ্ধার সাধন এক সুকঠিন কাজ। সেজন্য এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের উর্ধ্বকাল যাবৎ অমানুষিক পরিশ্রম, কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে যে সমস্ত বিষয়ের সঠিক সন্ধান দেওয়া অসম্ভব এবং যাহা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান উহার সমাধানের জন্য আমাকে গবেষণার আনুমানিক ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া নিজস্ব মত সন্নিবেশ করিতে হইয়াছে। যথাসম্ভব আধুনিক ও শেষ গবেষণার ফলাফল সর্বত্র সংযোজিত করিয়াছি। ইতিহাস দর্শনে কতটুকু সত্য আর কতখানি অসত্য সর্বক্ষেত্রে তাহা বলা সম্ভবপর নহে। ঐতিহাসিক কখনও শেষ সত্য দাবী করিতে পারেন না। নিখুঁত ইতিহাসকে স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। সুক্ষ্ম দার্শনিক যুক্তি, কুসংস্কার বর্জন ও বাস্তবধর্মী পন্থা অবলম্বনই জটিল সমস্যা সমাধানের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি।

গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য এতদঞ্চলের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিয়া বহু অনাবিষ্কৃত ও অনুদঘাটিত তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। আজীবন সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে যথাস্থানে সংযোজন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বহুক্ষেত্রে পূর্ববর্তী লেখকদের ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার সমালোচনা করিয়া নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। সমস্ত সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল সেকথা বলার ধৃষ্টতা আমার নাই। সম্ভাব্য ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক।

কোন কোন ঘটনাবলীর সন্দেহ নিরসন করিতে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে দিনের পর দিন ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। সাহিত্য সৌন্দর্য অপেক্ষা সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি। পক্ষান্তরে নীরস বিষয়বস্তুকে সরস করিয়া প্রকাশ করিতে ত্রুটি করি নাই।

স্থানিক পুরাতত্ত্ব ও সুন্দরবনের রহস্যোদঘাটনের জন্য আমাকে সদলবলে বহুবার ভয়সঙ্কুল বনস্থলী ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। সমুদ্র ভ্রমণ, গভীর জঙ্গলস্থ পুরাকালীন ভগ্ন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, দীঘিকা, রাস্তাঘাট, নেমকখালাড়ী প্রভৃতি অকুস্থলে উপস্থিত থাকিয়া গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বন ভ্রমণের দুর্গম ও ভয়সঙ্কুল স্থানসমূহ পরিদর্শনের আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। নদ-নদী বিধৌত বিশ্বের এহেন মনোরম ও রহস্যে ঘেরা জনমানবহীন জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিতে কতই না আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। ভ্রমণ ব্যাপদেশে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দুর্জয় ব্যাঘ্র শিকারী বনাঞ্চলেরর অভিজ্ঞ ব্যক্তি, পদস্থ কর্মচারী, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীর সাহায্য লাভ করিয়াছি। কোন কোন সময় গহন বনমধ্যে নৌকাপরি নদীতে দিনের পর দিন অবস্থান করিয়া গ্রন্থের বৈচিত্র্যময় তথ্য সংগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছি। নিভৃতে যে সাধনা করিয়াছি তাহাতে কতটা কৃতকার্য হইয়াছি সুধী পাঠক সমাজ তাহার বিচার করিবেন।

প্রাচ্যের স্বনামধন্য পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দেয়ায় আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাঁহার অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বহু জটিল ও বিতর্কমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য মওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ মরহুম, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যক্ষ জহুরুল ইসলাম মরহুম, ডক্টর আহমদ হোসেন দানী, সৈয়দ মুর্তজা আলী, ডক্টর এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ, ডক্টর নাজিমউদ্দীন, অধ্যক্ষ এনামুল হক প্রমুখ প্রবীণ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করিয়া উপকৃত হইয়াছি।

যে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক, আইনজীবী ও সাহিত্যিক বহুদিন যাবৎ অতীব আগ্রহ সহকারে তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারে এবং সন্দেহমূলক বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ অমূল্যধন সিংহ ও সৈয়দ সুলতান আলী মরহুম, এডভোকেট দিলদার আহম্মদ ও ডাঃ আবুল কাসেমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এডভোকেট আবদুল হাকিম মরহুম, পল্লীকবি জসিম উদ্দীন বর্ন বিভাগের ডি, এফ, ও, দ্বয় এম, এ, আলীম ও মকবুল হোসেন, সরদার জয়েনউদ্দীন, অধ্যাপক হাসান

আজিজুল হক, অধ্যাপক নাজিম মাহমুদ, অধ্যক্ষ দরবেশ আলী খান, আনিস সিদ্দিকী ও অধ্যাপক কুমারেশ বাওয়ালীর সাহায্য ভুলিবার নহে।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ও খুলনা সাহিত্যে পরিষদ-সদস্যদের সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য আমি তাঁহাদের কাছে ঋণী। ইতিহাস পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া সুধীমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি।

জি, এম, ওকালত আলী, এস, এম ইসরাইল হোসেন জাফরী, পল্লীকবি নেছারুদ্দীন, এবং খন্দকার আবুল হাসেম ও আরো অনেকে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বাংলা একাডেমির কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমার স্নেহাস্পদ কন্যা কানিজ মাওলা (রোজী) গ্রন্থখানির সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপির প্রেসকপি লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তার প্রতি আমার অশেষ স্নেহাশীষ।

দূরে অবস্থান হেতু আমার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছাপাকার্য পরিচালিত না হওয়ায় কিছু কিছু ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সেদিকে সহৃদয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আশাকরি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি সহকারে দেখিবেন।

সুদীর্ঘ দিন যাবৎ গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কর্মক্লান্ত জীবনে ভাটা পড়িয়াছে। নিদারুণ মানসিক পরিশ্রমের ফলে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং যৌবনে বার্ধক্য আসিয়াছে। একাধিকবার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছি। নানাবিধ বিপদ আপদ সত্ত্বেও আল্লার সাহায্য হইতে নিরাশ হই নাই।

আমার পর যাঁহারা মানবের সুখ-দুঃখের কথা লিখিয়া অমর আলয় গড়িয়া তুলিবেন তখনই আমার লেখনী সার্থক হইবে। সেদিন মর জগতে না থাকিলেও আশা করি আত্মা তৃপ্ত হইবে।

মাতৃভাষায় দীন লেখকের এ গ্রন্থ অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু ও বিদগ্ধজনের মনের খোরাক যোগাইতে সক্ষম হইবে—সে ভরসা আমার আছে। গ্রন্থখানি সমাজে আদৃত হইলে আমার কলম ধন্য হইবে।

নূর মঞ্জিল,
১, আহসান আহমদ রোড
খুলনা।

এ, এফ, এম, আবদুল জলিল
২৩ শে মার্চ ১৯৬৯

সূচীপত্র

এক

সুন্দরবন, নামের উৎপত্তি, ভূতত্ত্ব ও নদনদী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত জঙ্গলকে সুন্দরবন বলে। ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণভাগেও সুন্দরবন। "নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহু শাখা বিস্তার করিয়া সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদসঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।" পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর মোহনা হইতে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত এই সুন্দরবন বিস্তৃত। কেহ কেহ ভুল করিয়া মেঘনারও পূর্বে অর্থাৎ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী জেলা ও সন্দ্বীপ-হাতিয়া দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত জঙ্গলকেও সুন্দরবনের অর্ন্তগত মনে করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা ও মেঘনা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগের নামই সুন্দরবন।

সুন্দরবনের পশ্চিম সীমান্তে হরিণভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদী। কালিন্দী হইতে মধুমতী পর্যন্ত খুলনা জেলা এবং মধুমতী হইতে মেঘনা পর্যন্ত বাকেরগঞ্জ জেলা। খুলনার বর্তমান আয়তন ৪৬৫২ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ২৩১৬ বর্গমাইল সুন্দরবন। অর্থাৎ খুলনার প্রায় অর্ধেক ভূভাগই গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুন্দরবনের মধ্যে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল আবার জলভাগ। এই সমস্ত জলভাগই অসংখ্য খাল ও বড় বড় নদী। এইগুলিই সুন্দরবনের চলাচলের একমাত্র বাহন। বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সুন্দরবনের আয়তন মাত্র ২৫ বর্গমাইল। অসংখ্য নদ-নদী ও খালই সুন্দরবনের প্রাণ। শিরা ও উপশিরাসমূহ মানবশরীরে যেরূপ আবশ্যক, সুন্দরবন রক্ষণের জন্য উহার নদীনালার তেমনই প্রয়োজন।

সুন্দরবনের লোকসংখ্যা প্রায় দশ সহস্র। জনসংখ্যার প্রায় সবই ভাসমান (Floating Population)। তাছাড়া বনবিভাগের কর্মচারীরা কোথাও অফিস ঘরে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৌকায় অবস্থান করেন। "ফিসার ম্যানস" দ্বীপে কয়েক সহস্র লোক বৎসরে প্রায় ছয়মাস বসবাস করিয়া থাকে। কাঠুরিয়া ও জেলে ব্যতীত কিছুসংখ্যক লোক সর্বদা ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় সুন্দরবনের মধ্যে সাময়িকভাবে ব্যবসায় ও ভ্রমণ ব্যপদেশে অবস্থান করে।

নামের উৎপত্তি : সুন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অসংখ্য মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সুন্দরবনের সর্বত্র প্রচুর সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে এবং সুন্দরী বৃক্ষই অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা জনসাধারণের নিকট অধিক পরিচিত। সুন্দরীবৃক্ষের দ্বারা নৌকা ঘরের খুঁটি ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হয়। এই সর্বজন পরিচিত সুন্দরীবৃক্ষ হইতেই বনবিভাগের নামকরণ হইয়াছে সুন্দরবন। ইংরাজী পরিভাষায়ও ইহাকে সুন্দরবনই (Sundarbans) বলা হয়। সুন্দরবনের নাম সম্পর্কে ইহাই জনপ্রিয় অভিমত।

কথিত আছে যে, ইংরেজ আমলের প্রথমে বা উহারও অনেক পূর্বে বিদেশীয় পর্যটকেরা সুন্দরবনের নানাপ্রকার বৃক্ষাদি দর্শনে উহাকে "Jungle of Sundry Trees" নামে আখ্যাত করিতেন। ইংরাজী শব্দ "Sundry"—উহার অর্থ "নানাপ্রকার", এই মতাবলম্বীরা বলেন যে, এই সানড্রী শব্দ হইতে ধীরে ধীরে জঙ্গলের নাম সুন্দরীবন ও উহা হইতে সুন্দরবনে দাঁড়াইয়াছে।

অন্য মতাবলম্বীরা বলেন, সুন্দরবনে শুধু সুন্দরীবৃক্ষই নহে, অন্যান্য বহু বৃক্ষ আছে। গেওয়া, কেওড়া, ওড়া, পশুর, গরান, বাইন প্রভৃতি বৃক্ষও প্রচুর জন্মে। অতএব সুন্দরীবৃক্ষ হইতে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি তাঁহারা স্বীকাব করেন না। এই দলের মতে সমুদ্রের তীরে এই জঙ্গল অবস্থিত এবং সর্বত্র সামুদ্রিক জোয়ার-জলে সিক্ত বলিয়া উহার নাম সমুদ্রবন এবং এই সমুদ্রবন শব্দের অপভ্রংশই সুন্দরবন। এদেশের অশিক্ষিত লোকেরা সমুদ্রকে সুমুন্দর বা সুমুদ্দুর বলিয়া থাকে।

বাকেরগঞ্জের ইতিহাসপ্রণেতা বিভারিজ সাহেব বলেন যে, ঐ জেলার সুন্ধা নামক নদী হইতেই সুন্দরবনের নামকরণ হইয়াছে। সুন্ধা নদীর পূর্বনাম ছিল সুগন্ধা এবং এই সুন্ধার কূলের বনবিভাগকে সুন্ধারবন বলা হইত এবং পরে এই নাম সুন্দরবনে পরিণত হয়। বিভারিজ সাহেবের দেওয়া এই নামের বেশ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। নামের সহিত আপাতত মিলও ঘনিষ্ঠ। কিন্তু বিভারিজ সাহেব "হিস্টরী অব বাকেরগঞ্জ" লিখিয়াছেন; উহাতে সুন্দরবনের বিস্তৃত ইতিহাস ও ব্যাপক পরিচয় নাই। এই বিশালকায় বনস্থলীর নাম এক কোণের একটি নদীর নাম হইতে উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব মনে করি।

বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ সীমা লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের বনবিভাগকে চন্দ্র দ্বীপবন বা চন্দ্রবন বলা হইত এবং কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই চন্দ্রবন হইতে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অনুমান কাগজ-কলমেই রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই। আবার কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চন্দ্র দ্বীপ রাজ্যে চণ্ডভণ্ড নামে এক বন্যজাতি বসবাস করিত এবং চণ্ডভণ্ড শব্দ হইতেই সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। চণ্ডভণ্ড জাতির কথা বাকেরগঞ্জ জেলার আদিলপুর বা ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে।

ফ্রেডারিক ইডেন পার্গিটার বলিয়াছেন,—সুন্দরবনের দৃশ্যে কোনরূপ সৌন্দর্য নাই। তিনি হয়ত সুন্দরবনের দুই-একটি কদাকার স্থান দেখিয়া ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কোন কোন সময় মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার দরুণও সুন্দরকে অসুন্দর বলিয়া ধারণা হয়।

কিন্তু সুন্দরবন যে বাস্তবিকই অভিনব এবং অতীব সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দিগন্ত প্রসারিণী লবণাক্ত সলিলা নদ-নদী, অসংখ্য খাল এবং উহার দুই তীরব্যাপী বিটপীশ্রেণী এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃক্ষগুলি সবই যেন একই সময় শৃঙ্খলার সহিত রোপিত এবং একইভাবে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইয়াছে। হিংস্র জন্তুসঙ্কুল প্রদেশে এহেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এ বনে হস্তরোপিত বৃক্ষ বা পুষ্পোদ্যান নাই।

দেখিলে মনে হয় বৃক্ষগুলি যেন আবহমানকাল হইতে প্রীতির বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ রহিয়াছে। তাই সুন্দরবনের দৃশ্য মোটেই অসুন্দর নহে। সুন্দরবনের বিরাট আর্থিক সম্পদ এই বৃক্ষরাজি ও জীবজন্তু (Flora and Fauna)। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর জানোয়ার হরিণ এই বনে প্রচুর এবং সংখ্যায় সব জন্তুকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের চরভূমিতে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ চরিয়া বেড়ায়। বৃক্ষের শীতল ছায়ায় হরিণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওড়া, কেওড়া, আমুড় প্রভৃতি বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণ করে।

পৃথিবীর নিয়ম, যেখানে পুষ্প আছে, সেই স্থানেই কণ্টক আছে। সুন্দরবন প্রদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বহুলাংশে অনুরূপ। সুন্দরবনের দৃশ্য নয়নাভিরাম, উহার চরসমূহের সবুজ বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য ও পক্ষী, আঁকাবাঁকা নদীর জলস্রোত ও ধু ধু জলরাশি, বন্য জন্তুর দলে দলে অবাধ বিচরণ, বানরের নানাপ্রকার মুখভঙ্গী, নর্তন ও কুর্দন, দক্ষিণ সীমার সমুদ্র উপকূলের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য প্রভৃতি মিলিয়া সুন্দরবনকে সত্যই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের জন্য দক্ষিণবঙ্গের এই বনবিভাগের নাম হইয়াছে সুন্দরবন। জঙ্গল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত এবং বাস্তবিকই মনোরম বলিয়া এই বনের নাম সুন্দরবন হইয়াছে। সুন্দরবনের এই নামকরণটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা এই মতকে স্থির সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি না। সুন্দরবন নাম খুব প্রাচীন না হইলেও আধুনিক নহে। এতদঞ্চল নদীমাতৃক দেশ। এখানকার জলবায়ু আর্দ্র। সেইজন্য সমুদ্রকূলবর্তী দক্ষিণ প্রদেশকে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকেরা ভাটী দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং মুঘল যুগের বারভূঞাদিগের নামানুসারে এই দেশের নাম হইয়াছিল "বারভাটী বাংলা।"

সুন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা উপরে যে আলোচনা করিলাম তাহাতে সুন্দরী বৃক্ষের প্রাচুর্যের জন্য সুন্দরবন, মনোরম ও সুন্দর বনানী বলিয়া সুন্দরবন এবং বিভারিজ সাহেবের পূর্বোক্ত মত—এই তিনটি মতই বিশেষভাবে প্রবল। তবে একথা সত্য যে, সুন্দরী বৃক্ষ বনবিভাগের সর্বত্র আছে, উহাই সুন্দরবনের প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। উহার কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী। এতদ্ব্যতীত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে পুকুর খননের সময় প্রায়ই সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি মৃত্তিকার নিম্নে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুন্দরীবৃক্ষ সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। সুন্দরীই সুন্দরবনের কাঠের রাজা বা সর্বোৎকৃষ্ট কাঠ এবং তজ্জন্য বনবিভাগের নাম সুন্দরবন হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং স্বাভাবিক।

ভূতত্ত্ব : সুন্দরবনের আদি ইতিহাস জানিতে হইলে উহার ভূতত্ত্ব এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উৎপত্তি ও গঠনের বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশের যে ত্রিকোণ ভূ-ভাগের পশ্চিমে ভাগীরথী এবং উত্তর-পূর্বদিকে পদ্মা ও মেঘনা নদ এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর সেই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগকে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ (Gangetic delta) বলা হয়। এই ভূ-ভাগের

মধ্যে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং কলিকাতা শহর, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলা ভারতের অন্তর্গত।

উপমহাদেশের মধ্যে গঙ্গা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী। হিমালয় পর্বতের সানুদেশে গঙ্গোত্রী নামক স্থান হইতে উহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নামকরণ হয় গঙ্গা। হিমালয়ের তুষার-নিঃসৃত জলরাশি শতশত নির্ঝরিণী পথে বহির্গত হইয়া গঙ্গা নদীতে পতিত হয়। অপরিমিত পর্বতরেণু বহন করিয়া গঙ্গা সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় এবং উহার পলি দ্বারা নূতন ভূমি গঠন করে। গঙ্গা ও উহার শাখানদীসমূহ পলিমাটি বহন করিয়া পার্শ্ববর্তী ভূমি গঠন করিতে করিতে সুদূর দক্ষিণে সাগরে মিশিয়া যায়। এইভাবে যুগ যুগ ধরিয়া পলি দিয়া গঙ্গা স্বীয় শাখা-প্রশাখার দ্বারা দুই বাহুর মধ্যবর্তী ত্রিকোণ ভূ-ভাগ গঠন করিয়াছে। এই ভূ-ভাগকেই গঙ্গা নদীর দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বলা হয়।

নবীনচন্দ্র দাস তাঁহার এশিয়ার প্রাচীন ভূগোল (Ancient Geography of Asia) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল গঠিত হয় নাই এবং উহা তখন অতল সমুদ্রের একাংশ ছিল। ঋগ্বেদের আমলে বঙ্গের অধিকাংশ স্থান ছিল অতল সমুদ্র। শুক্লযজুর্বেদের যুগেও গণ্ডকী নদীর পূর্বদিক জলপ্লাবিত ছিল। মহাভারতিক কালেও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ ছিল সমুদ্রে লীন। ষ্ট্রাবোর ভারত ভ্রমণকালে (১৮-২৪ খ্রীঃ) সমুদ্রের লোনাজল প্রতিরোধের জন্য বহু নগরের চারিদিকে বাঁধ ছিল। হিউয়েন সাং সমতট ও কামরূপের মধ্যাঞ্চলে হাজার ক্রোশব্যাপী হ্রদ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ ও নবদ্বীপ হইতেই ব-দ্বীপের গঠন শুরু হইয়াছিল। অতএব সুন্দরবন ও তন্নিকটবর্তী জেলাসমূহ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত ছিল। যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের যে সমস্ত স্থানে প্রাচীনকাল হইতে শত সহস্র গ্রাম, নগর ও শহর গঠিত হইয়া শিল্প ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা এক অতি অজানা প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে বিলীন ছিল। গঙ্গানদী পূর্বদিকে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া মেঘনায় মিশিয়াছে। মেঘনা পদ্মা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। পদ্মানদী শতশত বৎসর ধরিয়া উহার দুইতীরে যেমন বহু ভূমি গঠন করিয়াছে তেমনই বহু নগর ও শহর ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য উহার আর এক নাম কীর্তিনাশা। গঙ্গানদী হইতে আর এক শাখা ভাগীরথী নাম ধারণ করিয়া মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত জঙ্গলাবৃত ভূভাগকে সুন্দরবন নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ অতীব প্রাচীন স্থান। বৈদিক যুগের গ্রন্থে এবং হিন্দু-পুরাণে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। পৌরাণিক গ্রন্থে এইটুকু জানা যায় যে, বিহার প্রদেশের নাম ছিল অঙ্গ, উড়িষ্যা দেশ কলিঙ্গ, দক্ষিণ রাঢ় বা হুগলী অঞ্চল সুম্ম এবং মালদহ হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ভূভাগের নাম ছিল পুণ্ড্র। ভাগীরথীর পূর্বকূলবর্তী স্থানসমূহের নাম

ছিল বঙ্গ। মহাভারত ও রামায়ণে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। রামায়ণে বর্ণিত সীতার পৈতৃক বাসভূমি মিথিলা বঙ্গের পশ্চিম-উত্তর কোণে অবস্থিত ছিল। বর্তমান মালদহ জেলা এবং রাজশাহীর একাংশ অর্থাৎ মহানন্দা নদীর পশ্চিমাংশ মিথিলার অন্তর্গত ছিল। তৎকালীন বঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্বে সমুদ্র ছিল। গঙ্গানদীর শাখা-প্রশাখাই যে পলিমাটির দ্বারা ব-দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে উহাই ভূতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের সুচিন্তিত অভিমত। এখনও বঙ্গোপসাগরের তীরে পলিমাটির চর পড়িতেছে এবং বাংলাদেশের বিশেষ করিয়া খুলনা ও বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ সীমার ভূমি বৃদ্ধি হইতেছে। সুখের বিষয় যে, নদীর ন্যায় সমুদ্রকূল ভাঙ্গে না, সর্বদাই কূলের সীমা বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে।

ব-দ্বীপের ধর্ম জলকে স্থল করা এবং স্থলভাগকে উন্নত ও উর্বর করা। প্রথমে সাগরের গর্ভে নদীস্রোত পতিত হয়। স্রোতের সঙ্গে পলিমাটি ধাবিত হয় এবং জল সরিয়া গেলে ভূমি উত্থিত হয়। কোন কোন স্থলে নদী বা নালা থাকিয়া যায়। পলিমাটির দ্বারা যে-সব চরভূমির সৃষ্টি হয় উহা ক্রমশঃ বৃক্ষলতায় ভরিয়া যাইতে থাকে এবং মনুষ্যবসতি স্থাপিত হয়। নদীর স্রোত গতি পরিবর্তন করিলে বৃহৎকায় চরভূমি রাখিয়া যায়। উহাকে মাদিয়া, দিয়াড়া বা দ্বীপ নামে অভিহিত করা হয়। ক্রমাগত নদীর খাতগুলি ভরাট হইয়া জমিতে পরিণত হয়। এইভাবে ব-দ্বীপের কার্য চলিতে থাকে। কিছুদিন পর্যন্ত নদীর তলভাগে জল জমিয়া থাকিলে উহা বিল বা বাওড় নামে কথিত হয়। আবাদ হইতে হইতে তাহাও থাকে না। এইভাবে গঙ্গা ও উহার শাখা-প্রশাখার মোহনা ক্রমেই দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইতেছে—ফলে ব-দ্বীপের আয়তন বাড়িতেছে এবং সাগরের আয়তন ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে।

সুন্দরবনের ৪৪ নং কম্পার্টমেন্টের দক্ষিণে দুব্‌লা দ্বীপের পশ্চিমে এবং পত্‌নী দ্বীপ হইতে সাত-আট মাইল পূর্বে ভাণ্ডার গাঙের সন্নিকটে সম্প্রতি একটি ছোট চর উঠিয়াছে। উক্ত চরের পরিধি এক বর্গমাইলের অধিক। এই চর আয়তনে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। চরের উপর জোয়ারের সময় সুন্দরী, গরান প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ ভাসিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে এবং উহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া স্থানটি যথাসময়ে সুন্দরবনে পরিণত হইবে। এইভাবে যুগে যুগে সুন্দরবনের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সাগরের অবস্থান দক্ষিণে সরিয়া যায়। শিবসা নদীর মধ্যস্থলে শেখের ট্যাকের দক্ষিণে আল্‌কী দ্বীপ পর্যন্ত প্রায় ১ বর্গমাইলব্যাপী একটি চর পড়িয়াছে। চরটি যথাসময়ে সুউচ্চ হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইবে।

পটুয়াখালী জিলার দক্ষিণে চর কুক্‌রী মুক্‌রী, চর মমতাজ, চর আণ্ডা প্রভৃতি দ্বীপের সৃষ্টি হইয়া বহুপূর্ব হইতে এখানে বসতি স্থাপিত হইয়াছে। এই চরসমূহের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় বিশ সহস্র। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত আরও বহু লোক উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়া চাষাবাদ করিয়া ধান্যের ফসল ফলায়। তাহারা বর্ষাকালে আসিয়া ধান্য রোপণ করে এবং শীতকালে পক্বধান্য কাটিয়া লইয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের এইদিকে

মাঝে মাঝে চর উঠিয়া থাকে। সুযোগসন্ধানীরা এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং চর উঠিবার সম্ভাবনা হইলেই মূল্যবান জমি পাইবার আশায় কালেক্টরের নিকট হইতে পূর্বাহ্নেই বন্দোবস্ত লইয়া সম্পত্তির মালিক হইয়া বসে। খুলনার দক্ষিণে চর উঠিলে উহা স্বাভাবিকভাবে সুন্দরবনে পরিণত হয়। আর বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে সুন্দরবন না থাকায় চরভূমি পার্শ্ববর্তী ভূমির ন্যায় ধান্যের আবাদে পরিণত হয়। এইভাবে খুলনা হইতে কক্সবাজার পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে সমস্ত চর উত্থিত হয় উহা যথাসময়ে পার্শ্ববর্তী ভূমির ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

১৯৬১ সালের ৯ই মে এবং ১৯৬৫ সালের ১১ই মে যে মহাপ্রলয়ঙ্করী ঝড় হয় উহাতে বাকেরগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সমুদ্রকূলবর্তী বসতি অঞ্চল বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ের সঙ্গে সামুদ্রিক বন্যার জলোচ্ছ্বাসে এতদঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশু ভাসাইয়া লইয়া যায়। ঝড়ের পরে কোন কোন এলাকা জনমানবশূন্য হইয়া শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। খুলনার দক্ষিণে ঘনাবৃত বনানীর অবস্থিতির জন্য যশোর-খুলনায় এই ধরনের জলস্ফীতির কারণ সচরাচর ঘটে না।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের এক নাম ছিল বক্‌দ্বীপ। বক্‌দ্বীপই বৌদ্ধ আমলে বগ্‌দী নামে পরিচিত হয়। হিন্দু রাজত্বের শেষ দিকে সেন ও পালরাজগণের সময় উহার নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ি। এতদঞ্চলে যে-সব অসভ্য জাতি বাস করিত তাহারা বাগ্‌দী নামে পরিচিত ছিল। এখন এই জাতির বসতি কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ব্যাঘ্রতটি (Tiger Coast) শব্দ হইতে বাগ্‌ড়ি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এ বিষয় অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই ব দ্বীপে মনুষ্যবসতি অপেক্ষা জঙ্গলই ছিল অধিক। প্রাচীনকালের বহু গ্রন্থে এতদঞ্চলের গভীর জঙ্গলের কথা উল্লেখ আছে। বাকেরগঞ্জ ও যশোর জিলার বহুস্থানে এবং খুলনা জেলার প্রায় সর্বত্র পুকুর খুঁড়িলে এখনও সুন্দরী প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়। অন্যান্য জেলায়ও এই ধরনের বৃক্ষ মৃত্তিকার নিচে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেক সময় এতদঞ্চলের লোকেরা পুকুর খননকালে প্রাপ্ত বৃক্ষের গুঁড়ি রৌদ্রে শুকাইয়া জ্বালানিরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে উহার কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত নিদর্শন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সর্বত্র এককালে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং ধীরে ধীরে এই সমস্ত জঙ্গল অপসারিত হইলে বা কাটিয়া ফেলিবার পর মনুষ্যবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নদীর স্রোত যে পলিমাটি বহন করিয়া আনে উহা শেষ সীমান্ত বা সমুদ্রের পার্শ্বে চরভূমি গঠন করে। জোয়ারের সময় বৃক্ষের বীজ ভাসিয়া আসে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় এবং চরভূমি যথাসময়ে গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। এই জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিলে ধানক্ষেত বা মানুষের আবাসযোগ্য ভূমি সৃষ্টি হয়। এইভাবে যুগ যুগ ধরিয়া ঘরবাড়ি, বাগিচা, ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ও কোলাহলময় নগরের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কোন কোন সময় ভূমিকম্প, প্লাবন প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাকে জনপদ বা

জঙ্গল বিধ্বস্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। নদীগর্ভে বসতবাটী বিলীন হওয়া নদীমাতৃক বাংলাদেশের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

ফরিদপুরের দক্ষিণে জলির পাড় অঞ্চলে এবং উত্তরে খুলনার তেরখাদা ও মোল্লাহাট থানায় সম্প্রতি যে পিট কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐসমস্ত স্থানে সুন্দরবন বা গভীর জঙ্গল ছিল। প্রমাণস্বরূপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ঐসব স্থানে তিন-চার ফুট মাটি খুঁড়িলেই জোব মাটি পাওয়া যায়। এই জোব মাটিই প্রাচীনকালীন বৃক্ষলতা এবং পলিমাটির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত স্থান জঙ্গল ছিল তাহার কিয়দংশ মনুষ্য দ্বারা এবং প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া জোব মাটিতে পরিণত হইয়াছে। এই জোব মাটির এলাকায় যেখানে কাঠের সংমিশ্রণ বেশি সেখানেই পিট পাওয়া যাইবে। এই পিট রৌদ্রে শুকাইলে আগুনে জ্বলিয়া থাকে। ইহাই বহু বিঘোষিত পিট কয়লা। ওয়াপদার একটি বিভাগ এই পিট উত্তোলন কার্যে লিপ্ত আছে। সম্প্রতি জলির পাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে চাঁদাব বিলে পিট খননের সময় প্রাচীনকালীন বৃক্ষ, মৎস্য ও অচেনা পশুর হাড় পাওয়া গিয়াছে। বহু অর্থ ব্যয়ের পর সরকার পিট খনন কার্য ত্যাগ করিয়াছেন।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বঙ্গদেশের একাংশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উহা উপবঙ্গ বলিয়া খ্যাত। এই উপবঙ্গ একটি বিশালকায় দ্বীপ। এক সময় উহা অনেকগুলি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। সমস্ত দ্বীপই গঙ্গার পলিমাটি হইতে উৎপন্ন। মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিল্‌জী নবদ্বীপ আক্রমণ করতঃ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গ বিজয় করেন। নবদ্বীপ নয়টি দ্বীপেব সমষ্টি বলিয়া ঐ নামে অভিহিত হয। ঐ সময় নবদ্বীপের অধীনে ১২টি প্রধান দ্বীপ ছিল। ঐ ১২টির মধ্যে নবদ্বীপ একটি এবং উহা আবার নয়টি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। দ্বীপগুলির নাম যথাক্রমে অগ্রদ্বীপ, উহার মধ্যাংশের নাম কণ্টক দ্বীপ বা কাটোয়া। দ্বিতীয়, নবদ্বীপ উহার মধ্যবর্তী দ্বীপগুলির নাম—মধ্যদ্বীপ, সীমান্ত দ্বীপ, রুদ্র দ্বীপ, অন্তর দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ, জহ্নু দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ ও কোল দ্বীপ। তৃতীয়, মধ্য দ্বীপ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চতুর্থ, চক্রদ্বীপ বা চাক্‌দাহ। পঞ্চম, এড়ো দ্বীপ বা এড়োদাহ। ষষ্ঠ, প্রবাল দ্বীপ। সপ্তম, কুশ দ্বীপ। অষ্টম, অন্ধ্র দ্বীপ। ঝিকিরগাছা, বেনাপোল, লাউজানী ও কেশবপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। নবম, বৃদ্ধ দ্বীপ বা বুড়ন। সাতক্ষীরা ও খুলনা সদরের উত্তর-পশ্চিম ভাগ এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। দশম, সূর্যদ্বীপ—যশোর জেলার পশ্চিমে মহেশপুর ইহার প্রধান নগর ছিল। একাদশ, জয়দ্বীপ এবং দ্বাদশ, রুদ্র দ্বীপ—খুলনার পূর্বভাগ এবং বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল। ইহাই ব-দ্বীপ গঠন ও ভূতত্ত্বের সার কথা।

নদ-নদী : বাংলাদেশের মধ্যে খুলনাই বনবিভাগের বৃহত্তম কেন্দ্র। বাকেরগঞ্জের মধ্যে যে সামান্য সুন্দরবন আছে উহাও খুলনা বনবিভাগের অধীন। পশ্চিমবঙ্গের ভিতর ২৪

পরগণায় যে সুন্দরবন পড়িয়াছে উহার দ্বিগুণ আয়তনেরও বেশী পড়িয়াছে খুলনা জেলায়। সুন্দরবনের মধ্যে এবং তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত বড় বড় নদী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

পূর্বদিকে বৃহত্তম নদী হরিণঘাটা— বলেশ্বর। পূর্ব-মধ্যদিকে খুলনা সদর ও বাগেরহাটের সীমা নির্দেশক বৃহৎ নদী পশর। খুলনা সদরের দক্ষিণে পড়িয়াছে প্রলয়ঙ্করী শিবসা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সাতক্ষীরার পূর্বসীমায় কপোতাক্ষ—আড়পাঙ্গাসিয়া। সুন্দরবনের পশ্চিম সীমার বৃহত্তম নদীর নাম রায়মঙ্গল ও হরিণভাঙা। সমস্ত নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সুন্দরবনের সমস্ত নদীই গঙ্গা বা পদ্মা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। গৌরী বা গড়ই নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কুষ্টিয়ার পার্শ্ব দিয়া যশোরে প্রবেশ করিয়া কুমার নদীতে মিশিয়াছে। কুমারের শাখা বারাসিয়া হইয়া এলেংখালিতে পড়িয়াছে। বারাসিয়া ও কুমার নদী দ্বয় মুঘল আমলে ফতেহাবাদ পরগণার ফৌজদারের এলাকাভুক্ত ছিল। এই দুই নদীর তীরে সেই সময় হইতে মুসলিম সভ্যতা গড়িয়া ওঠে। জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে সুমিষ্ট জল বা মধু বহনকারী (Honey bearing river) বলিয়া নদীর নাম হইয়াছে মধুমতী। পূর্বে বারাসিয়ার নাম মধুমতী ছিল। এলেংখালি নদীও মধুমতীর সহিত মিশিয়া পরবর্তী নাম গ্রহণ করিয়াছে। মধুমতী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদূর আসিয়া মাণিকদহের নিকট হইতে ডান দিকে আঠারবাঁকী শাখা প্রসারিত করিয়াছে এবং তথা হইতে আঠারবাঁকী আলাইপুরের সন্নিকটে আসিয়া ভৈরবের সহিত মিশিয়াছে। মধুমতী মোল্লাহাট হইয়া দক্ষিণদিকে যাইতে যাইতে বিস্তৃত হইয়া বলেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছে। কচুয়ার নিকট ভৈরব আসিয়া এই বলেশ্বরের সহিত মিশিয়াছে। বলেশ্বর যথাক্রমে বিষখালি, পানগুচি, কচা, ভোলা, পাকাশিয়া প্রভৃতি বহু নদীর জলস্রোত বহন করিয়া বঙ্গোপসাগরের নিকটে গিয়া হরিণঘাটা নাম গ্রহণ করিয়াছে। হরিণঘাটার বিখ্যাত মোহনার প্রলয়ঙ্কর রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। উহার প্রশস্ততা প্রায় ৯ মাইল। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে, হুগলী নদীর মোহনায় যেরূপ পলিমাটির দ্বারা স্রোতাবেগ হ্রাস পাইয়া থাকে এখানে সেরূপ কোন ভয় নাই। নদীর মোহনায় ভাটার সময় মাত্র ১৭ ফুট জল থাকে। মোরেলগঞ্জ হইতে সমুদ্রে প্রবেশ করিতে এই নদী বহিয়া আসিতে হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মোরেলগঞ্জকে একটি সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল ; কিন্তু উহা কার্যকরী হয় নাই। তবে এখনও মোরেলগঞ্জ শহর একটি ব্যবসায় কেন্দ্র।

গড়ই নদী বর্তমানে হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। মধুমতীর সে বেগ আর নাই। পূর্বের মত বহুল পরিমাণে মিষ্টপানি বহন করিয়া আনিতে পারে না। তবে পদ্মার মত এখনও এক কূল ভাঙ্গে ও অন্য কূল গড়িয়া যায়। আঠারবাঁকী প্রায় মজিয়া আসিতেছে।

মাথাভাঙ্গা নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া আলমডাঙ্গার নিকট হইতে কুমার নদ নাম গ্রহণ করিয়া যশোরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গা কালনার নিকট মধুমতীতে মিশিয়াছে। বহুদিন হইল উহা মজিয়া উত্তম শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গা বড়দিয়ার নিকট আসিয়া কালিয়ার পূর্বে কালিগঙ্গায় মিশিয়া গাজিরহাটের নিকট আসিয়া আতাই নদীতে পড়িয়াছে। আতাই নদী চন্দনী মহালের নিকট আসিয়া ভৈরবে পতিত হইয়া খুলনা শহরের সন্নিকটে স্রোতের বেগ জোরদার করিয়াছে।

ভৈরব যশোর-খুলনার দীর্ঘতম নদী। এই নদীর তাণ্ডব ছিল অত্যধিক এবং গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। সেইজন্য উহার নাম হইয়াছিল ভৈরব। যশোর ও খুলনা শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর যে স্থান উত্তর হইতে মহানন্দায় মিশিয়াছে তাহারই দক্ষিণে ভৈরব নদীর জন্মস্থান। ভৈরব নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া জলাঙ্গী নদীর সহিত কোথাও মিশিয়া আবার কোথাও পৃথকভাবে যশোরে প্রবেশ করিয়াছে। বারবাজার, যশোর, শিঙ্গিয়া, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, দৌলতপুর, খুলনা, আলাইপুর, ফকিরহাট ও বাগেরহাট হইয়া ভৈরব কচুয়ায় শেষ হইয়াছে।

পশর সুন্দরবনের এক অতি বৃহৎ নদী। ভৈরবের সাথে উহার কোন সংযোগ ছিল না। এককালে সমুদ্রের জল হইতে জোয়ার-ভাটা খেলিত। কিন্তু পর্বতের সঙ্গে কোন যোগসূত্র ছিল না। বিলপাবলা হইতে বয়রা শ্মশানঘাটের খাল খুলনা শহরের দক্ষিণে মৈয়ার গাঙ্গের সহিত মিশিয়া পশরে পড়িয়াছিল। নড়াইল মহকুমার ধোন্ধা গ্রামের রূপচাঁদ সাহা নামক জনৈক লবণ ব্যবসায়ী নৌকা যাতায়াতের জন্য ভৈরব ও কাজিবাচার সহিত সংযোগ করতঃ একটি ছোট খাল খনন করিয়াছিলেন। এই খাল প্রথম লম্ফ দিয়া পার হওয়া যাইত। পরে বাঁশের পোল দিয়া বরাবর লোক যাতায়াত করিত। রূপচাঁদের নামানুসারে এই খালের নাম হয় রূপসা। বর্তমানে রূপসা এক ভয়ঙ্কর নদী। পূর্ববর্তী নিয়ম এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সেইজন্য আদালতের সমনজারির কর্মচারীরা এই নদী পারাপারের খরচা পায় না।

শ্রীরামপুরের রামনারায়ণ ঘোষ আর একটি ছোট খাল কাটাইয়া কাজিবাচার সহিত পশরের সংযোগ করিয়া দেন। উহার নাম হয় নারাণখালির খাল। এইস্থান হইতে পশর বিস্তৃত হইতে হইতে চালনার সন্নিকট দিয়া বাজুয়া, চালনা পোর্ট ও ডাংমারী ফরেস্ট অফিস ধরিয়া সুন্দরবনের বিখ্যাত দেউরমাদে বা ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তরে মজ্জতের সহিত মিশিয়াছে। ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তর দিকে পশরের দক্ষিণ বাহু, শিবসা এবং আরও চারিটি নদী একত্রে মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থল হইতে নদী বৃহৎকায় রূপ ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত নদীসমূহের স্রোত বহন করিয়া দুবলা দ্বীপের নিকট গিয়া সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম হইতে উক্ত তিনটি নাম পরিবর্তিত হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত উহা কঙ্গো বা মারজাট্টা (মজ্জত) নাম গ্রহণ করিয়াছে। সাধারণ লোকে এই বনাঞ্চল ও জলস্থলীর দক্ষিণদিককে নীলকমল বলিয়া থাকে। পশ্চিম তীরে নীলকমল খাল পশ্চিম

দিকে গিয়াছে। উহার নিকটবর্তী চরভূমিকেও নীলকমলের চর বলে। মারজাট্টার মোহনার প্রস্থ প্রায় আট মাইল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে "বার্কশিয়া" নামক একখানি জাহাজ এই নদীতে নিমজ্জিত হয়। মারজাট্টার মুখে বঙ্গোপসাগরের তীরে বিখ্যাত "ফিসার ম্যানস আইল্যাণ্ড" এবং উহার পূর্ব দিকে "টাইগার পয়েন্ট" বা "বাঘের কোণা" অবস্থিত।

সুন্দরবন প্রদেশের আর একটি বিখ্যাত নদীর নাম কপোতাক্ষ (Eye of a pegion)। ভৈরব নদী হইতে উৎপত্তি হইয়া কপোতাক্ষ ক্ষুদ্রাকারে চৌগাছা, ঝিকিরগাছা, চাকলা, ত্রিমোহনী, সাগরদাঁড়ি, তালা, কপিলমুনি, রাড়ুলী, চাঁদখালী, বড়দল, আমাদি, বেদকাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের পার্শ্ব দিয়া সুন্দরবনের মধ্যে খোলপেটুয়ার সঙ্গে মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলেই কপোতাক্ষ ফরেস্ট অফিস। খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষের যুক্ত স্রোত প্রবল হইয়া আড়পাঙ্গাসিয়া নাম ধারণ করিয়াছে। বঙ্গোপসাগর হইতে দশ-বার মাইল উত্তরে আড়পাঙ্গাসিয়া নদী উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত মালঞ্চ নদীর সহিত মিশিয়া সমুদ্র পর্যন্ত মালঞ্চ নাম ধারণ করিয়াছে। এই নদীর মোহনায় স্রোত ভয়ঙ্কর। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ জাহাজ "ফালমাথ" (Falmouth) এখানে নিমজ্জিত হয়। মালঞ্চ ও রায়মঙ্গলের দক্ষিণ দিকে বিখ্যাত অতলস্পর্শ বা অতলতল (Swatch of no ground) অবস্থিত।

কপোতাক্ষের স্রোত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ভৈরবের শক্তি হ্রাস পাইয়া উহা একবারে মজিয়া যায়। যশোর জেলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির অন্তরায় হইয়া পড়ে এই মরা ভৈরব। বর্তমানে এককালীন প্রলয়ঙ্করী ভৈরবের উপর দিয়া বহুস্থানে পদব্রজে লোক যাতায়াত করে। বসুন্দিয়ার নিম্নে আফ্রার খালের দ্বারা চিত্রার জল ভৈরবে পড়িত বলিয়া সেই স্থান হইতে নদী এখনও নামে মাত্র জীবিত আছে। আলাইপুর হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত ভৈরব একরূপ মজিয়া গিয়াছে। কয়েকবার সংস্কার করার পরও সে পূর্বতন অবস্থা ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই। তবে এই পথে এখনও নৌকা চলাচল অব্যাহত আছে। কপোতাক্ষের মত বেতনা বা বেত্রবতী ভৈরবের আর একটি শাখা। সোনাই নদী ইছামতী হইতে উৎপত্তি হইয়া সাতক্ষীরার বল্লী বিলে পতিত হইয়াছে। বেতনা মহেশপুরের সন্নিকটে ভৈরব হইতে বাহির হইয়া নাভারন, বাঘাছড়া ও কলারোয়া হইয়া খুলনার সীমানায় আসিয়া বুধহাটার গাঙ্ নাম ধারণকরতঃ সুন্দরবনের সন্নিকটে খোলপেটুয়ায় মিশিয়াছে।

গুতিয়াখালী ও উজিরপুরের কাটাখালের সঙ্গমস্থল হইতে গলঘেসিয়া নদী কল্যাণপুর ও শ্রীউলা গ্রামের নিকট দিয়া খোলপেটুয়ায় পড়িয়াছে। উজিরপুর কাটাখাল এবং গুতিয়াখালী এক সময় কলিকাতার পণ্যদ্রব্য নৌকাযোগে আসাম ও পূর্ববঙ্গে বহন করিত। গলঘেসিয়া সুন্দরবন যাতায়াতের একটি বিশিষ্ট নদীপথ।

কপোতাক্ষ হইতে হরিহর নদী আসিয়া ভদ্রে মিশিয়াছিল। ত্রিমোহিনী ও মির্জানগর ভদ্রের তীরে মুঘল ফৌজদারের রাজধানী ছিল। ভদ্র ডুমুরিয়ার নিকটে খুব ছোট হইয়া

পরে আবার বৃহৎ আকার ধারণকরতঃ ঢাকি নদীর মধ্য দিয়া শিবসায় এবং পূর্বদিকে কিছুদূর গিয়া পশরে আত্মবিসর্জন দিয়াছে।

শিবসা অতিকায় বৃহৎ নদী। রাড়ুলীর সন্নিকটে কপোতাক্ষ নদী হইতে শিবসার উৎপত্তি হইয়াছে। গড়ইখালির ত্রিমোহনায় উহার ভয়ঙ্করী রূপ পরিলক্ষিত হয়। ঢাকী, বাদুড়গাছা, ডেলুটি মেনস, কয়রা এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদী বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া শিবসাকে জোরদার করিয়াছে। ঢাকী ভদ্রনদী ও শিবসাকে সংযুক্ত করিয়াছে এবং মেনস ও কয়রা ইহাকে কপোতাক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। শিবসা নলিয়ন ফরেস্ট অফিস হইয়া দক্ষিণে কিছুদূর গিয়া পশ্চিম দিকে উহার এক শাখা দক্ষিণমুখী হইয়া আড়োশিবসা নামধারণ করিয়াছে। ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তরে শিবসা নদী মারজাট্টা বা কঙ্গোর সহিত মিশিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। এই শিবসা নদীর পূর্বতীরেই সুন্দরবনের বিখ্যাত শেখের ট্যাক ও কালীবাড়ী নামক প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। শিবসার পশ্চিমতীরে অনেকগুলি ছোট-বড় দ্বীপ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

সুন্দরবনের পশ্চিমদিকের বৃহত্তম নদী রায়মঙ্গল। এই নদীও পদ্মার সহিত সংযুক্ত। মাথাভাঙ্গা নদী ভৈরব ছাড়িয়া দক্ষিণদিকে কৃষ্ণগঞ্জের নিকট চূর্ণী নাম ধারণ করিয়া উহার একশাখা পূর্বাভিমুখে বহির্গত হইয়াছে। এই নদীর নাম ইছামতী। ইছামতী বনগ্রাম রেলস্টেশনের পূর্বদিক দিয়া গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে বিখ্যাত যমুনা নদীর সহিত মিশিয়াছে। ভাগীরথী হইতে বাঘের খাল নামক স্থান যমুনার উৎপত্তি স্থল। যমুনা ক্রমে চৌবেড়িয়া ও গোবরডাঙ্গা ঘুরিয়া অবশেষে চারঘাটের নিকট ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইছামতী সোজা দক্ষিণমুখী হইয়া বসিরহাট, টাকী, দেবহাটা, শ্রীপুর ও কালীগঞ্জ হইয়া ঐতিহাসিক যশোর বা ঈশ্বরীপুরে মিশিয়াছিল। এইখানেই রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রসিদ্ধ যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। বসন্তপুর হইতে ইছামতী কালিন্দী নাম গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে ইহা একটি খালের মত ছিল। পরে কালিন্দী নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাহেবখালী কাকশিয়ালীর (Good landcreek) খাল খননের পর কালিন্দী বেগবতী হইয়া সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রায়মঙ্গল নাম ধারণ করে। এই নদী বর্তমান বাংলাদেশ-ভারতের সীমা নির্দেশ করিতেছে। দেশ বিভাগের পর রায়মঙ্গলের তীরে সীমান্ত পুলিশ ও শুল্ক বিভাগের অফিস স্থাপিত হইয়াছে। রায়মঙ্গল ক্রমাগত দক্ষিণে আসিয়া ভীমমূর্তি ধারণকরতঃ বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। রায়মঙ্গল নদী এবং মাদার বাড়ীর চরের উত্তর দিক হইতে নদী পশ্চিম-দক্ষিণমুখী হইয়া হরিণভাঙ্গা নাম গ্রহণকরতঃ সাগর-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। মাদার বাড়ীর চর প্রথমে ভারতের অন্তর্গত ছিল পরে উহা বাংলাদেশভুক্ত হইয়াছে।

চারঘাট হইতে যমুনা নাম বিলুপ্ত হইয়া ইছামতী হয়। বসন্তপুর হইতে ইছামতীর পূর্বদিকে আবার যমুনা প্রবাহিত হয়। যমুনার ন্যায় স্রোতস্বিনী নদী সে যুগে আর ছিল কিনা সন্দেহ। কালিন্দীর স্রোত প্রবল হইবার পর যমুনার যৌবন ফুরাইয়া গেল। উহাতে

আর জোয়ার আসিল না। এহেন সময়ে ১২৭৪ সালে এক ভীষণ ঝটিকা (Tornado) হয় তাহাতে সুন্দরবনে ১২ ফুট জলবৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় হইতে যমুনার স্রোত একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। বালি জমিয়া যমুনার গতি শান্তভাব ধারণ করে। ওদিকে কালিন্দীর জোয়ার যমুনায় প্রবেশ করিয়া উহাকে দোটানা করিয়া দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যে বিশালকায় যমুনা ভরাট হইয়া যায়। যমুনা নদী এখন শুষ্কপ্রায়। একটি খালের মত সূক্ষ্ম রেখা এখনও যমুনার চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে। এই নদীর মধ্যে এখন সুন্দর ফসল ফলে। যে নদীর তীরে রাজা প্রতাপাদিত্যের সহিত মুঘল সেনাপতি মানসিংহের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং যে নদীতে মুঘল ও প্রতাপাদিত্যের রণসম্ভার বহন করিয়া অসংখ্য রণতরী যাতায়াত করিত তাহা এখন মৃত। রোথনপুরের ত্রিমোহনা, জাহাজঘাটার চাকচিক্য মুকুন্দপুর ও মহৎপুরের গড়, রাজধানীর ধুমধাম, ধুমঘাটের দুর্গ সবই ধুলির সহিত বিলীন হইয়াছে। বহুকাল পরে যমুনার অবস্থা দর্শনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জনৈক পল্লীকবি গাহিয়াছেন :

"যমুনা! মোটেই তোমার নাই নমুনা ;
দেখিলে লাগে বেদনা,
যখন তোমার ছিল যৌবন
পাহাড় সমান উঠ্‌ত তুফোন
তুলিয়ে পাল ; কত ভূপাল
ভরিয়ে জাহাজ আনত সোনা।
তোমার বুকে সকাল বিকাল
কত জাহাজ উড়াতো পাল
এখন চাষী চষিছে হাল
নিয়তির খেলার নাই তুলনা।"

কালিগঞ্জ অঞ্চলে লোকমুখে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

"যমুনা নদী মরবে না
নকীপুরের জমিদার পড়বে না"

পরবর্তীকালে প্রবাদটির বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। সুন্দরবনের নদ-নদী দিবারাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবারে ৬ ঘন্টা করিয়া ২ বার জোয়ার ও ২ বার ভাটা হয়। ভাটার সময় বনাঞ্চলের পানি সমুদ্রে পতিত হয় এবং জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিতে নদী ফাঁপিয়া উঠে। এই জোয়ার-ভাটার সঙ্গমস্থলে উভয় দিক্‌কার জলের ধাক্কাধাক্কিতে জল এদিক ওদিক সরিয়া নদী হইতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের মধ্য দিয়া অসংখ্য খাল ও নালার সৃষ্টি হয়। চাঁদের গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার-ভাটার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। জোয়ারের সময় পানি সাত আট ফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভাটার সময় সর্বনিম্নস্তরে সরিয়া যায়। ভাটার সময় জঙ্গলের অসংখ্য খাল-নালা শুকাইয়া কর্দমাক্ত হইয়া পড়ে।

সুন্দরবনের সর্বত্র জোয়ার-ভাটার জন্য এখানকার বৃক্ষলতা বিশ্বের যে কোন জঙ্গল অপেক্ষা পৃথক ধরনের। নদীর স্রোতপ্রবাহে পলি জমিয়া যে চরভূমি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সমুদ্রের লবণাক্ত জল ও মৌসুমী বায়ুর জলীয় আবহাওয়ায় তথায় বিশেষ ধরনের বৃক্ষলতার জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ অভিনব জলবায়ুর জন্য সুন্দরবনের উৎকর্ষতা হ্রাস পাইতে পারে না। সেজন্য জঙ্গলের গাছ-পালা কাটিয়া ফেলিলে সেখানে আবার উহার জন্ম হয়। বৃক্ষের পাতা, ডালপালার পচানীতে শক্তিশালী সার থাকে এবং অনুরূপ জঙ্গল সৃষ্টিতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিশ্বের কোন পদার্থের বিনাশ নাই— আছে শুধু রূপান্তর। জীবজগতে যেরূপ একটি মাত্র প্রাণ হইতে ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে প্রাণীজগতের সৃষ্টি হইয়াছে তেমনই বৃক্ষলতার জীবনে উহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। সুন্দরবনের সর্বত্র নদী নালা ও খাল জালের ন্যায় বিস্তৃত। নদীর জলে সমস্ত সুন্দরবন জোয়ারের সময় প্লাবিত হইয়া যায় এবং ভাটার সময় ঐ জল অসংখ্য নির্ঝরিণী দিয়া খালে ও নদীতে পতিত হয়। সুন্দরবনের লোকেরা এই সমস্ত জল নিকাশের নির্ঝরিণীকে শীষে, ঝরা বা ঝরণা বলিয়া থাকে। দৈনিক দুইবার জোয়ারের জল উঠানামার জন্য সুন্দরবনের সর্বত্র কর্দমাক্ত থাকে।

সুন্দরবনের প্রায় একপঞ্চমাংশ জলভাগ এবং এই জলই সুন্দরবনের বৃক্ষলতার প্রাণ। নদী নালাসমূহ উত্তরদিক হইতে ক্রমাগত প্রশস্ত হইতে হইতে অতলসাগরে মিশিয়াছে। শিবসা, পশর, হরিণভাঙ্গা প্রভৃতি নদী সমুদ্রতীরবর্তী মোহনায় পাঁচ-ছয় মাইল প্রশস্ত হইয়া ভয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সুন্দরবনের সমস্ত নদীর পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নহে। বেদকাশী—গাবুরা অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তি সুন্দরবনের নদনদী, খাল, নালা, জঙ্গল প্রভৃতির নাম দিয়া একটি শায়ের বা গান রচনা করিয়াছেন। কর্মক্লান্ত নৌকার মাঝিরা এবং গ্রামাঞ্চলে যুবকেরা চিত্ত বিনোদনের জন্য এই গানটি গাহিয়া থাকে।

"বলেন মূর্খ মেহের
শোনেন সবাই গাঙ্গের শায়ের
খোদার মহিমা বুঝা ভার,
বলেশ্বর, সুমতি, ভোলা,
ছাপড়াখালি, বড়শেওলা,
হরিণটানা, শরণখোলা
আমবাড়ে আর চান্দেশ্বর।
ঝাপা, কালিদা, কট্‌কা
জাভা আর মরা পশর ।।
ডাংমারী, বড়পশর, চিলে, ছুতোরখালী,
শিবসা নদী, পড়ে বড় স্রোত।
চা'লো বগি, হর মহল, সে নদীতে বহুজল

বেড়ী আদা চাকীর খাল।
আড়ো শিবসা আড়ের পথ
হড্ডা, মহিযে, ছাছোন হোগলা
ঝপে ঝপে মাইর কি মজ্জত।।
শাকবাড়ে—সিঙ্গা, গোলখালী
কুকুমারী; ভোমরখালী
হংসরাজ, কাগা, নীলকমল।
দোবেকী, ফিরিঙ্গি, মাম্‌দো
কেওড়াসুতী, বন্দো, ধক্কোলা।
লতাবেড়ী, আঠারবেকী, ভেটুইপাড়া, বালুইঝাকী,
কালিকাবাড়ী, বেকারদ'নে
আন্ধারমাণিক, আড়পাঙ্গাসে
ঝা'লে, পাটকোষ্টা, বাসে
গোলভক্‌সা, ধানীবুনে,
হরিখালী, মনসারবেড়,
পুষ্পকাটী সামনে।।
কালীলাট, বগী চেচানে,
কুড়েখালী, ভুয়ের দ'নে,
কাঠেশ্বর, সোনারূপা খালী।
দুধমুখ, লাঠিমারা, তের্‌কাটি ; ধানঘরা
আড়বাসে, দক্ষিণচরা, সাপখালী, কদমতলী
বুড়ের ডাবুর, লক্ষীপশর।
মান্‌কী, আশাশুনি।।
তালতক্তা, ধ্বজিখালী, মণ্ডপতলা, নেতোখালী
ভায়েলা, বাগানবাড়ী, ঝাড়াবাগ্‌না।
বগাউড়া, বক্‌শখালী
চাইলতাবাড়ী, সিঙ্গড়তলী, মাথাভাঙ্গা, কইখালী,
মথুরা, খাসীটানা।
আগুন জ্বালা, ফুলঝুরী,
কালাবগা, খাজুরদানা।।
শুবদে, গুবদে, সোনাইপাটী,

সোনাইর গাং, কানাইকাটী
মরিচঝাপী, নেতাই তালপাটী,
ধনপতি, রাজাখালী, মুক্তবাঙ্গাল, আরিজখালী,
দুবলার ট্যাক, বিন্‌জিলী
বিবির মাঁদে, চট্‌কাখালী,
দেউর মাঁদে, চাম্‌টা কাম্‌টা।।
কুঞ্চেমাটে, ব্যয়লা কয়লা,
মাদার বাড়ে, বয়ার নলা।
হান্‌ফে, কলাগাছে।
মূল্যে মেঘনা, বাট্‌লো, বেতমুড়ী, বুড়িগল্লী, চুনকুড়ি
মায়াদী, আর ফুলবাড়ী, তালতলী, আংরাক্‌না,
গাড়ার নদী, বাদামতলী, ভুতের গাং, বৈকুণ্ঠহানা,
কর্‌পুরো, ছায়া হল্‌ ডি, আড়াভাঙ্গা, তালপাটী,
খেজুরে, কুড়ুলে, ছোটশেওলা।
কাঁচিকাটা, কুকুমারী, দাইরগাং, বৈকিরী।
জলঘাটা, ইলিশমারী,
ঝল্‌কী, আব সাতনলা
হেলার বেড়, কালিন্দে,
শাকভাতে, গোন্দা আর পালা।।
তেরবেকী, তালবাড়ে, হেড়মাত্‌লা, ভূড়ভুড়ে,
ছদনখালী, ফট্‌কের দাঁণে
ভরকুণ্ঠে, কেঁদোখালী
নওবেকী, কলসের বালি
পানির খাল, কুলতলী
বলবাড়ে আর সুকুনে
মধুখালী, পাশকাটী,
গোছবা, ঘটিহারানে।।
জাবাত্তম, লোকের দ্বিপী,
ভাবিয়া আল্লার নবী,
জাম্বুরদ্বীপ, বাহার নদীপার
বড়মাতলা, পায়রাটুনী,

কালবেয়ারা, ঢুকুনী,
পারশেমারী, ঠাক্‌রুণী,
মানুষ সমুদ্রে যায়
ধান্‌চের নদী, নারায়ণতলী,
কলাগা'ছে, গঙ্গাসাগর।

সুন্দরবন এক আজব দেশ, ইহার নদীনালা অসংখ্য। প্রলয় ঝটিকার সময় এবং স্রোতাবেগে কত নৌকা নদীতে ডুবিয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৯৫১ সালে দক্ষিণ খুলনাব ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় একখানি হিন্দুস্থানী পাট বোঝাই বিশালকায় জাহাজ কলিকাতায় যাইবার পথে সুতারখালী গ্রামে শিবসা নদীর মধ্যে ডুবিয়া যায়। প্রাক্ বিভাগ যুগে এই নদী বহিয়া অসংখ্য পণ্যবাহী জাহাজ কলিকাতা, আসাম ও পূর্ববঙ্গ যাতায়াত করিত। বর্তমানেও সে লাইন আছে। তবে পূর্বাপেক্ষা কম জাহাজই চলাচল করিয়া থাকে।

দুই

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অতলস্পর্শ, 'বরিশাল কামান' ও সুন্দরবনের অবনমন

সুন্দরবনের দৃশ্য গুরুগম্ভীর অথচ নয়নাভিরাম। জীবনে সর্বপ্রথম যখন সুন্দরবন দর্শন করি তখন হৃদয় ভাবাবেগে অভিভূত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল এ যেন অজানা জ্বিন-পরীদের আবাসভূমি এবং আশ্চর্য এক দেশ। কিছু দূর হইতে সুউচ্চ বৃক্ষসমূহের মস্তক উন্নত অবস্থায় দর্শন করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। এহেন দৃশ্য সর্বদিকেই একপ্রকার। পর্বতের ন্যায় সুন্দরবন এখানে সেখানে উচুঁ-নীচু নহে। সর্বত্র বৃক্ষের মস্তক সমানভাবে বর্ধিত। নদীতীরে বৃক্ষরাজির শ্রেণী দেখিলে মনে হয় কোন ঐন্দ্রজালিক হস্তের দ্বারা মনোরম বাগিচা সুসজ্জিত হইয়াছে।

জঙ্গলের বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে জন্মিবারও কারণ আছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, জোয়ারের সময় বৃক্ষের পক্ক ফলগুলি ঢেউয়ের ধাক্কায় একই লাইনে জমা হয়। জোয়ারের জল সরিয়া গেলে ফলগুলি মাটিতে বসিয়া একই লাইনে অঙ্কুরিত হয় ও সুন্দরভাবে একই শ্রেণীতে বর্ধিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য জঙ্গলে একই প্রকার বৃক্ষ একই স্থানে বহুলাংশে দৃষ্ট হয়। ইহারও অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। জোয়ার-ভাটা কম-বেশী ও ঋতু পরিবর্তনের জন্য তীরবর্তী স্থানে বা জঙ্গলের অভ্যন্তরে একই শ্রেণীর বৃক্ষের অবস্থান হওয়া স্বাভাবিক। গৃহস্থের দ্বারা সযত্নে প্রস্তুত উদ্যানসমূহের চেয়ে সুন্দরবনের বৃক্ষরাজির একত্র সমাবেশের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। বৃক্ষের ডালপালা ছাতার ন্যায় উপরিভাগে বিস্তৃত। সূর্যকিরণ পাইবার জন্য উহারা যেন একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে।

সুন্দরবনে নূতন চর উঠিলে অল্পদিনের মধ্যে অসংখ্য বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া সবুজ শোভা ধারণ করে। চারাগাছের শ্রেণীসমূহ পাটক্ষেতের ন্যায় মনে হয়। একদা পাঠাকাটা নদীর পূর্বতীরে এক নূতন চরে মধ্যবয়সী কয়েকশত কেওড়া গাছের এক ক্ষুদ্র জঙ্গল দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আমরা মোটর লঞ্চে প্রায় পঞ্চাশজন দর্শক। কেহই বলিতে পারিল না কোন্‌টি বড় আর কোন্‌টি ছোট। সর্বত্র সবুজের রাজত্ব এবং একই দৃশ্য। পার্শ্বে নারিকেলচারার ন্যায় অসংখ্য গোলগাছের শ্রেণী, অপরূপ বন্য শোভা ধারণ করিয়াছে।

ইরানের শাহানশাহ ইং ১৯৫৭ সালে সুন্দরবন পরিভ্রমণ করেন। তিনি অরণ্যসঙ্কুল এই সুন্দরবনকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মনোরম ও ভয়াবহ সমুদ্র উপকূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে নরখাদকেরা স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ফেনসেকো ও এণ্ড্রু নামক দুইজন পুরোহিত বাকলা হইতে চণ্ডিকানের পথে সুন্দরবনের নদীনালা, বিটপী শ্রেণীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এই বনে ফলবান বৃক্ষ নাই বলিলেও চলে। পুষ্পোদ্যানও এখানে নাই। বৃক্ষগুলি বৎসরে সর্বসময়ে সবুজরূপ ধারণ করিয়া থাকে। কোন সময় ইহার রূপ পরিবর্তন হয় না। সুন্দরবনের বৃক্ষরাজি প্রায়ই সুদীর্ঘ এবং আকাশগামী। ইহার শাখা-প্রশাখা অধিক নহে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু সুন্দরবনের নদীনালার আধিক্য আরও বেশী। সুন্দরবনের প্রায় একপঞ্চমাংশ জলভাগ এবং এই জলস্থলই সুন্দরবনের প্রাণ। উহা যুগ যুগ ধরিয়া সুন্দরবনের সৌন্দর্য রক্ষার্থে স্বীয় কর্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে। সুন্দরবনের সমস্ত নদীই সাগরমুখী এবং নদী যতই দাক্ষণে গিয়াছে ততই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইয়াছে। নদীর দুই কূল বহিয়া কত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে ধাবিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জঙ্গলময় প্রদেশের নদীর বর্ণনা দিতে গিয়া প্রাচ্যের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ

নদী চলিছে ডাহিনে বামে
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
হোথায় গহন গভীর বন
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে,
ঘাড়ে পড়ি আসে এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ,
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে
জল চকোচকো করি চাটে।

নদী হইতে উভয় পার্শ্বস্থ সুন্দরবনের দৃশ্য একই রূপ। গাছগুলি যেন সর্বত্র সমানভাবে দণ্ডায়মান। "নদীসমূহের পার্শ্বে কোথাও বলার ঝোপ এবং বন্য সুন্দরী ও হেন্তাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গাছসমূহ স্রোতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীরভূমি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও সুন্দরী, পশুর, গর্জন বা আমূড় প্রভৃতি বৃক্ষের শিকড়সমূহ বাহু বিস্তৃত হইয়া প্রবল প্রবাহ হইতে বৃক্ষাদি রক্ষা করিতে গিয়া ভগ্ন তীরের সহিত জড়াজড়ি করিতেছে। কোথাও বা নদী হইতে খাল উঠিয়া আঁকাবাঁকাভাবে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া অন্য নদী বা খালের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। নদীনালা ও খালসমূহ যেন সুন্দরবনের সর্বত্র জাল বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। নদী বা খালের উভয় তীরে গোলগাছের সারিগুলি প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া এক অদ্ভুত অথচ মনোরম বন্য শোভা বিস্তার করিয়াছে।"

যে-কোন নদীর শেষ প্রান্ত বা ত্রিমোহনায় পৌছিলে বনস্থলীর অপূর্ব শোভা উপভোগ করা যায়। মাঝে মাঝে চর ও নদীর মধ্যবর্তী বা পার্শ্বে দ্বীপ পরিলক্ষিত হয়। কোথাও

দেখা যায় বানরেরা দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়া ও কৌতুক করিতেছে। ক্রীড়ারত সুন্দরবনের এই সমস্ত সুচতুর জন্তুর অঙ্গভঙ্গীর দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। বানরেরা কোথাও ডালে ডালে নাচিয়া বেড়ায় এবং বৃক্ষের শাখা, ফল ও পাতা ভাঙ্গিয়া হরিণের দল ডাকিয়া আনে এবং উহাদিগকে তাহা খাইতে দেয়। হরিণের সঙ্গে বানরের সখ্যতা অত্যধিক। শিকারী বা ব্যাঘ্রের আগমনে বানরেরা হরিণদের সরিয়া যাইবার জন্য সংকেতসূচক ধ্বনি করে। আবার বানরেরা হরিণের পিঠে চড়িয়া আনন্দ করিয়া থাকে। সুন্দরবনে চলিতে চলিতে প্রায় সর্বপ্রকার জীবজন্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। অতিমাত্রায় হুশিয়ার এই জন্তু।

সুন্দরবনের সুন্দর হরিণ এক অমূল্য সম্পদ। হরিণেরা দলে দলে বনানীর পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত ময়দানে চরিয়া বেড়ায়। দূর হইতে ডাক দিলে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায় এবং শিকারী দেখিলে সভয়ে প্রস্থান করে। হরিণের চক্ষু প্রখর এবং গতি ক্ষিপ্র। অনেক সময় অসংখ্য হরিণ ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করিয়া আহার সংগ্রহ করে। জঙ্গলের মধ্যে এই ধরনের অপূর্ব শোভা দর্শনে ভ্রমণকারীর হৃদয় পুলকিত হয়। মানুষ নিকটবর্তী হইলে হরিণ দৌড়াইয়া বনস্থলীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সুন্দরবনে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এই সমস্ত দ্বীপের জঙ্গল গভীর। এখানে প্রচুর পরিমাণে হরিণ থাকে। তাড়া পাইলে দলে দলে হরিণ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং ক্ষিপ্রগতিতে অন্য তীর বা দ্বীপে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

খালের পার্শ্বস্থিত বনরাজির দৃশ্য আরও সুন্দর। উহার পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিকারীরা ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকার করিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ করে। নদীর পার্শ্ববর্তী চর বা দ্বীপের উপর জল তেমন স্রোতস্বিনী নহে। এবম্প্রকার স্থানে অসংখ্য পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে আশ্রয় লয় এবং আহার সংগ্রহ করে। নানা বর্ণের পক্ষীর দৃশ্য সত্যই আনন্দদায়ক। ভীমরাজ, টিয়ে, মানিকজোড়, গগনভীর, মাছরাঙ্গা, গয়াল, শাম্‌খোল, বাটাঙ, করমকুলী প্রভৃতি পক্ষী সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এইসমস্ত পক্ষীকুল জঙ্গলের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। খলসীর চর, মালঞ্চ, দুবলা দ্বীপ, কটকা, আলকী ও অন্য সমস্ত স্থানে পক্ষীরা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়ায়।

সূর্যাস্তের প্রাক্কালে একবারে শেখের ট্যাকে পৌঁছি। সবুজ বৃক্ষরাজির উপর সূর্যের কিরণ পড়ায় উহার শোভা আরও বর্ধিত হইয়াছিল। শিবসা তীরে প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ ও শেখেদের বাড়ী দেখিয়া শেখের খালের মধ্য দিয়া চলিলাম। খালের উভয় তীরে ঘন গোলগাছ, হেন্তাল ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। অতঃপর কালীবাড়ী ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিয়া শেখের ট্যাকেই রাত্রি-যাপন করিলাম। রাত্রিতে গ্রামাঞ্চলের ন্যায় পাখীর কলরব শ্রুত হইল না। দক্ষিণে আলকীর নিকট কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হইল। দ্বীপগুলির নাম যথাক্রমে আলকীরমাদে, ফুলমাদে, টিবলেরমাদে, বাহিরমাদে, বড়মাদে, ছোটমাদে। সুন্দরবনের মধ্যে নদীবেষ্টিত এই দ্বীপগুলির অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুলিবার নহে। এই সমস্ত দ্বীপে প্রচুর হরিণ বাস করে।

আমরা এখানে একদিন অবস্থান করিলাম। খলসীর চরে গিয়া আর একদিন তথায় অবস্থান করিলাম। এই চরে বহু নূতন বৃক্ষ গজাইয়া উঠিতেছে। এক স্থানে একটি ফুটবল খেলিবার মাঠের ন্যায় বিস্তৃত ময়দান। দুই দিকে গোল পোষ্ট দিয়া এখানে রীতিমত ফুটবল খেলা যায়। এখানে কেওড়া গাছের আধিক্য এবং নদীতীরে হরিণ দলবদ্ধ হইয়া কেওড়া ফল ভক্ষণ করে। খলসীর চরে এক প্রকার ধানের গাছ দেখিলাম। উহাকে সুন্দরবনের লোকেরা ধানী বলে। খরচ পোষায় না বলিয়া উহা কেহ কাটিয়া লয় না। ধানী গাছের মধ্যে নানাবর্ণের পক্ষী আপনমনে আহার সংগ্রহ করে। এই চরে প্রচুর গোলগাছ আছে। বন্য মোরগ-মুরগীও এখানে দৃষ্ট হইল। এই চরের সৌন্দর্য বর্ধিত হইয়াছে উহার সুউচ্চ ভূমির জন্য। কর্দমাক্ত স্থান এই চরে নাই। সুন্দরবনের বিরক্তিকর শুলো ও হ'দোবন খুবই কম। জুতা পরিধান করিয়া শীত-গ্রীষ্মকালে এখানে চলাফেরা করা যায়। বৃক্ষের নীচের পথগুলি খুবই পরিষ্কার। এখানে আমুড় বৃক্ষ অত্যধিক। বহু চারাগাছ হরিণে শিং দ্বারা নষ্ট করিয়াছে। তবুও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই চরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি। এখান হইতে পাঠাকাটা এবং তথা হইতে ত্রিকোণ দ্বীপ ও নীলকমল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে করিতে কতই না আনন্দ উপভোগ করিলাম। মনে হইয়াছে কি অপূর্ব এই দেশ! আর সৃষ্টিকর্তা কিরূপ নিপুণ তুলিকায় শ্রেণীবদ্ধ জঙ্গল সৃষ্টি করিয়া তাহারই কারুকার্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। ইরাণের মহাকবি শেখ সা'দীর একটি আধ্যাত্মিক কবিতা মনে পড়িয়া গেল। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বর্গে দরখ্‌তানে সব্‌য্‌'দর নয্‌রে হুশিয়ার্‌
হর্‌ ওর্‌কে দফ্‌তরেস্ত মা'রেফাতে কির্‌ দিগার।"

—হে প্রভু! তোমার মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য সহস্র খণ্ড হাদীস ও দর্শনের প্রয়োজন হয় না। ঐ যে শ্যামল তরুশিরে সুচিত্রিত পল্লবরাজি, তত্ত্বজ্ঞানীর নয়নে উহার প্রত্যেকটি পত্র তোমার মহিমা সম্পর্কে এক একটি মহাগ্রন্থ স্বরূপ।

সুন্দরবনের আরম্ভ হইতে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত সর্বত্র মনোরম দৃশ্য। সে দৃশ্যের ব্যাপক বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। পাঠাকাটার জঙ্গলে বাঘের আড্ডা খুব বেশী। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে সেই জন্য দ্বিতীয় টাইগার পয়েন্ট বলিয়া থাকে। এই জঙ্গল অত্যন্ত গভীর এবং সুন্দর।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের জঙ্গলের মধ্যে সুব্‌দী নামক স্থানে পাখীদের একটি বিরাট আড্ডা। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ পাখী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃক্ষের উপর অসংখ্য বাসা বাঁধিয়া পাখীরা বসবাস করে। এত বিপুল সংখ্যক পাখী মানস সরোবর ভিন্ন পৃথিবীর কোথাও একত্রে বাস করে কিনা জানা যায় নাই। বড় বড় স্টেডিয়ামে খেলা শেষ হইবার পর যেরূপ মানুষের মস্তকে মাঠ ভরিয়া যায় উহার চেয়েও অধিক সংখ্যক পাখী এখানে একত্রে চলাফেরা করে। এই জন্য এই স্থানকে সাধারণে "পাখীর আলয়" বলিয়া থাকে।

জুলাই মাসের দিকে পাখীর আড্ডা আরও অধিকভাবে জমিয়া থাকে। বৎসরের এই সময় লক্ষ লক্ষ পাখীর অবস্থান এক অভাবনীয় ও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এ দৃশ্য না দেখিলে এরূপ বর্ণনা বিশ্বাস করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। এখানকার পাখীর মধ্যে শাম্‌খোল, বক, বিলবাচ্চু এবং বাঁশীচোরা পাখীর সংখ্যাই অধিক। ভীমরাজ, কাক, পানকৌড়িও অসংখ্য দৃষ্ট হয়। অকস্মাৎ সম্প্রতিকালে এখানে পাখীর বসবাস হ্রাস পাইয়াছে।

শরণখোলার মধ্যে খড়মা নদীর পার্শ্বে সোনামুখী বাওড়ে অসংখ্য পক্ষী দৃষ্ট হয়। পক্ষীর অভিনব ভিড় দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। বৃক্ষের ডালে ডালে অসংখ্য পাখী বাসা বাঁধিয়া থাকে। বৈশাখ হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত পক্ষীকুল এখানে থাকে। শীত সমাগমে উহারা অন্যত্র চলিয়া যায়। এখানে পাখীরা ডিম পাড়ে এবং অসংখ্য বাচ্চা ফুটাইয়া থাকে। ইহাই সুন্দরবনের দ্বিতীয় পাখীর আড্ডা। এ দৃশ্য যেমন অত্যাশ্চর্য তেমনই নয়নাভিরাম। চাঁদপাই রেঞ্জের জিউধারা অফিসের সন্নিকটে ঐরূপ পাখীর আর একটি আড্ডা আছে! শরণখোলা রেঞ্জের অধীন সুপতি ফরেস্ট অফিসের দক্ষিণে চান্দেশ্বর নামক স্থানেও পাখীর একটি আলয় আছে। এই সমস্ত স্থানে সাধারণতঃ শিকারীরা পক্ষী শিকার করে না।

সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমান্তে অনন্ত সাগর, সর্বত্র জলে জলময়। সাগর তীরে দুবলার চরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক বাঁধ সাগরের ঢেউ হইতে সুন্দরবনকে রক্ষা করে। বাঁধটি দর্শনে মনে হয়, ইহা মানুষের তৈয়ারী, কিন্তু আসলে উহা আপনা-আপনি গঠিত হইয়াছে। এই বাঁধের উপর হরিণ দলে দলে চরিয়া বেড়ায়। ব্যাঘ্ররাজ সুযোগ পাইলে খপ্ করিয়া হরিণ শিকার করিয়া থাকে। দুবলার চরে এক সময় একই সঙ্গে অন্যূন এক সহস্র হরিণ দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। দুবলার চর, টাইগার পয়েন্ট এবং "ফিসার ম্যানস দ্বীপ" হইতে সাগরের দৃশ্য অবলোকন করিতে বড়ই মধুর লাগে। সমুদ্র তরঙ্গ কোথাও তীরের মৃত্তিকা ধুইয়া লইয়া যাইতেছে। আবার কোথাও সমুদ্রের মধ্যে চর পড়িতেছে। শীতকালে যখন সমুদ্রের ঢেউ শান্তভাব ধারণ করে, তখন অসংখ্য নৌকা বাদাম তুলিয়া সমুদ্রের মধ্যে মৎস ধরিবার জন্য যাতায়াত করে। এ দৃশ্য অতীব আনন্দদায়ক। সমুদ্র হইতে জঙ্গলের দৃশ্যও খুব সুন্দর দেখায়।

জনমানবশূন্য নির্জন স্থানে বিশাল সমুদ্রের জলরাশি ও তরঙ্গমালা এবং পার্শ্বেই গভীর এবং সুদৃশ্য অরণ্যানীর মধ্যে জালিয়াদের বসবাস ও চলাফেরা দেখিলে অন্তর পুলকিত হয়। এ দৃশ্য যাঁহারা স্ব চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই উহার সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছেন।

গহীন বনানীর পার্শ্বে সাগরের মধ্য হইতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর। আমরা একদা মোটরলঞ্চে বসিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে সূর্যাস্তের ছবি দর্শন করিতে থাকি। লোকালয় হইতে সূর্যাস্ত যত তাড়াতাড়ি বোঝা যায়, এখানে ঠিক তার বিপরীত। অনেকক্ষণ সূর্য রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। শুধু রক্তিমবর্ণ নহে, রঙের

ইন্দ্রধনু রচনা করিতে থাকে। বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হইলে সূর্য ক্ষুদ্রাকারে পরিবর্তিত হইতে থাকে। দুবলা দ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্য হইতে এই সূর্যোদয় অবলোকন করিতেছিলাম। সেই স্থান হইতে পশ্চিমে আকাশ একেবারে পরিষ্কার—অনন্ত সাগর, শুধু জল আর জল। সেই জন্য সূর্যাস্ত দর্শনে আমাদের আদৌ বিঘ্ন হইল না। সূর্য যে স্থানে অদৃশ্য হইতেছে মনে হইল দূর-দূরান্তের অসীম নীলাকাশের সব কিছুই নয়নগোচর হইতেছে। চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় সূর্য যেন ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং ধীরে ধীরে আপন মনে অদৃশ্য হইতে লাগিল। আমাদের সম্মুখে ও পিছনে অনন্ত সাগর, উত্তর দিক বিশাল সুন্দরবন, আকাশের সুদূর পশ্চিম সীমায় সূর্যালোকের এই খেলা সমুদ্র হইতে যেরূপ অবলোকন করা যায় এইরূপ আর কোথাও সম্ভব নহে। উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে এহেন দৃশ্য বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর।

সুন্দরবন যেমন অভিনব উহার পার্শ্ববর্তী অধিবাসীরা তেমন বিশিষ্ট ধরনের। চিরসবুজের মেলা এই সুন্দরবন এবং তৎপার্শ্ববর্তী বাকেরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চল। এ সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন ঃ

"ছায়া ঢাকা পাখী ডাকা" প্রকৃতিব অভিনব খেলা
সীমাহীন নদনদী, আ-দিগন্ত সবুজের মেলা।
... ...
আশ্চর্য মানুষ সব; অত্যাশ্চর্য জীবনের ধারা।
বৈদেশিক জলদস্যু পর্তুগীজ-মগ-ফিরিঙ্গিরা
পারেনি ছিনিয়ে নিতে অতীতের বিপুল সম্পদ,
সমুদ্রের বালুচরে গড়ে ওঠা এই জনপদ"

পূর্বেই বলিয়াছি সুন্দরবনের নদী-নালা স্থানীয় ভ্রমণকারীদের নখাগ্রে। সুন্দরবন সম্পর্কে তাহারা গল্প রচনা করে। ভৌতিক, আধিভৌতিক, কাল্পনিক গল্পের আসর জমাইয়া সুন্দরবনের লোকেরা চিত্তবিনোদন করে। নৌকা চালাইবার সময় এবং বিশেষ করিয়া নৌকা ছাড়িবার সময় মাঝিরা গাজী গাজী ও বদর বদর বলিয়া পীরবদর ও গাজীকে স্মরণ করিয়া থাকে। বিচিত্র এ জঙ্গল এবং উহার সব কিছুই বৈচিত্র্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বের কোথাও এহেন বৈচিত্র্যময় গহীন অরণ্য নাই। প্রকৃতির এ এক অভিনব অবদান। জনৈক সৌন্দর্যপ্রিয় কবি বলিয়াছেন ঃ

পেয়েছে শ্যাম সুন্দর সুন্দরবন
অপরূপ শোভা ফিরিতে চাহেনা নয়ন।

সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী জমিতে প্রচুর ধান্য ফসল ফলে। এখানকার জমি উর্বর এবং বাঁধ বা ভেড়ী থাকিলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। লবণাক্ত ও সুমিষ্ট জলের সংমিশ্রণে ধান্য সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়। এমন একটি মনোরম স্থানের শরৎকালীন ধান্যের আবাদ দর্শনে ডি. এল. রায় তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "আমার জন্মভূমি" রচনা করিয়াছিলেন।

খুলনা শহরের পূর্বে রূপসা নদীর তীরে একটি বহু পুরাতন অচেনা বৃক্ষ আছে। সেই জন্য লোকে উহাকে অচিন বৃক্ষ বলিয়া থাকে। এই বৃক্ষতলে বসিয়া কবিতাটি রচিত হয়। ডি. এল. রায় তখন খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কবিতাটির কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়েঘেরা
... ...
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী।
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে —
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

বঙ্গসাহিত্যে এই কবিতাটির স্থান অতি উচ্চে। "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" প্রাচীন বাংলাদেশের সমস্ত অংশই স্বাধীন বাংলাদেশভুক্ত হইয়াছে। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ আর কোথাও নাই। সুন্দরবনেব অবস্থিতি সৌন্দর্যকে আরও মনোরম রূপদান করিয়াছে।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এক সময় খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তখন তিনি সুন্দরবন ভ্রমণ করিতেন। সুন্দরবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে তিনি সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের গম্ভীরনাদিনী বারিধিতীরে বসিয়া তিনি উপন্যাস রচনার বিষয় চিন্তা করিতেন। গভীর জঙ্গলের প্রচ্ছদপট সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাব বিখ্যাত উপন্যাস 'কপাল কুন্ডলা' গ্রন্থের পটভূমি রচিত হইয়াছিল। পুস্তকের প্রথম অংশের রোমাঞ্চকর কাহিনী সুন্দরবন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। গল্পের নায়ক নবকুমার সঙ্গীদের জন্য জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নৌকায় ফিরিয়া আসে নাই। ইতিমধ্যে নৌকার অন্যান্য আরোহীরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নবকুমারের সন্ধান না পাইয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। একদিকে ভীষণ জোয়ারের টান অন্যদিকে নবকুমারকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে, নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া সহযাত্রীরা তাহার আশা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এইসব ঘটনাবলী আমাদের আলোচ্য সুন্দরবন হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়।

এখনও নবকুমারের ন্যায় কত নিরীহ ব্যক্তি জঙ্গলে হারাইয়া যায় বা প্রাণ ত্যাগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কবি ও সাহিত্যিকদের ভূরি ভূরি উপকরণ এই সুন্দরবনের সর্বত্র বিদ্যমান; কয়জন উহার খোঁজ রাখে? সুন্দরবন শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এক মনোরম গহীন অরণ্যসঙ্কুল স্থান নহে; উহা রহস্যময়ী ও অভিনব এক দেশ।

বর্তমানে সুন্দরবনের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। এই বিস্ময়কর জঙ্গলের মধ্যে একটি জাতীয় পার্ক স্থাপনের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন।

অতলস্পর্শ ও বরিশাল কামান : সুন্দরবন চিরদিনই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বর্মরূপে উহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সাগরের সীমা যতই দক্ষিণগামী হইতেছে সুন্দরবনও সেই অনুপাতে দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে। দেশের জলবায়ু এবং ভূমির উর্বরতার উপর সুন্দরবনের প্রভাব অত্যধিক। সুন্দরবনের সর্বত্র মৃত্তিকার নিম্নে জল সঞ্চিত থাকে। বনবৃক্ষসমূহ সেই সঞ্চিত জল হইতে উৎপন্ন রসাংশ পত্রসমূহের ভিতর দিয়া বায়ুতে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ইহার দ্বারা আকাশের বায়ু-শৈত্য রক্ষিত হয়। বৃক্ষের পত্রসমূহ যেখানে গরম থাকে সেখানে গ্রীষ্মের প্রখরতা উপলব্ধি করা যায় না। যেখানে জঙ্গল নাই সেই স্থান অতিবৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃক্ষহীন উলঙ্গ প্রদেশ বর্ষায় ভাসিয়া যায়; সেখানকার মৃত্তিকা যথেষ্ট জলগ্রহণ করিতে পারে না; অথবা সে জলপ্রবাহ দূরবর্তী স্থানে গিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকার মধ্যে জলাংশ এবং বায়ুস্তরে জলীয় বাষ্প হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় আবশ্যকীয় শস্যাদির সমধিক ক্ষতি হয়। এজন্য পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জঙ্গল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে জঙ্গলের প্রাচুর্যের জন্য এদেশে অনিষ্টের আশংকা কম। এতদঞ্চলে যদি বিশাল অরণ্যানী না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গোপসাগরের মেঘমালা উত্তর মুখে বহুদূরে গিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে বারিবর্ষণ করিত। তখন এই প্রদেশ বালুকাপ্রান্তরে পরিণত হইয়া মানব বসতির অযোগ্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিত।

সুন্দরবনের অবস্থিতির জন্য দেশ অনেক বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইতেছে। সমুদ্রের অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস প্রবল হইলেও দেশ ভাসিয়া যাইবার ভয় নাই। সামুদ্রিক ঝড় বা বায়ুপ্রবাহ বসতিস্থানসমূহ উৎখাত করিতে পারিবে না। সুন্দরবন আবাদ করিলে বর্তমান সময় অপেক্ষা বহু গুণে আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। এক সময় সুন্দরবনের জঙ্গল ধ্বংস করিয়া সমস্ত স্থান আবাদ করার পরিকল্পনা চলিতেছিল। অনেক গবেষণার পর সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। জঙ্গল কাটিয়া দিলে দেশে বর্ষা হইবে না এবং ঝড় ও প্লাবনের আধিক্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। সেইজন্য সুন্দরবন জাতীয় জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

সুন্দরবন আবাদ করা সম্ভবপর নহে। জঙ্গলের মধ্যে বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় জোয়ার আসে। জমি আপনা আপনি না উঠিলে কৃত্রিম উপায়ে উহাকে উঠান যায় না। সে স্থানে ভূমি নিম্ন থাকে সেখানে শত চেষ্টা করিয়াও জঙ্গল ধ্বংস করা যায় না। উহা কাটিয়া ফেলিলে পানির সাহায্যে আবার জন্মিয়া থাকে। জমি যখন আপনা আপনি উত্থিত হয়, তখন মানুষের হস্তে পড়িয়া আবাদযোগ্য ও বাসের উপযোগী হয়। ক্রমে জমি উচ্চ হইলে বসতবাটী স্থাপিত হয় এবং ফল-ফুলের বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের স্মৃতি লোপ পায়। তবে পুকুর খননকালে গাছের গুঁড়ি প্রায়ই

সেইসব স্থান হইতে বাহির হয়। কোন স্থানে একবার বহুকালের কাঁচা গোলপাতাও মৃত্তিকার নিম্নে পাওয়া গিয়াছে।

সময় সময় প্রাকৃতিক বিপ্লব আসিয়া সুন্দরবনের ঘোর পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। কখনও কখনও ঝটিকায় বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয়া ফেলে। বড় বড় নদী প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মজিয়া যায়, আবার একটি ক্ষুদ্র খাল ভীম মূর্তি ধারণ করে। কোন কোন স্থান মৃত্তিকা অবনমনের জন্য জলমগ্ন হয় এবং কোথাও উচ্চ ভূমি সৃষ্টি করে। পুনরায় হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া বসতবাটী এমনভাবে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া যায় যে, উহা বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন মানুষ বাধ্য হইয়া অন্যত্র হিজ্‌রত করে। ভগ্ন ও পরিত্যক্ত ভিটায় বৃক্ষ জন্মিয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। ঝটিকা, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি দুর্যোগ সুন্দরবনের পতনের কয়েকটি কারণ তাহা সহজেই অনুমেয়। ফার্গাসন ও বিভারিজ স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গোপসাগরের মালঞ্চ মোহনা ও রায়মঙ্গল হইতে দক্ষিণদিকে একস্থান অতলতল (Swatch of no ground) আছে। ইহা ২১° হইতে ২২° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। তীরবর্তী স্থান হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অতলতলের অবস্থান। এই স্থানের চারিদিকের জলের গভীরতা ৫০/৬০ ফুট। কিন্তু অতলতল বা অতলস্পর্শের গভীরতা প্রায় আঠার শত ফুট হইবে। এই স্থানের কয়েক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ৭০০ ও ১০০০ ফুট নিম্নে মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই প্রকার গভীর অতলতল বঙ্গোপসাগরের আর কোথাও আছে কিনা জানা নাই। ফার্গাসন বলেন যে, বঙ্গোপসাগরের পূর্বে পশ্চিমদিক হইতে বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতের জন্য ঐ স্থানে আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য সেখানে কোন মৃত্তিকা জমিতে পারে না। সুন্দরবনে ভূপঞ্জরের তলদেশ হইতে মাটি অবিরত অল্প অল্প ধুইয়া স্রোতের গতি অনুযায়ী এই অতলতলের গহ্বরে পড়িতেছে। এইভাবে মাটি সরিয়া যাইতে যাইতে হয়ত বহুদিন পরে জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগের অতিরিক্ত ভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিকে কোথাও বসাইয়া দিয়া যায়। জমি নীচু হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ জলপ্লাবনে সেইস্থান জলমগ্ন হয় আবার সেই জল পলির সহিত মিশিয়া ধীরে ধীবে জমির উচ্চতা সম্পাদন করে। অতলস্পর্শের জন্য এইভাবে মাঝে মাঝে সুন্দরবনের উত্থান ও পতন হয়। বিভারিজ সাহেব বলেন যে, পূর্বে বহু বাড়ীঘর সুন্দরবনে ছিল। অতলতলের জন্য জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় সে সমস্ত নিশানা মুছিয়া গিয়াছে। "ম্যানুয়াল অব দি জিওগ্রাফী অব ইণ্ডিয়ার" লেখক বলেন যে, অনুরূপ একটি অতলতল সিন্ধু ব-দ্বীপের অদূরে সাগরবক্ষে বিদ্যমান আছে। বিভারিজ ও ফার্গাসনের মতে এই অতলস্পর্শই সুন্দবনের অবনমন ও উহার সাময়িক ধ্বংসের প্রধান কারণ। আধুনিক যুগে মিঃ য়্যাডামস উইলিয়ামস অতলস্পর্শ সম্পর্কে সর্বশেষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"অতলতল বঙ্গোপসাগরের অতি প্রাচীনকালীন মূল তলদেশ এবং এখানে বহুকাল যাবৎ গঙ্গার পলিমাটি জমিতে পারে নাই।"

উপরে যে অতলস্পর্শের কথা বলা হইল উহা যেমন আশ্চর্য ও ভয়াবহ এবং সুন্দরবন ধ্বংসের অন্যতম কারণ তেমনি ইহাকে আর একটি অত্যদ্ভুত ঘটনার মূল বলা হইয়া

থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মাঝে মাঝে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে কামানের আওয়াজের ন্যায় একপ্রকার গুরুগম্ভীর শব্দ শ্রুত হয়; এই শব্দ বরিশালের দক্ষিণাংশ হইতে আসিতেছে বলিয়া অনুমিত হয়; এই জন্য কতিপয় ইংরেজ লেখক ইহাকে "Barisal Guns" বা "বরিশাল কামান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বরিশালের সাধারণ লোকে উহাকে "গায়েবী আওয়াজ" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে.

এ সম্পর্কে এদেশে বহু আজগুবী প্রবাদ শ্রুত হয়। "হিন্দুরা বলে লঙ্কা দ্বীপে রাবণের বিশাল তোরণদ্বার খোলা বা বন্ধ করিবার সময় এইরূপ শব্দ হয়। মুসলমানেরা বলে ইমাম মেহদী আবির্ভূত হইতেছে এবং তাঁহারই আগমনবার্তা এই কামানের শব্দ।" কিন্তু ইহার কোনটাই ঠিক নহে। এই শব্দ এত দূরবর্তী স্থান হইতে আসে যে, সাধারণের গোচরীভূত কোন শব্দ ঐ ধরনের হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গবেষকদের কেহ কেহ বলেন, বঙ্গোপসাগরের অতলতল হইতে এই শব্দ উত্থিত হয়। যখন এতদঞ্চলের অনেক স্থান হইতে বর্ষাকালে বা প্রবল বারিপাতের পর এই শব্দ স্পষ্টভাবে শুনা যায়, তখন বর্ষা বা জলপ্রবাহের সহিত উহার কোন সম্পর্ক আছে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। একথা সঠিক যে, উক্ত আওয়াজ খুলনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব এবং বরিশালের ঠিক দক্ষিণে শ্রুত হয়। এতএব বরিশালের দক্ষিণে সাগরের মধ্যে উহাব স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্বোক্ত অতলতলের স্থান রায়মঙ্গলের মোহনার নিকটেই এবং খুলনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। শব্দটি যদি এই অতলস্পর্শ হইতে নির্গত হয়, তবে উহা খুলনার দক্ষিণে এবং বরিশালের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে শ্রুত হওয়া উচিত।

'হিস্টরী অব বাকেরগঞ্জের' লেখক বিভারিজ সাহেব বরিশালের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপাঞ্চলে ভ্রমণকালে তথাকার অধিবাসীদের নিকট জানিতে পারেন যে, তাহারা ঐ শব্দ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ও ঝটিকার সময় দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে শুনিতে পায়। উহা অবিকল কামানের আওয়াজের ন্যায়। বাগেরহাটের তৎকালীন এস. ডি. ও. বাবু গৌরদাস বসাক বলেন যে, সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে শব্দ আসিলে যতই দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাইবে শব্দ ততই উচ্চতর হইবে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াও কিছু নির্ণয় করিতে পারে নাই।

বাগেরহাটের গ্রামাঞ্চল হইতে পূর্বে এই শব্দ শোনা যাইত। পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের দক্ষিণ হইতে পূর্বে এই শব্দ শ্রুত হইত। পটুয়াখালী মহকুমার প্রবীণ এডভোকেট আসাদুল হকের নিকট শুনিয়াছি যে, পর পর তিনটি আওয়াজ হইত। দিনের বেলা এবং রাত্রেও এ শব্দ শ্রুত হইত। তিনি বলেন যে, ভাটার সময় সমুদ্রে প্রায় চল্লিশ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিত এবং অনুরূপ দুইটি ঢেউয়ের সংঘর্ষের ফলে ঐরূপ আওয়াজ শোনা যাইত।

বর্তমানে ঐরূপ আওয়াজ সচরাচর শ্রুত হয় না। ভোলা-পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ চর মমতাজ, আন্ডাচর, কুক্‌রী, মুক্‌রী প্রভৃতি স্থান হইতে এখনও বর্ষাকালে ঐরূপ

শব্দ শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন এই ভীষণ শব্দ গভীর সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের জন্য হইয়া থাকে। যখন ভীমবেগে প্রাধবিত তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে, তখন জলোচ্ছ্বাস প্রথমে উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠে, পরে ভীষণ বেগে নিম্নে পতিত হয়। ঐ ধরনের পতনকালে যে ভীষণ শব্দ হয়, তাহাই 'বরিশাল কামান'। এই শব্দটি সাগরের বিভিন্ন দিক হইতে শ্রুত হয়। বিভারিজ সাহেব বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, ইহা বায়ুমন্ডলের কোন বৈদ্যুতিক ব্যাপার হইতে সম্ভূত। আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, আরাকানের উপকূলে মৃত্তিকার তলদেশে একটি আগ্নেয়গিরিশ্রেণী আছে। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথে উহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ইহার অগ্ন্যুদ্গমের সহিত 'বরিশাল গানের' সম্বন্ধ থাকা একেবারে অসম্ভব নয়; তবে এখনও এ বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। এ সম্পর্কে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার আবশ্যক। স্থানীয় লোকে একে বলে সর ও বান ডাকা। এই শব্দ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় অত্যধিক হয়। সমুদ্রতীরবর্তী স্থান হইতে স্পষ্ট শোনা যাইত। ঢেউ অকস্মাৎ সুউচ্চ হইয়া চরভূমিতে আঘাত লাগিয়া ভীষণ আওয়াজ হয়।

'বরিশাল গান' ও অতলস্পর্শের মধ্যে কার্যকারণসম্পর্কে (causal connection) আছে কিনা তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই—উহা কেবল অনুমান মাত্র। তবে উক্ত দুই বিষয়েরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের মতে এই দুইয়ের সত্তা পৃথক। অতলস্পর্শ খুলনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং 'বরিশাল গান' অত্র জেলার বহু পূর্বে অবস্থিত। দুইয়ের দূরত্ব অন্যূন শতাধিক মাইল। সমুদ্রের গভীর তলদেশের নিম্নস্থ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অতলস্পর্শই যে সুন্দরবন অবনমনের অন্যতম কারণ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুন্দরবনের নিম্নস্থিত মৃত্তিকার কর্দমপ্রকৃতি অবনমনের দ্বিতীয় কারণ এবং ভূমিকম্পন দ্বারাও সুন্দরবনের ধ্বংস হইতে পারে। যাহা হউক বিভিন্ন প্রকারের অবনমনকেই সুন্দরবন ধ্বংসের প্রথম কারণ বলা যাইতে পারে।

ঝটিকা ও জলোচ্ছ্বাস : সুন্দরবন ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ জলপ্লাবন ও প্রবল ঝটিকা। প্রাচীনকালীন ঘটনাবলীর কোন ইতিহাস নাই। তবে মুঘল আমল হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে প্লাবন ও ঝড়ে সুন্দরবনের অসংখ্য জীবন ও ধন নষ্ট হইয়াছে। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এমন ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হয় যে, চন্দ্রদ্বীপরাজ্য জলমগ্ন হইয়া যায়। ৫ ঘন্টাব্যাপী ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়াছিল। সমুদ্রের তরঙ্গমালা সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ঘর-বাড়ী, নৌকা, জাহাজ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় এবং প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুন্দরবনেরও যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। সেই সময় হইতে এদেশে সুউচ্চ বাঁধ বা ভেড়ীর গুরুত্ব উপলব্ধ হইতে আরম্ভ করে।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ ঝটিকা হয় তাহাতে সগর দ্বীপে ৬০ হাজারের বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি ঝড়ে সুন্দরবনের বৃক্ষাদি ও

জীবনের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল। সুন্দরবনের নিকটস্থ লোকেরা ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিয়াছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পের সঙ্গে আর একটি ঝড় হয়। ইহাতে সুন্দরবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই ঝড়ের পর সুন্দরবনের মনুষ্য বসতির চিহ্নসমূহ লোপ পায়। ইহাতে ৩০ সহস্র লোক অকালমৃত্যু বরণ করে। প্লাবনে গঙ্গানদীর জল ৪০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে (১২৬৯ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ) সুন্দরবন অঞ্চলে ও যশোহর, খুলনায় যে প্রবল ঝটিকা হয় উহাতেও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই বিখ্যাত ঝড়কে 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' বলা হয়। অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশু এই ঝড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শতবর্ষ পূর্বের এই ঝড়ের কথা এখনও লোকমুখে প্রচারিত হয় ঃ

তাল গাছে বিড়ালের ছাও শালিক নেওট পাড়ে,
কত মানুষ গরু মারা গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে।

১৮৬৯ খৃঃ মে মাসে যে ঝড় হয় তাহাতে অসংখ্য গবাদি পশু ও মানুষ মারা যায়। সুপারী ও নারিকেলবৃক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয় অপরিসীম। একমাত্র মোরেলগঞ্জে ২৫০ জন লোক ঝড়ের চাপে মারা যায়। ১৮৯৫ খৃঃ বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায় প্রচণ্ডতম বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হয়। সুপারি গাছের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং লবণাক্ত জলপ্লাবনে ঐ বৎসরের আমন ধানের চারা নষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আরও দুইটি ভীষণ ঝড় হয়। শেষোক্ত ঝড়ে খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষ নদীতে এবং তীরে ৪ হাত জল উঠিয়াছিল। সুন্দরবনের দিকে ৯ হইতে ১২ ফুট পর্যন্ত জল হয়। এই ঝড় ও প্লাবনেই কালিগঞ্জের দক্ষিণে যমুনা নদী ভরাট হইয়া যায়। এই ঝড়কে কার্তিকের ঝড় বলে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর ঝড় হয় তাহাতে বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার প্রায় দুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। দৌলত খাঁ অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

এই সময় হইতে সুন্দরবনের পূর্বভাগ বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়ে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১২ মিটার উচ্চ এক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস মেদিনীপুর জেলার উপর প্রচণ্ডতম শক্তিতে আঘাত হানে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্যূন বিশ হাজার নৌ-যান নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। বিশ্বের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে এই জলোচ্ছ্বাস সর্বাধিক ভয়াবহ। ১৮৮০ খৃঃ প্লাবনে সগরদ্বীপ বিধৌত হইয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় ঝড় হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর (১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন)। এ ঝড় বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জেলায়ই অধিক হইয়াছিল। এই ঝড়ে অসংখ্য বৃক্ষ ভূপতিত হইয়া সুন্দরবনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। আর একটি ঝড় হয় বাংলা ১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে। এই ঝড়েও সুন্দরবনের ভীষণ ক্ষতি হয়। বহু পুরাতন বৃক্ষ এই ঝড়ে উপড়াইয়া ফেলিয়া দেয় এবং ঘরবাড়ী নষ্ট করিয়া দেয়।

সম্প্রতিকালে এক ভয়াবহ ঝড় হইয়াছে ১৯৬১ সালের ৯ই মে তারিখে। চট্টগ্রাম নোয়াখালির প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও প্লাবনের তাণ্ডব লীলার কয়েক মাস পরে এই ঝড় হয়। ঝড়ে খুলনা শহরের বৈদ্যুতিক তারসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বহু পুরাতন বৃক্ষাদি উৎপাটিত হয়। অসংখ্য ঘরবাড়ী উড়িয়া যায়। বরিশাল ও বাগেরহাটে উহার প্রকট প্রলয়ঙ্করী আকার ধারণ করে। এই ঝড় খুলনা-বরিশালের নারিকেল, সুপারি, আম-কাঁঠাল, লিচু-জাম, জামরুল ও অন্যান্য বৃক্ষের বাগ-বাগিচা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে খুলনা ও বরিশালের দক্ষিণে যে প্লাবন হয় তাহাও ঝড়ের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর। প্লাবনে মানুষ ও গবাদি পশু ভাসিয়া যায় এবং ঝড়ে সুন্দরবনের পূর্বদিকের বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই অধিকতর ক্ষতি সাধিত হয়। অনুরূপ আর একটি ঝড় হয় ১৯৬৫ সালের ১১ই মে।

এইভাবে মধ্যে মধ্যে ঝটিকা ও প্লাবনে সুন্দরবন ধ্বংস হওয়ায় মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। সর্বদা জোয়ারের জল আসিয়া সুন্দরবনের মাটিকে আর্দ্র করিয়া রাখে সেজন্যও বর্তমানে সুন্দরবনে মনুষ্যবসতি সম্ভবপর হয় না।

ভূমিকম্পও সুন্দরবন ধ্বংসের আর একটি কারণ। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পনে সুন্দরবনের ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল তারিখে এক ভূমিকম্প আরাকান হইতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা হইয়া কলিকাতা পর্যন্ত গিয়াছিল। এই সময় সুন্দরবন একপ্রকার ডুবিয়া গিয়াছিল। ১৮১০ ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে দুইটি ছোটখাট ভূমিকম্প হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্প সর্বাপেক্ষা গুরুতর। এই ভূ-কম্পনে বঙ্গদেশ হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। উহা দ্বারা সুন্দরবনের অশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্প ছিল আরও ভীষণ। এই ভূমিকম্পনে বাংলাদেশ ও তথা সুন্দরবনের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৫২ ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে সুন্দরবনের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়।

মগফিরিঙ্গি অত্যাচার : সুন্দরবন ধ্বংসের শেষ বা চতুর্থ কারণ মগ-ফিরিঙ্গিদের অমানুষিক অত্যাচার। ঝটিকা, প্লাবন ও ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আরাকানবাসী মগ ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচার চরমে পৌঁছিয়া দেশব্যাপী দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ফিরিঙ্গি জলদস্যুদিগকে হারমাদ বলিত। ইহারা কলিকাতার দক্ষিণাংশে অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালাইয়া তাহাদের অধীন করিয়া লইয়াছিল। মগেরা সুন্দরবনে কোন কোন স্থানে লোকশূন্য করিয়া "মগের মুল্লুকে" পরিণত করিয়াছিল।

বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বর্ণিয়ার বলেন যে, জলপথে ও স্থলপথে লুটতরাজ করাই পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার জাহাজের সাহায্যে তাহারা বাংলাদেশের মধ্যে শতাধিক মাইল প্রবেশ করতঃ লুটতরাজ করিয়া যাইত। ইহারা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মনুষ্যবসতিপূর্ণ গ্রাম, নগর, হাট-বাজার, বিবাহ মজলিস্ লুটপাট করিয়া অর্থ ও জিনিসপত্র লইয়া উধাও হইত। শিশু ও নারীদের বন্দী করিয়া তাহাদের উপর

অমানুষিক অত্যাচার চালাইত। কোন কোন স্থানে তাহারা অগ্নি সংযোগ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিত।

অন্য একটি বিবরণে জানা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরাকান অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গ ধ্বংস করিয়া উহার অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। মগদিগেব অত্যাচারে সুন্দরবন প্রদেশের অধিবাসীরা ঐ সময় স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে হিজরত করে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সুন্দরবন এককালে জনবহুল স্থান এবং উর্বর ক্ষেত্র ছিল। পর্তুগীজ ও আরকানীজ দস্যুদল মানুষ ধরিয়া ক্রীতদাসের ব্যবসায় চালাইত। মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার কাহিনী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

"ইষ্ট ইন্ডিয়া ক্রোনিক্‌ল্" হইতে জানা যায় যে, ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে মগেরা এই প্রদেশের ১৮০০ অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া তাহাদের রাজার সম্মুখে উপস্থিত করে। আরাকান রাজ তাহাদের মধ্য হইতে একদলকে বাছিয়া লইয়া নিজের দাসত্ব কার্যে নিয়োগ করেন। অবশিষ্ট লোকদিগকে গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। এই দাসগণ জমি চাষের কার্যে নিযুক্ত হয়। মাসিক খোরাকের জন্য প্রত্যেকের ১৫ সের করিয়া চাউল নির্ধারিত ছিল। এই সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী আমাদিগকে আরব জগৎ ও রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীনকালীন ভয়াবহ দাসত্ব প্রথার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার তদীয় মোগল আমলের ইতিহাস গ্রন্থে মগ-পর্তুগীজদের অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে এক হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি উক্ত বিবরণীতে শিহাব উদ্দিন তালিশ লিখিত ফার্সী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণীতে আছে ঃ

—মোগল সম্রাট আকবরের সময় হইতে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত আরাকানীজ মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণ জলপথে আসিয়া এদেশে লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু, মুসলমান, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের তালুতে একটি ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে সরু বেত ঢুকাইয়া দড়ির মত করিয়া বাঁধিয়া রাখিত। জাহাজে উঠাইয়া একজনের উপর আর একজনকে চাপা দিয়া পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া দিত। প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে পাখীদের খাদ্যের ন্যায় তাহাদিগকে চাউল ছড়াইয়া খাইতে দিত। যে সমস্ত বন্দী এত জুলুমের পরও বাঁচিয়া থাকিত তাহাদিগকে ক্ষমতানুযায়ী কাজে লাগাইত এবং অমানুষিকভাবে নির্যাতন চালাইত। আবার কোন কোন সময় বন্দীদের লইয়া ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। ফিরিঙ্গি দস্যুরা এই বিক্রয়কার্যে লিপ্ত থাকিত। বহু উচ্চ বংশীয় পুরুষ ও মহিলা দাসদাসী রূপে বিদেশে ব্যবহৃত হইত। ঐ সমস্ত দস্যুদের নির্মম অত্যাচারে তথায় বর্তমানে একখানা বসতবাটী অথবা আলো জ্বালিবার কোনও লোক নাই। উপরোক্ত অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। মনে হয় এও কি বিশ্বাস্য? এই ধরনের অত্যাচারের

ফলে যে সুন্দরবন জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা একেবারেই নিঃসন্দেহ। সুখের বিষয় বাংলার তৎকালীন মোগল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার কঠোর হস্তে দমন করেন। যেভাবে দস্যুগণ এদেশে অত্যাচার চালাইযাছিল, ঠিক সেইভাবে তাহারা অত্যাচারিত হইয়া চিরদিনের জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমাদের দেশে কোন অন্যায়, অবিচার ও জুলুম হইলে এখনও লোকে উহাকে "মগের মুল্লুক" বলিয়া তুলনা করে। অত্যাচারী বা অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে হইলে লোকে বলে "শায়েস্তা" করিয়া দিব। কথা দুইটির উৎপত্তি ঐ সময় হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

অধুনা সুন্দরবন ধ্বংসের আর একটি অস্বাভাবিক কারণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতিকালে একাধিকবার সুন্দরবনের জঙ্গলে আগুন ধরিয়া অসংখ্য বৃক্ষলতা পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণ লাগিয়া এই অগ্ন্যুৎপাতের কারণ ঘটায়। স্থানীয় লোকেরা বলে দুষ্কৃতিকারীর দল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপন ও ধান্যের আবাদ প্রস্তুতের জন্য এইভাবে আগুন ধরাইয়া জাতীয় সম্পদের সর্বনাশ করে। শেষোক্ত কারণই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চাঁদপাই ফরেষ্ট অফিসের কয়েক মাইল দক্ষিণে একই বৎসর (১৯৬৫ সাল) দুইবার জঙ্গলে আগুন লাগে।

গত ১৯৬৫ সালের মে মাসে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে সুন্দরবনের অসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। বহু সংখ্যক হরিণ ও কয়েকটি ব্যাঘ্রও ঝড়ের আক্রমণে মারা যায়। ঝড়ের পর পর যে আগুন লাগে তাহাতে অসংখ্য বৃক্ষ ভস্মীভূত হয়। সুন্দরবনের কর্দমাক্ত মৃত্তিকাও তৎসহ পুড়িয়া যায়। প্রায় এক হাজার একর ভূমির জঙ্গল অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপ দৈব দুর্বিপাক যথা ঃ—ঝড়, প্লাবন ও সর্বদা দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা সুন্দরবনের সম্পদ অপহরণ প্রভৃতি কারণেও সুন্দরবন দ্রুত ধ্বংসের দিকে আগাইয়া যাইতেছে।

একটি দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শতকরা ২৫ ভাগ ভূমিতে জঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ পবিমাণ জঙ্গল নাই। সুন্দরবন ধ্বংস হইলে দেশের সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। বাকেঁরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশে যেভাবে জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনের ধ্বংসলীলা চলিতেছে তাহাতে সমুদ্রেব তীরবর্তী সমগ্র এলাকায় গভীর জঙ্গলপ্রস্তুত করিলে দেশের সমূহ উপকার সাধিত হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

সন্দ্বীপ, হাতিয়া, চর জববার, মনপুরা, দৌলত খাঁ, ভোলা প্রভৃতি সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর যে অভূতপূর্ব জলোচ্ছ্বাস হয় তাহাতে অন্যূন দশলক্ষ লোক অকাল মৃত্যুবরণ করে। বিশ্বের অন্যান্য দুর্ঘটনা অপেক্ষা ইহা খুবই ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক। শুধু সাগরতীরে বাঁধের দ্বারা সম্ভব নহে, জঙ্গল সৃষ্টি করিলে এই ধরণের বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

তিন

সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব ও পুরাকালীন জনপদ

অতি প্রাচীনকাল হইতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগীরথী ও পদ্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগ যে পলিমাটি সংযোগে যুগ যুগ ধরিয়া গঠিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের প্রায় সর্বত্র যে এককালে সুন্দরবন ছিল অবস্থা দর্শনে তাহাই প্রমাণিত হয়। মানুষের প্রয়োজনে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থাৎ ভূমিকম্প, প্লাবন ও ঝটিকায় সুন্দরবনের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। বহুস্থানে সুন্দরবন সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং মনুষ্য বসতির প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরিয়া নগর ও লোকালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গোপাসাগরের তীরবর্তী স্থানে পলিমাটি জমিয়া এখনও চর পড়িতেছে এবং সুন্দরবন দক্ষিণ সীমায় আরও আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। সুন্দরবনের উত্তরদিকে জঙ্গল কাটিয়া বহু স্থান লোকালয়ে পরিণত করা হইয়াছে।

সুন্দরবন যে অতীব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে যেখানে সুন্দরবন ছিল এখন সেখানে শহর ও লোকালয়। গঙ্গানদীর শাখা-প্রশাখা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানের উপরিভাগ কালে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে। গঙ্গা হিমালয়ের শীর্ষ দেশ হইতে অত্যধিক পরিমাণে গৈরিকমৃত্তিকা বহন করিয়া সাগরে ফেলিয়া দেয়। এই মৃত্তিকা এবং নদীতীরস্থ ভগ্ন বা ক্ষয়িত ভূভাগ পলিমাটি রূপে নদীর মোহনার সন্নিকটে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে ক্রমে চরভূমির সৃষ্টি করে। প্রথমে উহা দ্বীপাকৃতি হয়, পরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়।

গঙ্গানদীর সুমিষ্ট জল ও সামুদ্রিক লবণাক্ত জলের সংমিশ্রণে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের জন্ম হয়। সুন্দরবনের বৃক্ষ জন্মাইবার ইহাই বৈশিষ্ট্য। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় মানব ইতিহাসের সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়াছে। এই অভাবনীয় প্লাবন ও ধ্বংসযজ্ঞ সমস্ত বিশ্বকে অভিভূত করিয়াছে। গঙ্গানদীর শাখা-প্রশাখাসমূহের মোহনা যতই দক্ষিণ দিকে সরিতেছে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন ততই দক্ষিণগামী হইতেছে।

এককালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আকৃতি ক্ষুদ্র ছিল এবং যশোর—খুলনা ও বাকেরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান অতল সমুদ্রের মধ্যে বিলীন ছিল। সেই সুপ্রাচীন কালের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। মৃত্তিকা খনন করিলে এখনও ব-দ্বীপেব বহুস্থানে বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যাইবে। তেরখাদা ও কালিয়া থানার বিভিন্ন স্থানে পুকুর খননকালে এখনও অসংখ্য বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যায়। উহাকে লোকে বচের গাছ বলে। মঠবাড়িয়া হাইস্কুলের পুকুব খননকালে সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছিল। ২৪ পরগনায় ও কলিকাতায় এবং যশোর-খুলনার বিভিন্ন স্থানে পুকুর খননকালে অসংখ্য বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলি সুন্দরী বৃক্ষের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দৌলতপুর থানার মধ্যডাঙ্গা ও খুলনা

শহরের বানিয়াখামার গ্রামে পুকুর খননকালে বহু প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ি আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।

দিগ্বিজয় প্রকাশে যশোর প্রদেশ কানন সংযুক্ত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পানিনির মহাভাষ্য পাতঞ্জলী আর্যাবর্তের সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া কালকবনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালকবনই সম্ভবতঃ সুন্দরবন।

টৈনিক বৌদ্ধ যুগেও সুন্দরবনের অস্তিত্ব ছিল। পরিব্রাজকদের বিভিন্ন বর্ণনায় সুন্দরবনের বিশিষ্ট রূপের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা হইতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়।

সুন্দরবন সেন রাজগণের রাজ্যাধীন ছিল। দিগ্বিজয় প্রকাশে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব যশোরেশ্বরীর সন্নিকটে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেন বংশের রাজত্বকালে সুন্দরবনের কোন কোন অংশে জনবসতি এবং কোন কোন স্থান গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বঙ্গে তুর্ক-আফগান শাসন দৃঢ় হইলে সুন্দরবন পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়।

ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় বলেন ঃ "পঞ্চদশ শতকে খান জাহান আলী সুন্দরবনের গভীর অরণ্য আবাদ করিয়া তথায় গ্রাম ও নগরের পত্তন করেন। খান জাহান আলীই প্রথমে সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য-ছেদন করিয়া উহাকে বৃহৎ জনপদে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সময় সুন্দরবনে যাতায়াতের পথ সুগম হয়।" খান জাহান প্রসঙ্গে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সুন্দরবনের নদীনালা ও জঙ্গলে এখনও যেরূপ অবস্থা পাঁচশত বৎসর পূর্বেও তদরূপ ছিল। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভাগীরথীর মধ্য দিয়া প্রধান তীর্থ ছত্রভোগে উপস্থিত হন।

"এই মতে প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতূহলে।"

কবিকঙ্কনও ছত্রভোগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ভাগীরথীর তীরস্থ সুন্দরবনের অনেক স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। কবিকঙ্কনের কাব্যে সাগর সঙ্গমের উল্লেখ আছে;

যেখানে সগর বংশ ব্রহ্ম-শাপে হৈল ধ্বংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে
সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ।।
মুক্তিপদ এই স্থান, ইহাতে করিয়া স্নান
চল ভাই সিংহল নগরে। —কবিকঙ্কন চণ্ডি

পর্তুগীজদের সময় পোর্টোগ্রান্ডি বা চট্টগ্রাম হইতে পিপলী, বালেশ্বর, সপ্তগ্রাম, হুগলী বা পোর্টোপেকিনো প্রভৃতি বন্দরে তাহারা সমবেত হইত। তজ্জন্য সুন্দরবনের নিকটস্থ সমুদ্র পথে তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিতে হইত। বাকলা হইতে চণ্ডিকান

(প্রাচীন যশোর) আসিবার পথে ফেনসেকো ও এন্ড্রু নামক দুইজন পুরোহিত সুন্দরবনের নদনদী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তাঁহারা সুন্দরবনের ভয়সঙ্কুল বনস্থলী ও জলদস্যুর কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

তোডরমল্লের জরিপে সুন্দরবনের উল্লেখ নাই। তবে বঙ্গদেশে ১৯টি সরকার তাঁহার সময় সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে খলিফাতাবাদ একটি। এই সরকার শাহ সুজার সময় দুই পরগণায় বিভক্ত হয় ঃ (ক) আকলা—গোচারণ ভূমি এবং—(খ) বুনজের বা বনভূমির ফসল। সুন্দরবনকে তখন মোরাদখানা ও জেরাদখানা বলা হইত। ইহার নামমাত্র রাজস্ব ছিল ৮৪৫৪ টাকা। বাকেরগঞ্জেব সুন্দরবন বোজর্গ উমেদপুর পরগণার অধীন ছিল। তখনও অধুনা সুন্দরবন পরগণার সৃষ্টি হয় নাই। বাকেরগঞ্জ জেলায় মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মিষ্ট জলের আধিক্যে খুলনার ন্যায় লবণাক্ত জল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারায় উহার সুন্দরবনও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

'সুন্দরবনের নরখাদক' (Man Eaters of Sundarbans) পুস্তক প্রণেতা তাহাওয়ার আলী বলিয়াছেন যে, সমুদ্র গর্ভে পলিমাটি জমিতে জমিতে প্রশস্ত হইয়া দুই সহস্র বৎসর পূর্বে সুন্দরবন উত্থিত হয়। এই মন্তব্যের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই। এই পুস্তকখানি নানা প্রকার গল্পগুজবে পূর্ণ, ঐতিহাসিক বিষয় কিছুই নাই।

পর্তুগীজদের পর ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ জাতি বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে আগমন করে। ডি-ব্যারোর মানচিত্রে সুন্দরবনের মধ্যস্থ পাঁচটি নগরীর নির্দেশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তিনটি বাকেরগঞ্জ এবং দুইটি খুলনা জেলায় বলিয়া নিখিল বাবু অনুমান করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদেব বক্তব্য পরে পেশ করিয়াছি।

পুরাকালীন জনপদ : অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আছে। তবে পূর্বে যে সমস্ত স্থান জুড়িয়া সুন্দরবন ছিল, এখন তাহার বহুস্থান মনুষ্য বসতি ও ফসলের জন্য আবাদভূমি ও বিলে পরিণত হইয়াছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পরও সুন্দরবন টিকিয়া আছে, ইহাই আশার কথা। তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকা উদ্ধৃত করিয়া মিঃ ব্লকম্যান দেখাইয়াছেন যে, উত্তরদিকে প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে সুন্দরবনের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। কারণ এই সময়কার রাজস্বের পরিমাণ গড়ে প্রায় একরূপই ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে মনুষ্য বসতি ছিল এবং কোথাও কোথাও ছোটখাট নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। মুসলমান আমলের পূর্বে বৌদ্ধ ও আদিম অধিবাসীরাই (Aboriginals) এদেশের প্রধান বাসিন্দা ছিল। প্রাচীন আমলের বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন বৌদ্ধ জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। মুসলমান আক্রমণের পূর্বে এদেশে কায়স্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুদের বসতি ছিল না বলিলেই চলে। মোগল আমলে ভৈরব ও কপোতাক্ষী তীরে হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার আত্মজীবনী গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ "১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ শতাব্দীতে মুসলমান পীরগণ প্রথম ধর্মপ্রচারকসুলভ উৎসাহ

লইয়া এই যশোর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের পতাকা বহন করিয়াছিলেন এবং তথায় লোক বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের ইতস্তত বহু গ্রামের নামই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যথা ঃ ইসলামকাটী, মামুদকাটী, হোসেনপুর, হাসনাবাদ (হোসেন-আবাদ) ইত্যাদি। ইসলামের এই অগ্রদূতের মধ্যে খাঞ্জা আলীর নাম সর্বপ্রধান। ইনিই ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বাগেরহাটের নিকট বিখ্যাত ষাটগুম্বজ নির্মাণ করেন। রাড়ুলীর প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে আর একটি মসজিদও এই মুসলমান পীরের নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

"সুন্দরবন অঞ্চল আবাদ করিবার সময় কতকগুলি লোক জঙ্গল পরিষ্কার করিতে করিতে কপোতাক্ষী নদীতীরে চাঁদখালীর প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে, একটি প্রাচীন মসজিদ মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত দেখে, সেইজন্য তাহারা গ্রামেব নাম রাখে "মসজিদকুড়"। এই মসজিদটি দেখিলেই বোঝা যায় যে, ইহা ষাটগুম্বজের নির্মাতারই কীর্তি।"

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণভাগে সর্বত্র সুন্দরবন ছিল। মুসলমানেরা এদেশে আগমন করতঃ ব্যাপকভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছে। বহিরাগত মুসলমানেরাই বসবাস আরম্ভ করিয়া এতৎপ্রদেশে চাষাবাদ করিয়া জমিতে ফসল উৎপন্ন করিয়া জীবনধারণ করিত। খান জাহান আলী এদেশে অসংখ্য জলাশয়, মসজিদ ও ইমারত গড়িয়া বহু জনপদের সৃষ্টি করেন। যশোরের বারবাজার হইতে মুরলীকসবা হইয়া, পায়গ্রাম কসবা, দীঘলীয়া ও সেনহাটি হইয়া বাগেরহাট পর্যন্ত তাঁহার রাস্তার চিহ্ন অদ্যপি বিদ্যমান। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়িয়া দেশব্যাপী এক নবযুগের সূচনা করেন। এল. আর. ফকাস বলেন ঃ—"পীর খান জাহান আলী পঞ্চদশ শতকে বহুদিন যাবৎ দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেন। বাগেরহাটের সন্নিকটে তাঁহার সমাধিমন্দির, দীঘি, মসজিদ, রাস্তাসমূহ তাঁহার কীর্তি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে।" তাঁহারই কিছুকাল পরে খলিফাতাবাদ (বর্তমান বাগেরহাট) বাংলার স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের সুযোগ্য পুত্র নসরত শাহের রাজধানী ছিল। নসরত শাহ এইখানে বসিয়া কিছুদিন সুন্দরবন অঞ্চল শাসন করেন এবং তথা হইতে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন।

খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা এল. এস. এস. ওমালী আই, সি, এস, বলেন ঃ "The earliest traditions of the district are connected not with any ancient Budhist or Hindu Kingdom but with a Mohammedan called Khan Jahan Ali or more generally Khanja Ali. Local legend relates that he came here over four centuries ago to reclaim and cultivate the Sundarbans which were then waste and covered with forest." অর্থাৎ "প্রাচীনকালীন প্রবাদ হইতে ইহাই জানা যায় যে, এই জেলার ইতিহাসে কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু রাজত্বের সম্পর্ক ছিল না। খান জাহান আলী বা খাঞ্জালী নামক জনৈক মুসলমানের নামই সর্বাগ্রে শ্রুত হয়। স্থানীয় কাহিনীতে জানা যায়, তিনি চারি শতাব্দী পূর্বে যখন এদেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন সুন্দরবন আবাদযোগ্য করার জন্য শুভাগমন করেন।"

মিঃ ওয়েষ্টল্যান্ড তাঁহার প্রণীত Report on Jessore (যশোরের ইতিবৃত্ত) পুস্তকে বলিয়াছেন ঃ—"চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান পীর ও ধর্মযাজকগণ ইসলামের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে যশোর অঞ্চলে আগমন করিয়া জঙ্গল আবাদ, পুষ্করিণী খনন এবং দালান-কোঠা নির্মাণ করিয়া মানুষের আবাদযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, দ্বাদশ জন আউলিয়া সর্বপ্রথম যশোরের উত্তর-পশ্চিমে যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানের নাম হয় বারবাজার। গরীবশাহ্ ও বোরহানুদ্দীন মুরলীতে (যশোর টাউন) ইসলাম প্রচার করেন। অন্যান্য কতিপয় আউলিয়া চট্টগ্রাম ও সিলেটের দিকে গমন করিয়াছিলেন। খান জাহানের দুইজন শিষ্য আমাদী গ্রামে বসতি স্থাপন করতঃ ইসলাম প্রচার করেন। তাঁহাদের নাম বুড়া খাঁ (বোরহান খাঁ) ও ফতে খাঁ। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে মুসলমানেরা প্রধানতঃ সুন্দরবন আবাদ করিয়া তথায় মানব সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

রামপাল থানার হুড়কোর ঝলমলিয়া দীঘি এবং কালেখাঁর বেড়ের দীঘি খান জাহান আলীর সময় খনিত বলিয়া প্রবাদ আছে। হুড়কোর দীঘিতে একটি পাকা ঘাট ছিল। একটি রাস্তা পেড়ীখালির মধ্য দিয়া এই দীঘিতে আসিয়াছিল। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমার সময় এখানে মেলা হয়। পেড়ীখালি গ্রামে নারিকেলবুনিয়ার দীঘি ও ফলপুকুরিয়ার দীঘি আছে। থানার উত্তর পার্শ্বে রামপাল ও শ্যামপাল নামক দুই ভাইয়ের দীঘি। প্রত্যেকটি দীঘির জল সুপেয়। চাঁদপাই গ্রামে একটি পুরাতন পুকুর ও মাজার আছে। কথিত আছে এখানে বাছের শাহ ও মেছের শাহ্ ফকির জঙ্গল আবাদ ও ইসলাম প্রচার করেন। তাঁহাদিগকে তয়েবাড়ীর ফকির বলা হয়। এখানে প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে।

বাগেরহাট থানার অন্তর্গত যাত্রাপুর বাজারের তিন মাইল উত্তরে বিখ্যাত অযোধ্যার মঠ অবস্থিত। কে বা কাহারা কোন্ প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগরের অদূরে সুন্দরবন আবাদ করিয়া লোকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই ঐতিহাসিক ও গগনচুম্বী মঠ নির্মাণ করেন তাহা জানিবার সঠিক উপায় নাই। ইষ্টক নির্মিত এই বিরাট মঠ আজিও উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। দেশ-বিদেশ হইতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এই মঠ পরিদর্শন করিতে এখানে আসিয়া থাকেন। অযোধ্যার মঠের সহিত রামায়ণে বর্ণিত প্রাচীন অযোধ্যা নগরীর কোন সম্পর্ক নাই। এতদঞ্চল এককালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্মানার্থে এই মঠ নির্মিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সম্রাট আকবরের সময় রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও তদীয় ভ্রাতা বসন্ত রায় যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ বর্গমাইল ব্যাপী গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জনাকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই যশোর রাজ্যের রাজধানী গড়িয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ের প্রচুর ধনসম্পদ মুসলিম বাদশাহের কর্মচারী বিক্রমাদিত্য ও তদীয় ভ্রাতা বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। তাঁহারা এই ধনসম্পদ সুদুর সুন্দরবন অঞ্চলে আনিয়া একটি ক্ষুদ্রায়তন

বিশিষ্ট রাজ্য গঠন করেন। ইহাই পরবর্তীকালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোর রাজ্য। এই স্থান হইতে ক্রমাগত সুন্দরবনের মধ্যে বসতি গড়িয়া উঠিতে থাকে। চাকশ্রী নামক দ্বীপে বসন্ত রায়ের রাজধানী এবং যশোর রাজ্যের নৌবাহিনীর কেন্দ্র ছিল। তখন হইতে এই অঞ্চলেও মনুষ্য বসতি গড়িয়া উঠে। চাকশ্রীতে মোগল আমলে নির্মিত একটি মসজিদ অদ্যপি বিদ্যমান। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন এককালে তথায় সুন্দরবনের জঙ্গল মধ্যে সুশ্রী মৌচাক শোভা পাইত। সেজন্য গ্রামের নাম হইয়াছে চাকশ্রী। অন্য মতে এই চকে সুন্দর ধান্য ক্ষেত ছিল বলিয়া গ্রামের নাম হয় চকশ্রী।

বর্তমান সুন্দরবনের প্রান্তসীমা বেদকাশী গ্রাম। তুর্ক-আফগান আমলে খালেস খাঁ নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এখানে একটি বিরাট দীঘিকা খনন করেন। তিনি ইস্‌লাম প্রচারক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। দীঘির উত্তরদিকে বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও গড়খাই আছে। এখানে পরে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার বিশেষ চিহ্ন এখন নাই। কিন্তু জলাশয়টি দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ-সাধন করিতেছে। সতীশবাবু বলেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রতীক হিসাবে এই দীঘিটির নাম হয় কালীখালাস খাঁ। কিন্তু আমরা স্থানীয় তদন্তের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, ঐ দীঘির নাম কোনদিনই কালীখালাস খাঁ দীঘি ছিল না। উহা পূর্বের ন্যায় এখনও সকলের নিকট খালেস খাঁ বা খালাস খাঁ দীঘি নামে পরিচিত।

বেদকাশী গ্রামে বড় বড় প্রস্তর পড়িয়া আছে। এখানে যত্রতত্র ইষ্টক পাওয়া যায়। অনেকগুলি পুরাতন বাড়ীর ভগ্নাবশেষকে লোকে বড়বাড়ী বলে, সেখানে জাহাজঘাটা বা ডকের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। খালাস খাঁর দীঘি ব্যতীত এই গ্রামে আরও তিনটি পুরাকালীন দীঘি আছে। উহার নাম যথাক্রমে রত্নদীঘি, দুই সতীনের পুকুর এবং লোনাদীঘি। শেষোক্ত জলাশয় সর্বাপেক্ষা বৃহৎকায়। প্রবাদ আছে যে, ধনপতি সওদাগর রত্নদীঘি খনন করেন। দুই সতীনের পুকুরে ইষ্টক ও প্রস্তর অসংখ্য আছে। বড়বাড়ীর সন্নিকটে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে প্রস্তরনির্মিত থাম ও তীর আছে। বাড়ীর চতুর্দিকে প্রাচীরের চিহ্ন আছে। খালেস খাঁ জঙ্গল আবাদ করিয়া সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন পঞ্চদশ শতকে। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এই ধরনের জনবসতি এইভাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

বেদকাশীর উত্তরে কপোতাক্ষীর তীরে গোবরা গ্রাম। কপোতাক্ষ এক সময় পদ্মার মিষ্ট জল বহন করিয়া সুন্দরবনাঞ্চলে পৌঁছাইয়া দিত। সেইজন্য এখানে সুন্দর ধান্য ফসল ফলিত। কপোতাক্ষীর সে মিষ্ট জল আর নাই। সর্বত্রই লবণাক্ত, সেজন্য নদী তীরবর্তী জমিতেও সুন্দর ফসল ফলে না। মিঃ ওমালী বলেন যে, কর্ণেল গ্যাষ্ট্রিল গোবরা গ্রামের দক্ষিণে একটি ইষ্টকনির্মিত বড়বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে একটি প্রাচীন প্রাঙ্গণ, বাগিচা এবং বৃক্ষলতা ছিল। উক্ত বাড়ীর কে বা কাহারা মালিক ছিল জানা যায় নাই। আমরা এই বাড়ী সম্পর্কে বহু খোঁজ করিয়া ইহার কোন সন্ধান পাই নাই। সম্ভবত ইহা বেদকাশীর বড়বাড়ীই হইবে।

ইংরেজ আমলে স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন কর্তৃক গোসবা নামক স্থানে সুন্দরবনের মধ্যে একটি আধুনিক শহর নির্মিত হয়। ইহা আদর্শ কৃষি উপনিবেশ। এখানে অতিথিশালা, পথঘাট ও সুপেয় জলের বন্দোবস্ত আছে। বর্তমানে উহা ভারতের অন্তর্গত।

পাইকগাছা থানার মধ্যে মহারাজপুর গ্রামে মৃত্তিকা গর্ভে প্রাচীনকালীন ইষ্টক প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামে তিনটি ভিটায় ইষ্টকনির্মিত বাটীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। শাকবাড়ে নদীর তীরে লবণের কারখানার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে দশ বার হস্ত দীর্ঘ পাকা গাঁথুনী মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া যায়। স্থানীয় বিজ্ঞ লোকেরা উহাকে একটি বৃহৎকায় লবণ প্রস্তুতের কারখানা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মদিনাএবাদে অনেকগুলি পুরাতন কবরের নিদর্শন এবং অসংখ্য পুরাতন কড়ি পাওয়া গিয়াছে। কড়ি দিয়া এককালে ক্রয়-বিক্রয় চলিত তাহা সহজেই অনুমেয়। মাত্র ৮০ বৎসর পূর্বে এইখানে জঙ্গল আবাদ করিয়া বসতি স্থাপিত হয়। এখানে মৃণ্ময় পাত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি, প্রচুর পরিমাণে পুরাকালীন ইষ্টক ও ঝামা পাওয়া গিয়াছে। কয়রা গ্রামে ইটখোলার পুকুর নামে একটি প্রাচীন পুকুর আছে। এখানে পাকা ঘাট ও রাস্তার চিহ্ন আছে। প্রাক্-মোগল ও মোগল আমলে এতদঞ্চলে জঙ্গল মধ্যে যে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঝটিকা ও প্লাবনে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষ অন্যত্র হিজরত করে। তাহাদের অনেকে আবার ইংরেজ আমলে এখানে পুনরায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

বর্তমানে যেখানে মনুষ্য বসতি পূর্বে সেখানে সুন্দরবন ছিল। আবার বর্তমানে যেখানে সুন্দরবন সেখানে ভবিষ্যতে মনুষ্য বসতির সমূহ সম্ভাবনা আছে। এখন যে স্থান সুন্দরবনে পরিপূর্ণ সেখানে পূর্বে স্থানে স্থানে মনুষ্য বসতি ছিল একথা অনেকেই জানে না এবং উহা বিশ্বাস করিতে অনেকের কষ্ট হয়। ইংরেজ লেখকদের অনেকেরই মত সুন্দরবনের মধ্যে কখনও সুদৃশ্য বাসভূমি ছিল না। মাঝে মাঝে দুঃসাহসী লোক আবাদ করার চেষ্টা করিলেও তাহা সবসময়ে সফলকাম হয় নাই। এতদঞ্চলে এবং চন্দ্রদ্বীপ, নোয়াখালীর সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে সভ্য জাতির আবাসভূমি প্রাচীনকাল হইতে ছিল। একথা প্রমাণিত হয় যে, সুন্দরবনের সর্বত্র না হইলেও মধ্যে মধ্যে সুন্দর জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে আদিলপুরের চণ্ডভণ্ড জাতি এবং যশোর-খুলনার বিভিন্ন স্থানে আদিম অধিবাসীরা বসবাস করিত।

খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের ঘনবসতি এবং কৃষিকার্যে তাহাদের দক্ষতা ইহাই প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের পূর্বেও এই জাতীয় লোকেরা এদেশের অনেক স্থান আবাদ করিয়াছিল। মিঃ ফকাস এই জাতিকে আদিম জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং পোদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরিয়া ইহাদের দান অস্বীকার করিলে এই বিরাট একটি জাতির প্রতি অবিচার করা হইবে।

পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় নমঃশূদ্র সমাজও ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, যশোর ও খুলনা জুড়িয়া বসবাস করিতেছে। তাহারাও এদেশের এক প্রাচীন জাতি এবং এদেশে তাহাদের

সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে। সুন্দরবন আবাদে এই জাতির অবদানও কম নহে। ফকাস সাহেবের মতে ইহারাও আদিম অধিবাসী শ্রেণীর মানব এবং চণ্ডাল জাতীয় হিন্দু সমাজ হইতে উদ্ভুত। কৃষিকার্যে এই উভয় জাতি বিশেষ দক্ষ এবং এদেশের মুসলমান ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহারা জমিতে অত্যধিক ফসল ফলাইয়া থাকে। এই দুইটি জাতির লোকেরা জঙ্গল কাটিয়া মাটি তুলিয়া নিম্নস্থানকে সুউচ্চ করিয়া বহুস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

সুন্দরবন চিরদিন আবাদ হইতে পারে নাই। এক সময় সুন্দরবন উঠিয়াছে এবং উহা আবাদ করিবার পর বসতি স্থাপিত হইয়াছে। আবার উহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সুন্দরবন ভ্রমণকালে আমরা স্থানে স্থানে পুকুর, বাঁধা ঘাট, দুর্গ, মন্দির, বসতবাটীর চিহ্ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এই সমস্ত স্থানে ঘনবসতির চিহ্ন দর্শন করা এক ভয়াবহ ব্যাপার। যেখানে ইষ্টকনির্মিত বসতবাটীর ভগ্নাবশেষ সেখানেই বাঘের আবাসভূমি। মানুষের আগমন বুঝিতে পারিলে শিকারীর ভয়ে বাঘ সরিয়া পড়ে। জনমানবশূন্য জঙ্গলে মনুষ্য বসতির চিহ্ন দর্শন আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণেব প্রধান আকর্ষণ ছিল।

একটি বিষয় স্মবণ রাখা আবশ্যক যে মনুষ্য বসতির পার্শ্বে যে সমস্ত বৃক্ষ পাওয়া যায় সুন্দরবনের তাহা জন্মে না এবং সুন্দরবনে যে সমস্ত বৃক্ষ বিদ্যমান, আবাদকৃত ভূমিতে তাহা দুষ্প্রাপ্য। সুন্দরবনে ভিতর কোন কোন স্থানে গাব, জাম, বট, জিওল প্রভৃতি গাছ দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি সুন্দরবনের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। এই সমস্ত দর্শনে ইহাই প্রতীত হয় যে, মানুষের দ্বারা এই সমস্ত বৃক্ষাদি এককালে রোপিত হইয়াছিল। আবার সুন্দরী, গরাণ, পশুর ইত্যাদি বৃক্ষ লোকালয়ে জন্মে না। তেমনই গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু সুন্দরবনে নাই। আবার ব্যাঘ্র, হরিণ, বানর ইত্যাদি লোকালয়ে দুষ্প্রাপ্য।

ইংরেজ লেখকদের নিকট ফ্লোরা ও ফনা শব্দদ্বয় সবিশেষ প্রিয়। মিঃ ফকাস প্রমুখ লেখকেরা বলিয়াছেন যে, সুন্দরবনের ফ্লোরা (উদ্ভিদ) এবং ফনা (জীবজন্তু) লোকালয় হইতে পৃথক। সুন্দরবনের মৎস্য ও পক্ষী বহুলাংশে লোকালয় হইতে ভিন্ন ধরনের। ইহাই সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য।

সুন্দরবনের সর্বত্র না হইলেও মধ্যে মধ্যে সুন্দর মনুষ্য বসতি ছিল সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুন্দরবনের প্রাচীন কীর্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ আজিও বহুস্থানে বিদ্যমান। কিন্তু এখনও বহুস্থান মানুষের অগম্য রহিয়াছে এবং সমস্ত স্থান দর্শন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

কালীগঞ্জের নিকট শিববাটীতে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল। যশোরের সর্বপ্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ হেংকেল সাহেব হেংকেলগঞ্জ (হিঙ্গলগঞ্জ) নাম দিয়া সুন্দরবন আবাদের জন্য একটি নগর স্থাপন করেন এবং উহার উত্তরসীমা নির্ধারণ করেন। হেংকেল সাহেব সুন্দরবন অঞ্চলে ১৬টি তালুকদারী সৃষ্টি করেন এবং জঙ্গল কাটিয়া

আবাদ করিবাব জন্য নামমাত্র খাজনায় জমি বন্দোবস্ত দেন। শুধু হিঙ্গলগঞ্জ নহে, হেংকেল সাহেব বাগেরহাটের কচুয়া এবং খুলনার চাঁদখালি সুন্দরবনের উত্তরসীমা নির্দেশ করেন। এই কেন্দ্রগুলিকে খাস-আবাদ নাম দেওয়া হয়। প্রতাপশালী জমিদারগণ সুন্দরবনের সর্বত্র এমনকি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত জমির দখল দাবী করিয়া বসিলেন, তখন হেংকেল নদীতীরবর্তী স্থানে বরাবর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় শত মাইল পথ বাঁশ পুঁতিয়া সীমা নির্দেশ করেন। ইহাই হেংকেলের "বাঁশ গাড়ী" নামে সর্বজনবিদিত। জমিদারদের দাবীর উত্তরে রেভিনিউ বোর্ড তিন মাসের মধ্যে তাঁহাদের দাবীকৃত সীমানার বিবরণ দাখিল কারতে বলেন। হেংকেলের মধ্যস্থতায় জমিদার ও সরকারের মধ্যে সুন্দরবনের সীমা শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয়। চাঁদখালীতে হেংকেল হিঙ্গলগঞ্জের ন্যায় একটি শহর নির্মাণ করেন। তাঁহার সময় একটি ইষ্টকনির্মিত কাছারীঘর নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। সেদিনকার একটি দীঘি মাত্র আছে। উহার পার্শ্বে পুরাতন কয়েকটি বটবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। আরও অনেক দক্ষিণে কপোতাক্ষী নদীতীরে জঙ্গল আবাদ করিয়া লোকে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কয়েকটি প্রাচীন দীঘি এখনও দৃষ্ট হয়। এখানে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন মুদ্রিত ২টি এবং প্রাচীনকালীন অন্য ৩৬টি মুদ্রা ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে মৃত্তিকাগর্ভে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে কয়েকটি মুদ্রা গৌড় সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ অঙ্কিত। সব কয়টি মুদ্রাই বঙ্গদেশের টাকশালে মুদ্রিত হইয়াছিল।

বুড়ী গোয়ালিনীর অধীন ছদনখালীর জঙ্গলে ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সিন্দুকখালীতে গাব, জাম, বটগাছ এবং লবণ তৈয়ারীর চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকনির্মিত উনান দৃষ্ট হয়। এখানে একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া যায় বলিয়া স্থানের নাম হইয়াছে সিন্দুকখালি। তাম্বুলবুনিয়ায় নারিকেল, তাল, জামগাছ ও বৃহৎকায় একটি দীঘি আছে। ফুলঝুরির জঙ্গলে একটি তালগাছ দৃষ্ট হয়। বিবির মাদে বা পতণী দ্বীপে ও সুপতি নদী তীরে ইষ্টকনির্মিত দশ-বার হাত লম্বা উনান আছে। শরণখোলার দক্ষিণে ভোলা নদীর তীরে খুদিরামেব চরে নাবিকেল, জাম, তালবৃক্ষ ও দবলা ঘাস আছে। টাইগাব পয়েন্টের সন্নিকটে নদীর মুখে নারিকেল ও কলাগাছ আছে। এখানে বট, তাল, ক্ষুদেজাম এবং বোরই গাছও দৃষ্ট হয়। আমাদের একখণ্ড জমি বাণীশান্তা মৌজার খাজুরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। এই জমি ও স্থানীয় বসতবাটীসমূহ জঙ্গল আবাদ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। জঙ্গল ও জমির মধ্যে একটি ছোট নদী। ধান পরিপক্ক হইলে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল হইতে হরিণ আসিয়া ধান খাইয়া যায়।

খোলপেটুয়া ও কদমতলীর মধ্যবর্তী তের্‌কাটী ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। চুনানদী হইতে তের্‌কাটী খাল, নৈহাটীর দোয়ানিয়া, মোড়লখালি ও পোদখালীর খাল এই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। এই সমস্ত নদী ও খালের পার্শ্বে বসতবাটীর চিহ্ন আছে। তিওব ও পোদ জাতীয় লোকেরা এখানে বাস করিত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। তিওর হইতে তিওরকাটী এবং পরে উহা তের্‌কাটীতে দাঁড়াইয়াছে। এই জঙ্গলে বসতবাটীর

চিহ্ন, ভাঙ্গা মৃণ্ময় পাত্র, বট, রয়না, সড়া, ক্ষুদেজাম, নিম ও অন্যান্য বৃক্ষ, দুর্বাঘাস প্রভৃতি দৃষ্ট হয়; দুই-একটি ক্ষুদ্রকায় ইষ্টক স্তূপও আছে। পোদখালীব পশ্চিমদিকে একটি দীঘি ও কোঠাবাড়ী আছে। এখানে একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয় বলিয়া সতীশবাবু উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা উহার কোন সন্ধান পাই নাই। মামদো বা মাদার নদীর পার্শ্বে দুইটি পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ আছে।

সুন্দরবনে বহুস্থানে নেমকখালাড়ী, অর্থাৎ লবণ প্রস্তুতের কারখানা ছিল। মলঙ্গীরা সুন্দরবনের মধ্যে কারখানা স্থাপন করিয়া লবণ তৈয়ার করিত এবং এই ব্যবসায় তাহারা বিশেষ লাভবান হইত। মালঞ্চ, রায়মঙ্গল, শিবসা. পশর, আলকী প্রভৃতি নদীর পার্শ্বে বহু লবণের কারখানা ছিল। বর্তমানে এই সমস্ত কুটার শিল্পের নাম নিশানা দেশ হইতে একরূপ মুছিয়া গিয়াছে। মারজাট্টার পার্শ্বে ভেদাখালীর জঙ্গল। দুবলা ভারানী খালের উত্তর তীরে বহু সংখ্যক নেমকখালাড়ীর চিহ্ন ছিল এবং অদ্যাপি কিছু কিছু নিশানা বিদ্যমান থাকিয়া এই কুটীর শিল্পের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। ত্রিকোণ দ্বীপেও নেমকখালাড়ীর চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সুন্দববনেব আরোও বহু স্থানে নেমকখালাড়ীর সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে। এখনও বহুস্থানে মৃণ্ময় পাত্র ও বসতির নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

সুন্দরবনে পূর্বে লবণ ও কাগজ প্রস্তুতের কারখানার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। মলঙ্গী ও কাগচীবা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত। এজন্য সুন্দরবনে প্রচুর কাঁচামাল মওজুদ ছিল। উহাব ব্যয়ও নগণ্য ছিল। ইংরেজ আমলে অত্যাচারমূলক আইন দ্বারা লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইন বলে বড়দল, মোরেলগঞ্জ ও চালনায় তিনটি অফিস স্থাপিত হয়। তিনজন সাবইন্সপেক্টব, ৬জন জমাদার এবং ৬২জন পিওন একজন প্রতাপশালী ইন্সপেক্টরের অধীনে লবণ প্রস্তুতের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিত। দমনমূলক আইনের প্রকোপ এবং এই বাহিনীর অত্যাচারে সম্ভবতঃ লবণ শিল্প দেশ হইতে দূরীভূত হয়। দরিদ্র জাতির পক্ষে সে এক করুণ ইতিহাস। ডি জুরিক বলেন যে. শুধু সন্দ্বীপে প্রস্তুত লবণের দ্বারা সমগ্র বঙ্গদেশের চাহিদা মিটিত। ইহাতে বুঝা যায় যে, তৎকালে লবণ শিল্প কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

খেপুপাড়ার সন্নিকটে কচুপাতরা নদীর ভাঙ্গনকূলে প্রায় দশ হাত নীচে মৃত্তিকাগর্ভে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ধাপে ধাপে ক্ষুদ্রকায় লাল ইষ্টকের গাঁথুনি। ইহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

উপরে বর্ণিত সমস্ত নিদর্শন হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, সুন্দরবনের সর্বত্র কোন এক সময়ে ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল স্থান ছিল না, স্থানে স্থানে মনুষ্যবসতি ছিল। আড়পাঙ্গাশিয়া ও মালঞ্চের মধ্যবর্তী জঙ্গলে হরিখালী ও পূর্ববর্ণিত সিন্দুকখালীতে ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। বেয়ালাকয়লা দ্বীপের পার্শ্বে বিবির মাদিয়ায় পুরাতন রাস্তা আছে। উহাকে গোলাপদীখালীর আট বলে। ইহা প্রায় ১ মাইল লম্বা।

ধূমঘাট. জাহাজঘাটা, বসন্তপুর, মহতপুর, নূরনগর প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া সুন্দরবনের যে অংশে শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল উহারই আশেপাশে আরও বহুদূর বেষ্টন করিয়া

জঙ্গলের মধ্যে লোকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পরভাজ খাঁ নামক জনৈক পাঠান প্রতাপাদিত্যের বহু পূর্বে কালিগঞ্জের দক্ষিণে জঙ্গল আবাদ করিয়া বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, পরভাজ খাঁ নামক সেনাধ্যক্ষ যমুনা নদী তীরে এই স্থানে আসিয়া ঘাঁটী নির্মাণ করেন। তিনি এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। জঙ্গলময় স্থানে এখনও মসজিদটি কোন প্রকারে টিকিয়া আছে। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম হয় পরভাজপুর। ইহারই অদূরে মুকুন্দপুরের গড়।

আশাশুনি থানার অন্তর্গত প্রতাপনগরের মধ্যে গড়কোমলপুরে প্রতাপাদিত্যের গড় ও সেনানিবাস ছিল। প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি খাজা কামালের নামানুসারে এই নগরীর নাম হয় কামালপুর। পরে ঐ নাম কোমরপুর এবং উহা হইতে বিকৃত হইয়া কোমরপুরে দাঁড়াইয়াছে। আশাশুনি বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে গুতিয়াখালী নদী। উহার পশ্চিম দিকে সাঁইহাটি গ্রাম। এই স্থানে এক সময় গভীর জঙ্গল ছিল। স্থানীয় প্রবীন লোকদের মুখে জানা যায় যে, প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে গভীর জঙ্গল আবাদ হয়। সেখানে কয়েকটি পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

সাঁইহাটীর পার্শ্বে উজিরপুর গ্রাম। এখানে একটি বৃহৎকায় পাকা ইমারতের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ছিল। উহাকে সাধারণে, উজিরের বাড়ী বলে। দশালীয়া ও প্রতাপনগরে এখনও বিরাট গড় আছে এবং উহারই পার্শ্বে খোলপেটুয়া নদীর তীরে একটি মিষ্টি জলের পুকুর আছে। সুন্দরবনের কোথাও পানীয় জল পাওয়া যায় না। সবই লবণাক্ত। সেইজন্য বিশ মাইল দূরে অবস্থিত থাকিলেও বহুলোক তথা হইতে নৌকাযোগে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লয়। এইধরণের পুষ্করিনী হইতে এককালে সুন্দরবনের এবম্প্রকার স্থানে কিছু লোকবসতি ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। প্রতাপনগরের উত্তরে বিছটগ্রাম। এখানে নৌ-বাহিনীর অধীনে সুন্দরবনের মধ্যে একটি ডক প্রস্তুত হইয়াছিল। এখানে বানিয়াপুকুর নামে একটি দীঘি ও বিরাটকায় গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। লঞ্চযোগে দক্ষিণ খুলনা ভ্রমণ করিলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান ও কীর্তিরাজি পরিদৃষ্ট হয়।

হরিণঘাটার মোহনা হইতে চাঁদেরআড়া নদী পশ্চিম দিকে গিয়াছে। উহার পার্শ্বে এখনও পুকুর ও কলাগাছ আছে। সেখানে রাস্তার চিহ্ন এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে এই চাঁদের আড়ায় বিখ্যাত চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গাগুলির পোতাশ্রয় ছিল। হরিণঘাটার পশ্চিম দিকে বাঘের কোণা (Tiger point)— উহার সন্নিকটে ইষ্টকের স্তূপ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে এখানে একটি পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পশরের নিকট নন্দবালা নামক খালের উত্তর তীরে জঙ্গলের মধ্যে বকুল বৃক্ষ বেষ্টিত একটি দীঘি মনুষ্য বসতির কথা প্রমাণ করাইয়া দেয়। শেলা নদীর পার্শ্বে তাম্বুলবুনিয়ায় একটি জলাশয় ও উহার উত্তর পাড়ে নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষ জঙ্গলের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। খড়মা নদী হইতে সোনাখালী খাল দক্ষিণে শেলা নদীতে পড়িয়াছে। উহার পার্শ্বে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সুন্দরবনের জানোয়ারসমূহের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কপোতাক্ষীর তীরে আমাদী গ্রামে পীর খান জাহান আলীর শিষ্যদ্বয় বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁ এতদঞ্চল আবাদ করেন। ঐ গ্রামে তাঁহাদের সমাধি অদ্যপি বিদ্যমান। সম্ভবত ফতে খাঁ নামীয় ফতেকাটি গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। শিবসা নদীর তীরে পাটকেলপোতা মৌজায় অনেকগুলি ইষ্টক স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। "পাটকেলপোতা" শব্দ উহার পরিচয় দেয়। এখানেও পুরাকালে সুন্দরবনের মধ্যে জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে শিবসা নদীর ভাঙ্গনকূলে মৃত্তিকার নিম্নে বহু ইষ্টক পাওয়া যায় এবং অনেক সময় উহার মধ্যে গৃহস্থের ব্যবহার্য জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে।

রায়মঙ্গল চেকপোষ্টের পশ্চিমে প্রায় বিশ মাইল দূরে জঙ্গল মধ্যে অট্টলিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে চতুর্দিকে আট নয় মাইল জুড়িয়া মধ্যে মধ্যে বসতবাটীর ভগ্নাবশেষকে ভাটির প্রধান দক্ষিণ রায় ও রাজা মুকুট রায়ের বাড়ী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। লোকে বলে এখানে দড়ার ঘাট পার হইয়া গাজী যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

সরল ও লস্কর গ্রামের বিশালকায় দীঘিসমূহ এতদঞ্চলে সেকালের মনুষ্য বসতির পরিচয় দিতেছে। এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, বাকেরগঞ্জ ও খুলনার দক্ষিণে সর্বত্র জনবসতি ছিল এবং পরে মগদের অত্যাচারে বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়া লোকে স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পুনরায় এই সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিণত হয়। বহু পরে আবার জঙ্গল কাটিয়া এই সব স্থানে দ্বিতীয়বার মনুষ্য বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহারা কাটি বা জঙ্গল কাটিয়া সর্বপ্রথম গ্রামের পত্তন করিয়াছিল তাহাদিগকে 'কাটিকাটা' বলা হয়। তাহারাই গ্রামের আদি বাসিন্দা বলিয়া গৌরব অনুভব করে। এদেশে 'কাটিকাটা' বংশকে গ্রামের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বংশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

মঙ্গলা পোর্টের পশ্চিমে করমজলীর জঙ্গলে রাস্তা, পুকুর ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেখানে গাবগাছ ও বকুলগাছ বহুকাল ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। এখানে সুন্দরবনের দুষ্প্রাপ্য মাগুর ও কই মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। করমজলীর উত্তরে বানীশান্তা ও লাউডোবের আবাদ। এখানেও জঙ্গল কাটিয়া চাষীরা ধান্য ফসল ফলাইতেছে। কালিকাবাড়ীর খালের পার্শ্বে এক প্রকান্ড ইষ্টক স্তূপ পাওয়া গিয়াছিল। শরণখোলা ফরেষ্ট অফিসের পশ্চিম দিকে ভোলা নদীর উপর প্রাচীর বেষ্টিত একটি বাড়ী ছিল, উহার ভগ্ন প্রাচীর অদ্যপি বিদ্যমান। চাঁদপাই ফরেষ্ট অফিসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সোনামুখী খালের পার্শ্বে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ইটের পাঁজা পাওয়া গিয়াছিল।

আড়ো শিবসা হইতে গ্যাভারখালী নদী উত্তর দিকে গিয়াছে। উহার তীরে প্রকাণ্ড দীঘি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। এই দীঘি গ্যাভারখালি দীঘি নামে সুপরিচিত। দীঘির পার্শ্ব দিয়া পুরাতন রাস্তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই স্থানে ব্যাঘ্রের আড্ডা খুব বেশী। সুউচ্চ স্থানে জোয়ারের জল না আসার জন্য এখানে সর্বদা ব্যাঘ্রদের আনাগোনায় ভরপুর থাকে। এখানে আরও একটি দীঘি আছে, ইহাকে লোকে বুড়ের পুকুর বলে। তথায়

কয়েকটি বকুল ও গাবগাছ আছে। মুরলী খালের পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি পাকা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, গাব ও জিওল গাছ আছে।

চাঁদপাই জঙ্গলের দক্ষিণে চাঁদেশ্বর খালের পার্শ্বে পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে দুইটি নারিকেল ও একটি তালগাছ আছে। একটি দীঘি ও উহার একটি পাকা ঘাটও দৃষ্ট হয়। এককালে এখানে জনবসতি ছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়।

সুন্দরবনের পশ্চিম দিকে নেটোর দোয়ানে ও মহিষাদল নদী। এই নদী হইতে একটু দক্ষিণ দিকে গিয়া তথা হইতে পশ্চিম দিকে বসতবাটীর সর্বপ্রকার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। একটি বাটীর ভগ্নস্তূপ এবং গোরস্থানের চিহ্ন আছে। গোরস্থানটি পাকা ইটের দ্বারা এককালে প্রস্তুত হইয়াছিল। ছাচনাংলা খালের পশ্চিম দিকে পাশখালী ভারানী এবং মঠের খাল। মঠের খালের পার্শ্বে একটি ইটের পাঁজা ছিল। এখানে বট ও গাবগাছ পরিলক্ষিত হয়।

পর্তুগীজেরা এদেশ হইতে চিরবিদায় লইয়াছিল কিন্তু মগেরা অনেকে বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া এদেশে থাকিয়া যায়। তাহারা পটুয়াখালী জিলার আমতলী থানার অধীন চাপলী, নিশানবাড়ী, মোবী, খাপডাডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে। মগেরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কয়েক সহস্র মগ,—সবাই বাংলায় কথা বলে। নলুয়া, কলমীরচর ও খেপুপাড়ায়ও মগবসতি আছে। বরিশাল-খুলনার আদিম অধিবাসী, দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের চণ্ডভণ্ড জাতি, যশোর-খুলনার পৌণ্ড্রগণ সর্বপ্রথম সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করে। খান জাহান ও প্রতাপাদিত্যের পিতার ন্যায় দনুজমর্দনদেবও চন্দ্রদ্বীপের বনাঞ্চলে এক রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সময় এখানে অসংখ্য নূতন বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম তীরে কচুয়ায় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী ছিল। মগের অত্যাচারে বা নদী ভাঙ্গনে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

বরিশাল হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সুজাবাদ গ্রামে একটি পুরাতন দুর্গের শেষ চিহ্ন বিদ্যমান। সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ্‌সুজা যখন বাংলার সুবাদার ছিলেন তখন সুন্দরবনাঞ্চলে মগদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য এই দুর্গটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আজিও সুজাবাদ গ্রাম মোগল যুবরাজ শাহ্‌সুজার নাম বহন করিয়া আসিতেছে। শায়েস্তা খাঁনের ভ্রাতা বোজর্গ উমেদ খাঁ মগ অত্যাচার দূরীকরণে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁহারই নামানুসারে বাকেরগঞ্জের প্রধান একটি পরগণার নাম হয় বোজর্গ উমেদপুর। দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন কালীন বহু জলাশয় ও অন্যান্য নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

শিবসা নদীর পূর্বতীরে যে স্থান হইতে শেখের খাল পূর্ব দিকে গিয়াছে উহার সঙ্গমস্থলের জঙ্গলের নাম শেখেরট্যাক। সুন্দরবন ভ্রমণকালে একদা উত্তর দিক হইতে এই স্থানের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে আমরা একদল ভ্রমণকারী শেখেরট্যাকে উপস্থিত হই। সুন্দরবনের কেন্দ্রস্থলে এই স্থান অবস্থিত। কাঠুরিয়া ও

ভ্রমণকারীদের নিকট স্থানটি সুপরিচিত। আমরা দশ জন ভ্রমণকারী, কয়েকটি বন্দুক ও রাইফেল সহ জঙ্গলে প্রবেশ করি। নদীতীর হইতে অন্যূন ১০০ গজের মধ্যেই কথিত শেখেদের বাড়ী। নদীতীরেই কয়েকটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। কালের কঠোর আঘাত ও শিবসার ভয়াবহ তাণ্ডবে তীরভূমি ভাঙ্গিয়া অট্টালিকাগুলি নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এখনও লবণাক্ত জলে ক্ষয়িত ইটের চিহ্ন দেখিলে উহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই প্রকার কয়েকখানা ইট আমরা সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

শেখের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এবং বাড়ীগুলির মধ্যস্থলে একটি জলাশয় দর্শন করি। অট্টালিকার মধ্যে কয়েকটি দ্বিতল বলিয়া অনুমিত হইল। জলাশয়ের চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। উহার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। এই স্থানে সুন্দরবনের দুষ্প্রাপ্য এবং লোকালয়ের পরিচিত জিওল, সড়া, গাব, গিলেলতা, ক্ষুদে জাম ও বটগাছ আছে। একটি প্রকাণ্ড জিওল গাছ—উহার বেড় ৯৪" ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় আট ফুট। এই স্থানে কবে কাহারা বাস করিত তাহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাধারণের নিকট ইহা শেখের বাড়ী বলিয়া সুপরিচিত।

নলীয়ান ফরেষ্ট অফিস হইতে শেখেরট্যাকের দূরত্ব দক্ষিণ দিকে ২০ মাইল হইবে। শেখেরট্যাকের অবস্থান সম্পর্কে খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা ওমালী সাহেব যে বর্ণনা দিয়াছেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। এই বর্ণনার সহিত আমরা ঐক্যমত স্থাপন করিতে পারিনা। শেখেব বাড়ী বলিয়া কথিত স্থানটি সম্পর্কে সতীশ বাবু লিখিয়াছেন ঃ "বাস্তবিকই এই স্থানে উপরে বহুদূর ধরিয়া নানা বসতি চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে একটি বাড়ী বেশ জাঁক জমকশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহাকে কাঠুরিয়াগণ "কামার বাড়ী" বলে। কারণ কোনকালে নাকি সেখানে কামারদিগের লোহাপিটান একটি "নোহাই" পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রবাদ মাত্র। দ্বিতল একটি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিলে তাহা কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ধনীর বাড়ী বলিয়া মনে হয়।" আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এখানে "কামার বাড়ী" বলিয়া কথিত কোন বাড়ী পাই নাই এবং ঐরূপ কোন প্রবাদের বিষয়ও জানিতে পারি নাই। কাঠুরিয়া, শিকারী ও সুন্দরবনের নিকটবর্তী সকলের কাছেই উহা শেখের বাড়ী বলিয়া সুপরিচিত।

সতীশবাবু শেখেরট্যাকের অবস্থান সম্পর্কে বলিয়াছেন : "মার্জাল নদী হইতে একটি খাল পূর্বাভিমুখে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম কালীর খাল। শেখের খাল ও কালীর খালের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি বিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গলকে শেখেরট্যাক বলে।" কিন্তু উহা ঠিক নহে। শেখের খাল এবং কালীর খাল শিবসা নদী হইতে পূর্বদিকে গিয়াছে। মার্জাল নদীর কোন নামগন্ধ এখানে নাই। শেখের খালের সংলগ্ন উত্তরদিকে শিবসা নদীর তীরে শেখেরট্যাক অবস্থিত। আমরা একাধিকবার ঐ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া উহার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করিয়াছি।

আমরা ভ্রমণকালে বরাবর শেখের খালের মধ্য দিয়া দুই তীরবর্তীর গভীর জঙ্গল অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে প্রায় দেড় মাইল পৌঁছিবার পর খালের দক্ষিণ তীরে একটি

প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। এখানে কয়েকটি গাবগাছ আছে, তথায় নৌকা রাখিয়া আমরা দক্ষিণ দিকে পদব্রজে গাছের ঘন গুড়ি, শুলো ও হদোবনের মধ্য দিয়া কর্দমাক্ত পথ ধরিযা প্রায় এক মাইল পরে একটি নগরের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেখানে এক বিরাটকায় দীঘির চারিপার্শ্বে দুর্গের ভগ্নাবশেষ, দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি মন্দির ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ ও মন্দিরের মধ্যে প্রায়ই ব্যাঘ্রদল আসিয়া আশ্রয় লয়। ভয়সঙ্কুল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইলাম। শেখের বাড়ীর ন্যায় এখানে প্রচুর বট ও গাবগাছ ইত্যাদি আছে। জলাশয় প্রচুর মৎস্যে পূর্ণ। জলাশয়ের চারিদিকে শতাধিক পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ। মন্দিরটি কোন সময় নির্মিত সঠিকভাবে কেহ বলিতে পারে নাই। মন্দিরের ইটের মাপ ৬" × ৩" × ২" এবং ছোট সাইজের টালির মত ইটও ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের দরজা খোলা। কেহ কেহ এই স্থানকে রাজা প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ অথবা মোগল আমলে নির্মিত কোন দুর্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মন্দিরের অবস্থানের জন্য এই স্থান সাধারণের নিকট কালীবাড়ী বলিয়া সুপরিচিত এবং ইহার দক্ষিণদিকের খাল, কালীর খাল নামে পরিচিত। এই স্থানকে অবশ্য কেহ কেহ কামার বাড়ীও বলে।

উপরোক্ত কালীবাড়ীর প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং কালীর খালের উত্তর পারে অনেকগুলি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেও অনেক ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। এই অঞ্চলটি গড়ে ১০ বর্গমাইল হইবে। এককালে এখানে বহুলোকের বসবাস ও গমনাগমন ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করার জন্য মোগল শাসকেরা এইখানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন এবং তথায় সুন্দর লোকালয় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মন্দিরটি হিন্দু রাজকর্মচারীদের জন্য নির্মিত হইয়া থাকিবে।

ওমালী বলিয়াছেন যে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে পর্তুগীজদের প্রণীত মানচিত্রে বঙ্গোপসাগরের তীরে পাঁচটি শহরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের নাম যথাক্রমে কুইপিটাভিজ, নলদী, ডাপারা, প্যাকাকুলী এবং টীপারিয়া। শেখেরট্যাক, কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থান মিলিয়া এই পাঁচটি শহর একটি হইতে পারে। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এবং ব্যাঘ্র-সঙ্কুল স্থানে এই ধরণের প্রাচীন কীর্তি অদ্যাপি দর্শকদের অন্তরে অপরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

পর্তুগীজদের উপরোক্ত মানচিত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুন্দরবন উর্বর দেশ এবং তাহাতে পাঁচটি নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। ডি ব্যারোজ প্রণীত এশিয়ার ইতিবৃত্তে তাহাই প্রমাণিত হয়। পেচাকুলী ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে একটি পরগনা ছিল। কুইপিটাভিজ খুব সম্ভব খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট)। খলিফাত পর্তুগীজদের বিকৃত ভাষায় কুইপীট এবং আবাদ হইতে আভাজ হইয়াছে। ভ্যাণ্ডেন ব্রুক ও মিঃ ওমালী এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। ডাপারা ও নলদী সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। টিপারীয়াকে ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া সতীশ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শুধু অনুমান মাত্র। মোগল-

পর্তুগীজ আমলে বঙ্গোপসাগর হইতে ত্রিপুরা বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং সুন্দরবনের সহিত এই স্থানের কোন সম্পর্ক ছিল না। নিখিলনাথ রায়ের মতে পাঁচটি শহরের তিনটি বাকেরগঞ্জ এবং দুইটি খুলনায় অবস্থিত ছিল।

সুন্দরবন ঘনবসতিপূর্ণ শহর ছিল, না মধ্যে মধ্যে বসতি ছিল অথবা বর্তমানের ন্যায় জনমানবহীন ছিল এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্লকম্যান বলেন যে, সুন্দরবনে কোন এক সময়ে শহর, পথঘাট এবং বাড়ীঘর গড়িয়া উঠার চেষ্টা চলিয়াছিল মাত্র। কাপ্টেন মরিসন বলেন যে, সুন্দরবনে ঘনবসতি ছিল এবং চাষাবাদ হইত। ব্লকম্যান এই মতের বিরোধী। তিনি বলেন যে, পর্তুগীজ ও ডাচ মানচিত্রে সুন্দরবনে যে পাঁচটি শহরেব উল্লেখ আছে তাহা কিছুই প্রমাণ করে না। ওমালী বলেন যে, তোডরমল্লের জরিপে জানা যায় যে যোড়শ শতাব্দীতে এখনকার ন্যায় জঙ্গল ছিল। বিভারিজ বলেন, সুন্দরবনের জঙ্গল এখন যে অবস্থায় আছে তখনও তদরূপ ছিল। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতি অতীতকে অনেক বড় করিয়া দেখে এবং তাহারা বলে যে সুন্দরবনে বড় বড় শহর ছিল। আমাদের মন্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা খামার জঙ্গল আবাদ করেন ইংরেজ জমিদার রবার্ট মোরেল। বাইরের মানুষ এনে সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

চার

প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পর্যটক ও আমাদের বন ভ্রমণ কাহিনী

সুন্দরবন ভ্রমণে যেমন অফুরন্ত আনন্দ পাই তেমনই বিপদ-আপদেরও সম্ভাবনা কম নহে। নবাগতদের পক্ষে সুন্দরবন ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক। প্রথম সংস্করণে এ বিষয় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। সেজন্য ভ্রমণকারী ও আগ্রহী পাঠকদের সুবিধার্থে সেইসমস্ত বিষয় সংক্ষেপে সংযোজিত হইল। প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও জঙ্গলের বিধিনিষেধ সম্পর্কে সর্বপ্রথমে আলোচনা করিতেছি।

সুন্দরবন অতীব পুরাতন, কিন্তু উহার প্রাচীনকালীন শাসন ব্যবস্থার বিষয় কিছুই জানা যায় না। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা নূতন সরকার পত্তন করিয়া সুন্দরবনকে উহার অন্তর্ভুক্ত করেন। তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা এই তালিকা পুনর্বিন্যাস করেন। মোগল আমলে সুন্দরবনকে মোরাদখানা ও জেরাদখানা বলা হইত। তখন উহার নামমাত্র রাজস্ব নির্ধারিত ছিল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ক্লডরাসেল সুন্দরবন আবাদ করেন। ইহার পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে যশোরের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেলের সময় সুন্দরবন জমিদারদের হস্তচ্যুত হইয়া জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। এ বিষয় আমরা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। ১৮১৭ খৃঃ ২৩ রেগুলেশন অনুসারে সুন্দরবনের শাসনব্যবস্থা পৃথকভাবে দেখান হয় এবং উক্ত বিধানের বলে "কমিশনার অব সুন্দরবনস" পদেব সৃষ্টি হইয়া উহার শাসন বাবস্থা শৃঙ্খলিত হয়।

লেফটেন্যান্ট হজেস ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবন জরিপ কবেন। আলীপুরে সুন্দরবন বিভাগের সর্বপ্রথম হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়।

সুন্দরবন পূর্বে সংরক্ষিত ছিল না। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে সমগ্র বন বিভাগ জমিদারেরা ভোগ দখল করিত। তখন বন বিভাগের জন্য কোন সরকারী অফিস স্থাপিত হয় নাই। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সুন্দরবন হইতে রাজস্ব আদায়ের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। সুন্দরবন সর্বপ্রথম পোর্ট-ক্যানিং কোম্পানিকে বাৎসরিক আট হাজার টাকায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট সুন্দরবনের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেষ্ট মিঃ শ্লিট বন বিভাগের আর্থিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল সুন্দববনেব অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া পার্শ্ববর্তী জেলার অধিবাসীদের নিকট উহা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

স্থানীয় জনসাধারণ এই সময় সুন্দরবনের স্থানে স্থানে চাষাবাদযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। সুন্দরীকাঠের অভাব দেখা দিলে জঙ্গল আবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আপত্তি উঠল। এবিষয় তদন্ত করার পর সুন্দরী বৃক্ষ রক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি হইয়া মাত্র ৮৮৫ স্কোয়ার মাইল জঙ্গল সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে আরও ৩১৪ বর্গমাইল এলাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ভাবে ক্রমাগত সমগ্র সুন্দরবনের এলাকা সংরক্ষিত হইয়া সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আসে। সুন্দরবন অঞ্চলে ধীরে ধীরে লোকালয়ের ন্যায় আইনকানুন প্রবর্তিত হয়।

সুন্দরবনের শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে বিভিন্ন এলাকায় বন বিভাগের অফিস স্থাপিত হয়। এই সমস্ত অফিসে দিবারাত্র লোকের ভীড় থাকে। সুন্দরবনের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে বন বিভাগের কর্মচারীরাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৎসরের বারমাসই তাহাদিগকে জঙ্গলের নির্জন স্থানে অবস্থান করিতে হয়। এই সমস্ত স্থানে লোকালয়ের ন্যায় হাটবাজার, মাঠ, ঘাট, ডাকঘর ইত্যাদি নাই। লোকালয় হইতেই এই সমস্ত কর্মচারীদের খাদ্য ও অন্যান্য তৈজসপত্র সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সুন্দরবনের সর্বত্রই লবণাক্ত পানি। এক ফোঁটাও পানের যোগ্য নহে। সেজন্য প্রতিটি মানুষকে দূর-দূরান্ত হইতে পানীয় জল আহরণ করিয়া রাখিতে হয়। জঙ্গলের ভয়সঙ্কুল নির্জন স্থানে কর্মচারীদের জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। শহর-গঞ্জের সুযোগ সুবিধা হইতে তাহারা একেবারেই বঞ্চিত।

বনবিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য জনমানবশূন্য স্থানে উচ্চ ঘর বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। গৃহগুলিকে বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। এই সমস্ত উঁচু ঘরে কাঁচা বা পাকা মাটির দেওয়াল বা মেঝে হয় না। কাঠের পাটাতন মেঝে রূপে ব্যবহৃত হয়। ঘরগুলি প্রায় সবই কাঠ নির্মিত—ছাউনি গোলপাতা বা করোগেট টিনের। কাঠের মই দিয়া মাটি হইতে এই সব ঘরে উঠিতে হয়। নদী বা সমুদ্রতীরে সাধারণের সুবিধাজনক স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সকাল বেলা হইতে এই সমস্ত অফিসে বহিরাগত লোকের ভীড় জমিতে থাকে। কেহ কাঠের পাশ, কেহ গোলপাতার, কেহ মধু সংগ্রহ বা মাছ ধরার জন্য ঐ সমস্ত অফিসে হাজির হয়। নৌকার মাপঝোক, কয়জন মানুষ, বন্দুক ইত্যাদি লেখাইয়া প্রবেশপত্র গ্রহণ করিতে হয়। সর্বপ্রকার শিকারীদের জন্যও এই পাশের আবশ্যক হয়। নির্জন বনের অফিসগুলি প্রায়ই জনকোলাহলময় থাকে।

সুন্দরবনে তিনটি বিভাগ আছে। উহার নাম যথাক্রমে খুলনা সদর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় ৫০টির অধিক কূপ অফিস আছে। বাকেরগঞ্জ জেলায় যে ক্ষুদ্রকায় জঙ্গল আছে উহা কুয়াকাটা বিট অফিস কর্তৃক শাসিত হয়।

বন বিভাগের বহু কর্মচারী নৌকায় অফিসের কার্যাদি পরিচালনা করেন এবং নৌকায় চড়িয়া বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া কার্যের তদারক করেন। এই সমস্ত নৌকা এতদঞ্চলের

অধিবাসীদের নিকট পিটেল বোট (Patrol Baot) বলিয়া পরিচিত। নৌকাস্থ কর্মচারীদের পিটেলবাবু বলা হয়।

বাংলাদেশের বন বিভাগের প্রধান ইনস্পেকটর জেনারেল অব ফরেষ্ট। তাঁহার পরবর্তী পদ যথাক্রমে চীফ কনজারভেটর এবং কনজারভেটর। ডেপুটি কনজারভেটর এবং সহকারী কনজারভেটরও আছেন।

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবন একটি বিভাগ। ইহার শাসক বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসার—(ডি এফ. ও.)। তাঁহার একজন সহকারী আছেন। উভয়ে সুন্দরবন বিভাগের উপর স্থানীয় ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব করেন। খুলনা শহরে তাঁহাদের কার্যালয় অবস্থিত। মধ্যে মধ্যে সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহাদের অধীনে অনেকগুলি মটর লঞ্চ সর্বদা সুন্দরবনে যাতায়াত করে।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের অফিস বুড়িগোয়ালিনী জঙ্গলের সন্নিকটে অবস্থিত। সদরের রেঞ্জ অফিস নলিয়ানে, শিবসা নদীর তীরে, সুন্দরবনের পার্শ্বে। বাগেরহাট রেঞ্জের অফিস শরণখোলায় অবস্থিত। শাসন কার্যের সুবিধার্থে বর্তমান চালনা পোর্টের সন্নিকটে চাঁদপাই নামক স্থানে আর একটি রেঞ্জ অফিস স্থাপিত হইয়াছে। রেঞ্জ অফিসের কর্তাকে রেঞ্জার বলা হয়। রেঞ্জার পদ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার পরবর্তী পদ ডেপুটি রেঞ্জার। ডেপুটি রেঞ্জারের নীচে ফরেষ্টার বা বনকরের দারোগা। দারোগার পরে গার্ড বা পাহারাদার। ইহার নীচে বোটম্যান বা নৌকার মাঝি ও পিয়ন।

সুন্দরবনের ভ্রাম্যমান জনবসতির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। আদমশুমারীতে সুন্দরবনের সর্বপ্রকার জনসংখ্যা পৃথকভাবে দেখান হয়। জনসংখ্যার অধিকাংশই ভাসমান। বিধিবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা না থাকিলে সুন্দরবন আবার মগের মুল্লুকে পরিণত হইত।

বর্তমানে এতদঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। গোড়ইখালি, নলিয়ান, বেদকাশী, মঙ্গলা, বুড়িগোয়ালিনী ও রায়েন্দা বাজারে সুন্দরবনের লোকেরা খাদ্যবস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। পুরাতন পোর্ট চালনা হইতে মঙ্গলা নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। পশর নদীতীরের এই বন্দর বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সামুদ্রিক জাহাজ দেশ বিদেশ হইতে পশর নদীর উপর দিয়া পার্শ্ববর্তী সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া বিদেশী পণ্য দেশে আমদানী করে। কালক্রমে সুন্দরবনের পার্শ্বে অবস্থিত এই বন্দরে একটি বৃহৎকায় শহর গড়িয়া উঠার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

বর্তমানে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল কর্মচারীরা কয়েকশত মজুরসহ সর্বদা সুন্দরবনে থাকিয়া এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বৃক্ষ ছেদন করিয়া কাঠ সংগ্রহ করে। এই স্কিমকে "গেউয়া অপারেশান" বলা হয়। মিলের পক্ষ হইতে জঙ্গলে বড় বড় অস্থায়ী ঘর আছে। কর্মচারী ও ঠিকাদারগণ কাঠ সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। হার্ডবোর্ড, ম্যাচ ফ্যাকটরীর জন্যও সুন্দরবন হইতে গেউয়া কাঠ সংগৃহীত হয়।

বৎসরের সব সময়ে নদী ও জঙ্গলে কাজ চলে। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সুন্দরবনের সর্বত্র অত্যধিক কার্য-তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময় নদী ও সমুদ্র শান্ত

থাকে। সুন্দরবনের বৃক্ষের ঘের নিলামে বিক্রয় হয়। মহাজনেরা এই ঘের খরিদ করে। গোলপাতারও নিলাম হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময় খুলনা অফিসে প্রকাশ্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। নানা প্রকার কাঠ, গোলপাতা, মৎস্য, হাঙ্গর, কুমীর, ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকারী, মৌয়াল ও ভ্রমণকারী প্রভৃতি সকলের নিকট হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হয়। কাঠ ও গোলপাতার আয় সর্বাধিক। বিভাগ পূর্ববর্তী কালে সুন্দরবনের আয় ছিল সামান্য, বর্তমান বাৎসরিক আয় এক কোটী টাকার উপর।

রেঞ্জ ও কূপ অফিসসমূহে মন্থর গতিতে কাজ চলে। একে কর্মচারীর অভাব, তদ্ব্যতীত কোন কোন সময় সুন্দরবন প্রবেশকারীদেব ঘন্টার পর ঘন্টা ঐ সমস্ত অফিসে অযথা বসিয়া থাকিতে হয়। নির্জন বনানী এবং নদীনালা বেষ্টিত ভয়সঙ্কুল স্থানে অসহায় ও দরিদ্র কাঠুরিয়া ও অন্যান্যদের নিকট হইতে ছলে বলে কৌশলে উৎকোচ গ্রহণ একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈপ্লবিক পন্থায় সমগ্র সুন্দরবনের শাসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস হওয়া অত্যাবশ্যক।

বন বিভাগেব অফিসার ব্যতীত মৎস্যবিভাগের কর্মচারীরা কর্যোপলক্ষে মটরলঞ্চ ও নৌকাযোগে মধ্যে মধ্যে সুন্দরবনে অবস্থান করেন। মৎস্য শিকার ও মৎস্যবহনকারী মটর লঞ্চ বঙ্গোপসাগর হইতে খুলনা শহর পর্যন্ত যাতায়াত করে।

পর্যটক : সুন্দরবন পরিভ্রমণের জন্য প্রতি বৎসব বিদেশ হইতে বহু পরিদর্শক এখানে আগমন করেন। বাংলাদেশ ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক আকর্ষণ সুন্দরবন। বিপুল আগ্রহ সহকারে বিদেশী পর্যটকেরা এই রহস্যময় জঙ্গল ভ্রমণ করিয়া শিক্ষাগ্রহণ ও নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বহু পাশ্চাত্য সাংবাদিক (Common wealth pressmen) সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন। তাঁহাদের ভ্রমণ কাহিনী বহু পত্র পত্রিকায় নানা প্রকার নয়নাভিরাম ছবির সম্ভারে প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকগণ নিঝুম-নিরালা বনের রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া যান। তাঁহারা সমুদ্রও ভ্রমণ করেন।

ইংল্যাণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের পর্যটকগণ সুন্দরবনের অবস্থান, গঠন প্রণালী, ফ্লোরা ও ফনা দর্শনে এখানে রাজকীয় সফরে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক স্থানীয় শিকারীদের সহায়তায় ব্যাঘ্র-কুম্ভীর প্রভৃতি শিকার করিয়া থাকেন। দুঃসাহসিকতার সহিত তাঁহারা গভীর জঙ্গলে থাকিয়া শিকার ব্যাপদেশে আনন্দ উপভোগ করেন।

বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ সুন্দরবন পর্যটন করিয়া সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দান করেন। নিউজপ্রিণ্ট মিল প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ ভ্রমণ করিয়া পরামর্শ দান করিয়াছেন।

বিশিষ্ট বৃটিশ চিত্র নির্মাতা মিঃ টস ষ্টোবাট শীতের মরশুমে একবার সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া শুটিং করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঢাকার একটি ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একজন

প্রতিনিধি সুন্দরবনের ছবি গ্রহণের জন্য এই লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

সম্প্রতি (ইং ১৯৬৭ সাল) বিশ্ব বন্যজন্তু তহবিলের পক্ষে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল গাই মাউণ্টফোর্টের নেতৃত্বে তথ্যানুসন্ধানের জন্য সপ্তাহাধিকব্যাপী সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। এই দলের বিশেষজ্ঞদের অভিমত জীবজন্তু সংরক্ষণ প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

এই বিশেষজ্ঞদলের প্রধান মাউণ্টফোর্ট সুন্দরবনে একটি জাতীয় পার্ক প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে গিরগিটের ন্যায় সুন্দরবনেও একটি জাতীয় পার্ক নির্মিত হইতে পারে।

দি ওয়েভ পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে (৯ই ডিসেম্বর '৬৭ সাল) সুন্দরবনে জাতীয় পার্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইরূপ একটি পার্কের প্রতিষ্ঠা হইলে সুন্দরবন সমগ্র বিশ্বের ভ্রমণকারীদের এক মনোরম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে। সরকারকে সেজন্য যাতায়াত ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্পাদকীয় নিবন্ধে আরও বলা হয় যে, আমাদের হর্মরাজির বহর ও স্থাপত্য শিল্পের চাকচিক্যের দ্বারা পাশ্চাত্যের ভ্রমণকারীদের চক্ষু ঝলসিয়ে দেওয়া অসম্ভব। আকাশচারীদের নিকট উহার সৌন্দর্য অবলুপ্ত হইয়াছে। বরং তাঁহারা দেশ ভ্রমণে বিস্ময় ও রোমাঞ্চকর পরিবেশ দেখিতে বিশেষ আগ্রহী। তন্নিমিত্ত কেনিয়া ও উগাণ্ডা বিশ্বভ্রাম্যমানদের অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে।

জার্মান টেলিভিশান দল কয়েক বৎসর পূর্বে সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। তাঁহারা ছবি গ্রহণ ও ব্যাঘ্র শিকার উভয় কার্যে লিপ্ত ছিলেন।

ইং ১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে নেপালের রাজা মহেন্দ্র এবং রাণী রত্না যুবরাজসহ সুন্দরবন পরিভ্রমণে আসেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য খুলনার সর্বত্র বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং পার্শ্ববর্তী বৃক্ষসমূহের নিম্নভাগে চুনকাম করা হয়। গভীর জঙ্গলে তাঁহাদের জন্য ডায়নামা স্থাপন করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এবং শিকারের জন্য তিনটি বড় মাচাং নির্মাণ করা হয়। ত্রিকোণ দ্বীপের জঙ্গলে আলোকসজ্জা দর্শনে লোকে স্তম্ভিত হইয়া যায়। মশার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাচাং-এর পার্শ্ববর্তী স্থান ডি. ডি টি. দ্বারা স্প্রে করিয়া দেওয়া হয়।

অনেকগুলি ছাগল ব্যাঘ্র শিকারের জন্য বাঁধিয়া রাখা হয়। তন্মধ্যে এগারটি ছাগল ব্যাঘ্র ভক্ষণ করে। রাজা-রাণী ব্যাঘ্র শিকারে ব্যর্থ হন। রাজকুমার যে মাচাংয়ে ছিলেন সেখানে বাঘ আসিয়াছিল। কিন্তু সুন্দরবনের শিকারে অনভ্যস্ত বলিয়া উহাও ব্যর্থ হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে ইরানের শাহান শাহ্ রেজা আরিয়া মেহের সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। তিনি সুন্দরবনকে মনোরম ও ভয়াবহ বনস্থলী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে তিনি এই জঙ্গলের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছিলেন।

যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী বিশ্ববিশ্রুত এই মনোরম জঙ্গল পরিদর্শনের জন্য ঢাকা পর্যন্ত আসিয়া তাঁহার বন ভ্রমণ প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া দেন।

দেশী বিদেশী সম্ভ্রান্ত পর্যটকদের জন্য চালনা বন্দরের কর্তৃপক্ষ মর্জত নদীর পশ্চিমতীরে বিখ্যাত নীলকমল চরে এবং বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে এক মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির নির্জন স্থানে একটি আরাম নিবাস নির্মাণ করিয়াছেন। এখানে একটি বেতার কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গভীর জঙ্গলের পার্শ্বে এখানে আধুনিক ধরণের যে সুন্দর ইমারত নির্মিত হইয়াছে, উহা বনাঞ্চলে এক অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। পোর্ট ডাইরেক্টরের অধীনে কয়েকজন কর্মচারী এখানকার কার্য্যাদি তত্ত্বাবধান করেন। বিদেশী মেহমান ও সরকারের পরিদর্শকদের জন্য সাময়িক অবস্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানকে 'হিরণপয়েন্ট'ও বলা হয়। মর্জতের পশ্চিমতীরে এবং দুবলা দ্বীপে সামুদ্রিক জাহাজের পথ নির্দেশের জন্য দুটি লাইট হাউস আছে। মর্জতের পূর্বতীরে লাইট হাউসের স্থানকে 'জাফর পয়েন্ট' বলা হয়। পশ্চিমতীরের লাইট হাউস চাঁদা বুনিয়ার চরে অবস্থিত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে সুন্দরবনের মধ্যস্থ এই চরে সাময়িক বেতারকেন্দ্র ও পর্যবেক্ষণ অফিস স্থাপিত হইয়াছিল।

বাগেরহাট রেঞ্জের কটকা ও ঝাপার জঙ্গলে বন বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বিশেষভাবে সংরক্ষিত (Sanctuary) আছে। এই স্থানে হরিণ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে এই নিয়ম কয়জনে পালন করে? এখানে কর্মচারীদের বাসের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রায়মঙ্গলে জঙ্গল মধ্যে সীমান্ত পুলিশ ও শুল্কবিভাগীয় অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

লাইট হাউস ও লাইট পোষ্টের সাহায্যে ভ্রমণকারী সুন্দরবনের নদীপথে যাতায়াত করেন। সামুদ্রিক জাহাজে নাবিকেরা এই লাইট পোষ্টের সাহায্যে নদীপথে চলাফেরা করে। কোথায় চরভূমি, কোথায় নদী গভীর, কোথায় বামে বা দক্ষিণে পথ চলিতে হইবে সে সব বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। চালনা পোর্ট হইতে আসমুদ্র নদীপথে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন স্থানে সরকারী ও বেসরকারী অফিসাদির জন্য ভ্রমণকারীদের বিশেষ সুবিধা হয়।

সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের জন্য কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। নৌকায় বা লঞ্চে সুন্দরবন ভ্রমণে আসিলে খাদ্যদ্রব্য পানীয়জল এবং অন্যান্য মাল মশলা সঙ্গে লইতে হয়। খুলনা বন-বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিস হইতে আদেশ পত্র সংগ্রহ করিয়া উহা আবার প্রবেশ পথে দেখাইতে হইবে। এই সমস্ত প্রবেশ পথের অফিসে মাথাপিছু দৈনিক কর ও নৌকা লঞ্চের জন্যও করাদি আদায় দিতে হইবে। বন বিভাগের আইন-কানুন সম্পর্কে তাহাদের পরিজ্ঞাত হইয়া উচিৎ।

ভ্রমণকারীরা কখনও সুন্দরবনের নদীনালায় অবতরণ করিবে না। তথায় সর্বদা হাঙ্গর ও কুমীরের আক্রমণ ভীতি বিদ্যমান। জঙ্গলে ব্যাঘ্র, সর্প ইত্যাদির ভয় আছে। সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সুন্দরবন পরিভ্রমণ করিতে হয়। বিস্ময়কর পরিবেশে বন ভ্রমণ যেমন আনন্দদায়ক তেমনই বিপজ্জনক।

অক্টোবর হইতে জানুয়ারী বা কার্তিক হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত সুন্দরবন ভ্রমণের অতি উত্তম সময়। এই সময় বর্ষা, ঝড় বা ঢেউয়ের উপদ্রব নাই বলিলে চলে। সমুদ্র ও নদীর পানি শান্ত থাকায় নৌ-পথে যাতায়াতের সুবিধা হয়। এক কথায় হেমন্ত ও শীতকাল ভ্রমণকারীদের বন ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ আরামদায়ক। অন্যান্য সময় সুন্দরবন ভ্রমণ বিপজ্জনক।

দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের পক্ষে দর্শনীয় অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান আছে। সুন্দরবনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিতে মনোরম। জঙ্গলের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সামুদ্রিক পরিবেশ, নদীনালার প্রাচুর্য, পার্শ্বেই গহীন অরণ্য এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। এ দৃশ্য যেমন বিস্ময়কর তেমনই সুন্দর।

প্রত্নতাত্ত্বিক পাইবেন সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত ভগ্ন অট্টালিকা সমূহ। তাঁহাদের পক্ষে শেখেরট্যাক, কালীবাড়ী, তেরকাটি, চাঁদেশ্বর, রায়মঙ্গল প্রভৃতি জঙ্গল দেখিতে হইবে। শিকারী ভ্রমণ করিবেন কটকা, ঝাপা, আমবাড়ীয়া, মাদারবাড়ীয়া, ত্রিকোনদ্বীপ, পাঠাকাটা প্রভৃতি জঙ্গল। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও বৈজ্ঞানিক সুন্দরবনের সর্বত্র তাঁহাদের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ফলকথা যিনি যেভাবে সুন্দরবন দর্শনে আনন্দ পান তিনি সেইভাবেই উহা উপভোগ করিবেন।

দেশী ভ্রমণকারীদের কথা বলা হয় নাই। বাংলাদেশের অসংখ্য ভ্রমণকারী কেহ কার্যোপলক্ষে, কেহ নিছক ভ্রমণ ব্যাপদেশে, কেহ শিকারের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন পরিভ্রমণ করেন। তাঁহারা ক্যামেরার সাহায্যে জঙ্গলের ছবি গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের জনৈক ভ্রমণকারী মধ্যে মধ্যে বাঘ শিকার করিতে আসিয়া থাকেন। ব্যাঘ্র না পাইলেও ব্যাঘ্র শিকারের আজগুবি কাহিনী ও নিজের অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি একখানি বই লিখিয়াছেন, উহার অধিকাংশ অসম্ভব ঘটনাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। একবার দুইজন যুবক সুন্দরবন ভ্রমণ করে। সেই সময় নলিয়ানালার এক অফিসার একটি ব্যাঘ্র শিকার করেন। উক্ত যুবকদ্বয় বাঘের ছবি লইয়া লাহোরে প্রচার করিয়া দেয় যে তাহারাই বাঘ মারিয়াছে। এইভাবে সত্য-মিথ্যা বহু প্রচারও চলে। আমরা বনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনের সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালাইয়াছি।

পাকিস্তানের অধিকাংশ ভ্রমণকারী মনোরম সুন্দরবনের অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দর্শন মানসে এতদঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। টুরিষ্ট ব্যুরো হইতে সুন্দরবন ভ্রমণের যে যৎসামান্য ব্যবস্থা আছে উহা সাধারণ বা মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। ভ্রমণকারীদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে অচিরে সরকারী ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। বর্তমান দেশী-বিদেশী শিল্পীরা সুন্দরবনের ফিল্ম প্রস্তুতের চেষ্টা চালাইতেছেন। সুন্দরবনের ডকুমেন্টারী ফিল্ম সর্বত্র প্রদর্শন করা উচিৎ। কয়েক বৎসর পূর্বে এক বিদেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ডি. এফ. ও.-র মধ্যস্থতায় এই লেখকের নিকট হইতে সুন্দরবনের ঐতিহাসিক স্থানসমূহের হর্মরাজি ও উহার ভগ্নাবশেষের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ধরনের ফিল্ম প্রস্তুত হইলে দেশবাসী সুন্দরবন সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিজ্ঞাত হইবেন।

ভ্রমণকারীদের পক্ষে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। অনেকে মনে করেন যে, ঢাকা ও প্রদেশের অন্যান্য স্থান হইতে খুলনায় পৌঁছিলে সুন্দরবন পরিদর্শন করা যায়। কিন্তু তাহা ভুল। বহুলোক খুলনা পর্যন্ত আসিয়া সুন্দরবন যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। সুন্দরবন খুলনা শহর হইতে অন্যূন ৪০ মাইল দূরে এবং সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় শতাধিক মাইল। খুলনা শহর বা অন্য স্থান হইতে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য নৌকা বা লঞ্চ যোগাড় করিতে হয়। এ বৎসর (১৯৬৭ সাল) দিনাজপুর হইতে প্রায় ২০০ ছাত্র বন ভ্রমণের জন্য খুলনায় আসিয়া পৌঁছে। তাহারা কোন যানবাহন যোগাড় করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সাধারণ ভ্রমণকারী খুলনা হইতে যাত্রীবাহী লঞ্চে গিয়া সুন্দরবনের প্রান্তসীমা হইতে নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে পারেন।

দেশের শিকারী ও ভ্রমণকারীদের সুন্দরবন ভ্রমণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সাধারণ ভ্রমণকারী ব্যতীত রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রী এবং উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরাও সুন্দরবন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটবলঞ্চ বা জাহাজ যোগে সুন্দরবনের মধ্যে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত পরিভ্রমণ করেন এবং ব্যাঘ্র, হরিণ, কুম্ভীর প্রভৃতি শিকার করিয়া থাকেন। এই ধরণের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আগমনে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। তাঁহাদের আগমনে প্রাচীন ইরান সাম্রাজ্যের শাশানীয় সম্রাট বাহরামগুরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমান দেশী-বিদেশী পর্যটকের আনাগোনায় সমগ্র সুন্দরবন মধ্যে মধ্যে কোলাহল মুখরিত থাকে।

আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণ : প্রথম জীবনে সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়াছি সাধারণ ভ্রমণকারীর ন্যায় নিছক বনভ্রমণের উদ্দেশ্যে। তখন এই গ্রন্থ প্রণয়নেব কোন পরিকল্পনা ছিল না। পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৫৭ সাল হইতে আজ পর্যন্ত যতবার সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়াছি, প্রত্যেকবারেই বহুসোঘেরা বনভূমি হইতে অত্র গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত হইয়াছি। বনভ্রমণে কেহ শিকারে লিপ্ত, কেহ ছবি তুলিতে ব্যস্ত, আবার কেহ নূতন নূতন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। আমার কাজ কাগজ-কলমসহ সর্বদা নোট লিখিয়া যাওয়া। এইভাবে অত্র গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য নৌকা ও মটর লঞ্চ যোগে কতবার যে বন হইতে বনান্তরে, এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে, এক নদী হইতে অন্য নদীতে, আবার নদী হইতে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে তাহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সাগর সৈকতে, উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে, সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কর্দমাক্ত শূলো বনের মধ্য দিয়া জুতাবিহীন চরণযুগলের উপর নির্ভর করিয়া গহীন অরণ্যে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। রাত্রিতে নৌকা নঙ্গোর করিয়া সুন্দরবনের নদীতীরে অবস্থান করিয়াছি। কোন কোন দিনের ঘটনা মনে করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। এখানে আমরা কয়েকটি বিশেষ বনভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিব।

সুন্দরবনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিশালকায় নদী শিবসা। গড়াইখালি বাজার হইতে তিনখানা নৌকাসহ আমরা ১২ জন যাত্রী শিবসা নদী হইয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করি।

নলিয়ানালা অফিস হইতে প্রবেশ পত্র লইয়া আমাদের নৌকা দক্ষিণ দিকে যাইতে থাকে। পথে সর্বত্র সুন্দরবনের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করিতে থাকি। মাঝিরা মধ্যে মধ্যে গান করিয়া আপনমনে নৌকা চালাইতে থাকে।

নদীপার্শ্বে বিভিন্ন খালের নামগুলি লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলাম। শিবসা নদী হইতে যে সমস্ত খাল পশ্চিমমুখী হইয়াছে, উহাদেব নাম যথাক্রমে ঘোষখালি, গাঙরখি, হড্ডা, আগারদোয়ানে, বোতলখালি, মুচির দোয়ানে, লক্ষ্মীপ্রসাদ, কাটরার খাল, ছাচনাংলা, ভাইজোড়া, মার্গির খাল. মার্গির চরের খাল, বড় বুজবুনিয়া, ছোট বুজবুনিয়া, ছোট কালীর খাল, আড়ো শিবসা নদী, চেতলার চরের খাল, ছোট দুধমুখী, বড় দুধমুখী, মান্দার বাড়ীর খাল, আলকীর ভারানী ইত্যাদি!

নদীর পূর্বপারের খালগুলির নাম যথাক্রমে সুতারখালী, চরের খাল, আড়বাউনে, বড় কুকরোকাটী. ছোট কুকরোকাটী, মজোখালী, কোড়াকাটা, কুমোরের চরের খাল, পাখীউড়োর খাল, হাটডোর, হাট ডোরার চরের খাল, আদাচাকি, বেদের খাল, শেখের খাল, কালীর খাল, মোচড়া শিঙে, নিশান খালি। নীলকমল পর্যন্ত আরও বহু খাল পরিদর্শন করিলাম।

হংসরাজ, শিবসা, পশর, পাঠাকাটা, অগ্নিজ্বাল প্রভৃতি সাতটি নদীর মোহনা যেখানে একত্রিত হইয়াছে, উহাকে লোকে "সাতমুখ আগুনজ্বাল" বলিয়া থাকে। এই স্থানে নদীর প্রস্থ প্রায় পাঁচ মাইল। সে দৃশ্য যেমন অভিনব, তেমন ভয়াবহ ও সুন্দর। নীলকমল খালের পার্শ্বে একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে একটি সুন্দর ময়দান দৃষ্ট হয়। এই ধরনের সৌন্দর্যশালী ময়দান জঙ্গলে বিরল।

খালের নামগুলি সাধারণতঃ আমাদের গ্রামের ন্যায়। নামগুলিব কোন কোনটির কারণও জানা গেল। নলিয়ান গ্রামের মজিদ ওরফে ম'জোকে বাঘে খাইয়াছিল বলিয়া উহার নাম হইয়াছে মজোখালির খাল। কামারখোলা গ্রামের কাদেরকে একটি চরে বাঘে লইয়া যায়। তদবধি ঐ চরের নাম হইয়াছে কেদোখালিব চর। সুন্দরবনের প্রত্যেকটি জঙ্গল, নদীনালা, খাল, চরভূমি ও দ্বীপের নাম আছে। আমরা যেখানে গিয়াছি সেখানকাব নাম ও বহু রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি। উহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নহে। যুগ যুগ ধরিয়া সরকার, জনসাধারণ, বাওয়ালী ও ভ্রমণকারীদের দ্বারা সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য সুন্দরবনের প্রতিটি স্থানের সঠিক পরিচয় পাওনা যায়। স্থানের নাম ও অবস্থান জানা থাকিলে সহজেই গন্তব্যস্থলে যাওয়া যায়। মানচিত্র দেখিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে পথনির্দেশ করিতাম।

পূর্ববর্তী ভ্রমণে আমরা সাতদিনব্যাপী গহীন জঙ্গলে নদীর মধ্যে অবস্থান করি। নানা প্রকার পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, নদনদী পরিদর্শন করিতাম। খলশীব চরে এক বৃক্ষের সঙ্গে আমাদের নৌকা একদিন বাঁধা ছিল। দিনের বেলায় সেখানে মোরগ-মুরগি ও বাচ্চা হরিণ ঘুবিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি কিন্তু শিকার করি নাই।

নূরুদ্দিন মিয়ার তিনখানি নৌকার সঙ্গে চাউল, ডাল, মশলা ইত্যাদি ছিল। বন ভ্রমণে নৌকাপরি তৃপ্তির সহিত আহার করা যায়। মধ্যে মধ্যে সামান্য তেল মশলার বিনিময়ে

জেলেদের নিকট হইতে নানা প্রকার সুস্বাদু মৎস্য সংগ্রহ করা হইত। নিজেরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুকনা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতাম। একদিন বেপারী না আসায় শিবসা নদীর জেলেরা আমাদের এক ঝাড় বৃহৎকায় গল্দাচিংড়ি মৎস্য বিনা পয়সায় দিয়া দিল। আমরা তাহাদের চাউল ও অন্যান্য তৈজসপত্র দিয়াছিলাম। রান্না করিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করা হইল। সুন্দরবনের নৌকাপরি প্রবল ক্ষুধা হইত। পাখী শিকার চলিত। ওড়া ও কেওড়া ফল সিদ্ধ করিয়া লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতাম। গোলফলও পাওয়া যাইত। হরিণের মাংসও বন ভ্রমণে কদাচিৎ ভক্ষণ করিয়াছি।

আমরা চলিতে চলিতে বনের সুদৃশ্য সৌন্দর্য অবলোকন করিতে থাকি, এমন সময় দূর হইতে শেখেরট্যাক দেখা গেল। সুউচ্চ বৃক্ষলতাবেষ্টিত নদীতীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এই বিখ্যাত শেখেরট্যাক। এই ঐতিহাসিক স্থান দর্শনেব আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে শেখেরট্যাকের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তথায় সূর্যাস্তের পূর্বে অবতরণ করিলাম। এই ভ্রমণকালে আমরা শেখেরট্যাক ও কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করি। ইহার বিবরণী পুরাকালীন জনপদ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

এই ভ্রমণকালে আলকীর সন্নিকটে এক গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকারে গিয়া আমাদের সঙ্গী ডাঃ তমেজউদ্দিন, মনসুব আহম্মদ ও মোজাফফর হারাইয়া যান। মানুষ হারাইয়া গেলে 'কু' বা 'কুই' দিয়া সন্ধান করিতে হয়। আমি ও নূরুদ্দিন মিঞা কয়েক ঘন্টা ধরিয়া 'কু' দিয়াও আমাদের সঙ্গীদের সন্ধান পাইলাম না। সঙ্গীদের নেশা ব্যাঘ্রশিকার। উহার জন্য আদেশ পত্রও সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা সঙ্গীদের সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িতেছি, এমন সময়ে গভীর নিশীথে তাঁহাদের সংবাদ পাইলাম। 'কু' দিয়া বা ডাকে নয়, বন্দুক ও রাইফেলের গর্জনে। সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ! চারিদিক নিস্তব্ধ, গহীন অরণ্য, কোথাও ঝি ঝি রব নাই। সেই ভীষণ জঙ্গলে আমরা নদীর মধ্যে আর আমাদের সঙ্গীরা ব্যাঘ্রের পিছনে অথবা ব্যাঘ্র তাঁহাদের পিছনে। রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকা, আমরা বহু অপেক্ষা করিয়া সঙ্গীদের আশু মিলনের আশা ত্যাগ করিয়াছি। ঠিক এমন সময় দিঙমণ্ডল কাঁপাইয়া বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিত ভাবিলাম আমাদের সঙ্গের কৃষকায় লোকটিকে ব্যাঘ্র লইয়া গিয়াছে।

ব্যাঘ্রের নেশায় মত্ত ব্যক্তিদের অনেক সময় ব্যাঘ্রে জীবনলীলা সাঙ্গ করে। ব্যাঘ্র শিকার করিলে আবার তাহাদের কৃতিত্ব। জয়-পরাজয় শিকারীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

আমাদের পূর্বোক্ত সঙ্গীদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সম্পর্কে আরও মন ভারাক্রান্ত হইল। ইতিমধ্যে আমরা স্থির বিশ্বাস করিয়াছি যে, আমাদের একজনকে নিশ্চয়ই ব্যাঘ্রে উদরস্থ করিয়াছে। শহরে ফিরিয়া কি কৈফিয়ত দিব? নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন আর খামখেয়ালি করিয়া অমূল্য জীবন নষ্ট করিলেন। এ কৈফিয়তের কোন জবাব নাই। এইরূপ দুশ্চিন্তা ও আলোচনা করিতে করিতে প্রায় রাত্রি শেষ, এমন সময় বীর শিকারীরা সশরীরে ডিঙ্গি নৌকাযোগে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তাঁহাদের আগমনে আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। ভবিষ্যতের জন্য সকলকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে সুন্দরবনের নদীনালায় জোয়ার ভাটার সাহায্যে নৌকাযোগে জঙ্গলের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিগত ১৯৬৫ সালের রাস পূর্ণিমার সময় খুলনা সাহিত্য পরিষদের ডাঃ আবুল কাসেম, এস. এম. মোবারক আলী প্রমুখসহ সমুদ্রতটবর্তী দুবলা দ্বীপের মেলায় গমন করি। বয়োবৃদ্ধ হিন্দুদের নিকট জানিতে পারি যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামের জনৈক ঠাকুর স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে পূজাপার্বনাদি অনুষ্ঠান করেন। তদবধি ধীরে ধীরে ক্রমাগত এই মেলায় জনসমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেবতা নীলকমল ও গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে হিন্দুরা প্রার্থনা করে। বাদ্য, নৃত্যগীত ও বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে। ঢেউ সেবনের সময় মন্ত্রাদি উচ্চারণ পাঠাছাগল, ফল ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ করিতে দেখা যায়।

বঙ্গোপসাগরের তীরে দুবলা দ্বীপ সুন্দরবনের এক মনোরম স্থান। এই দ্বীপকে সাধারণে দুবলার ট্যাক বলিয়া থাকে। বিস্তীর্ণ চরের বালুকারাশি ক্ষুদ্রকায় মরুভূমির ন্যায় মনে হয়। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র কর্দমাক্ত স্থান। কিন্তু এই বালুচর উহার ব্যতিক্রম। এই স্থানের বালুকা খুঁড়িলে সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়। এখানে চরের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। বালুকার শ্বেতকায় কণাগুলি রৌদ্রকিরণে ঝক্‌মক্ করে। দ্বীপের উঁচুস্থান কাশবন ও উলুখড়ে আবৃত। দ্বীপের পশ্চিম দিককে হলদির চর বলে। নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে এই চর। এখানে নদীর প্রশস্ততা ৫ মাইলের অধিক। দূরে সমুদ্রের উর্মিমালা সুউচ্চ হইয়া আবার সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

এখানে জোয়ারের সময় ভীষণ ঢেউ হয়। স্বচক্ষে না দেখিলে উহার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা সুকঠিন। দুবলা দ্বীপের দক্ষিণে অনন্ত সমুদ্র। শুধু জলে জলময়। আমরা ভ্রমণকালে সাগর পরিদর্শন করিয়া উহার ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়াছি।

গভীর বনানীর পার্শ্বে এই দুবলার চরে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ চরিয়া বেড়ায়। ব্যাঘ্রের আগমন সংবাদে হরিণকুল বনের মধ্যে উধাও হয়। মেলার সময় জনসমাগমের জন্য হরিণ ও ব্যাঘ্রকুল দূরে সরিয়া থাকে। অন্ত্যজ হিন্দুরা বলে এই দুইদিন বড়দাদা বা গাজীঠাকুর (ব্যাঘ্র) কোন লোককে আক্রমণ করে না।

দুবলার মেলায় অসংখ্য দর্শকের ভীড় হয়। সন্তানাদি জন্মগ্রহণ না করিলে অনেক অন্ত্যজ হিন্দু এই মেলায় মানত করে এবং বৎসরের এই সময় আসিয়া মানতকারীরা অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে। কেহ কেহ কৃত পাপ মোচন হইবে মনে করিয়া এই স্থানে আগমন করে এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে ডুবিয়া স্নান করে।

দুবলার মেলায় কয়েকসহস্র লোক সমাগম হয়। মৎস্যজীবিদের আবাসস্থল হইতে এই মেলার স্থান প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে এবং টাইগার পয়েন্ট এখান হইতে প্রায় ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। হিন্দুগণ গঙ্গাসাগরের মেলার ন্যায় একটি তীর্থস্থান মনে করিয়া

এখানে আসিয়া ভীড় জমায়। বনাঞ্চলের অসংখ্য হিন্দু নরনারী ও শিশু এই মেলায় জমায়েত হয়। মুসলমানেরাও এই মেলার সময় সুন্দরবন ও সমুদ্র ভ্রমণ করে।

ভ্রমণ ব্যাপদেশে আমরা একাধিকবার এই মেলা পরিদর্শন করিয়াছি। লোকালয় হইতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, ইক্ষু, ফলমূল, খেলনা, মৃন্ময় পাত্র ইত্যাদি পণ্যসম্ভার নৌকাযোগে দুবলার চরে নীত হইয়া ক্রয়-বিক্রয় হয়। উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী এখানে উপস্থিত থাকেন। পুলিশ ও বনবিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যা অধিক পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গল ও সমুদ্র ভ্রমণকারী নানা শ্রেণীর মানুষের সে এক অপূর্ব ও অভিনব সমাবেশ।

এই মেলাকে অনেকে মগদের মেলা বলিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দিগন্তব্যাপী সলিলরাশির তীরে দুবলা দ্বীপের শ্যামায়মান বৃক্ষশ্রেণীর সবুজ রেখা দূর হইতে তীরভূমির অস্পষ্ট আভাষ জানায়। মেলার একাধিক দিন নির্জন দ্বীপকে একটি ক্ষুদ্রকায় শহরের ন্যায় মনে হয়। দুবলা দ্বীপের পশ্চিমাংশে মেলা বসে, উহাকে হলদির চরও বলা হয়।

সমুদ্রতটে পাঁচ-ছয় মাইলব্যাপী প্রশস্ত বালুচরে পদব্রজে ভ্রমণ মানবমনে অপূর্ব আনন্দ দান করে। যুবকেরা সাগরতীরের বালুচরে ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলিয়া অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। ক্যামেরার সাহায্যে ফটো তোলার হিড়িক পড়িয়া যায়। জনমানবশূন্য প্রদেশে সে এক অভিনব ও নয়নাভিরাম দৃশ্য। এই ভ্রমণে দলবদ্ধভাবে আমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের নিখুঁত অথচ মনোরম দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছি।

তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীরা নৌকায় নৌকায় রান্না ও আহার করে। মনোরম বালুচরে এবং জঙ্গলের পার্শ্ব দিয়া নির্ভয়ে চলাফেরা করে। অনেককে কন্টিকেরী বৃক্ষ ও সমুদ্রের ফেনায় গঠিত শক্ত পদার্থ সংগ্রহে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। শত শত নৌকা ও বহু মটর লঞ্চের সমাগমে স্থানটি দুই-এক রাত্রির জন্য আলোকমালায় সজ্জিত হয়। জ্যোৎস্না রাত্রে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সাগর সৈকতে দাঁড়াইয়া চারিদিকের মনোরম দৃশ্য ভ্রমণকারীদের অপূর্ব আনন্দ দান করে।

১৯৬৪ সালে খুলনা সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন শেষে খ্যাতনামা পল্লীকবি জসীমউদ্দিন সাহেব একান্ত আগ্রহের সহিত সুন্দরবন ভ্রমণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সাহিত্য পরিষদের নাফিউদ্দীনও আমাদের সঙ্গী হিসাবে যাত্রা করেন। মটরলঞ্চ ছয়ঘন্টায় আমাদের হাটডোরা কুপ অফিসে পৌছাইয়া দিল। পল্লীকবি জসীমউদ্দিন সাহেব, ডি. এফ. ও. আলীম সাহেব সহ লেখক লঞ্চে ঘুরিয়া জঙ্গলের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। দিবা শেষে আমরা সদলবলে কুপ অফিসে রাত্রি যাপন করি।

সারারাত্রি গল্প, রূপকথা, ধূয়া ও জারিগান চলিল। মধ্যে একবার রেডিও মারফত পল্লী গানের বিশেষ আসর শ্রবণ করি। জসীমউদ্দিন সাহেব বাওয়ালীদের সঙ্গে গল্পের আসর জমাইয়া বনস্থলী মুখর করিয়া রাখিলেন। আমাদের উপস্থিতিতে এই সমস্ত দরিদ্র বাওয়ালীদের মধ্যে বিপুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। বাওয়ালীদের সংস্পর্শ ভুলিবার নহে। জঙ্গলে বসিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের কাহিনীও শ্রবণ করি। বিরাটকায় সাঁকো দ্বারা

কুপ অফিসের পথ নির্মিত হইয়াছে। হেমন্তকাল—বাওয়ালীদের ভীড় অতিমাত্রায়। কবি জসীমউদ্দীন সাহেবের এই প্রথম সুন্দরবন পরিদর্শন। তিনি জঙ্গলের নির্জন স্থানসমূহ ও বিস্ময়কর পরিবেশ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

বনাঞ্চলের মানুষ বিশেষ অতিথিপরায়ণ। ছাত্র, যুবক, মোড়ল মাতব্বর বনভ্রমণে যে প্রকারে সাহায্য করিয়াছে তাহা ভুলিবার নহে। সুন্দরবনের একটি প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখার জন্য তাহাদের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারা সাগ্রহে আমাদের গ্রন্থের অসংখ্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছে।

শেখের ট্যাকের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, গহীন অরণ্যে দেবমন্দির ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখিয়া পল্লীকবি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অভিনব জঙ্গলময় পরিবেশের মধ্যে কবি ভাবাবেগে উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। কবি জসীমউদ্দীন সাহেব জঙ্গলময় নির্জন স্থানে বসিয়া নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন।

গহন সুন্দরবনের
অজানা বিহগ কণ্ঠে
কে গাহিছে গান
আর কে শুনিছে বসি
দেবতাবিহীন এই নির্জন মন্দিরে
পাতায় পাতায় কারা কহিতেছে
ফিস ফিস কথা
কার কথা, কোন সে বিস্মৃত রূপ কথা
আধ জানা আধ নাহি জানা
ভুলে যাওয়া ছায়া পথ ধরি
কোন্ সে অতীত হতে
আনিয়াছে বটুক আহরি।
কি করুণ সুরে পাখিটি ডাকিছে
বাঁশিটি বাজিছে রয়ে রয়ে
মনে বলে এইখানে রয়ে যাই
মন্দিরের শিলাখণ্ড হয়ে।

—জসীমউদ্দীন

৩১-৩-৬৪

এইভাবে আমাদের বহুবার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পদস্থ কর্মচারী, অভিজ্ঞ শিকারী এবং বনাঞ্চলের দুর্জয় ব্যক্তিদের সঙ্গে করিয়া গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্যে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে।

১৯৫৭ সালে সরকারী কার্যোপলক্ষে লেখক এম. পি. এ. হিসাবে মৎস্যবিভাগের মন্ত্রী শরৎচন্দ্র মজুমদারের সহিত সুন্দরবন ও সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে আমরা সুন্দরবনখ্যাত জঙ্গল ও টাইগার পয়েন্ট ও দুবলা দ্বীপের মৎস্যকেন্দ্র পরিদর্শন করি। এ বিষয় অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

বিভিন্ন সময়ে আমি সুন্দরবনখ্যাত শিকারী পচাবদী গাজী ও অন্যান্য দুর্জয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বুড়ি-গোয়ালিনী অঞ্চলের সুন্দরবন পরিদর্শন করি। বুড়ি-গোয়ালিনীর সন্নিকটে তেরকাটি, আড়পাঙ্গাশিয়া, ছদনখালি প্রভৃতি জঙ্গল পরিদর্শন কবিয়া বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করি। চাঁদনীমুখো গ্রামের নূর আলী সরদার আমাদের নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া ভ্রমণের পথ সুগম করিয়া দেন। বনভ্রমণে বহু ভদ্রমহোদয়ের সাহায্য পাইয়াছি তাহা ভুলিবার নহে।

আমাদের বনভ্রমণ কাহিনী দীর্ঘ করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। সেজন্য আর একটি মাত্র ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া অত্র প্রসঙ্গ শেষ করিব।

১৯৬৭ সালের ১৫ই নভেম্বর বেলা দেড় ঘটিকাব সময় মটরলঞ্চ 'মকিম' যোগে আমরা ৪৪ জন যাত্রী খুলনা ফরেষ্ট ঘাট হইতে সুন্দরবন যাত্রা করি। যাত্রীদলে খুলনা জেলা বার সমিতির ২৩ জন এডভোকেটের মধ্যে জনাব দিলদার আহাম্মদ, জনাব আবদুল অহেদ, জনাব আহাম্মদ আলী ছিলেন। খুলনা সাহিত্য পরিষদ সম্পাদক এস. এম. এ. জব্বার এবং সদস্য আবুল হাসান, শেখ আবদুল মজিদ প্রমুখও ছিলেন। এতদ্ব্যতীত খুলনার সাবজজ জনাব আবুল হাসেম ও মুন্সেফ হাবিবুর রহমান তালুকদার ও জেল সুপারিন্টেডেন্ট জনাব ওহিদউদ্দীন আমাদের সঙ্গে বনভ্রমণে যান।

এইরূপ একটি সুশিক্ষিত বাহিনীর সঙ্গে বনভ্রমণ বিশেষ আনন্দদায়ক সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তিন ঘন্টার মধ্যে আমাদের নৌ-যান চালনা পোর্টের সন্নিকটে পৌঁছিলে তথায় নানা প্রকার সামুদ্রিক জাহাজ দেখা গেল। একখানি জাহাজের নাম গ্লাসগো এবং অন্য এক জাহাজের নাম মোস্তাসির। তৃতীয় জাহাজের নাম বাগ-ই ঢাকা এবং চতুর্থ জাহাজের নাম আজিজ ভাট্টি। পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের এক ডজন সামুদ্রিক জাহাজ নয়নগোচর হইল। সমুদ্র ও নদীর সঙ্গমস্থানেও অনুরূপ দুইখানা জাহাজ দৃষ্ট হইয়াছিল।

চালনা পোর্ট ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় দেখিতে লাগিলাম। যাঁহারা এই সর্বপ্রথম সুন্দরবন পরিদর্শনে আসিয়াছেন তাঁহারা বন্য শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। নানা জনের নানা প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। সুন্দরবনের অভিনব কাহিনী শুনিতে শুনিতে পথ চলিতে লাগিলাম।

পশর নদীর দুই তীর গহীন জঙ্গলে ঘেরা। নদীমধ্য দিয়া লঞ্চও হু হু কবিয়া চলিতে লাগিল। নদীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লাল ও সাদা আলো দেখিয়া পথ অতিক্রম করিতে থাকি। মনুষ্যাকৃতি বয়ার মধ্যে গ্যাস পুরিয়া রাখা হয়। ঐ গ্যাসের জন্য দিবারাত্র মিনিটে মিনিটে

আলো জ্বলে। তবে দিনের বেলায় সূর্য কিরণে আলো দেখা যায় না। এই সমস্ত আলোই বিদেশাগত সামুদ্রিক জাহাজ ও ভ্রমণকারীদের দিকদর্শন। লালবাতি প্রজ্জ্বলিত হইলে উহার বাম দিকে এবং সাদা বাতির ডাহিন দিক দিয়া পথ চলিতে হইবে। জাহাজ সমুদ্র হইতে উপরে আসার সময় উহার বিপরীত দিকে চলিতে হইবে।

পথে ডাংমারী, চাঁদপাই, ধানসিদ্ধের চর, কাগা, বগা প্রভৃতি জঙ্গল ছাড়িয়া মরা পশর নদীর মধ্য দিয়া নীলকমল পৌছিয়া সেখানে রাত্রিযাপন করিলাম। কয়েকজন যুবক হরিণ শিকারের জন্য ছোট নৌকায় খালের মধ্য দিয়া দুই তিন মাইল গিয়া ফিরিয়া আসিল। নীলকমল খালের মধ্যে লঞ্চে রাত্রি অতিবাহিত হইল। ভোর বেলা লঞ্চ দুবলার চরের দিকে যাত্রা করিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া প্রত্যুষে সূর্যোদয় দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে প্রাতরাশের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় দেখা গেল। আমরা ক্যামেরার সাহায্যে উহার ছবি তুলিলাম। সূর্য দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল।

ভীষণাকার দরিয়ার ঢেউয়ের মধ্যে লঞ্চ চলিতে লাগিল। অদূরে সামুদ্রিক তরঙ্গমালা দৃষ্ট হইল। সে কি ভয়ঙ্কর! তীরে অবতরণের পর দলের কেহ কেহ মৎস্যের আড্ডায় ৫ মাইল দূরে মাছ ক্রয় করিতে গেল। আমরা একদল বালুচরের প্রায় তিন মাইল পথ হাটিয়া ফিরিয়া আসিলাম। সমুদ্রের চরে কতিপয় মৎস্যজীবীদের সঙ্গে আমাদের ছবি গ্রহণ করা হইল।

দুবলা চরে পৌছিবার পূর্বে সারেং সমুদ্রের মধ্যে পথ ভুলিয়া প্রায় ৫ মাইল পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার এই ভুল সংশোধন করিয়া ঠিক পথে চালিত করিতে হয়।

দুপুর বেলা চরের বালুকা গরম হয়। দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে সবুজ বনানী, মধ্যে সাদা বালুচর। বনভ্রমণকারীদের তীর্থক্ষেত্র এই দুবলা দ্বীপ।

লঞ্চ তীর হইতে কিছু দূরে রাখা হইল। একখানি নৌকা ডাকিয়া তাহাতে ব্যস্ততার সহিত কয়েকজন তীরে চলিয়া গেল। একে একে লঞ্চ হইতে সকলেই তীরে নামিয়া পড়িল। ২৪ ঘন্টা পানির উপর থাকিয়া সবাই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ঐদিন মেলার আয়োজন চলিতেছে। পরদিন স্নান। তীরভূমিতে অসংখ্য মানুষ চলাচল করিতেছে। তাহারা যেন নবাগতদের হাতছানি দিয়া তীরে আহ্বান জানাইতেছে। আমাদের সঙ্গে বয়-বাবুর্চিরাও তীরে চলিয়া গেল। সেজন্য রান্নার অভাবে অনেকের মধ্যাহ্নভোজন হয় নাই। সুন্দরবনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা অসম্ভব। কিন্তু মেলার সময় সমুদ্রের বিশাল বালুচরে দলে দলে ঘুরিয়া সকলেই অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে চায়।

বেলা দুই ঘটিকার সময় এক এক করিয়া সবাই লঞ্চে আসিতে লাগিল। কাহারও হাতে জোংড়া বা ঝিনুক, কাহারও হস্তে কস্তরি, কেউবা একখানা ইক্ষু, আবার কেহবা মাছ (শুটকি ও তাজা) ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। আমাদের সকলের খাবারের জন্য একটি জাভাভোলা মাছ, ওজন আধমন, মাত্র দশ টাকায় খরিদ করিয়া আনা হইয়াছে। অন্যালোকে বলিল উহার দাম মাত্র পাঁচ টাকা, আপনাদের দেখিয়া বেশী দাম লইয়াছে।

পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক মৎস্য কেন্দ্র সুন্দরবনের দুবলা দ্বীপ। চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম জেলে ও মগেরা শীতসমাগমের পূর্বে এখানে আসিয়া মৎস্য ধরা আরম্ভ করিয়াছে। অসংখ্য নৌকায় জেলেরা জাল তুলিয়া মৎস্য ধরিয়াছে।

পদব্রজে ১০/১২ মাইল চলিয়া সকলে লঞ্চে ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল আর কেহ বাকী নাই। তখন ম্যানেজার লঞ্চ ছাড়ার হুকুম দিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন যুবকের হরিণ শিকারের নেশা চাপিয়াছে। একটি মাত্র বন্দুক। তাহারা বনে গিয়া বীরত্ব দেখাইবে। নূতন অবস্থায় জঙ্গলে গেলে সকলেরই এ নেশা চাপে। শিকারী না হইলেও জঙ্গল যেন প্রত্যেককে হাতছানি দিয়া ডাকে। উগ্র মত্ততায় তাহারা কয়েকজন জঙ্গলে শিকারের জন্য প্রস্তুত। সুন্দরবনে শিকার এক ভয়ঙ্কর নেশা। এ নেশা ঘাড়ে চাপিলে উহা প্রতিরোধ করা মুশকিল। জিদ ধরিল শিকারে যাইবেই। রাত্রে ও সকাল বেলা কেহ কেহ জঙ্গলে ঢুকিয়াছিল সেজন্য মুরব্বিরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়েন।

যে কয়জন যুবক আইনজীবী বনে প্রবেশের জন্য জিদ ধরিয়াছে, তাহাবা কেহই শিকারে অভ্যস্থ নহে। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে, আইনজ্ঞ হিসাবে পারদর্শিতা লাভ করিতেছে, তাহারাই সমাজের বুদ্ধিজীবী। বন্দুক চালনা করিতে জানে, কিন্তু কেহই জীবনে কোনদিন হরিণ শিকার করে নাই।

আমাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য একটি মাত্র বন্দুকের আদেশপত্র পাওয়া গিয়াছে। সে বন্দুকও সাবজজ সাহেবের। তাছাড়া আমরা আইনজীবী ও জজ—বার ও বেঞ্চ। শিকার করিলেও কেহ কিছু বলিবে না। প্রবীণ সদস্যগণ কেহই আইনভঙ্গ করিতে দিবেন না বলিয়া হুমকি ছাড়িলেন। যুবকদের দলভারি, তাহারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের অনমনীয় মনোভাব। তাহারা আমাদের নির্দেশ ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক। উভয়পক্ষে বাকবিতণ্ডা চলিল। তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্ন তুলিল। দিলদার সাহেব ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ জানলে আমি তোমাদের সাথে কিছুতেই সুন্দরবনে আসতাম না"। আমিও যুবকদের ধমক দিলাম। ম্যানেজার বলিলেন হরিণ শিকার করিতে ডি. এফ. ও. নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ এই সময়ে হরিণের পেটে বাচ্চা থাকে, সেজন্যে কেহ যেন শিকার না করেন।

যুবসুলভ তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া করিয়া ঐ দল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আমরাও নানা প্রকার ভয়ভীতির দ্বারা তাহাদের একেবারে হতাশ করিয়া দিতেছি। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত তাহাদের শিকারের আশা ও নেশা বিষাদময় পরিবেশে অন্তর্হিত হইতে চলিল।

অন্য কারণও ছিল। বনভোজন, খেলাধূলা, উৎসবাদি এবং বিশেষ করিয়া সুন্দরবন ভ্রমণে যখনই অস্বাভাবিকভাবে বাড়াবাড়ি হয় তখনই কোন না কোন বিপদ ঘটে। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বেথুন কলেজের একদল ছাত্রী সমুদ্রে ঢেউ খেলিতে যায়। আমোদ-প্রমোদের সময় শতাধিক ছাত্রীর মধ্যে ছয়জনকে অকস্মাৎ ঢেউয়ে ভাসাইয়া অতল সমুদ্রে

লইয়া যায়। তাহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কয়েক মাস পূর্বে একদল কলেজ ছাত্রের পিকনিক করার সময় সুন্দরবন হইতে একজনকে বাঘে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কারণে অকারণে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। এ সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বহু দুর্ঘটনার সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আমরা সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া যুবকদের আবদার ও অনুরোধে কর্ণপাত করি নাই। আমাদের বনভ্রমণ আমোদ-প্রমোদ ও শিকারের জন্য নহে—সমুদ্র ও সুন্দরবন দর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যুবকদের কথা হরিণ শিকার না করিলে সুন্দরবন ভ্রমণই বৃথা। আমরা বলিলাম এইরূপ ধারণা লইয়া কাহারও সুন্দরবনে আসা উচিৎ নয়। সঙ্গে শিকারের আদেশ পত্র নাই, ঝানু শিকারী নাই, বন্দুক নাই। একটি মাত্র বন্দুক, কিন্তু একজনের বন্দুক অন্যে ব্যবহার করা বে-আইনী। আমরা এতদূর পর্যন্ত বলিলাম "ঢাল নাই তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার"। আমাদের ন্যায় আইনজীবীর পক্ষে আইন ভঙ্গ করা রক্ষক হইয়া ভক্ষক হওয়ার তুল্য। যুবকদের প্রোগ্রাম ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্রতটের জঙ্গলে অবস্থান কবিয়া নিশা সমাগমে শহরের দিকে যাত্রা করা হইবে। বাধ্য হইয়া একথাও বলিতে হইল যে, "পাগলে পাগলামী করে, দানা লোকে মানা করে"। উপায়ান্তব না দেখিয়া কয়েকজন যুবক আমার সমালোচনা করিয়া বলিল "সুন্দববনের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য এসেছেন, সেজন্য ওর তো শিকাবের দরকার নেই, নিজের কাজ হলেই হলো"। দূর হইতে একথা আমাদের কানে ভাসিয়া আসিল। সমস্ত সমালোচনা আমরা হাস্যভরে উড়াইয়া দিলাম।

বহুক্ষণ ধবিয়া বাগবিতণ্ডার পর যুবকেরা মাথা নত করিল। মনে মনে আমাদের বিজয় ঘোষণা করিলাম। অতঃপর সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া যে যাহার বিছানায় গিয়া বসিয়া পড়িল।

লঞ্চ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু চরে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অনেকক্ষণ দেরী হইয়া গেল। পথিমধ্যে নদীতীরের জঙ্গলে নামিয়া অনেকেই সুন্দরবন দেখিয়া আসিলেন।

পশর নদীর পূর্বতীরে এক ভীষণাকায় জঙ্গল। যবক আইনজীবিদের কয়েকজন বন্দুক লাঠি হাতে বনের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। তারা আবার বাঘের পদচিহ্ন দেখিয়া ত্রস্তে ফিরিয়া আসিল। একজনকে দেখি ভয়ে কম্পবান। আমি বললাম, সাধ মিটিয়াছে? অন্যান্য যারা তীরে জঙ্গল মধ্যে অবতরণ করিয়াছিল, তারাও একটু ঘুরিয়া যথাসত্ত্বর ফিরিয়া আসিলে লঞ্চ আবার যাত্রা করিল।

বনপ্রান্তে ডাংমারী অফিসে প্রবেশ পত্র দাখিল করিয়া আসিতে হইল। এইখানেই চালনা বন্দর। দিবা রাত্র বার ঘন্টা লঞ্চ চালাইয়া গভীর রাত্রিতে আমরা খুলনায় পৌঁছিলাম। পথিমধ্যে বনের অভাবনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে আসিয়াছি। বনভ্রমণে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকিলে প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা যায় কিন্তু অচেনা লোকের সঙ্গে বনভ্রমণ আনন্দদায়ক হয় না।

পাঁচ

বনজ সম্পদ ও উহার আর্থিক গুরুত্ব

আমরা সুন্দরবনের বৃক্ষলতা বা বনজ সম্পদ সম্পর্কে অন্যত্র আলোকপাত করিয়াছি। হিমালয়ের পলিমাটি ও সাগরের লবণাক্ত জল মিশ্রিত হইয়া এখানকার বৃক্ষসমূহ জন্মলাভ করে এবং দিনে দিনে বর্ধিত হয়। প্রত্যেক গাছের ফল আছে এবং উহার বীজ হইতেই গাছ জন্মিয়া থাকে। সুন্দরবন নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। এই নিবিড় জঙ্গলে অসংখ্য জীবজন্তু বাস করে। বৃক্ষলতা ও জঙ্গল না থাকিলে জীবজন্তুর বসবাস আদৌ সম্ভব হইত না। ইহাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র জোয়ারের সময় জল উঠিয়া বৃক্ষের শিকড় আর্দ্র করিয়া দেয়। সেজন্য সুন্দরবন প্রায় সর্বত্রই সর্বসময়ে কর্দমাক্ত অবস্থায় থাকে। কর্দমাক্ত হইলেও বৃক্ষের নিম্নস্থান সমূহ পরিষ্কার থাকে এবং বৃক্ষপত্রও জমিয়া থাকে না এবং কোথাও কোন দুর্গন্ধ নাই। বৃক্ষ-শিকড় হইতে শুলোর উৎপত্তি হয়। এই শুলো প্রায় দুই হাত লম্বা হয়। এগুলি শক্ত এবং ইহার অত্যাচারে সুন্দরবনে চলাচল অতীব কঠিন। সুন্দরবনের কর্দমাক্ত স্থানে এবং লবণাক্ত জলে যে সমস্ত চারাগাছ বিপদ-আপদ সহ্য করিতে পারে, কেবল সেইগুলিই টিকিয়া থাকে।

প্রবল বাতাসের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃক্ষলতার টিকিয়া থাকিতে হয়। তীব্র স্রোত অনেক সময় নদীতীর ভাঙ্গিয়া দিলে বৃক্ষের গুঁড়ি বাহির হইয়া পড়ে। এক বৃক্ষের গুঁড়ি অন্য বৃক্ষের গুঁড়িকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে এবং সেইজন্য নদীস্রোত সহজে উহাকে ভূপাতিত করিতে পারে না। সুন্দরবনের মাটির নীচে শুধু শিকড়ের রাজত্ব। কোন কোন গাছের শিকড় আবার মাটির উপর হইতে দেখা যায়। সূর্যের কিরণ, মৃত্তিকার রস ও লবণাক্ত জলের পার্শ্বে এই সমস্ত বৃক্ষ দিনে দিনে বর্ধিত হয়। সুন্দরবনের সমস্ত বৃক্ষই সুউচ্চ হয়; আম বা গাবগাছের ন্যায় ঝাপটা হয় না। বৃক্ষগুলির গোড়ার দিকে কোন ডালপালা গজায় না। উপরে বর্ধিত হইয়া বৃক্ষসমূহের শাখা প্রশাখা বাহির হয়। বৃক্ষ লম্বা হওয়ার জন্য উহার উপকারিতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুন্দরী, পশুর প্রভৃতি বৃক্ষ অত্যধিক লম্বা হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ সম্ভবতঃ সূর্যকিরণ পাইবার আশায় একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করে। বৃক্ষ ঘন হয় এবং সেইজন্য উহার ডালপালাও অধিক হয় না। পৃথিবীর অন্য কোথাও সুন্দরবনের ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃক্ষলতা নাই। এখানে এই অমূল্য সম্পদ জন্মিবার কোন কৃত্রিম উপায় বা খরচ নাই।

এখানে আমরা বনবিভাগের সংরক্ষিত বৃক্ষলতার একে একে পরিচয় দিব এবং জাতীয় জীবনে উহার আবশ্যকতা এবং আর্থিক গুরুত্বের বিষয়ও বর্ণনা করিব।

সুন্দরী : সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ সুন্দরী। সর্বত্র উহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই বৃক্ষ সাধারণতঃ লোকালয়ের বড় জামগাছের ন্যায় মোটা হয়, আম্র বা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়

তত বড় হয় না। ইহা খুব লম্বা এবং উহার কাঠের রং লাল; তন্নিমিত্ত বৃক্ষের নাম সুন্দরী হওয়া স্বাভাবিক। সুন্দরীর চারা সোজা ও সরলভাবে মস্তক উন্নত করিয়া উঁচু হইতে থাকে। এই বৃক্ষের পত্রগুলি ক্ষুদ্র এবং খুব ছোট ছোট হলুদ বর্ণের ফুল হয়।

সুন্দরী বৃক্ষ এদেশের ঘরে ঘরে বিভিন্ন প্রকার কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠে মজবুত তক্তা হয় এবং তদ্বারা নৌকা এবং ঘরের জানালা দরজা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুন্দরী কাঠের নৌকা এদেশে প্রসিদ্ধ। এই কাঠ শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী এবং বহু প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন কাজের জন্য শহর অঞ্চলে এমনকি অধুনা গ্রাম অঞ্চলেও সুন্দরী কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদঞ্চলে ইট তৈয়ারীর জন্য পাঁজা পুড়াইবার সময় কয়লার পরিবর্তে সুন্দরী কাঠ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য সুন্দরী কাঠের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বড় বড় নৌকা বোঝাই হইয়া সুন্দরী কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য রাজধানী ঢাকায় চালান হইয়া থাকে। টাঙ্গাইল জেলার বিখ্যাত মির্জাপুর হাসপাতালে সুন্দরী কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায়ও প্রচুর পবিমাণে কাঠ রপ্তানী হয়। সুন্দরী কাঠ মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া কাজে লাগাইলে শত শত বৎসরেও উহার সার নষ্ট করিতে পারে না। বর্তমানে সেগুন কাঠের অভাবে সুন্দরী কাঠের দ্বারাই প্রচুর পরিমাণে নৌকার ডালি প্রস্তুত হইতেছে। সুন্দরী কাঠ জনসাধারণের অতীব উপকারী।

সুন্দরীর চারা গাছকে ছিট বলে। উহার দ্বারা নৌকা চালাইবার লগী প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাঠের দ্বারা নৌকার দাঁড় ও বৈঠা প্রস্তুত হয়। গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, অর্থাৎ রুয়া, বাতা, পাইড় প্রভৃতি কাজে সুন্দরী সর্বত্র অবাধভাবে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরীর খুঁটিও মজবুত। এই কাঠের বহুল প্রকার ব্যবহারের জন্য উহাকে সুন্দরবনের কাঠের রাজাও বলা হইয়া থাকে। তবে গেউয়া ও পশুর অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সুন্দরীবৃক্ষের প্রতিপত্তি পূর্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সুন্দরীকাঠের বাকল রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার ছড়ি, ছাতার বাট, দাড়িপাল্লার কাঠ প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুতের জন্য এই কাঠ পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষ বর্তমানে এত প্রয়োজন যে উহা দ্বারা বৈদ্যুতিক তার চলাচলের জন্য অসংখ্য থাম প্রস্তুত হইতেছে। লোহার অভাবে সুন্দরীর থামের দ্বারা এই অতীব আবশ্যকীয় কার্যটি সমাধা হইতেছে। সম্প্রতি খুলনা হইতে বাগেরহাট ও যশোর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তার লওয়া সম্ভব হইয়াছে এই সুন্দরী বৃক্ষেব দ্বারা। ইহা দ্বারা নদী ও খালের উপর সাঁকো নির্মিত হয়।

কেওড়া : সুন্দরীবৃক্ষের পরই কেওড়ার স্থান। এ বৃক্ষ বৃহৎকায় ও দীর্ঘ হয়। বড় বড় নদী ও খালের তীরে এবং চরের উপর কেওড়ার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। হেমন্ত ও শীতকালে জোয়ারের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় জোয়ারের জল সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা। ঐ সময় কেওড়াফল পাকিয়া বৃক্ষতলে স্তূপীকৃত হয়।

সেইজন্য ঐ সমস্ত ফল জোয়ারে ভাসিয়া নদী বা খালের তীরভূমি হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। তন্নিমিত্ত নদী বা খালের তীরবর্তী স্থানে কেওড়া বৃক্ষের আধিক্য দেখা যায়। এই গাছ নীচ ও কর্দমাক্ত জমিতে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

কেওড়া বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। এই বৃক্ষের উপর দিকে কিছু ডালপালা হয়। বৃক্ষের ডাল ধরিয়া উপরেও উঠা যায়। কেওড়ার পাতাগুলি সরু। হরিণ ও বানরের নিকট কেওড়ার ফল ও পাতা উপাদেয় খাদ্য। এই বৃক্ষে ছোট গাবের আকৃতির ন্যায় প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মে। উহার স্বাদ জলপাই-এর ন্যায় অম্ল এবং বীজ খুব বড়। খোসা ফেলিয়া লবণ মিশ্রিত করিয়া বা অম্বল প্রস্তুত করিয়া সুন্দরবনের অধিবাসীরা উহা তৃপ্তির সহিত আহার করে। শরৎকালে কেওড়া ফল পরিপক্ক হয়। হেমন্তের প্রারম্ভে বৃক্ষের তলে পড়িয়া ফলগুলি স্তূপীকৃত হয়। লক্ষ লক্ষ মণ কেওড়ার ফল যত্রতত্র পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ উহা কুড়াইয়া আনিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই ফল দ্বারা চাট্‌নি প্রস্তুত হইলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে।

কেওড়া ফল ও পাতা খাইবার জন্য এই সমস্ত বৃক্ষের তলে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ চরিয়া বেড়ায় এবং মনুষ্য সমাগমের আভাস পাইলে এক প্রকার বিশিষ্ট ধরনের শব্দ করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করে। যে বনে কেওড়া বৃক্ষের আধিক্য সেখানেই হরিণ শিকারের উপযুক্ত স্থান। কেওড়া কাঠ পশুর বা সুন্দরীর ন্যায় শক্ত ও ভারী নহে। তবে ইহার প্রয়োজনিয়তা দিন দিন বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে। কেওড়ার তক্তা হাল্‌কা এবং সুন্দর হয়। শাল ও সেগুনের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য কেওড়া কাঠ এদেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার তক্তা দিয়া ঘরের বেড়া, জানালা-দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গ্রাম্য লোকে এই কাঠের দ্বারা আসবাবপত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। করাত কলের দ্বারা এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কেওড়ার তক্তা প্রস্তুত হইয়া বন্দর ও বাজারে আমদানী হয়। সুন্দরী ও কেওড়ার মূল্য প্রায় সমান সমান।

পশুর : সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কাঠ পশুর। এই কাঠ অত্যন্ত ভারী বিধায় স্থানান্তরিত করা কষ্টসাপেক্ষ। সুন্দরী অপেক্ষা পশুরের ওজন বেশী। এই বৃক্ষ যেমন মোটা তেমন লম্বা হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়াও এই কাঠ বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে। পশুর কাঠের মূল্য সুন্দরী ও কেওড়ার প্রায় দ্বিগুণ। পশুরের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। সাধারণ পশুর ও কালী পশুর। কালী পশুরের ভিতরকার বর্ণ গাঢ় কালো এবং সর্বত্র সারযুক্ত। এজন্য এতদঞ্চলে অধুনা নির্মিত হর্মরাজির জানালা-দরজায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠ জলে ভিজাইয়া রাখিলে বা উহার উপর বর্ষা পতিত হইলে এক প্রকার চমৎকার রং নির্গত হয়। বর্তমানে পশুরের বাকল দ্বারা মূল্যবান রং প্রস্তুত হইতেছে। চামড়ার কারখানায় সুন্দরী, গরাণ, ও পশুরের বাকল রং প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পশুরের তক্তাও মূল্যবান। তবে অত্যন্ত ভারী বলিয়া জানালা দরজার পাল্লায় কম ব্যবহৃত হয়। পাটাতন হিসাবে পশুর বিশেষ উপযোগী। ছাদের বরগা হিসাবে এই কাঠ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। শক্ত ও ভারী হওয়া সত্ত্বেও ইহার দ্বারা ছাদের কড়ি মজবুত হয় না। বক্র হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া এই কাঠ ঐ কাজে ব্যবহৃত হয় না।

পশুর বৃক্ষের পত্র কাঁঠালের পাতার ন্যায় প্রশস্ত। পশুর গাছের খুঁটি এতদঞ্চলে গৃহ নির্মানের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং মৃত্তিকার নীচে শতবৎসরের মধ্যেও নষ্ট হয় না। সুন্দরবন অঞ্চলে পুকুর খননকালে হাজার বৎসর পূর্বের পশুর ও সুন্দরীর বৃক্ষ মৃত্তিকার তলদেশে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়। দৌলতপুর, ফুলতলা, অভয়নগর, কালীয়া, মোল্লাহাট, তেরখাদা ও পিরোজপুর প্রভৃতি স্থানে পুকুর খননের সময়ে সুন্দরী ও পশুরের গুঁড়ি মৃত্তিকার নিম্নে পাওয়া যায়। শাল বৃক্ষের দুষ্প্রাপ্যতায় বর্তমানে সর্বত্র পশুরের খুঁটি ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত খুঁটি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। পশুর কাঠের দ্বারা গৃহের সাজ-সরঞ্জামও প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটি বৃক্ষে দুই হইতে চারটি পর্যন্ত খুঁটি হয়। বৃক্ষ বড় হইলে ছয়টি পর্যন্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষ যত লম্বা হইবে খুঁটির সংখ্যা ততই অধিক হইবে। সম্পূর্ণ বৃক্ষ দ্বারাও বড় বড় খুঁটি প্রস্তুত হইয়া প্রকান্ড ঘরে ব্যবহৃত হয়। এতদঞ্চলে দিন দিন পশুরের চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

গেউয়া : গেউয়া গাছ সুন্দরবনের আর্থিক সম্পদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বৃক্ষ সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি খুব লম্বা এবং সোজা হয়। গেউয়া কাঠ খুব হাল্কা। এই কাঠের দ্বারা লোকে কয়লা ও টিকিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহার গাত্রে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ আঠা আছে। বৃক্ষ কাটিবার সময় কোনপ্রকারে চোখে লাগিলে চক্ষু নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, সেজন্য কাঠুরিয়াগণ সাবধানতার সহিত এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকে। গেউয়া গাছের ফুলে সুমিষ্ট মধু হয় এবং উহার ফল হরিণে ভক্ষণ করে। এই বৃক্ষের গুঁড়িতে ঢোলক, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর খোল প্রস্তুত হয়। এই কাঠের দ্বারা জ্বালানীও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অধুনা গেউয়া কাঠের প্রয়োজনিয়তা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার জাতীয় জীবনে এক নব যুগেব সূচনা করিয়াছে। গেউয়া কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজ দেশ-বিদেশে "নিউজপ্রিন্ট" হিসাবে সংবাদপত্রের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করিয়া গেউয়া কাঠ পরীক্ষা করিতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর প্রমাণিত হয় যে উহার দ্বারা সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত প্রতিষ্ঠান অতঃপর ১৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খুলনার সন্নিকটে খালিশপুরে একটি বিরাটকায় নিউজপ্রিন্ট মিলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যান্ত্রিক উপায়ে গেউয়া কাঠের দ্বারা উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইয়া দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। বাদা অঞ্চলে এজন্য কর্পোরেশনের অফিস খোলা হইয়াছে। ঠিকাদার ও কর্মচারীগণ সুন্দরবনে এই কাঠ সংগ্রহ করে।

খালিশপুরে নদীমধ্যে সর্বদা লক্ষ লক্ষ টুকরা গেউয়া কাঠ ভাসমান অবস্থায় একত্রে দৃষ্ট হয়। এগুলিকে কাঠের ভুর বলে। ক্রেনের সাহায্যে বান্ডিল করিয়া তীরে নীত হয় এবং তথা হইতে মিলের কাজে ব্যবহৃত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দৈনিক শত শত টন কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজ ছাত্রদের লেখারও উপযোগী হইয়াছে। তবে উহা কর্ণফুলী কাগজের ন্যায় পরিষ্কার ও শক্ত নহে। এই কাগজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সুন্দরবন হইতে খালিশপুর পর্যন্ত নদীপথে গেউয়া কাঠ আনিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের সর্বত্র এই কাঠের প্রাচুর্য অত্যধিক এবং উহা বহু বৎসরের জন্য প্রকান্ড নিউজপ্রিন্ট মিলের চাহিদা মিটাইতে পারিবে। দেশের শিল্পোন্নয়নে নিউজপ্রিন্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তৎকালীন পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছিলেন যে নিউজপ্রিন্ট মিলের সম্প্রসারণ সুসম্পন্ন হইলে বৎসরে ৫০ হাজার ৬ শত টন কাগজ উৎপাদিত হইবে। সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্র এবং অন্যান্য অসংখ্য পত্র-পত্রিকার চাহিদা এই শিল্প প্রতিষ্ঠান মিটাইতেছে।

দেশলাইয়ের কাঠি এবং পেন্সিলের কাঠ গেউয়া ধুন্দুল কাঠের দ্বারা প্রস্তুত হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ শিমুল বৃক্ষের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ম্যাচ ফ্যাক্টরীসমূহে গেউয়া কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। গেউয়া কাঠ হাল্‌কা এবং উহাতে সুন্দর দেশলাইয়ের কাঠ প্রস্তুত হয়। শিল্প এলাকায় এই কাঠের চাহিদা অত্যধিক।

বাইন : সুন্দরবনের প্রধান প্রধান বৃক্ষের মধ্যে বাইন অন্যতম। এই বৃক্ষ অত্যধিক বড় হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে বাইন বৃক্ষেব গুঁড়ি পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। বাইন, আম বা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় প্রকান্ড পরিধিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক সময় গাছের গুঁড়ি শূন্য-গর্ভ হয়। বাইনের তক্তা এদেশে বিখ্যাত। এই কাঠে ঘরের বেড়া দেওয়া হয়। জানালা, দরজা প্রভৃতি কাজেও এই তক্তা অবাধভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কাঠের চেয়ে বাইনের দামও একটু কম। গাছ মোটা বলিয়া বাইনের তক্তা খুব প্রশস্ত হয় এবং উহার দ্বারা গৃহস্থের বাক্স, পিঁড়ি, আলমারি, টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। বাইন গাছে ধান ভানা ঢেঁকি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বরিশাল জেলার সরূপকাঠি থানার ইন্দিরহাটে বাইন কাঠের বহু আসবাবপত্র প্রতি হাটবারে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে।

গরান : গরান সুন্দরবনের একটি নামকরা বৃক্ষ। ইহা অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎকায় হয় না। এগুলি সাধারণতঃ সরু বাঁশের ন্যায় এবং সাত আট হাতের অধিক হয় না। গরান গাছের ঝাড় হয়। এক একটি ঝাড়ে অনেকগুলি গাছ জন্মে। ইহার পাতা হরিদ্রাবর্ণের এবং পুরু ও গোলাকার। গরান কাঠ ছোট হইলেও বেশ শক্ত। গরান কাঠে ঘরের খুঁটি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। গরানের কাঠ রুয়া, বেড়া ও জমি ঘিরিবার খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা নৌকা চালাইবার লগিও প্রস্তুত হয়। সুতার মিস্ত্রীরা এই কাঠের দ্বারা হুকার নল্‌চে প্রস্তুত করিয়া থাকে। দৌলতপুর থানার অন্তর্গত বারাকপুরে এই নল্‌চে

তৈয়ারীর অনেকগুলি কুটীর শিল্পের কারখানা আছে। গরান কাঠের দ্বারা দাড়িপাল্লার কাঠ, ছাতার বাট, ছড়ি ও খাটের নোলা, রুটি তৈয়ারীর বেলুন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গরান কাঠের বর্ণ রক্তিম এবং এই কাঠ জ্বালানী কাঠের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কাঠ দিয়া দ্রুত রান্না করা যায় এবং উহা পুড়াইতে বেগ পাইতে হয় না। ইহা কুঠার দ্বারা চেরাই করিতেও সুবিধা হয়। সুন্দরী ও অন্যান্য কাঠের জ্বালানী অপেক্ষা গরান কাঠের মূল্য অধিক। শহরের কাঠগোলায় সর্বত্র জ্বালানী কাঠের জন্য সুন্দরী ও গরান সর্বদা মজুত থাকে। গরানের বাকলেও সুন্দর রং তৈয়ার হয়।

গর্জন : গর্জন বৃক্ষ সুন্দরীর ন্যায় সোজা হইয়া উঠে। ইহা সুন্দরবনের সর্বত্র পাওয়া যায়। নদী বা ঝিলের তীরে এই বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বট বৃক্ষের ন্যায় শিকড়গুলি গাছকে সোজা করিয়া রাখে। গর্জন বৃক্ষের ফুল হয় এবং ঐ ফুল হইতে সজিনার ন্যায় খাড়া বাহির হয়। পাতা বেশ পুরু। গর্জন বৃক্ষে তৈল প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা উক্ত তৈল প্রতিমার গাত্র উজ্জ্বল করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগে গর্জন তৈল মহা উপকারী।

ধোন্দল : ধোন্দল বৃক্ষ অনেকটা পশুরের মত। ধোন্দল বৃক্ষে খুঁটি ও তক্তা হয়। তবে এ কাঠ খুব মূল্যবান নহে এবং সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ধোন্দল বৃক্ষে পেয়ারার সাইজের চেয়েও বড় ফল হয়। ফলগুলি হরিণে খায়। হরিণ এই ফল খাইতে গেলে কড়মড় শব্দ হয় এবং শিকারীরা তথায় হরিণ আছে বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া যায়। ধোন্দলের পাকা ফলগুলি ফাটিয়া গেলে উহার ভিতর হইতে তালের আঁটির মত কয়েকটি বীজ বাহির হয় এবং তাল বৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া উহা হইতে চারা গজায়।

কাক্ড়া : বর্তমানে কাক্ডা বৃক্ষের নাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে এতদঞ্চলে এই বৃক্ষের নাম শুনা যাইত না। কাক্ড়া বৃক্ষ সুন্দরী বা পশুরের চেয়েও অধিক লম্বা ও সোজা হয়। তবে উহার কাঠ ভারী নহে। এই কাঠে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত হয়। বর্তমানে কাক্ড়া কাঠ দিয়া লোকে ছাদের কাঁড়ি-বর্গা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেগুনের অভাবে লোকে কড়ি হিসাবে কাক্ড়াই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। খুব শক্ত না হইলেও কড়ির জন্য কাক্ড়া কাঠই উত্তম। কাক্ড়ার তক্তায় জানালা দরজা ও অন্যান্য আসবাবপত্রও প্রস্তুত হয়। কাক্ড়ার মূল্য সুন্দরী ও কেওড়ার সমান।

হেন্তাল : সুন্দরবনের সর্বত্র হেন্তাল গাছ আছে। জঙ্গলের লোকেরা উহাকে 'হ্যাতালী' বলিয়া থাকে। ইহা বহুলাংশে খেজুর গাছের ন্যায়। তবে উহার ন্যায় দীর্ঘ হয় না। ইহারও মাথায় খেজুরের ডালের মত ছোট ছোট ডাল জন্মে। এগুলি সাধারণতঃ ৭/৮ হাত লম্বা হয় এবং খালের পার্শ্বেই বহুল পরিমাণে জন্মে। ইহাতে ঘরের রুয়া প্রস্তুত হয়। এই বৃক্ষ অন্য কোন কাজে লাগে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সুন্দরবনের বাওয়ালীরা হেন্তালের অগ্রভাগ কাটিয়া খেজুর বৃক্ষের ন্যায় উহার মাথি খাইয়া থাকে। এই জংলী গাছের মধ্যে বাঘ লুকাইয়া থাকে। ইহা এতই ঘন হয় যে বাঘ লুকাইয়া থাকিলে দেখা

সম্ভব হয় না। হেন্তাল কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষ এবং উহার মধ্যে মানুষের যাতায়াত দুঃসাধ্য। বেহুলার ভাসানের বহুস্থানে হেন্তাল বৃক্ষের বর্ণনা আছে।

ওড়া : ওড়া বৃক্ষ এদেশে সুপরিচিত। ওড়া গাছ কেওড়ার ন্যায় বৃহৎ হয়। শুধু সুন্দরবনে নহে, লবনাক্ত নদী ও খালের পার্শ্বে লোকালয়ে এই বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। ওড়া গাছে বড় বড় ফল হয়। উহা কাচা ও রান্না করিয়া গ্রামের লোকেরা 'অম্বল' করিয়া খায়। ওড়া বৃক্ষের পাতার পচানির গন্ধে চিংড়ি মৎস্য তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং লোকে এই উপায়ে মৎস্য ধরিয়া থাকে। ওড়ার ফল বেশ বড় এবং মসৃণ। উহা হরিণের সুখাদ্য। ওড়ার ফল বহুলাংশে টম্যাটোর আকৃতিবিশিষ্ট।

অন্যান্য বৃক্ষ : আমুড় সুন্দরবনের আর একটি বৃক্ষ। এই বৃক্ষগুলি মসৃণ এবং হরিণ চলিবার সময় আঘাত পাইলে উহার চারা গাছগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। আমুড় বৃক্ষে সুন্দর জ্বালানী প্রস্তুত হয়। সুন্দরবনের ভ্রমণকারীরা শুকনা আমুড় বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া তাহা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে। জঙ্গলে কৃপে নামে আর এক প্রকার গাছ জন্মে। উহা পশুরের ন্যায় শক্ত বলিয়া উহাতে ঘরের খুঁটি প্রস্তুত হয়। ডাওর নামক আর একটি বৃক্ষের নামও শুনা যায়। তবে উহা সুন্দরবনে পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে না। ইহাতে আমের ন্যায় ফল জন্মে, উহা লোকে খায় না।

হঁদো গাছের ঝোপ হয় এবং উহা ৫ ফুটের বেশী উঁচু হয় না। নিবিড় হঁদো গাছের নীচে ব্যাঘ্রের লুকাইয়া থাকিবার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। শিঙ্গড়া, ভাদাল, গাড়ে, খলসী, হিঙ্গে প্রভৃতি গাছ সুন্দরবনের আগাছা বিশেষ। উহাতে জ্বালানী কাঠ হয়। খলসী ফুলে মধু হয় এবং ঐ ফুল বেশ সুগন্ধযুক্ত। হিঙ্গের কাঠ খুব পাতলা এবং উহার দ্বারা পালঙ্কার বাট হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা জাল ভাসাইয়া রাখার জন্য হিঙ্গের কাঠ দ্বারা "ভাসান কাঠী" প্রস্তুত করে। হিঙ্গের কাঠে কৃষিকার্যের জন্য লাঙ্গলের জোয়াল ও সুন্দর মই প্রস্তুত হয়।

হঁদো গাছের ন্যায় বলাসুন্দরীর নীচেও বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। বলা গাছে হলুদ বর্ণের ফুল হয়। শ্বেতবাড়েলা, শ্বেতআকন্দ, শ্বেতবসন্ত, শ্বেতমাখাল, শ্বেতকরবী প্রভৃতি ক্ষুদ্র গাছে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে গিলে গাছ দৃষ্ট হয়। এগুলি খুব দীর্ঘ। শেখের ট্যাকে এই গাছ আছে এবং তথা হইতে আমরা গিলে ফল সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কাপড় কুচি দেওয়ার জন্য গৃহস্থেরা এবং দরজিগণ এই ফল সর্বত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রামের লোকেরা ধান্যের গোলায় পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য কয়েকটি তেঁতুলের বীজ ও তৎসহ কয়েকটি গিলে ফলও রাখিয়া দেয়। বনের মধ্যে বেত গাছ খুব দীর্ঘ ও মোটা হয়। বেত সাংসারিক জীবনে অনেক আবশ্যকীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত খালের তীরে হরগোজার কাটা, উন্মুক্ত স্থানে খড়, কাশবন ও তুলাটেপারী এবং বালুচরে বুনো ঝাউ গাছ জন্মিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বুনো নেবু গাছও দেখা

যায়। এতদ্ব্যতীত কন্টিকেরী ও অন্যান্য বহু প্রকারের মূল্যবান ঔষধি ও লতা সুন্দরবনে পাওয়া যায়। বাওয়ালীদের অসুখ হইলে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কন্টিকেরী কণ্টাকাকীর্ণ গাছ। উহা শুকাইয়া ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের আরও কত আবশ্যকীয় লতাপাতা জঙ্গলে পড়িয়া আছে, অনেকে উহার খবর রাখে না।

বাক্‌ঝাকা গাছ জরাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঔষধ হিসাবে খাইতে দেওয়া হয়। লাটিম বা লাট্‌নে গাছ পেন্সিলের কাঠ হয়। বনশশা গাছে উচ্ছের ন্যায় ফল হয় এবং উহা লোকে খায়। বগুলা নামক আর একপ্রকার গাছ আছে। উহাতে বড় বড় ফল হয়। উহাও লোকে খাইয়া থাকে। চান্দা গাছের গায়ে খুব কাঁটা। সুন্দরবনে টক সুন্দরী নামক আর এক প্রকার গাছ আছে। উহাতে জ্বালানী প্রস্তুত হয়। কনেক বাইন ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং উহার পাতা সরু হয়। জানা গাছ খুব বড় হয়। ইহার কাঠের দ্বারা গৃহের সাজসরঞ্জাম ও জ্বালানী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার পাতা কাঠাল বৃক্ষের পাতার ন্যায়। কাজ্‌লী লতা, বাগলো লতা, গিলে লতা, কেক্‌চীবন বা কেঁয়াগাছও সুন্দরবনের সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অশ্বত্থ, ক্ষুদে জাম, জিওল ও সড়া প্রভৃতি সুন্দরবনের বৃক্ষ নহে। তবে উহা কোথাও প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা বা দীঘির নিকট বিদ্যমান থাকিয়া মনুষ্য বসতির সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ব্যতীত সুন্দরবনে বুজ, বোরই ও চৈতগাছ আছে। বোরই গাছে এক প্রকার বুনো কুল হয় এবং উহা সুন্দরবনের লোকেরা খায়।

গোলগাছ ও হোগলা : জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় এই গোলগাছ। এগুলি দেখিতে ২/৩ বছরের নারিকেল গাছের ন্যায় এবং তদ্রূপ লম্বা হইয়া থাকে। নদী ও খালের তীরে এবং নূতন চর বা দ্বীপে গোলগাছ প্রচুর জন্মে। জলের পার্শ্বে কর্দমাক্ত স্থানে এবং অল্প জলের মধ্যেই এগুলি জন্মিয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি প্রশস্ত ও খুব বড় হয়। উলু খড়ের ন্যায় এই গোল পাতার দ্বারা দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ ঘরের ছাউনি হইয়া থাকে। খড়ের চাষ দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। আবার করোগেট টিনও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। অন্য কোন উপায় না থাকায় লোকে ঘরে গোলপাতার ছাউনি দেয়। ইহাতে গ্রীষ্মকালে ঘরের মধ্যের হাওয়া শীতল থাকে। লোকে অসংখ্য নৌকায় সুন্দরবন হইতে গোলপাতা কাটিয়া লোকালয়ে বিক্রয় করে। এই গোলগাছে বন বিভাগের প্রচুর আয় হয়। গোলগাছ সুন্দরবনের এক মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। গোলগাছ দিয়া বাড়ি ঘিরিবার বেড়া দেওয়া হয় এবং কোন কোন সময় লোকে নৌকার উপর ছাউনি দিয়া থাকে।

সুন্দরবনের নদী ও খালের মধ্যে সর্বত্র গোলগাছ পরিলক্ষিত হয়। উহার পাতার রং সবুজ এবং ডাঁটার রং কালো। পাতা অনেকটা নারিকেলের পাতার ন্যায়, তবে মসৃণ। উহার ডাঁটা খুব শক্ত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যূন শতকরা ৯০ খানা বাসগৃহ গোলপাতার ছাউনিযুক্ত। গোলগাছে তালশাঁসের মত কান্দি হয়। উহার ফল ভক্ষণ করা যায়। ফলগুলির মধ্যে শক্ত তালশাঁসের ন্যায় শাঁস থাকে। উহা তালশাঁসের ন্যায় সুস্বাদু নহে। সুন্দরবনের

গোলফল কাটা একেবারেই নিষিদ্ধ, কারণ উহা হইতে অসংখ্য গোলগাছ জন্মে এবং উহার বংশ বৃদ্ধি হয়। বরিশাল ও খুলনায় অসংখ্য লোক গোলগাছ সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। গোলপাতার মূল্য দিন দিন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

খেজুর ও তালগাছের ন্যায় গোলগাছে এক প্রকার মিষ্ট রস হয়। বরিশালের বর্ষাকাটীর বাওয়ালীরা মৃন্ময়পাত্র বাঁধিয়া গোলগাছ হইতে রস সংগ্রহ করে এবং উক্ত রস জ্বালাইয়া খেজুরের গুড়ের ন্যায় মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়া খায়। ইহা সুন্দরবনের বাওয়ালীদের একটি আবিষ্কার। কেহ কেহ বলেন মোগল যুগে মগেরা যখন সুন্দরবন অঞ্চলের যত্রতত্র লুটতরাজ করিত, তখন তাহারা গোলগাছ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

লবণাক্ত এলাকার নদী ও খাল বাঁধিবার সময় বাঁধের জন্য গোলগাছ দিয়া "মাতা" প্রস্তুত করা হয় এবং নদীর ঢেউ হইতে ভেড়ী রক্ষা করিবার জন্য ঝাপ হিসাবে গোলপাতা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুন্দরবনে যেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলপাতা পাওয়া যায়, তদ্রূপ উহার ব্যবহার ও আবশ্যকতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুন্দরবনে সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী হোগলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা সাধারণতঃ পাটগাছের ন্যায় সাত আট হাত লম্বা এবং এক ইঞ্চি প্রশস্ত হয়। ইহা তিনকোণবিশিষ্ট। হোগলায় বসিবার আসন, নৌকা ও ঘরের ছাউনি, কৃষকের মাথাল এবং বাড়ীঘরের বেড়া, পাটাতন প্রভৃতি নির্মিত হয়। হোগলা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট প্রায় গোলপাতার ন্যায় মহোপকারী। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হোগলা ও মা'লে জন্মে। মা'লের দ্বারা দেশবাসীর অত্যাবশ্যকীয় পাটী, মাদুর, জায়নামাজ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। হোগলা সাধারণতঃ নদী ও খালের পার্শ্বে কর্দমাক্ত স্থানে জন্মে। হোগলা ও মা'লে ব্যতীত সুন্দরবনের চরে কোন কোন স্থানে প্রচুর উলুখড় জন্মে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ঘরের ছাউনির জন্য উলুখড়ের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

আর্থিক গুরুত্ব : সুন্দরবনের বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সুন্দরবনের কাঠের দ্বারা অসংখ্য গৃহস্থের জ্বালানী প্রস্তুত হয় এবং এতদঞ্চলে হর্মরাজি নির্মাণের জন্য কাঁচা ইট পোড়াইয়া পাকা করা হয়। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারি, বাক্স প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ইহা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জাতির অশেষ কল্যান সাধন করিতেছে। সুন্দরবনের কাঠ না হইলে কোঠাবাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের কুটীর পর্যন্ত নির্মাণ করিতে সাধ্যাতীত ব্যয় হইত। কাঠের দ্বারা ঘরবাড়ীর অত্যাবশ্যকীয় খুঁটি ও সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নদী পথে নৌকাই একমাত্র বাহন বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং উহাও বহুলাংশে সুন্দরবনের কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। শুধু নৌকা নহে, কাঠ দ্বারা নদী ও খালের উপর সাঁকো নির্মিত হয় এবং বৈদ্যুতিক তার চলাচলের থামরূপে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বত্র কাঠের ব্যবসায়ের দ্বারা অসংখ্য লোক জীবিকা নির্বাহ করে। বাওয়ালীরা প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড বৃক্ষ কুঠারের সাহায্যে ধরাশায়ী করে এবং নৌকা বোঝাই করিয়া শহর ও বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে। বড়দল, চাঁদখালী, গড়ইখালী, রাম্‌পাল, মোরেলগঞ্জ, খুলনা, রাজাপুর, সিংহের চর, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, বরিশাল, বড়দিয়া, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি বন্দরে অসংখ্য কাঠগোলা ও কাঠের আড়ৎ সুন্দরবনের কাঠের দ্বারা ব্যবসায় চালাইতেছে। অসংখ্য ছুতার মিস্ত্রী আসবাব প্রস্তুতের কার্যে দিবারাত্র লিপ্ত থাকে। দেশের সর্বত্র করাতিরা বড় বড় বৃক্ষ চেরাই করিয়া গৃহের খুঁটি ও সাজসরঞ্জামের কাঠ প্রস্তুত করে। অনেকগুলি যন্ত্রচালিত করাতকল বড় বড় বন্দরে কার্যে লিপ্ত আছে। সুন্দরবনের জ্বালানী ও অন্যান্য কাঠ বোঝাই হইয়া অসংখ্য নৌকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া তথাকার জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতেছে।

সুন্দরবনের কাঠে প্রচুর কাগজ পেপার মিলে প্রস্তুত হইতেছে, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে এই মূল্যবান বনজ সম্পদ আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এতদঞ্চলে কাঠের পাটাতন, ছাদ, জানালা, দরজা এমন কি জানালার শিকও এই কাঠের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধান ভানিবার জন্য গৃহস্থের অত্যাবশ্যকীয় ঢেঁকি এই কাঠ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। দালানের কড়ি, বর্গা, জানালা-দরজার চৌকাঠ, মটর বাস, লঞ্চ ও নৌকার ছাউনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এই কাঠ কাজে লাগিতেছে। কাঠের ন্যায় গোলগাছও এক অতীব মূল্যবান বনজ সম্পদ । একদিকে যেমন বনজ সম্পদ হইতে সরকারের আয় বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনই ইহা দ্বারা দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোন কোন বৃক্ষের বাকল হইতে নানা প্রকার রং প্রস্তুত হইতেছে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ভবিষ্যতে বৃক্ষের শিকড়, বাকল, পাতা এবং ফল ও ফুল হইতে বহু প্রকার নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান মিলিবে এবং মানুষের আবশ্যকীয় খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য তৈজষপত্র প্রস্তুত হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা চলিতে থাকিলে বনজ সম্পদের দ্বারা দেশবাসীর আরও অধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ছয়

সুন্দরবনের জীবজন্তু ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা

সুন্দরবনের সর্বত্র স্থল ও জলভাগে অসংখ্য জীবজন্তু বাস করে। নিবিড় অরণ্যানী ও বিশালাকায় নদনদী, "ডান্দ্বায় বাঘ---জলে কুমীর" প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর জন্য সুন্দরবনকে ভীষণতায় পরিণত করিয়াছে। এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিলে অনেকের মনে সুন্দরবন সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হয় এবং উহার রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক কাহিনী শুনিতে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য জন্মে।

ব্যাঘ্র : সুন্দবরনের জীবজন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্রের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশের ব্যাঘ্র অপেক্ষা সুন্দরবনের ব্যাঘ্র অত্যধিক বলশালী ও হিংস্র। এই ধরণের ভীমমূর্তিধারী ব্যাঘ্র বিশ্বের আর কোথাও নাই। তন্নিমিত্ত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ইহাকে রয়াল বেঙ্গল টাইগার (Royal Bengal Tiger) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাঘ্রের প্রতাপ এত অধিক যে উহার ভয়ে সুন্দরবনের অন্যান্য সমস্ত প্রাণী এবং মানুষ সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। জঙ্গলের লোকেরা ইহাকে বড় শিয়াল ও বড় মিয়া বলিয়া থাকে। হিন্দুরা ব্যাঘ্রকে বড় মামা, বড দাদা এবং কেহ গাজী ঠাকুরও বলে। ব্যাঘ্রের কথা শ্রবণে অনেক অন্ত্যজ হিন্দু শক্তিশালী এই জন্তুর প্রতি ভীতিপূর্ণ নমস্কার জানায়। আবার কেহ কেহ বিরক্তির সহিত ইহাকে ভোতড়ও বলে। বাওয়ালীরা উহার ভয়ে অনেক সময় বাঘ বা ব্যাঘ্র নাম উচ্চারণ করে না।

সুন্দবরনের ব্যাঘ্রের গাত্র হরিদ্রা বর্ণের এবং কাল ডোরাযুক্ত। কোন কোন ব্যাঘ্রের গায়ে লম্বা কাল ডোরা বা গোলাকার চিহ্ন দেখা যায়। গোলাকার ফোটাযুক্ত বাঘকে গুলবাঘ বলা হয়। এগুলি সুন্দরবনে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ৮ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রায় চারি ফুট উঁচু হয়। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় মোটা ও অতিমাত্রায় বলশালী। বড় বড ব্যাঘ্রে মহিষ, গরু প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু সহজে স্কন্ধের উপর ফেলিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। বাঘের মস্তক বৃহৎ ও গোলাকৃতি এবং চক্ষুদ্বয় বেশ বড় ও অত্যুজ্জ্বল। এহেন ভয়ংকর ও সুতীব্র চাহনী পৃথিবীর অন্য কোন জন্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

বিড়ালের আকৃতি ব্যাঘ্রের ন্যায়, সেজন্য এদেশে বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিড়ালের প্রকৃতি শান্ত এবং ব্যাঘ্রের প্রকৃতি হিংস্র। রয়াল বেঙ্গল টাইগার অতিমাত্রায় রক্তপিপাসু, হিংস্র এবং শিকারের সময় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। জীবজন্তু শিকারের পর ব্যাঘ্র প্রথমে উহার স্কন্ধ হইতে রক্তপান করে। সাধারণতঃ ইহারা পিছন দিক হইতে আসিয়া মানুষের স্কন্ধে কামড় দেয়। ব্যাঘ্রের মধ্যে কোনকোনটি

নরখাদক। যে-সমস্ত ব্যাঘ্র একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পাইয়াছে তাহারা যে কোন অবস্থায় মানুষ আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। মানুষ দেখা মাত্র উগ্র নেশা চড়িয়া যায় এবং ইহারাই মনুষ্য শিকারে দক্ষ। তজ্জন্য লোকে এই প্রকার ব্যাঘ্রকে নরখাদক বলে। সাধারণ ব্যাঘ্র অপেক্ষা নরখাদক অত্যধিক ভয়ঙ্কর ও হিংস্র এবং ইহাদের ভয়ে ঝানু শিকারী পর্যন্ত শিহরিয়া উঠে। ইহাদের সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুন্দরবনের হঁদো, হেন্তাল ও বলাসুন্দরী বৃক্ষের নীচে লুক্কায়িত থাকিয়া ব্যাঘ্রে শিকার করিয়া থাকে। শিকারের সুযোগ পাইবামাত্র সে ভীম বিক্রমে উহার উপর লাফাইয়া পড়ে।

বাঘিনী ২ হইতে ৫টি পর্যন্ত ছানা প্রসব করে এবং প্রসবের পর ছানাগুলিকে লুকাইয়া রাখে। ব্যাঘ্রে দেখিতে পাইলে ছানাগুলি খাইয়া ফেলে। বাঘিনী কিছুতেই তাহার বাচ্চা অন্যকে খাইতে দেয় না। বাচ্চা প্রসবের পর উহার পেট খালি হয় এবং অন্য কোন খাদ্য না পাইলে স্বীয় বাচ্চা কদাচিত ভক্ষণ করে। ইহা এই সময়কার বিশেষ ব্যতিক্রম। এই সময় বাঘিনী বাচ্চাকে জিহ্বা দিয়া চাটিতে বিশেষ আস্বাদ পায় এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাচ্চা ভক্ষণ করে। ব্যাঘ্রের তেজব্যঞ্জক ও ভয়াবহ মূর্তির জন্য উহাকে সাধারণে সুন্দরবনের রাজা বলিয়া থাকে। সুন্দরবনে সচরাচর ব্যাঘ্রের ডাক শ্রুত হয় না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় বাঘ ও বাঘিনীর ডাক শুনা যায়।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রের প্রয়োজনিয়তা অত্যধিক। ব্যাঘ্রের অবস্থানের জন্য চোর ডাকাতেরা সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করিতে ভয় পায়। ব্যাঘ্র না থাকিলে মানুষ এতদিনে হরিণের বংশ ধ্বংস করিয়া দিত। ব্যাঘ্রের আক্রমণ ভয়ে কেহ জঙ্গলের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া শিকার করিতে সাহস পায় না। সেজন্য বনবিভাগও ব্যাঘ্রকুলকে ধ্বংস করিতে দেয় না। ব্যাঘ্র, সর্প, বন্যবরাহ প্রভৃতি ধ্বংস হইলে সুন্দরবনের সম্পদ রক্ষিত হইবে না। এই সমস্ত জন্তুরও আবশ্যকতা আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সুন্দরবনে উহাদের অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস করা বহুলাংশে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্রকে শুধু ভক্ষক বলিলে ভুল হইবে, উহা সুন্দরবনের রক্ষকও বটে। গবাদি পশুর কোন একটি বিশেষ অসুখ হইলে সুন্দরবনের লোকেরা ব্যাঘ্রের দন্ত বা উহার মস্তকের হাড় ঘসিয়া কলাপাতার মোড়কে পুরিয়া খাওয়াইয়া দেয়। উহাতে অসুখ আরাম হয় বলিয়া শুনা যায়। ব্যাঘ্রে বানর, শূকর ও হরিণ ধরিয়া খাইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য ও কাঁকড়া খায়। সুন্দরবনে পূর্বে চিতাবাঘ ছিল, এখন উহার বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যাঘ্রের চামড়া বহু প্রয়োজনে লাগে। উহার দ্বারা জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের পশম, গোঁফ, কেশর, দাঁত ও হাড় দ্বারা অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহার মাংস ও জিহ্বায় মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। ব্যাঘ্র জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষের উপকারে আসে। পুরাকালে গ্রীসদেশের

লোকে ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাঘ্র নখের অলঙ্কার ব্যবহার করিত। ইহা মানব জাতির মহাশত্রু এবং মহোপকারীও বটে। মগ জাতীয় লোকেরা ব্যাঘ্রের মাংস খাইয়া থাকে। নীলকমল, ভেদাখালী ও কটকা, ঝাপা, মরাধুলি, ছাপড়াখালী, ত্রিকোণ-দ্বীপ, কাঠেশ্বর, ডিন্দিমারী, বৈকীরি, চুনকুড়ি, পুষ্পকাটী প্রভৃতি জঙ্গলে ব্যাঘ্রের আধিক্য দেখা যায়। সুন্দরবনের নরখাদক বা মানুষখেঁকো বাঘ (Man eaters of Sundarbans) ও ব্যাঘ্র শিকার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

হরিণ : হরিণ সুন্দরবনের এক মনোরম ও প্রিয়দর্শন জন্তু এবং মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। বনানীর সর্বত্রই ইহারা বসবাস করে। সুন্দরবনে হরিণের গমনাগমনের পথ আছে, এবং এই জন্তু চলিবার সময় পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। হরিণ দলে দলে চলিয়া আহার সংগ্রহ করে। ইহারা খুব আরামপ্রিয়। এই শৌখিন জন্তু কর্দমাক্ত স্থান মোটেই পছন্দ করেনা। তবে বাধ্য হইয়া উহাদের এই কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পায়ে কাদা লাগিলে উহারা বিরক্তি বোধ করে এবং ঝাড়া দিয়া কাদা ফেলিতে থাকে। পৃথিবীতে ইহার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট জন্তু আর আছে কিনা সন্দেহ। সুযোগ পাইলেই ব্যাঘ্রে হরিণ ধরিয়া খায়। কিন্তু ব্যাঘ্রের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র হরিণ তীর বেগে দৌড় দেয় এবং প্রতিযোগিতায় ব্যাঘ্র হরিণের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। অতিমাত্রায় হুশিয়ার এই জন্তু। ব্যাঘ্র দর্শনে হরিণ কুঁ কুঁ শব্দ করে। উহারা খুব চঞ্চল এবং সর্বদা সতর্কতার সহিত চলাফেরা করে। বাদা অঞ্চলের লোকেরা বলে, ব্যাঘ্র কুড়ি হাত আর হরিণ একুশ হাত পর্যন্ত এক লম্ফ দিয়া যাইতে পারে। এইজন্যই সম্ভবতঃ হরিণকে সহসা ব্যাঘ্রে ধরিতে পারেনা। শিঙ্গেল হরিণ দ্রুত দৌড়াইবার সময় বৃক্ষলতার সন্দে যাহাতে শিঙ জড়াইয়া না যায় সেইজন্য মাথা ও শিঙ উপর পিঠের উপর ফেলিয়া রাখে। হরিণের পদগুলি সরু ও দীর্ঘ। তজ্জন্য উহারা দ্রুত দৌড়াইতে পারে। হরিণের চক্ষু অতীব সুন্দর এবং রং রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ। ইহাদের গাত্রে সাদা সাদা ডোরা। সুন্দরবনে এই ধরনের ডোরাযুক্ত হরিণই অত্যধিক। কিছু কিছু কুকুরে হরিণও সুন্দরবনে আছে।

এগুলির রং খেঁকশিয়ালের বর্ণের ন্যায় এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। কাল ও সাদা হরিণ কদাচিৎ সুন্দরবনে দৃষ্ট হয়। সাদা হরিণের গায়ে কাল ডোরা দেখা যায়। শরণখোলা রেঞ্জের কোন ঝোপজঙ্গলের হরিণ খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং ঈষৎ কাল বর্ণের।

হরিণের মাংস সর্বজাতীয় লোকে খায়। এদেশের লোকেরা হরিণের মাংস পাইলে খুব আদর করিয়া ভক্ষণ করে। তবে উহা খাসী ছাগলের ন্যায় সুস্বাদু নহে। মাংসের বর্ণ গাঢ় লাল এবং চর্বি খুব কম। একটি হরিণে একমণ মাংস হইয়া থাকে। মৃগ শিকার পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশে সুপরিচিত। পুরাকালে বিভিন্ন দেশের রাজা-মহারাজারা পাত্রমিত্রসহ মৃগ শিকারে যাইতেন। সে কথা বিভিন্ন জাতির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

হরিণ সুন্দরবনের বৃক্ষের পাতা ও ফল খায়। ওড়া, কেওড়া, গোল, ধোন্দল, গেউয়া প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হরিণেরা যত্নের সহিত ভক্ষণ করে। এই সমস্ত ফল জোয়ারের জলে দূরে নীত হয় এবং জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া থাকে। দলে দলে হরিণ আসিয়া উহা ভক্ষণ করে। কেওড়ার পাতা ও ফল হরিণের সুখাদ্য। বানরেরা হরিণের জন্য ডাল ভাঙ্গিয়া ফল ও পাতা খাইবার নিমিত্ত নিম্নে ফেলিয়া দেয়। বানরের সঙ্গে হরিণের সখ্যতা অত্যধিক। ব্যাঘ্র দেখিলে উহারা একপ্রকার বিশিষ্ট ধরনের শব্দ করে এবং এইরূপ বিপদসংকেত পাইবামাত্র হরিণেরা তথা হইতে পলায়ন করে। সুন্দরবনের নিকটবর্তী লোকালয়ে আসিয়া সময় সময় হরিণে ক্ষেত হইতে ধান্য খাইয়া যায়। কৃষকেরা তাড়া করিলে ইহারা ক্ষিপ্র গতিতে জঙ্গলাভ্যন্তরে পলায়ন করে। সুযোগমত আবার হরিণের বাচ্চা তাহাদের হাতে ধরা পড়ে।

ধনাঢ্য লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া হরিণের বাচ্চা পুষিয়া থাকে। কিন্তু শিঙ উঠিলে উহা শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া ঘায়েল করে। বড় শিঙওযালা হরিণকে শিঙেল বলে। সুন্দরবনে হরিণ শিকার সহজ এবং দুরূহ বটে। হরিণ এত সজাগ যে গুলি করারও সুযোগ দেয় না। মানুষের গন্ধ পাইলে হরিণ তীর বেগে ছুটিতে থাকে। শিকারীর গা ঘেঁসিয়া বাতাস প্রবাহিত হইলে হরিণে বুঝিতে পারে। সেইজন্য শিকারীকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। দূরে শিকারী ধূমপান করিলেও উহা হরিণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। সেইজন্য শিকারীরা শিকারের সময় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া ধূমপান করিতে পারে না। ব্যাঘ্র অপেক্ষা হরিণের ঘ্রাণশক্তি অধিকতর প্রখর। মানুষের বুদ্ধি কৌশলের নিকট এহেন হুঁশিয়ার প্রাণীদেরও মতিভ্রম ঘটে।

হরিণের শিঙ এক ফুটের অধিক লম্বা হয় এবং উহার শাখা প্রশাখা হইয়া থাকে। ইহাই হরিণ-শিঙের বৈশিষ্ট্য। যে হরিণের শিঙ চামড়া বেষ্টিত, উহাকে "ভেলভেট" বলে। স্ত্রী হরিণের শিঙ গজায় না। কেবলমাত্র পুরুষ হরিণের শিঙ হয়। শিঙ-এর তারতম্য অনুসারে উহাকে কাঠ শিঙেল, কাল শিঙেল, বুটো শিঙেল ও খোর শিঙেল বলা হইয়া থাকে। শিকারীরা সাধারণতঃ স্ত্রী ও গর্ভবতী হরিণকে শিকার করে না। কর্তৃপক্ষ সুন্দরবন হইতে বিশেষ অনুমতি ভিন্ন হরিণ শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়াছে। হরিণের নিরাপত্তার জন্য সুন্দরবনে কয়েকটি ঘের পৃথকভাবে রাখা হইয়াছে। উহাকে পশুপক্ষীর নিরাপদ আবাসভূমি (Sanctuary) বলা হয়। ঝাপা, নীলকমল, বায়লাকয়লা, দুবলার ট্যাক, বিবির মাদে, আমবাড়ীয়া প্রভৃতি জঙ্গলে প্রচুর হরিণ পাওয়া যায়।

শুধু মাংস নহে, হরিণের চামড়ার দ্বারাও মানুষের উপকার হয়। এই জন্তুর চামড়ায় সুন্দর জুতা প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত লোকে উহা জায়নামাজ রূপেও ব্যবহার করে। হিন্দুরা হরিণের চামড়া বিছাইয়া পূজার আসন করিয়া থাকে। হরিণের শিঙ দ্বারা সুন্দর ছড়ি

প্রস্তুত হয়। হরিণ পৃথিবীর মধ্যে একটি সুন্দর জন্তু এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের বিশেষ প্রিয়। মানুষ ইহাকে অত্যন্ত আদর করে। কবি এই সৌন্দর্যশালী জন্তুর মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"বনের হরিণ বলে আমি কার বা ধার ধারি,
আপনার মাংস দিয়া জগৎ কব্‌লাম বৈরী।"

বানর ও বন্যবরাহ: সুন্দরবনের জন্তুর মধ্যে বানর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। বানরের আকৃতি ও প্রকৃতি সকলের জানা আছে। সুন্দরবনের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে বানর অবস্থান করে। ইহারা হরিণের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গর্বানুভব করে। ব্যাঘ্র দর্শনে বানরে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করে। আবার কোন কোন সময় সাধুর ন্যায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে। এই ধূর্ত জন্তু গাত্রে কাদা মাখিয়া মৌচাক হইতে মধু পান করে। কাদার জন্য উহার গাত্রে মৌমাছির হুল বিঁধিতে পারে না।

বানরে হরিণকে বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া পাতা ও ফল খাইতে দেয়। বানরেরা কোন কোন সময় হরিণের পিঠে চড়িয়া বেড়ায় এবং আনন্দ উপভোগ করে। শিকারের সময় ক্রোধান্বিত বানর মানুষের হাত কামড়াইয়া দেয়। বানর বনবিভাগের অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীব। ব্যাঘ্র দর্শনে ইহারা শুধু হরিণকে বিপদ সংকেত দিয়া সরাইয়া দেয় না, মানুষকেও বিশেষ সাবধান করিয়া দেয়। দূরে ব্যাঘ্র দেখিলে বানরেরা ধপাস্ করিয়া বৃক্ষের ডাল হইতে মাটিতে পড়ে এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করে। কাঠুরিয়া ও শিকারীরা "বিপদ সংকেত" বুঝিতে পারিয়া সাবধানতা অবলম্বন করে। হরিণ ব্যাঘ্রাক্রমণের বিপদ সংকেত বুঝিতে না পারিলে বানর উহার মুখে চপেটাঘাত করে।

বন্য বরাহ বা বুনো শূকর সুন্দরবনের সর্বত্র বাস করে। ইহাদিগকে সুযোগ পাইলে বাঘে ধরিয়া খায়। বন্য বরাহের শক্তি খুব বেশী এবং অনেক সময় ইহাদিগকে শিকার করিতে বাঘের গলদঘর্ম হইয়া যায়। শূকরগুলি প্রায় তিনহাত লম্বা এবং একহাত আন্দাজ উঁচু হয়। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ; ঘাড়, বুক ও পেটের লোম গোড়ার দিকে কাল এবং অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণের। সুন্দরবনের শূকরের মস্তক প্রকান্ড ও দাঁত খুব বড় ও প্রখর হয়, এজন্য লোকে শূকরকে দাঁতাল বলে।

অন্যান্য জন্তু—গণ্ডার ও বয়ার: সুন্দরবনের অন্যান্য জন্তুর মধ্যে "উদ্" বা ধাড়ে, সজারু, বনবিড়াল প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। সজারুর গায়ে লম্বা কাটা থাকে। উদ বা ধাড়ে পোষ মানিলে উহারা জেলেদের মৎস্য ধরায় বিশেষ সাহায্য করে। সুন্দরবনে শৃগাল নাই। সম্ভবতঃ কর্দমাক্ত স্থান শৃগালের পক্ষে বাসের অনুপযোগী। ব্যাঘ্রের দাপটেও শৃগালকুল সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জঙ্গলের বাইসন বা বন্য গরুও সুন্দরবনে নাই।

সুন্দরবনে কোথাও গণ্ডার নাই বলিয়া সকলেই জানে কিন্তু কেহ কেহ বলেন এখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোথাও গণ্ডার থাকিতে পারে। তবে একথা সত্য যে সুন্দরবনে পূর্বে বহু গণ্ডার ছিল এবং কি কারণে এখন গণ্ডার দৃষ্ট হয়না তাহা অনেকেই বলিতে পারে না। সুন্দরবন অঞ্চলে শ্যামনগর থানার অর্ন্তগত হরিনগর গ্রামে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পুকুর খননের সময় এফাজতুল্লা সরদারের বাড়ীতে একটি বড় গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। উহা এখনও সেই বাড়ীতে রক্ষিত আছে। উক্ত থানার শ্রীফলকাঠি গ্রামে গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ধূমঘাটে দীঘি খননের সময় ছয়টি গণ্ডারের কঙ্কাল পওয়া গিয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ লোকরা শ্রীফলাকাঠি ও খেগড়াঘাটের জঙ্গলে স্বচক্ষে গণ্ডার দেখিয়াছেন। গণ্ডারের শিঙ অতীব মূল্যবান। সাধারণতঃ ইহারা তৃণভোজী। ঈশ্বরীপুরে মাখনলাল অধিকারীর বাড়ীতে ৬টি গণ্ডারের কঙ্কাল দেখিয়াছি।

সুন্দরবনে মহিষ, গরু ও হস্তী নাই। তবে বাগেরহাট অঞ্চলের সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে বন্য মহিষ পাওয়া যাইত। মানসিংহ কর্তৃক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে পাঠান বিদ্রোহ দমনের পর তাঁহাকে সুন্দরবন অঞ্চলে ফতেহাবাদ সরকারের জায়গীর প্রদত্ত হয়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এই অঞ্চলে তখন বহু হস্তী ও অন্যান্য বন্য জন্তু পাওয়া যাইত। সজারু এবং চিতাবাঘও সুন্দরবনে পাওয়া যাইত। বনাঞ্চলের লোকেরা পূর্বে গণ্ডার ও মহিষ শিকার করিত এবং উহার মাংস ভক্ষণ করিত। লোক বুনো মহিষকে বয়ার বলিত এবং গ্রামের মেয়েরা হরিণ শিকারের ন্যায় বয়ার ও গন্ডার শিকারের গল্প করিত। গণ্ডারকে "গাড়া" বলা হইত। রামপাল থানার "গাড়া মারা" নামে একটি গ্রাম আছে।

গণ্ডার হরিণের ন্যায় অনেকগুলি বাচ্চা প্রসব করে না। কথিত আছে যে গণ্ডার দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে মাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করে। গণ্ডারের প্রাচুর্যের জন্য সম্ভবতঃ নদীর নাম হইয়াছে গাড়া নদী। বিভারীজ সাহেব বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে কুক্রী মুক্রী দ্বীপে শূকর ও বন্য মহিষ দেখিয়াছেন। তখন সেখানে হরিণ ছিল না। গণ্ডার সম্পর্কে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন বলেন যে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক গণ্ডার সুন্দরবনে ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে গণ্ডার সাংঘাতিক হিংস্র জন্তু। ইহা অন্য জন্তুর মাংসসহ চামড়াও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালঞ্চ ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনার সন্নিকটে অসংখ্য গণ্ডার ছিল। দেশী শিকারীদের হাতে পড়িয়া গণ্ডার ও বন্য মহিষের বংশ ধ্বংস হইয়াছে। গ্যান্ডারখালীব জঙ্গল একটি বাঘের আড্ডা এবং ভয়সঙ্কুল স্থান। কেহ কেহ বলেন, এখানে এককালে বহু গণ্ডার পাওয়া যাইত। সেইজন্য জঙ্গলের নাম হইয়াছে গণ্ডারখালী বা গ্যাণ্ডারখালী।

গণ্ডারের শিঙ মূল্যবান পদার্থ। পুরাকালে ইজিপ্টের রাজারা বিষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গণ্ডারের শিঙ দ্বারা পান করিতেন।

সুন্দরবনের সর্প ও তারকেল : সুন্দরবনের সর্প ভয়ঙ্কর জীব। যেমন বাঘের ভয়, সর্পের ভয় প্রায় সেইরূপ। তবে জঙ্গলের মধ্যে সর্পাপেক্ষা ব্যাঘ্র আগেই দেখা যায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। সর্প অতর্কিতে মানুষকে আক্রমণ করে। তবে সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণের ন্যায় সাপের ভয় ততোধিক নহে। সুন্দরবনে যত্রতত্র সর্প আছে। বন্দুক দ্বারা অনেক সময় সর্প মারা যায় না। ইহারা কোন কোন সময় লেজ দ্বারা বৃক্ষের ডাল জড়াইয়া অধোমুখে ঝুলিয়া থাকে এবং কোন জন্তু গেলে উহাকে সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে বিষাক্ত সর্প আছে। বড় বড় সর্পের শক্তি অসীম। উহারা বড় বড় জন্তু পেচাইয়া উপড়াইয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। ব্যাঘ্র পর্যন্ত সর্পকে বিশেষ ভয় করে। সর্প দংশনে ব্যাঘ্রও নিহত হয় বলিয়া শুনা যায়।

সর্প সাধারণতঃ দুই প্রকার—বিষহীন ও বিষাক্ত। বিষধর সর্পকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—চৌপাশা, বোড়া এবং বীজজড়ী। কেউটা, গোখুবা, আইরাজ ও কানড় ; এই চারি প্রকার সর্পই চৌপাশা শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের আবার প্রকারভেদ আছে। কেউটা, আবার কাল কেউটা, পদ্ম কেউটা, বাঁশবুনে কেউটা প্রভৃতি। গোখুরা ৫ প্রকার—কালী গোখুরা, পদ্ম গোখুরা, খ'য়ে গোখুরা, হলদে গোখুরা ও নাগরাজ গোখুরা। আইরাজ অনেক প্রকার—তন্মধ্যে দুধরাজ, পাতরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচুর প্রসিদ্ধ। শঙ্খরাজ সর্পের বিষ সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। কানড়েরও এইরূপ শ্রেণী বিভাগ আছে।

কেউটা সাপের মস্তকে পদ্ম বা গোলাকাব চিহ্ন আছে এবং গোখুরার মস্তকে "U" চিহ্ন আছে। কেউটা, গোখুরা ও আইরাজের ফণা আছে। কিন্তু কানড়ের ফণা হয় না। প্রত্যেকটি সর্পে সাংঘাতিক বিষ আছে। ইহাদের আঘাতে মানুষ অধিক সময় বাঁচিতে পারে না। বহু গবেষণার পরও আজ পর্যন্ত সর্পাঘাতের কোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্রাম্য ওঝারা নানা প্রকার মন্ত্র, দোয়া, তাবিজ ও বৃক্ষের শিকড় বা লতা দ্বারা কোন কোন সময় সর্পাঘাতের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তবে উহা নির্ভরযোগ্য নহে। আমাদের দেশের লোকালয়ে কেউটা ও গোখুরা সাপ দৃষ্ট হয়। আইরাজ সর্প সুন্দরবনেই অধিক। গ্রামাঞ্চলের সর্পকুল হইতে সুন্দরবনের সর্পের প্রকৃতি একটু পৃথক। আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য বন্য সর্প কম বিষাক্ত।

কেউটা সর্পের দংশনে শরীরে কন্‌কনে যন্ত্রণা হয় এবং আহত ব্যক্তি যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়িতে থাকে। উহার মুখে ফেণা উঠে এবং বিষের ক্রিয়ায় সর্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। ইহারা জলাভূমিতে মানুষকে কামড়ায়। গোখুরার আঘাতে শরীরে অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। ইহারা কখনও জলে কামড়ায় না। ইহাদের বিষে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং গুরুতর আঘাতের সন্ধে সন্ধে মরিয়া যায়। আইরাজ ও কানড় প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।

বোড়া (পাইথন) সর্প আকারে খুব বড় হয়। উহার প্রকারভেদ আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রবোড়াই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা অন্য সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই সর্পকে ভয়াবহতার জন্য অজগর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা শিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। ইহারা একই পথ দিয়া যাতায়াত করে। দড়ি দিয়া ফাঁসি প্রস্তুত করতঃ উহাদের গমন পথে পাতিযা রাখিলে আটকাইয়া যায়। এই সমস্ত সর্প লম্বায় প্রায় ২৫ ফুট এবং ওজনে পাঁচমণ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

শঙ্খচুর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর সর্প আর নাই। উহা দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। হিংসা ও ক্রোধ উহার সর্বদেহে জড়িত। ছোবল মারিবার সময় শুধুমাত্র লেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রায় মানুষের সমান উঁচু হইয়া থাকে। ফণা বিস্তার করিয়া এই সর্প যখন ফোঁস ফোঁস শব্দ কবিতে থাকে তখন ইহার সম্মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই।

হবিণবোড়া সর্প আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং হরিণ ও ছাগলের ন্যায় জন্তু আস্ত গিলিয়া খাইতে পাবে। বীজজড়ি সর্পের কালনাগিনী, রুদ্রকাল, মহাকাল প্রভৃতি প্রকার ভেদ আছে, শঙ্খরাজ সাপ খুব বড়, ফণাধাবী সর্পের ন্যায় ছোবল মারিবার জন্য যখন উঁচু হইয়া উঠে তখন ইহাদের গাত্রে কয়েকটি ভাঁজ পড়ে। উহা দেখিতে অতীব সুন্দর।

বাকাল সাপের তিনটি শিরা আছে। সেই জন্য উহা দেখিতে বিশেষ ধরণের। কালনাগিনীর কাল গায়ে লাল ফুলের চিহ্ন থাকে। উদয়কাল সর্প বহুরূপী। উহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাব বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। যত বড় বিষধর সর্প হউক না কেন সাপুড়েরা উহাব বিষদাত ভান্দিয়া বশে আনয়ন কবে। সুন্দরবন হইতে আদেশপত্র লইয়া লোকে বড় বড় সর্প ধরিয়া শহবে লইয়া আসে।

ব্যাঘ্রের ন্যায় সর্প মানব জাতির মহাশত্রু। কিন্তু শুনা যায়, উহারও যথেষ্ট গুণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিষাক্ত সর্পের অবস্থান দেশের আবহাওয়ার পক্ষে মন্দ্বলকর। দেশে সর্পকূল না থাকিলে বনে জন্দ্বলে চোর, ডাকাত লুক্কায়িত থাকিয়া মানুষের সর্বনাশ সাধন করিত। সর্পেব চামড়া মূল্যবান। উহা দ্বারা জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাপুড়িয়ারা বড় বড সর্প ধরিয়া আনিয়া গ্রামে খেলা করিয়া আয় উপার্জন করে এবং অবসব সময়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাপের খেলা দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে সর্প সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য সর্প আছে। সেখানকার লোকেরা বলে যে জনৈক সাপুড়িয়া অসংখ্য সর্প লইয়া অন্যত্র যাইবাব সময় নদীতে নৌকাসহ ডুবিয়া যায়। সাপুড়িয়া অর্থের মায়ায় বৃহত্তম সর্পটির লেজ ধরিয়া থাকে এবং সমস্ত সর্প ঐ সর্পের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। পরে সাপুড়িয়া বড় সর্পটিকে ছাড়িয়া দিলে সমস্ত সর্প একযোগে মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরেব জন্দ্বলে প্রবেশ করে। তখন হইতে ঐ অঞ্চলে সর্পের আধিক্য বাড়িয়া যায়। গল্পটি কতদূর সত্য জানিনা।

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার সর্প বিরাজমান। পাহাড়িয়া অঞ্চলেও যথেষ্ট সর্প আছে। কিছুদিন পূর্বে আসামের এক জঙ্গলে একটি বিরাটকায় পাইথন বৃক্ষে জড়াইয়া থাকে। তথাকার লোকেরা বৃক্ষটির দুইদিক ছেদন করিয়া সর্পটিকে সেই অবস্থায় শহরে লইয়া আসে। একবার খুলনা শহরে এক দ্বিতল গৃহের কামরায় দুইটি সর্প প্রবেশ করে। সর্প দুইটি যখন ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতেছিল তখন ঘুমন্ত লোকটি জাগিয়া উঠে এবং সতর্কতার সহিত বাহিরে গিয়া প্রতিবেশীদের জানায়। পরে সর্প দুইটিকে গুলি করিয়া মারা হয়। রাত্রে ঘরের মধ্যে বিষধর সর্প প্রবেশ করিয়া মানুষ দংশন করিবার ঘটনা বিরল নহে। চৌকির নীচে কেউটা সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দে নিদ্রাভঙ্গ এবং অনুরূপ ভয়াবহ বিপদের কথাও শ্রুত হয়। আমাদের এক বন্ধুর সহিত একটি সর্পের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়। সুন্দরবনের নিকটবর্তী ধান্যের জমিতে ভেড়ীর উপর দিয়া চলিবার সময় সর্পটি অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার সমান উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে কি ভীষণ অবস্থা! উভয়ই পরস্পর মুখোমুখী, উভয়ের চক্ষু উভয়ের দিকে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু আক্রমণ করিবার কোন অস্ত্র নাই। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর সৌভাগ্যক্রমে সর্পটি স্বীয় গর্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে।

সর্প ভয়ঙ্কর জীব। কিন্তু সুযোগ পাইয়াও অনেক সময় উহারা মানুষকে ছোবল মারেনা। গাত্রে স্পর্শ বা আঘাত লাগিলে উহারা মানুষ দংশন করিয়া থাকে। এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে সব সময় মানুষের মৃত্যু হয়না। জানিয়া শুনিয়া সর্পে আঘাত করিলে, মানুষ বিষে জর্জরিত হইয়া দ্রুত প্রাণ ত্যাগ করে।

সুন্দরবনের লোকেরা বিপদে পড়িলেও উহা প্রতিহত করিবার উপায়ও জানে। সুন্দরী, কেওড়া প্রভৃতি বৃক্ষে পরগাছা জন্মিয়া থাকে এবং উহার গোড়ায় 'চিলে' নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহার উপর মুর্গিতে ডিম পাড়ে। নৌকার ছিদ্র দিয়া পানি প্রবেশ বন্ধ করিতে হইলে নৌকার তলদেশে ঐ চিলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। উহা ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে পানি প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়। একদা জনৈক ব্যক্তি চিলে সংগ্রহ করিবার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করে এবং উহা ভাঙ্গিবার সময় একটি বিষাক্ত সর্প অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করিয়া তাহার হস্তে ছোবল মারে। তৎক্ষণাৎ সঙ্গীরা তাহার হাতের বাহুর দিকে জোরে কাপড় বাঁধিয়া দেয়। তাহাতে শরীরের মধ্যে সর্প বিষ প্রবেশ করিতে পারেনা। সর্পের বিষ হৃদপিন্ডে পৌঁছিলে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে। লোকটির হস্তখানার সর্বত্র বিষে কালিমাময় হইয়া যায়। তাহার বন্ধন না খুলিয়া হাসপাতালে আনা হয়। বিষ বাহির করায় লোকটি বাঁচিয়া যায়, কিন্তু চিরদিনের জন্য হস্তখানা নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে।

বিষহীন সর্পের মধ্যে ধোড়াই প্রধান। ইহাদের মধ্যে দাঁড়াশ, ময়াল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ময়াল সাপের শক্তি ভয়ঙ্কর। উহা লেজ দ্বারা মানুষের হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। শঙ্খিনী বা সানী সাপের দুইদিকেই মুখ থাকে। উহার লেজ হয়

না। ইহারা অন্য সাপ ধরিয়া খায়। ইহাও বিষাক্ত সাপের অন্তর্গত। লাউডোব সাপ আন্দ্বলের ন্যায় মোটা এবং দেড় হাত লম্বা হয়। উহার বর্ণ সবুজ। এই সর্প গোলগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের বর্ণের সহিত মিশিয়া থাকে। বিষহীন সর্প প্রায়ই মানুষ কামড়ায় না এবং কামড়াইলেও মানুষ মরে না। সুন্দরবনের গোলগাছে আর এক প্রকার মাথা মোটা সাপ থাকে। উহা মানুষ কামড়ায় না। কাচো নামক সাপের বিষ নাই।

গুইসাপ বা তারকেল সর্পের আকৃতিবিশিষ্ট না হইলেও উহাকে সর্পশ্রেণীভুক্ত করা হয়। সুন্দরবনে অসংখ্য গুইসাপ আছে। বহুলোক ইহা ফাঁসী দিয়া বা স্বহস্তে শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। গুইসাপের চামড়ার মূল্য অত্যধিক এবং উহা দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। গুইসাপের চামড়ায় জুতা ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চামড়া প্রচুর পরিমাণে জাপানে রপ্তানি হয় এবং উহার ব্যবসায়ের দ্বারা অনেকে বিশেষ লাভবান হইয়া থাকে। গুই সর্প বিশেষ উপকারী জীব ; ইহা মানুষ দংশন করে না এবং বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে উহা ধরিয়া ভক্ষণ করে। সুন্দরবনের লোকে উহাকে 'তারকেল' বলে। উত্তর অঞ্চলের লোকেরা ইহাকে গুড়গুড়েল বা 'ঘোড়েল' এবং বরিশালের লোকেরা 'গুইল' বলে। ইহাকে রামগুই বা রামগদীও বলা হয়। গুইসাপের চামড়া খুলিয়া ফেলিলেও কয়েক ঘন্টা বাঁচিয়া থাকে।

বৃহৎকায় সর্প বা ব্যাঘ্র যখন জন্দ্বলের মধ্যে চলাফেরা করে, তখন শালিক ও অন্যান্য পক্ষী কিচির মিচির শব্দ করিয়া সকলকে হুশিয়ার করিয়া দেয়। সম্প্রতি সোভিয়েট কিরগিজ গবেষণাগারে পঞ্চাশ সহস্র সর্পের এক অত্যদ্ভুদ জয়ন্তী পালন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে বিষের ছোট ছোট পার্শেল প্রেরিত হয়। উহা বিষ চিকিৎসার কার্যে ব্যবহৃত হইবে।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, সর্পে যখন কর্ণ দিয়া শ্রবণ করে তখন চক্ষু দিয়া দেখিতে পারে না এবং চক্ষু দিয়া দেখিলে কর্ণে শ্রবণ করিতে পারে না। চক্ষু এবং কর্ণের একই ইন্দ্র বলিয়া সাপুড়িয়ারা বাঁশী বাজাইয়া সর্প ধরিয়া থাকে। কথিত আছে যে, বিষাক্ত সর্পে মানুষ দংশন করিলে সেই ব্যক্তি যদি সর্পকে স্বীয় দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া দিতে পারে তবে সে বাঁচিয়া যাইবে এবং সর্প মরিয়া যাইবে। আজ পর্যন্ত বিশ্বে সর্পাঘাতের ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই।

জলজন্তু—কুমীর : সুন্দরবনের সমস্ত নদী ও খালে অসংখ্য কুমীর বাস করে। এই জলজন্তু অতিমাত্রায় শক্তিশালী এবং হিংস্র। বড় কুমীর লেজসহ ২০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের ন্যায় এই জন্তু শিকারে বিশেষ কষ্ট স্বীকাব করিতে হয় না। কুমীর ও হান্দ্বরের ভয়ে সুন্দরবন ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোথাও নদী বা খালে স্নান করা বা সাঁতার দেওয়া একরূপ অসম্ভব। জীবজন্তু বা মানুষ নদী ও খালে অবতরণ করিলে কুমীর ও হান্দ্বরে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্রে ভীমবেগে নদী সাঁতরাইয়া পার হয়। ঐ অবস্থায় কুমীর উহাদের আক্রমণ করিতে পারে না। কুমীর শিকারী জন্তু। অনেক

সময় নৌকার উপর হইতে লম্ফ দিয়া মানুষ শিকার করিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া ভক্ষণ করে। কুমীরের বংশ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। কুমীরের দন্ত ও চামড়া মূল্যবান পদার্থ। উহার তৈল ও চর্বি বহু উপকারী কাজে লাগে। কুমীরের জিহ্বা নাই। উহার লেজে সাংঘাতিক শক্তি ধারণ করে। লেজের সাহায্যে কুমীরে শিকার সংগ্রহ করে। কুমীরের শিকার পদ্ধতি সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

কুমীরের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে প্রাণীবিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত কোন সঠিক তথ্য দিতে পারেন নাই—দেওয়াও দুষ্কর। তবে শুনা যায় একটি কুমীরের আয়ু ২০০ বৎসর পর্যন্ত হইয়া থাকে। কুমীর উভচর প্রাণী। তবে স্থলভাগ অপেক্ষা জলস্থলীতে উহার গতি ক্ষিপ্র। কুমীরের চক্ষুদ্বয় মস্তকের উপরিভাগে অবস্থিত। শুধু চক্ষু দুইটি ভাসাইয়া সে দূর হইতে শিকারের সন্ধান করিতে পারে। কুমীরের পক্ষে উহা বিশেষ সুবিধা। কুমীরের দন্তগুলি অত্যন্ত ধারাল। এই জন্তু যখন মুখ বন্ধ করে, তখন এক পাটির দাঁত অন্য পাটির দাঁতের ফাঁক দিয়া ঢুকিয়া যায়। সাধারণ কুমীরের ডিম তারতম্য অনুসারে হাঁস বা মুরগীর ডিমের ন্যায় হইয়া থাকে। একটি স্ত্রী কুমীর প্রায় ৫০টি পর্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা নদী বা সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে ডিম পাড়ে। ডিম তা দেওয়ার কয়েকদিন পরে খোসার মধ্য হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া নদীতে সাঁতার খেলে। এইসব বাচ্চার আর কোন প্রকার যত্ন লইতে হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় কুমীর স্বীয় বাচ্চা ধরিয়া উদরস্থ করে। সম্ভবতঃ সেইজন্য কুমীরের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়িতে পারে না। কুমীরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় উহার দুই চক্ষে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন কোন লোক কুমীরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

ব্যাঘ্রের ন্যায় কুমীরও নরখাদকে পরিণত হয়। একবার মানবরক্ত পান করিলে উহার হিংস্র স্বভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষখেঁকো কুমীর দূর হইতে শিকারের প্রতি লক্ষ্য করে। বড় বড় নৌকার মাঝিরা চৌকির উপর উচ্চ স্থান হইতে হা'ল চালনা করিয়া নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। শিকারী কুমীর দূর হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া অতীব সন্তর্পণে হা'লের নিকট যাইয়া ভীষণ জোরে ধাক্কা দেয়। অকস্মাৎ ধাক্কায় মাঝি নদীতে পড়িয়া গেলে কুমীর তাহাকে উদরস্থ করে। সুন্দরবনের নদীতে এই ধরনের ঘটনা শ্রুত হয়। কোন কোন সময় কুমীর শক্তিশালী লেজের সাহায্যে নৌকার উপর হইতে মানুষ শিকার করে। একবার সুন্দরবনের কোন নদীতে নৌকার উপর একজন বাওয়ালী মল ত্যাগ করিতেছিল। কুমীর দূর হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া লেজ দ্বারা ঐ বাওয়ালীকে ধরিয়া লইয়া যায়।

হাঙ্গর : হাঙ্গর বা কামট সুন্দরবনের এক ভয়াবহ জলজন্তু। কুমীরের পরেই জলাভূমিতে ইহাদের প্রাধান্য। তবে এই জন্তু কুমীর অপেক্ষা অধিকতর হিংস্র। সুন্দরবনের নদীনালায় অসংখ্য হাঙ্গর থাকে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত হাঙ্গর মানুষ আক্রমণ করিয়া হস্তপদ ও শরীরের অন্যান্য অংশ কর্তন করিয়া লইয়া যায়। নদীতে হাঙ্গরে মানুষ আক্রমণ

করিবার পর অনেক সময় রক্ত ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায়। ব্যাঘ্র ও কুমীর অপেক্ষা হান্দরের দন্ত অধিকতর প্রখর। উহার দাঁত এতদূর ধারাল যে, কর্তন করিবার সময় কোন প্রকার শব্দ হয় না। বড় বড় হান্দর ৭/৮ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার গালের উপর দুই পাটি এবং নীচে একপাটি দন্ত আছে। সমস্ত দন্তগুলি মসৃণ মাংসপেশীর দ্বারা আবৃত। তজ্জন্য এই জন্তু যখন কাহারও গাত্রে মুখ দেয়, তখন সে কিছুই বুঝিতে পারে না। পরে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ দন্তরাজি বহির্গত হইয়া মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। সুন্দরবন অঞ্চলে এখনও অনেক লোক জীবিত আছে, যাহাদের হস্তপদ হান্দরে কর্তন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। হান্দর দেখিতে অনেকটা বড় পাঙাশ মৎস্যের ন্যায়। এতদঞ্চলে ধীবরদের বেড জালে অনেক সময় হান্দর ও কুমীর ধরা পড়িয়া থাকে। হান্দরে মূল্যবান তেলও প্রস্তুত হয়। এদেশের লোকেরা উহাকে কামটের তেল বলে। সম্প্রতি কুমিল্লা মৎস্য বিভাগীয় গবেষণাগারে হান্দরের তৈলের উৎকর্ষ বিধানে দুইটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই গবেষণাগার দীর্ঘকাল হইতে বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত হান্দরের জৈব উপাদান হইতে রাসায়নিক ভেষজ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। এই নয়া উদ্ভাবনার একটি হইতেছে "শার্কলিভার অয়েল ক্যাপসুলের" উৎকর্ষ বিধান এবং দ্বিতীয় সাফল্য হইতেছে "শার্কলিভার অয়েল কনসেনট্রেট"।

সুন্দরবন অঞ্চলে হান্দর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা যেমন মানব জাতির মহা শত্রু, তেমনই মহোপকারী। এদেশের বিশেষ আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত ও বয়োপ্রাপ্ত হান্দরের জৈব উপাদান হইতে গঠিত বলিয়া উপরোক্ত ভেষজ ও ক্যাপসুল হজমশক্তির বিশেষ সহায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। চাক্‌মা জাতীয় লোকের নিকট হান্দরের শুট্‌কী অতি উপাদেয় খাদ্য। চট্টগ্রামের মগজাতীয় লোকেরা হান্দর শিকার করিয়া উহা শুকাইয়া অন্যত্র রপ্তানি করে এবং যথেষ্ট লাভবান হইয়া থাকে। হান্দরের পাখ্‌নার "স্যুপ" চীনাদের নিকট মহামূল্যবান খাদ্য।

অন্যান্য জলজন্তু : শোষ বা শিশু সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর, উহারা প্রায়ই জলের মধ্য হইতে মস্তক উঁচু করিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। উহারা মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে। নদী ও খালের মুখে যেখানে মৎস্যের যাতায়াত অধিক সেখানেই উহাদের আধিক্য দেখা যায়। কুমীর ও হান্দরে ইহাদের ন্যায় মৎস্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

সুন্দরবনের মৎস্য : মৎস্য বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য। এদেশের লোকে বলিয়া থাকে, 'মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে'। বৃক্ষরাজির ন্যায় সুন্দরবনের মৎস্য এক অমূল্য সম্পদ। বাঙ্গালীর নিকট মাছ একটি বিশেষ আবশ্যকীয় খাদ্য। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদীতে ও খালে এবং সুন্দরবন সংলগ্ন সাগরে পর্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়। অসংখ্য লোক মৎস্য ধরিয়া জীবনধারণ করে। মৎস্যের ব্যবসায়েও বহুসংখ্যক লোক সর্বদা নিযুক্ত থাকে। ধীবরগণ ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় লোকেরাও মৎস্য ধরার কার্যে বৎসরের সব সময়ে নিযুক্ত

থাকে। বহু সংখ্যক নৌকা ও অসংখ্য জাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মৎস্য ধরার কার্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের মৎস্য একটি বিশেষ জাতীয় সম্পদ। এই মৎস্য দেশ বিদেশে নৌকা ও জাহাজে রপ্তানি হইয়া থাকে। দুবলা দ্বীপ হইতে চট্টগ্রামের জেলেরা লক্ষাধিক মণ শুটকী চট্টগ্রাম ও বার্মায় রপ্তানি করে। ভারতেও বহুল পরিমাণে মৎস্য রপ্তানি হইয়া থাকে। অধুনা বাজুয়া "কোল্ড স্টোরেজ" হইতে চিংড়ী মৎস্য আমেরিকায় রপ্তানি হইতেছে। ভারত ও আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে মৎস্য রপ্তানি বাবদ সরকারের যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় হইয়া থাকে। সরকার মৎস্য হইতে যথেষ্ট অর্থ কর হিসাবে আদায় করিয়া থাকে। দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নিকট হইতে এই কর আদায় রহিত করা উচিৎ।

সুন্দরবনের মৎস্যের মধ্যে পাঙাশ, ভেটকী, পারশে, ভান্দান, ছিলিন্দে এবং গলদা চিংড়ী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কইভোলা সবাপেক্ষা বৃহৎ মৎস্য। উহার একটির ওজন প্রায় ২০ মণ পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই ধরনের একটা মৎস্য কয়েক বৎসর পূর্বে গোড়াইখালীর নিকট শিবসা নদীতে বেড় জালে ধরা পড়িয়াছিল। উহার ওজন প্রায় ১৫ মণ। জেলেরা গ্রাম্য লোকের সাহায্যে এই মৎস্য তীরে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। চাকোলও নাম করা মৎস্য।

মুল্লে এক প্রকার বড মৎস্য। উহার লেজ পাঁচ ছয় ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং উহার দ্বারা শক্ত ও মজবুত ছড়ি প্রস্তুত হয়। লেজ দ্বারা অশ্বের চাবুকও প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

পাঙাশ মাছ খুব বড় হয় এবং উহা খাইতে সুস্বাদু। এই মাছ যত বড হইবে উহার স্বাদ ততই বৃদ্ধি পাইবে। গ্রামাঞ্চল ও শহরের লোকেরা ইহা খুব তৃপ্তির সহিত আহার করে। পাঙাশ মৎস্য ওজনে প্রায় একমণ হয়।

ভেট্‌কী বা ভেকট ছোট বড় সর্ব প্রকারের হয়। বড জাতীয় মৎস্যের মধ্যে ভেটকী খুব বিখ্যাত। ইহা ওজনে এক মণের অধিক হইয়া থাকে। ভেট্‌কী মাছ নদী ও খালে সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছোট ভেট্‌কীকে পাতাড়ীও বলা হয়।

গলদা চিংড়ী মানুষের অতি উপাদেয় খাদ্য। গ্রাম্য লোকেরা উহাকে গল্লা চিংড়ী বলে। এই মৎস্যের মাথায় একখানি করাত থাকে এবং উহার মস্তিষ্কে সুস্বাদু মগজ থাকে। এই মৎস্যে রক্ত নাই বলিলে চলে। পারশে ও ভান্দান মাছ সুস্বাদু। ভান্দান শোল মাছের ন্যায়। সেইজন্য লোকে উহাকে সুন্দরবনের শোল বলে। ছিলিন্দে মাছ খুব বড় হয় এবং উহা সুস্বাদু ও মূল্যবান। ছিলিন্দে আকারে পাঙাশের ন্যায় বৃহৎকায় হইয়া থাকে। চিল মৎস্য শুটকী করিলে অবিকল চিল পক্ষীর ন্যায় দেখায়। উহার সরু লেজ আছে। ঐ লেজ দুই হাত পর্যন্ত লম্বা হয়।

সুন্দরবনের মৎস্য ধরিবার জন্য নানা প্রকার জাল ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে খেপলা জাল, কোমর, পাটাজল, চারপাটা, ভাসানজাল, আটনজাল, বাছাড়ীজাল, খালপাটা ও বঁড়শি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গলদা ব্যতীত চিংড়ী মৎস্যের আরও প্রকার ভেদ আছে। গলদা অপেক্ষা ছোট চিংড়ীকে বাগ্‌দা বলে। ইহার মূল্য গলদা হইতে কম। এই শ্রেণীর চিংড়ী বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। বাগ্‌দা চিংড়ী সুন্দরবনের নিকটবর্তী অঞ্চলে অধিক পরিমাণে জন্মে। এতদ্ব্যতীত ছট্‌কা ও ঘুষোচিংড়ী নামক আরও দুই প্রকার চিংড়ী মৎস্য আছে। ঘুষোচিংড়ী ক্ষুদ্রকায় এবং অল্প দামে বিক্রয় হয়।

খরশুল্যা সুন্দরবনের আর এক প্রকার মাছ। উহা নদীতে মাথা উঁচু করিয়া চলাচল করে। ধনী লোকেরা এই মৎস্যের দ্বারা গ্রাম্য পুকুরের শোভা বর্ধন করে। এতদঞ্চলে এই মৎস্যকে খল্লা বা খরুল্লা বলা হইয়া থাকে।

সুন্দরবনের সুস্বাদু দুইটি মৎস্যের নাম যথাক্রমে রেখা ও চিত্রা। রেখা মাছ বহুলাংশে কই মৎস্যের ন্যায় এবং উহার গায়ে কালো কালো ডোরা আছে। চিত্রা মৎস্য গোলাকার। উহা কয়েকপ্রকারের হইয়া থাকে। সুন্দরবনের নদী-নালায় দাঁতনে, রুচো, রূপচাঁদা, গাগ্‌রা, সাহারা গাগরা, ছোট গাগরা, মেদ, মুল্লে, ভোলা, জাবা ও খয়রা প্রভৃতি সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কা'ন মাছ মাগুর মৎস্য অপেক্ষা অনেক বড় হয়। মাগুরের আকৃতি বলিয়া উহাকে কা'ন মাগুর বলা হয়। মুল্লে মৎস্য মুসলমানেরা খায় না। বদরের ছুরি ও কাক্‌ছেল অন্য দুই প্রকারের মৎস্য লোকালয়ে দৃষ্ট হয় না। সুন্দরবনের মৎস্যের অনেক প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। নানাজাতীয় ট্যাংরা, ফ্যাসা, গাং খয়রা ও চাপ্‌লীয়া মাছ সর্বত্র পাওয়া যায়। তপস্যা, সুরমা, করাত, লইট্যা প্রভৃতি বহুপ্রকার মৎস্য সুন্দরবনের নদীতে ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। অন্যান্য মৎস্যের মধ্যে চিরনদাঁতে, কাটাবোল, মরুল্ল বা চাক্র মাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু প্রকারের মাছ সুন্দরবনের নদী নালা ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন কোন মাছের লেজ ও পাখ্‌না আছে, উহারা বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারে। অন্য এক প্রকার মৎস্য কিছুদুর উড়িয়া যাইতে পারে।

কচ্ছপ ও কাঁক্‌ড়া মৎস্যশ্রেণীভূক্ত নহে। বহু হিন্দুর নিকট উহা প্রিয় খাদ্য। সুন্দরবনের পক্ষীকূল সর্বদা মৎস্য শিকার করিয়া ভক্ষণ করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ ও চাক্‌মা জাতির লোকের নিকট হান্দরের শুট্‌কী এক উপাদেয় খাদ্য। তাহারা লবণ ও কাঁচা লঙ্কার সাহায্যে হান্দরের শুট্‌কীর দ্বারা প্রচুর পরিমাণ ভাত খাইয়া থাকে। মগেরা হান্দর ধরিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে। হান্দরের কলিজা মূল্যবান খাদ্য। একটি বৃহৎকায় হান্দরের কলিজা দেড় ফুট দীর্ঘ ও অর্ধ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ৩ সের পর্যন্ত ওজন হইয়া থাকে।

মৎস্য ব্যবসায়ের আর্থিক গুরুত্ব অত্যধিক। দেশ-বিদেশে সুন্দরবনের মৎস্য বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মৎস্য ধরিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকটি কোল্ডষ্টোরেজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে, জাতীয় তহবিলে মৎস্য ব্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হইবার সম্ভাবনা আছে।

পক্ষী : সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র পক্ষী দৃষ্ট হয়। উহারা গাছে গাছে বাসা বাঁধিয়া বাস করে এবং ঋতুর পরিবর্তনে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। সুন্দরবনের বৃহৎ পক্ষীগুলির

মধ্যে 'গাড়াপোলা' ও 'মদনটাক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি পক্ষী আকারে খুব বড় হয়। মদ্‌না বা মদনটাক খুব উঁচু ও লম্বা। উহার ঠোঁট বকের ঠোঁটের ন্যায় এবং উহা প্রায় ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। এই দুইটি পক্ষী অনেকাংশে রাজহংসের ন্যায়। বাঁশকুরাল ও চিল শিকারী পাখী। উহা বিকট শব্দ করে এবং প্রচুর মৎস্য ধরিয়া খায়। নদীতীরে দার্শনিকের ন্যায় বসিয়া বক মৎস্য শিকার করে। কাকও সুন্দরবনের সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

লোকালয়ের ন্যায় সুন্দরবনে মাঝে মাঝে বন্য মোরগ-মুরগী দেখিতে পাওয়া যায়। ভোর রাত্রে আমরা সুন্দরবনের মধ্যে মোরগের ডাক শুনিয়াছি। এগুলি খুব দ্রুতগতিতে চলাফেরা করে। তবে লোকালয়ের মুরগীর ন্যায় উহার মাংস সুস্বাদু নহে। বড় কাগ্ খুব বৃহৎ পক্ষী। উহার বর্ণ নীল। একটি পক্ষীতে ৭ সের পর্যন্ত মাংস হয়। মাছরান্ধা ও মাছাল সর্বত্র দৃষ্ট হয়। উহারা মৎস্য শিকারে বিশেষ পটু। মাছরান্ধার মৎস্য শিকার অব্যর্থ।

শামখোল, মানিক, গয়াল, বাটাঙ, করমকুলী সুন্দরবনের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে দলবদ্ধ হইয়া আহার সংগ্রহ করে। আবার দলবদ্ধভাবে অন্যত্র উড়িয়া যায়। বাটাঙ ও করমকুলীর মাংস সুস্বাদু। সুন্দরবনের নদীতে বন্যহাঁস, বালিহাঁস, পানকৌড়ি, বিভিন্ন প্রকার হাঁসপাখী ও কা'ন পাখী দেখা যায়। ছোট পাখীদের মধ্যে গাঙ্‌শালিক, টিয়া, হড়েল (ঘুঘু), শ্বেতকাক, দোয়েল, কাস্তেচোরা, ফিঙে প্রভৃতি পক্ষী প্রায়ই দৃষ্ট হয়। দুধরাজ, রক্তরাজ এবং ভীমরাজ একই জাতীয় পক্ষী। ভীমরাজ জঙ্গলের সেরা পক্ষী। ইহারা শিক্ষা দিলে কথা বলিতে পারে। দুধরাজ শ্বেতবর্ণ ছোট পক্ষী। উহার লেজ খুব লম্বা এবং রক্তরাজও ঠিক ঐরূপ তবে উহার বর্ণ লাল। এতদ্ব্যতীত বিলবাচ্চু, হট্‌টিডি বা হাটটিমাটিম, রামশালিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুল্যা সুন্দরবনের আর একটি বড় পক্ষী।

পক্ষী মানবজাতির পক্ষে বিশেষ এক উপকারী জীব। লোকে আদর করিয়া পক্ষী পোষে এবং যত্নের সহিত পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করে। পূর্বে পক্ষীর পালক কলিকাতায় চালান হইয়া তথায় টুপি প্রস্তুত হইত। পক্ষীর ঘাড়ের উপর পয়ার জন্মে। উহা ইউরোপীয়দের টুপির একটি উত্তম ও আবশ্যকীয় বস্তু। ইউরোপে এই পয়ার মূল্যবান পদার্থ। তথাকার নরনারীদের নিকট পাখীর পয়ার ও পালক অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বে কলিকাতায় এই পয়ার ভরি হিসাবে বিক্রয় হইত। সুবদী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লোকে পালক ও পয়ার সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিত। বর্তমানে উক্ত ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুবদীর "পাখীর আলয়" এবং সোনামুখী বাওড়ের পক্ষীর "আড্ডা" অশ্রুতপূর্ব। এই সম্পর্কে গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

মৌমাছি ও মধু : সুন্দরবনের পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে মৌমাছি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু এই অত্যাবশ্যকীয় জীব কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে মধু আহরণ করে উহা আমরা তৃপ্তির সহিত পান করি। সুন্দরবনের মধ্যে মৌমাছিরা গুনগুন শব্দে ঘুরিয়া

বেড়ায়। জঙ্গলের যে সমস্ত বৃক্ষে ফুল হয়, সেখানে মৌমাছিরা গুঞ্জরণ করিয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে মধু সংগ্রহের জন্য উড়িয়া বেড়ায়। বড় বড় বৃক্ষের উপর অসংখ্য মৌমাছি একত্রিত হইয়া মৌচাক্ সৃষ্টি করে। বৃক্ষ শাখায় এই চাক্ ঝুলিয়া থাকে এবং উহা দেখিতে অতীব সুন্দর। সুন্দরবনের খল্‌সী ও গেউয়া ফুলে প্রচুর মধু থাকে এবং মৌমাছিদের আড্ডা সেখানেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গভীর জঙ্গলের মধ্যেই অধিকাংশ মৌচাক সৃষ্টি হয় এবং মধু সংগ্রহকারী মৌমাছির দল এই সমস্ত চাকে মধু সঞ্চয় করে। মৌমাছি অতীব কর্মপটু জীব। ইহারা সর্বদাই মধু সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। এই জীবের কর্মব্যস্ততা ও সঞ্চয়ী ধর্ম সর্বজনবিদিত। পবিত্র কোরানেও মৌমাছি সম্পর্কে একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ আছে।

গ্রাম বা শহর অঞ্চলে যে-সব মৌচাক হয় উহা অপেক্ষা সুন্দরবনের মৌচাক বৃহৎকায় হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি মৌচাক হইতে প্রচুর পরিমাণ সুমিষ্ট মধু পাওয়া যায়। বৎসরের সব সময়ে মৌচাকে মধু সঞ্চিত থাকে না। বসন্তের শেষে এবং গ্রীষ্মকালে মৌচাক হইতে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধু সুন্দরবনের এক বিশিষ্ট সম্পদ। ইহা জগৎবিখ্যাত উপাদেয় খাদ্য। মধুর সাহায্যে ঔষধ ও ঔষধের অনুপান প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকল ফুলে মধু হয়। তন্মধ্যে গবাণ ফুলের মধু সর্বশ্রেষ্ঠ। মধুর সঙ্গে প্রতি মণে আড়াই সের নোনাপানি মিশ্রিত না করিলে মধু নষ্ট হইয়া যায়। মিষ্টপানি মিশ্রিত করিলে সঙ্গে সঙ্গে মধু নষ্ট হইয়া যাইবে। মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে রাখিলে মধু টাটকা থাকে। এইরূপ পাত্রে বেগুনের বোঁটা দ্বারা সরিষার তেল মালিশ করিয়া মধু রাখিলে মিছরীর দানার ন্যায় শক্ত হইবে। উহা সুমিষ্ট খাদ্য। মধু মানুষের অশেষ উপকার সাধন করে। সুন্দরবনের মধু ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে এতদঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশ-বিদেশে মধুর চাহিদা অত্যধিক এবং ইহার দ্বারা জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

মালঞ্চ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও এমন অগম্য ও গভীর জঙ্গল আছে যেখানে আজ পর্যন্ত মধু সংগ্রহের কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। তালপাটী, জলঘাটা, আশাশুনী, পাবলাতলা, মাদারবাড়ী, কাল্‌কেবাড়ী প্রভৃতি গহীন অরণ্যে সহসা প্রবেশ করিতে শিকারী বা মৌয়ালরা সাহস পায় না।

অন্যান্য সম্পদ : সুন্দরবনের যত্রতত্র বিভিন্ন প্রকার ঝিনুক আছে। সমুদ্রে বিরাটকায় শঙ্খ ও সামুদ্রিক ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঝিনুক নানা প্রকারের। শঙ্খ ও ঝিনুকের দ্বারা অনেক আবশ্যকীয় জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড় শামুককে সুন্দরবনের লোকেরা গুবদী গুবদী নাম দিয়াছে। সমুদ্র তীরে এক প্রকার অভিনব পদার্থ পাওয়া যায়। উহাকে লোকে 'জোংড়া' বলিয়া থাকে, উহা গাজরের আকৃতিবিশিষ্ট। জন্তু ও জোংড়ার ন্যায় কস্তুরীরও প্রাণ আছে।

একটি কস্তুরীর ওজন দুইতিন সের পর্যন্ত হয়। উহার দ্বারা চুন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কস্তুরী সরিষার তৈলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া মালিশ করিলে বুকের বেদনা প্রশমিত হয়। ঝিনুকের চুন খুব মূল্যবান। সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত একপ্রকার শক্ত ফেনা থাকে। তরঙ্গাঘাতের সঙ্গে তীরে পড়িয়া শক্ত পদার্থে পরিণত হয়। ইহা সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। লোকে উহা সংগ্রহ করিয়া গৃহে রাখে এবং অসুখে কাজে লাগায়। শঙ্খ ও ঝিনুকের ন্যায় জোংড়ায়ও সুন্দর চুন প্রস্তুত হইয়া থাকে। একশ্রেণীর লোক এই ব্যবসায়ের দ্বারা জীবন ধারণ করে।

সুন্দরবনের আয়তন একটি ক্ষুদ্রকায় রাজ্যের সমান। এখনও এই জনমানবশূন্য গহীন অরণ্যে বহু অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারের আশা আছে। পাখীর পয়ার, নানা প্রকার বৃক্ষের বাকল, ফল, শিকড়, পাতা, চুন প্রস্তুতের উপকরণ, জীবজন্তুর হাড়, শিঙ, চর্বি, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য হইতে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ লাভ করিতে হইলে সুন্দরবনাঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গবেষণা ও প্রচেষ্টা চালাইলে বহু গুপ্তধন মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

জীবজন্তু সংরক্ষণ : বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুই সুন্দরবনের অফুরন্ত জাতীয় সম্পদ। দিন দিন যেভাবে এই সম্পদের অপচয় হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবন ধ্বংসের পূর্বাভাষ পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতে শুরু করিয়াছেন।

'বিশ্ব বন্যজন্তু তহবিল' (World wild life fund) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একদল বিশেষজ্ঞ গাই মাউন্টফোর্টের নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। বন্যজন্তু রক্ষার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মাউন্টফোর্ট এই বনে চারিশত প্রকার পক্ষী দর্শন করিয়াছেন। তিনি বা তাঁহার দলের কোন সদস্য ব্যাঘ্র দেখিতে পান নাই, তবে কয়েক স্থানে উহার সন্ধান পাইয়াছেন মাত্র। এক মন্তব্যে তিনি জানান যে, বনের সর্বত্র তল্লাশী চালাইয়া উহার সম্পদ নির্ণয় করিতে হইবে। এখনও বুনো জানোয়ার ও পক্ষীকুলের বহু বিষয় জানিতে বাকী আছে। ভ্রমণকারীদের স্বর্গ হিসাবে সুন্দরবনের প্রয়োজনিয়তার বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া মিঃ মাউন্টফোর্ট বলেন যে, সুন্দরবন বিশ্বব্যাপী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

গাই মাউন্টফোর্টের বিবরণে জানা যায় যে, তাঁহার দলীয় বিশেষজ্ঞরা সুন্দরবনের পূর্ব হইতে পশ্চিম দিক পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সফর করিয়াছেন। তাঁহারা মাদারবাড়িয়া, টাইগার পয়েন্ট, কটকা, চাঁদপাই রেঞ্জ ও অন্যান্য বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণশেষে এই দল সিলেটের জঙ্গল দর্শনের উদ্দেশ্যে খুলনা ত্যাগ করেন।

সাপ্তাহিক 'দি ওয়েভ' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ সম্পর্কে বলা হয় যে, সুন্দরবন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। এখনও এ সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য

লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া আছে। এতদিন পর্যন্ত বহির্বিশ্বে শুধু সুন্দরবনের ফ্লোরা ও ফনা সম্পর্কে প্রচার করা হইয়াছে। বিশ্বের বন্যজন্তু সম্পর্কীয় গবেষণামূলক পুস্তকে সুন্দরবনের জীবজন্তুর উল্লেখ নাই। উক্ত দলের বিশেষজ্ঞগণ সুন্দরবনকে অত্যাশ্চর্য জঙ্গল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরও বলা হয় যে, সুন্দরবনের রোমাঞ্চকর পরিবেশের তথ্য বিশ্বভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রায় বিশেষ লাভবান হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। সাত সমুদ্র তের নদী পারের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ না দিলে এখানে কিছুই করা যায় না। এইভাবে অনেক সময় আমাদের জাতীয় গৌবব পর্দার আড়ালে আবৃত থাকে।

উক্ত নিবন্ধে আরও বলা হয় যে, উন্নত দেশসমূহের পণ্ডিতবর্গ আন্তর্জাতিক বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন. পক্ষান্তরে আমরা আমাদের গৃহকোণের সংবাদ রাখি না।

উপরোক্ত দলের পাঁচজন বিশেষজ্ঞই সুন্দরবন সম্পদ, বিশেষ করিয়া জীবজন্তু সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা গহীন অরণ্যে ব্যাঘ্রের সংখ্যা নির্ণয় করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন।

উক্ত ভ্রাম্যমাণ বিশেষজ্ঞ দলের নেতা মাউন্টফোর্ট একজন পক্ষীতত্ত্ববিদ, লেখক এবং বেতার প্রচারক। তিনি স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেন যে, বাংলাদেশ অফুরন্ত সম্পদশালী দেশ। এখানকার জঙ্গলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবজন্তু রক্ষা করিলে মহামূল্যবান সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারে। বিশ্ব প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাদের এই আগমন বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রদান। বন্যজন্তু সংরক্ষণই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। সরকারপক্ষ হইতে জঙ্গল ও জঙ্গলস্থ জীবজন্তু রক্ষার জন্য একটি কমিশনের নিযুক্তি বিবেচনাধীন আছে। এই কমিশনের অনুমোদন সরকার বিবেচনা করিবেন। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে আফ্রিকার যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ এদেশে কার্য পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে এদেশে প্রেরণ করা হইবে।

মাউন্টফোর্ট আরও বলেন যে, জীবজন্তু রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক রম্য স্থানে গাছপালা ও জঙ্গল সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই প্রধান ও প্রাথমিক কার্য। এদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও বিশৃঙ্খলভাবে বন্যজন্তু শিকার সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন্যজন্তু রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বন্যজন্তু শিকার বাঙালীর বিশেষ প্রিয় বিষয়, কিন্তু বর্তমানে তাঁহারাই বন্যজন্তুর অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। বন্যজন্তু শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা কি শিকার করিবেন?

মাউন্টফোর্ট এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বন্যজন্তু রক্ষা বিষয়ে শিক্ষাদানের পরামর্শ দেন। এই দল গত বৎসর চট্টগ্রামের বনস্থলীতে জরিপ কার্য পরিচালনা করেন।

সম্পাদকীয় নিবন্ধে আরও বলা হয় যে, বৃক্ষছেদন যেরূপ ব্যাপক ও এলোপাথাড়িভাবে চলিতেছে এবং বাছ-বিচার না করিয়া যেভাবে বন্যজন্তু শিকার করা হইতেছে তাহা বিশেষ

উদ্বেগজনক। যদি জীবজন্তু সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তবে সুন্দরবন হইতে এই মূল্যবান সম্পদ অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞেরা দীর্ঘ আট দিনের মধ্যে একটিও রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্রের দর্শন পান নাই, ইহা অমঙ্গলসূচক সংবাদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে-কোন উপায়ে হউক বনবিভাগ কর্তৃক হরিণ শিকার যথাসম্ভব একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলে সুন্দরবন আবার বন্যজন্তুর আস্তাবলে পরিণত হইবে।

সম্প্রতি 'দেশের ডাক' পত্রিকায় রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্রের ছবিসহ এক আকর্ষণীয় সংবাদে বলা হয় ; পৃথিবীর ব্যাঘ্রকুলের সংখ্যা দিন দিন কমে চলছে। এই সঙ্গে পূর্ব বাংলার সুন্দরবনের বিশ্ববিখ্যাত রয়াল বেঙ্গল টাইগার আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে ; এদের বংশধরেরাও নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

"পাক-ভারত উপমহাদেশে পঞ্চাশ বছর পূর্বেও চল্লিশ হাজার বন্যবাঘের সংখ্যা ছিল। আর আজ দাঁড়িয়েছে মাত্র আটাশ শতে। কিন্তু সুন্দরবনে কত বাঘের সংখ্যা, তা বলা সত্যই দুরূহ।"

এই সমস্ত বিষয় গভর্ণর সম্মেলনে আলোচিত হয়। বন্যজন্তু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার বন্যজন্তুর চামড়া রপ্তানি পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে চীনকারাজাতীয় দুর্বল প্রাণী শিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রাণীগুলি এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। হোয়াইট হিডার ডাক্‌ ও মার্বেল টিলকেও বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হইয়াছে। বিশ্ব বন্যজন্তু তহবিল সম্প্রতি যে-সব প্রস্তাব অনুমোদন করিযাছে সম্মেলনে তাহাও বিবেচিত হয়।

"কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাছ-বিচারহীনভাবে সুন্দরবনে বন্যজন্তু হত্যার ফলে কয়েক ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ হয়ে যেতে বসেছে। একারণেই উপরোক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়।"

সুন্দরবন বিভাগের প্রধান আলীম সাহেবের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন সময়ে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তিনি জানান যে, প্রত্যেক দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য শতকরা ২৫ ভাগ স্থানে জঙ্গলের অবস্থিতি আবশ্যক, কিন্তু এ দেশে মাত্র ১৬ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান আছে। আলীমসাহেবও বনের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। জীবজন্তু শিকার এবং জঙ্গলের বৃক্ষাদি ছেদনে সুন্দরবন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, সে জন্য তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। বনস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতির কথাও তিনি স্বীকার করেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলেন, যদি অবস্থার আরও অধঃপতন ঘটে তবে অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সম্পর্কে আমরাও বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। সামগ্রিকভাবে সরকারকে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতায় সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অত্র গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছি। বনজ সম্পদ রক্ষার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সরকারের সেজন্য সরকারকেই সর্বপ্রথম আগাইয়া আসিতে হইবে।

সুন্দরবনের যে-কোন পরিদর্শক এই বিশালকায় বনভূমি সম্পর্কে প্রথম দর্শনে উচ্চ ধারণা পোষণ করিবেন সন্দেহ নাই। মনে হইবে এহেন জঙ্গলময় স্থানের ধ্বংস সম্ভব নহে। সুন্দরবন দর্শনে কোন কোন ভ্রমণকারী এই লেখককে বলিয়াছেন, "আজীবন একই স্থানে একই প্রকার বৃক্ষরাজি একই অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি। কোন দিন যেন এই বৃক্ষরাজির শেষ নাই। ইহা যেন চিরদিন মাথা উঁচু করিয়া দন্ডায়মান আছে।"

অন্যমতাবলম্বীরা বলেন, বিশ্বের সম্পদ ক্ষয় হয় না। এক যায় আর এক আসে মাত্র। কিন্তু এই মতবাদ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জেলার প্রায় সর্বত্র পুরাকালে সুন্দরবন ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা বহু প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি।

যুগ যুগ ধরিয়া জঙ্গল আবাদ করিয়া মানুষ বসতি স্থাপন করিয়াছে। এখনই জঙ্গলের শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিলে ধান্যের আবাদ ও বসবাসের জন্য মানুষ জঙ্গল কাটিয়া ছারখার করিয়া দিবে; সেজন্য সর্বপ্রথমেই জঙ্গল সংরক্ষণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

সুন্দরবন মন্ত্রতন্ত্রময় এক অভিনব দেশ। জীবজন্তু শিকার নিষেধ সত্ত্বেও অনেকেই আইন অমান্য করিয়া যত্রতত্র শিকার করিয়া থাকে। সেজন্য সরকারকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্বে কটকা, দুবলা প্রভৃতি অঞ্চলে একই ঝাঁকে সহস্রাধিক হরিণ দেখা যাইত। সে মনোরম দৃশ্য এখন আর নাই। এক ঝাঁকে এখন শতাধিক হরিণ দর্শনও অসম্ভব।

ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। গ্রামের জঙ্গলে যে সমস্ত ব্যাঘ্র বাস করিত তাহা বহু পূর্বে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। জঙ্গল ও জীবজন্তু সংরক্ষিত না হইলে উহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। জঙ্গলের সঙ্গে উহার জীবজন্তু সংরক্ষণের বিষয় ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। এখন এমনই এক উদ্বেগজনক পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে যে, জঙ্গল ও জীবজন্তুর সংরক্ষণ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবজন্তুর মধ্যে শুধু ব্যাঘ্র ও হরিণ নহে, কুম্ভীর, হাঙ্গর, সর্প, গুইসাপ, বানর, বন্য বরাহ প্রভৃতি জন্তুরও সংরক্ষণের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। কুমীরের বংশও ধ্বংস প্রায়।

সুন্দরবনের পক্ষীকুল সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। শুবদী অঞ্চলের পাখীর আলয় ও সোনামুখী বাওড়ের পাখীর আড্ডা অশ্রুতপূর্ব, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শুবদীর জঙ্গলে যে লক্ষ লক্ষ পক্ষী দৃষ্ট হইত উহা এখন আর নাই। সেখানে পক্ষীকুল রক্ষা করিলে পক্ষীজাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সংযোজন হইত। বৃক্ষ ছেদনের ফলে সেখানকার বিচিত্র বর্ণের পক্ষীকুল সুন্দরবন ত্যাগ করিয়াছে।

কিভাবে মূল্যবান জীবজন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় উহার কতিপয় জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। শেরশাহের সময় সুন্দরবনের উত্তর-পূর্বদিকে খলিফাতাবাদের জঙ্গলে বুনোহস্তী পাওয়া যাইত। আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে বন্য হাতীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ঐ সমস্ত বুনো হাতী ইংরেজ আমলের পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। খুলনার পূর্বপারে এখনও হাতী দাড়ার রাস্তা নামে একটি প্রাচীন গ্রাম্যপথ আছে। পিলজঙ্গ (ফিল = হাতী) নামক স্থানে হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধ হইয়াছিল বুঝায়।

সুন্দরবনে পূর্বে অসংখ্য চিতাবাঘ বাস করিত। চিতাবাঘ ব্যতীত বনবিড়ালও পাওয়া যাইত। গুলবাঘ নামক আর এক প্রকার ব্যাঘ্রের নামও শ্রুত হয়। লোকালয়ের নিকটস্থ জঙ্গলে চিতাবাঘের সংখ্যাধিক্য ছিল। চিতাবাঘ গ্রামে ঢুকিয়া মধ্যে মধ্যে গরু-ছাগল আক্রমণ করিত। এখন এই সমস্ত জন্তুর কোন নাম-গন্ধ সুন্দরবনে নাই।

ইতিপূর্বে সুন্দরবনের গণ্ডারের কথা বলিয়াছি। সমগ্র সুন্দরবনে অসংখ্য গণ্ডার বাস করিত। সুন্দরবন শুধু ব্যাঘ্র ও হরিণের আস্তাবল নহে, ইহা হিংস্র গণ্ডার ও বন্য মহিষের আবাসভূমি ছিল। রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনীতে জানা যায় যে, তিনি যৌবনকালে জঙ্গলস্থ গণ্ডার শিকারে দক্ষ ছিলেন। তখনকার দিনে স্থানীয় শিকারীরা দেশী বন্দুকের সাহায্যে গণ্ডার ও অন্যান্য জন্তু শিকার করিত।

এদেশের হিন্দু মুসলিম অধিবাসী গণ্ডারের মাংস ভক্ষণ করিত। সেই জন্য গণ্ডার শিকারের নেশা তীব্রভাবে দেখা দিয়াছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে সুন্দরবনে বিপুল সংখ্যক গণ্ডার বাস করিত। ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারী এবং স্থানীয় দক্ষ শিকারীদের হাতে পড়িয়া গণ্ডারের বংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অধুনা যেরূপ ব্যাপকভাবে শিকার চলিতেছে তাহাতে ব্যাঘ্র ও হরিণকুলকে গণ্ডারের পশ্চাদনুসরণ করিতে হইবে এ বিষয়ে আমি একেবারেই নিঃসন্দেহ।

সম্প্রতিকালে জঙ্গলের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে দীঘি খননের সময় একাধিক গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে উহা এখনও রক্ষিত আছে। প্রাকৃতিক বিপ্লবেও কিছু সংখ্যক গণ্ডার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৬১ ও ১৯৭০ সালের ঝড় ও প্লাবনে বহুসংখ্যক হরিণ, কতিপয় ব্যাঘ্র ও অসংখ্য বৃক্ষলতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

গভীর অরণ্যে এখন একটিও গণ্ডার নাই। আচার্য স্যার পি. সি. রায়ের ভ্রাতা রায়সাহেব নলিনী ভূষণ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবনে শেষ গণ্ডার দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

মহিষ প্রকৃতপক্ষে বুনো জানোয়ার। মানুষের হাতে পড়িয়া ইহা পোষ মানিয়াছে। এককালে সুন্দরবনে অসংখ্য বুনো মহিষ পাওয়া যাইত। বাকেরগঞ্জের জঙ্গলে বুনো মহিষের প্রাচুর্যের কথা শ্রুত হইত। এখনও কোন কোন অঞ্চলে বুনো মহিষ আছে বলিয়া শ্রুত হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা বুনো মহিষ শিকারে দক্ষ ছিল। তাহারা শিকার করিয়া বন্য মহিষের মাংস ভক্ষণ করিত। শিকারীরা দলবদ্ধভাবে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন উপায়ে মহিষ শিকার করিত। তাহারা মহিষের চামড়া বিক্রয় করিয়া লাভবান হইত। অর্থের অভাবে মানুষ এইভাবে বন হইতে বনান্তরে মহিষ শিকার করিয়া বেড়াইত।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর নওয়াব সলিমুল্লাহ লর্ড কার্জনকে বরিশাল পরিদর্শনে আনয়ন করেন। সুন্দরবনে তখন অসংখ্য মহিষ বাস করিত। তথা হইতে কৌশলে মহিষ

ধরিয়া বড়লাটের শিকারের জন্য বরিশালের অদূরে চর চন্দ্রমোহন গ্রামের জঙ্গলে বাঁধিয়া রাখা হয়। লর্ড কার্জন এইভাবে কয়েকটি বাঁধা মহিষ শিকার করেন, উহার মধ্যে দুইটি প্রকাণ্ড মহিষের শিং মস্তকসহ বরিশাল শহরস্থ খানবাহাদুর হাসেম আলী খাঁর বাড়ীতে রক্ষিত আছে। শিং-এর দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন ফুট।

বুনো মহিষকে এদেশের সাধারণ লোকে বয়ার বলিত। আর গণ্ডারকে গাঁড়া বলা হইত। এতদঞ্চলের বয়ারগাতী, বয়ারভান্ধা, বয়ারশিঙে প্রভৃতি গ্রামের নাম বুনো মহিষের অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। এখানকার হরিণ ও ব্যাঘ্র শিকারের ন্যায় বয়ার শিকারের কাহিনী পূর্বে শ্রুত হইত। সুন্দরবনে অসংখ্য বয়ার ছিল। বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই উহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। বাগেরহাট ও বাকেরগঞ্জের জঙ্গলে বুনো মহিষ এবং সাতক্ষীরার জঙ্গলে গণ্ডারের আধিক্য ছিল।

বাঘে-মহিষে যুদ্ধের কথাও শ্রুত হয়। বন্য মহিষও হিংস্র জানোয়ার। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সুন্দরবনখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারী পচাব্দী গাজী স্বচক্ষে কয়েকটি বুনো মহিষ দেখিয়াছিল। ওয়াজেদ আলী নামক আশি বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধও চল্লিশ বৎসর পূর্বে জঙ্গলে গণ্ডার দেখিয়াছেন। লেখকের নিকট উভয়ে এই তথ্য প্রকাশ করে। ইহার পর সুন্দরবনে বুনো মহিষের নাম-গন্ধ পাওয়া যায় নাই।

একে একে হস্তী, গণ্ডার ও বুনো মহিষ শেষ হইয়াছে। এখন ব্যাঘ্র, হরিণ ও বানরের পালা। এই সমস্ত জন্তু শেষ হইলে সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। জঙ্গল ও জীবজন্তুর সম্পর্ক নিবিড়। শুধুমাত্র ব্যাঘ্র ও সর্পকুল শেষ হইলে সুন্দরবনের মূল্যবান সম্পদ চোর দস্যুরা আত্মসাৎ করিবে। ব্যাঘ্রকুল শুধু ভক্ষক নহে, সুন্দরবনের রক্ষকও বটে। ইহা সুন্দরবনের অতন্দ্র প্রহরী।

কিভাবে সুন্দরবনের জীবজন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করিয়াছি। কি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, কি সরকারী কর্মচারী বা জনসাধারণ, সম্মিলিতভাবে সকলেই এজন্য দায়ী। কোন হোমরাচোমরা ব্যক্তি সুন্দরবনে প্রবেশ করিলে ডজনখানেক হরিণ শিকার না করিয়া নিরস্ত হন না। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অবাধে হরিণ শিকার করিয়া আনন্দোৎসব করেন। পুলিশ ও বনবিভাগীয় কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন না করিয়া তাহারাই অধিক সংখ্যক হরিণ শিকার করে। আবার এমনও একাধিক পদস্থ অফিসার দেখিয়াছি যাঁহারা জীবনে হরিণ শিকার করেন নাই। এইরূপ গুণবান মহৎ ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য।

জনসাধারণ মনে করে সুন্দরবন ভ্রমণ অর্থে হরিণ শিকার ও উহার মাংস ভক্ষণ। আমরা অনেকের সংবাদ রাখি যাঁহারা বনভ্রমণে গিয়া মধ্যে মধ্যে অসংখ্য হরিণ শিকার করিয়া এই মূল্যবান জাতীয় সম্পদের সর্বনাশ সাধন করেন। কথিত আছে যে, রাজা কোন বৃক্ষের একটি ফল গ্রহণ করিলে অনুচরেরা উহার শিকড়শুদ্ধ তুলিয়া আনিবে।

বড়কর্তা একটি হরিণ শিকার করিলে পরিষদেরা কতকগুলি ধরিয়া আনিবে। ইহাই সমাজের মারাত্মক ব্যাধি। এবম্প্রকার সমাজবিরোধী কার্য সুন্দরবনে অহরহ ঘটিতেছে।

সরকারকে এদিক দিয়া সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। জনসাধারণেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট কর্তব্য আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, কিছুকাল পূর্বে কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বে-আইনীভাবে হরিণ শিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হরিণ শিকারে নিরস্ত হইলে নিম্ন পর্যায়ের লোকেরা হরিণকুল ধ্বংস করিতে সাহস করিবে না।

বনাঞ্চলে চোরা শিকারীদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহারা গ্রামাঞ্চলে হরিণের মাংস পর্যন্ত বিক্রয় করে। বেপাশী বন্দুক দ্বারা দুর্বৃত্তেরা হরিণ শিকার করে এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ বে-আইনীভাবে আহরণ করে। ইহারাই রাষ্ট্রের প্রকৃত দুশমন। আইন লঙ্ঘনকারী ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। অন্যথা সুন্দরবন 'মগের মুলুকে' পরিণত হইয়া অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সাত

রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্র, নরখাদক ও শিকারী কাহিনী

সুন্দরবনের জীবজন্তু অধ্যায়ে ব্যাঘ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ইউরোপীয় পর্যটকেরা এই জন্তুকে রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই হিংস্র জন্তুর প্রভাব বনবিভাগের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সুন্দরবনে চিতাবাঘের বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন শুধুমাত্র রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্রই সর্বত্র বিরাজমান। ব্যাঘ্রের সংখ্যা সুন্দরবনে অত্যধিক ছিল। বর্তমানে উহা বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাঘ্র জাতির মধ্যে এক শ্রেণী আবার মানুষখেঁকো বা নরখাদক। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি ভয়ঙ্কর। ইহারা মানব জাতির নিকট এক ভয়াবহ জীব বিশেষ। এই বনে সিংহ নাই, তজ্জন্য উহার গর্জনও শুনা যায় না। পশুর রাজা সিংহকেই বলা হয়, কিন্তু সুন্দরবনে ব্যাঘ্রই পশুরাজ।

যশোরের ইতিবৃত্তের লেখক জেম্স ওয়েষ্টল্যান্ড লিখিয়াছেন ঃ একটি হিংস্র ব্যাঘ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুন্দরবনের একাংশে নির্ভয়ে বিচরণ করিত। ভ্রমণকারী ও শিকারীরা ব্যাঘ্রটির বিষয় ভালভাবে জানিতেন। কিন্তু কেহই ইহাকে শিকার করিতে পারে নাই। আমার সুন্দরবন ভ্রমণে আগ্রহ ছিল অত্যধিক। একদিন আমি একখানি অন্য ইংরেজের নৌকায় সুন্দরবনে ভ্রমণ করি। নদীতীরে অবতরণ করিয়া দাড়ি মাঝিদের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিতে থাকি। আমার সহকর্মী ইংরেজ উক্ত ব্যাঘ্রের দিকে গুলি করে, কিন্তু গুলি উহার গাত্রে না লাগিয়া শিকারীকে গুরুতর আঘাত করিয়া ব্যাঘ্রটি পলায়ন করে। আর একজন শিকারী জঙ্গল মধ্যে একদিন উক্ত ব্যাঘ্রটির সহিত কয়েক গজ দূরত্বের মধ্যে সাক্ষাৎ করে। এই ধরনের ভয়সঙ্কুল সাক্ষাৎ তাহার প্রায়ই হইত। সে ব্যাঘ্রটিকে গুলি করা মাত্র তীর বেগে উক্ত স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত মোরেলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মোরেল সাহেব এই ব্যাঘ্রটিকে হত্যা করেন। উক্ত ব্যাঘ্র শিকারের এক অদ্ভুত কাহিনী জানা যায়। মোরেল সাহেব বিরাট এক লৌহ-নির্মিত খাঁচা প্রস্তুত করিয়া জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে ঐ খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া সুযোগমত উপরোক্ত ব্যাঘ্রের প্রতি গুলি ছুড়িয়া মারেন. উহাতে ব্যাঘ্র গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শিকারীর প্রতি ভীষণ ক্রোধ—প্রতিশোধ লইবার জন্য সে লম্ফ দিয়া শিকারীকে লৌহ-নির্মিত খাঁচার উপর আক্রমণ করে। কয়েকবার চেষ্টার পর ব্যাঘ্রটি লোহার আঘাতে ক্রমাগত দুর্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ব্যাঘ্রে অনেক সময় নদীর মধ্যে নৌকায় লম্ফ দিয়া শিকার করিয়া থাকে এবং উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাঠুরিয়াগণ ওঝাদের ঝাঁড়ফুক এবং তাবিজ কবজ ধারণ করিয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করে। অশিক্ষিত লোকেরা বাউলী বা ওঝা সঙ্গে লইয়া মন্ত্রের দ্বারা

বাঘের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তাহারা বনবিবি ও গাজীর দোহাই দেয় এবং জঙ্গল হইতে সিন্নি মানত আদায় করে। সামাজিক অশিক্ষা ও কুশিক্ষার জন্য এই ধরনের কুসংস্কার একশ্রেণীর লোকের মধ্যে চিরকাল বিদ্যমান থাকিয়া বংশানুক্রমে উহার বিষময় ফল ফলিতেছে। এই ধরনের কুসংস্কার আজিও জঙ্গলে বিদ্যমান। ব্যাঘ্রকুল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাল্পনিক বনদেবতার সাহায্য কেহ কেহ আশা করিয়া থাকে। পূর্বে যদি কোন স্থান হইতে ব্যাঘ্রে মানুষ ধরিয়া লইয়া যাইত তখন ওঝার কেরামতি বাহির হইয়া পড়িত এবং ব্যাঘ্র আক্রমণের নির্দিষ্ট স্থানে কাঠুরিয়াগণ লাল ঝান্ডা উত্তোলন করিয়া জঙ্গলাগত ব্যক্তিদের হুশিয়ার করিয়া দিত। বর্তমানেও ঐ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অনেক সময় ব্যাঘ্রে আক্রান্ত ব্যক্তির পোষাক-পরিচ্ছদও বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া আগন্তুকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালে জানুয়ারীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ৫৫ জন কাঠুরিয়াকে মানুষখেঁকো ব্যাঘ্রের কাছে প্রাণ দিতে হইয়াছে। কেউ ভয়ে জঙ্গলের দিকে যায় না। নিহত ব্যক্তিদের সঙ্গীরা দুইটি ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রকে তাড়া করিয়া দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করিয়া স্ব স্ব বাড়ীতে আনিয়া সমাধিস্থ করিয়াছে।

সুন্দরবনের কোন কোন এলাকায় ব্যাঘ্রের উপদ্রব ভীষণভাবে দেখা দেয়। ১৯৬০ সালে মালঞ্চ নদীর পার্শ্বে পুষ্পকাটী ও মাদারবাড়ীয়ার জঙ্গলে ছয়জন বাওয়ালীকে হিংস্র ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া উদরস্থ করে। অকস্মাৎ এই অঞ্চলে ব্যাঘ্রের অত্যাচারে মানুষ ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বনবিভাগ হইতে তখন একজন স্থানীয় শিকারীকে ব্যাঘ্র নিধনের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই শিকারী "কল্‌পাতা" পদ্ধতিতে কয়েকটি ব্যাঘ্র শিকার করে। ঐ বৎসর নীলকমল অঞ্চলে ছাপড়াখালীর জঙ্গলে কয়েকদিনের মধ্যে ২৬ জনকে ব্যাঘ্র ভক্ষণ করে। উহারা অধিকাংশই গোড়ইখালী অঞ্চলের লোক। ইহাতে ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং জঙ্গলাভ্যন্তরে হাহাকার পড়িয়া যায়।

ঝাপার জঙ্গলে ৫ জন লোককে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। সেনাবিভাগের জনৈক অফিসার এবং বনবিভাগের কর্মচারীরা তথায় যাইয়া কয়েকটি অর্ধভুক্ত লাশ উদ্ধার করিয়া ক্যামেরার সাহায্যে উহাদের ছবি তুলিয়া রাখেন। নীলকমল অঞ্চলে চাঁদামারীর খালের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ১৯৬১ সালে মানুষখেঁকো বাঘের ভীষণ উপদ্রব হয়। পক্ষকালের মধ্যে ৬ জন নিরীহ কাঠুরিয়া এই মানুষখেঁকোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। দুইজনকে ব্যাঘ্রে মুখে করিয়া জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়। ৩ জনকে গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় সঙ্গীরা উদ্ধার করিয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করে। আর একজনের অর্ধভুক্ত লাশ পাওয়া যায়। ঐ লাশ জঙ্গলের মধ্যে নীলকমল বেতার যন্ত্রের পার্শ্বে সঙ্গীরা সমাধিস্থ করে। আড়ো শিবসার তীরে ভুতুমমারীর চরে ব্যাঘ্রে আক্রান্ত অনেকগুলি লাশ সমাধিস্থ করা হইয়াছে। এই সমস্ত সমাধি দর্শনে ভ্রমণকারীদের অন্তর শিহরিয়া উঠে। ঝাপা ও আমবাড়িয়ায় অনুরূপ বহু কবর আছে।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রকুলের যাতায়াতের নিজস্ব পথ আছে। বাঘ যে পথে যাইবে সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিবে। শিকারের উদ্দেশ্যে ইহারা বন হইতে বনান্তরে এইরূপে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুন্দরবনের মালঞ্চ অঞ্চলে এককালে যেখানে গণ্ডারের আধিক্য ছিল, বর্তমানে সেখানে ব্যাঘ্রের আনাগোনা অত্যধিক। সুন্দরবনের মাঝামাঝি এলাকায় পাঠাকাটা, হাজারীর চর, বিদ্যের চর, শেখের ট্যাক এবং গ্যাণ্ডারখালিতে ব্যাঘ্রের সংখ্যা অধিক। এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন অহরহ পরিলক্ষিত হয়। দুবলা দ্বীপের অদূরে ছাপড়াখালী, ঝাপা, ঝট্‌কা, হিরণ পয়েণ্ট ও আমবাড়িয়ার জঙ্গলে বহুসংখ্যক ব্যাঘ্র বাস করে।

শিকার একপ্রকার নেশা। হিংস্র ব্যাঘ্র শিকার আরও ভয়ঙ্কর নেশা। এই নেশা যাহার মস্তকে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। শিকারীরা ব্যাঘ্র শিকারের জন্য মদমত্ত হইয়া পড়ে। এই দুর্দমনীয় নেশার জন্য কেহ কেহ অতীব সংগোপনে শিকার করিয়া থাকে। শিকারীদের পক্ষে হরিণ শিকার অতীব সহজ। কিন্তু ঝানু ব্যাঘ্র শিকারীরা হরিণ নিকটে পাইলেও শিকার করে না। ইহা অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিকারীর ধর্ম। সম্প্রতি ঢাকা হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি সুন্দরবনে ব্যাঘ্র শিকার করিতে এক সপ্তাহব্যাপী তথায় অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তিনি বা তাঁহার সঙ্গী সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও একটি হরিণ শিকার করেন নাই। দেশে এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব।

সুন্দরবনের সর্বত্র ব্যাঘ্রের আতঙ্ক অত্যধিক এবং চিরদিন ধরিয়া এই আতঙ্ক বিদ্যমান আছে। সমস্ত ব্যাঘ্রে যখন তখন মানুষ আক্রমণ করে না। কিন্তু যে ব্যাঘ্র একবার নররক্ত পান করিয়াছে, সে মানুষ দেখিলে আক্রমণের নেশায় মদমত্ত হইয়া উঠে। সাধারণ ব্যাঘ্র ও মানুষখেঁকোর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষখেঁকো বা নরখাদকেরা ভয়ংকর হিংস্র স্বভাবের এবং ভীমমূর্তিধারী। ইহারা অতীব ধূর্ত, চালচলন ও হাবভাব দর্শনে ঝানু শিকারী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে। শিকারের সময় নরখাদকের রক্তচক্ষুদ্বয় কি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে! উহাদের আক্রমণ যেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন্ স্থলে কি ভাবে আক্রমণ চালাইতে হইবে এবং কখন পশ্চাদপসারণ করিতে হইবে সে চিন্তাশক্তি ও হুশিয়ারী তাহাদের আছে।

শিকারী, ভ্রমণকারী, কাঠুরিয়া প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর মানুষকে জঙ্গলে সর্বদা হুশিয়ার থাকিতে হয়। নিমেষের অসতর্কতার জন্য জীবন বিপন্ন হইতে পারে। শিকারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। মুহূর্তমাত্র দেরী বা এক মুহূর্ত পূর্বে নহে, ঠিক সময় দেখিয়া শিকারীকে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য আঘাত হানিতে হইবে। সামান্য ভুলের মাশুল শিকারীকেই দিতে হয়। ব্যাঘ্রের পাগমার্ক ও উহার অবয়ব দর্শনে ঝানু শিকারী বুঝিতে পারে বাঘ না বাঘিনী, বাচ্চা না বৃদ্ধ, এবং কত বয়সের বা শারীরিক গঠন কিরূপ। ব্যাঘ্রের থাবায় কোন ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা বা উহার কোন পা অথবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গা কিনা তাহা উপলব্ধি করা যায়। অভিজ্ঞতার দ্বারা এই সব বিদ্যা আয়ত্বে আসে।

মানুষখেঁকো ব্যাঘ্র যদি জানিতে পারে, শিকারী তাহার পশ্চাতে, তখন সে বিশেষ সতর্কতার সহিত শিকারীর পিছনে ধাওয়া করে। ব্যাঘ্র মানুষের হাতে মারা পড়ে, মানুষও তেমনই ব্যাঘ্রের হাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করে। তদানীন্তন এক সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯০৫-০৬ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনে ন্যূনপক্ষে ১০১ জন এবং পরবৎসর অর্থাৎ ১৯০৬-০৭ খৃষ্টাব্দে ৮৩ জন লোককে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া উদরস্থ করে। ব্যাঘ্রকুলকে শিকার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে পশর নদীর পূর্ব দিকে প্রতিটি ব্যাঘ্রে ৫০ টাকা এবং নদীর পশ্চিম দিকের জঙ্গলে অনুরূপ শিকারের জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে উক্ত পুরস্কার সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা। ব্যাঘ্রের তারতম্য অনুসারে এইরূপ পুরস্কার প্রদত্ত হয়। আদেশপত্র ভিন্ন কেহ ব্যাঘ্র বা অন্য কোন জীবজন্তু শিকার করিলে আইনানুসারে তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হয়। যখন তখন ব্যাঘ্র শিকারের আদেশপত্র দেওয়া হয় না। বৎসরের কোন কোন সময়ে শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ (Closed season) ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস হইলে অচিরাৎ বনজ সম্পদ ও হরিণ ইত্যাদির চিহ্ন লোপ পাইবে। ব্যাঘ্রকুল বনজ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। উহাদের সুন্দরবনের রক্ষক ও অতন্দ্র প্রহরী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র, সর্প ইত্যাদির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

মানুষখেঁকো ব্যাঘ্র খোচ্ ধরিয়া চলিতে চলিতে শিকারীর অনুসরণ করে। একদা একটি নরখাদক এইভাবে চলিতে চলিতে শিকারী যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে মই দিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার ঘ্রাণ লইতে থাকে। দ্রুত সর্তকতা অবলম্বনের জন্য শিকারী প্রাণে বাঁচিয়া যায়। ত্বরিতবেগে ব্যাঘ্রও জঙ্গলে সরিয়া পড়ে। মানুষ যেমন ব্যাঘ্রকে ভয় করে, ব্যাঘ্রেরও তেমনই মনুষ্যভীতি আছে। পক্ষান্তরে ব্যাঘ্র যেমন দুঃসাহসী তেমনই ভীরু।

সুন্দরবনের নাড়ীনক্ষত্র স্থানীয় প্রবীণ শিকারীদের নখদর্পনে। প্রত্যেকটি এলাকা, প্রতিটি বৃক্ষলতা তাহাদের সুপরিচিত। বানরেরা কিচির মিচির সংকেত দিলে সুন্দরবনের অন্যান্য প্রাণীকুল ব্যাঘ্রের আগমন জানিতে পারিয়া পলায়ন করে। ব্যাঘ্র মানুষ শিকার করিলে উহার রক্ত পানের পূর্বে শিকারের সহিত খেলা করিয়া থাকে। হিংস্র জীবের হিংসা ও লালসাকে উগ্র করার জন্য তাহারা শিকারের সঙ্গে এই ধরণের ক্রীড়া করিয়া থাকে। শিকার মরিয়া গেলেও নখর দ্বারা শিকারকে থাবা দিয়া ধরে এবং বিড়ালের ন্যায় নাড়াচাড়া করিয়া উহার সঙ্গে খেলা করে। ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইলে সে মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করে। কোন কোন সময় মানুষের রক্তমাংস ভক্ষণ অপেক্ষা প্রতিশোধ লইবার বাসনা উগ্র থাকে। এমতাবস্থায় ব্যাঘ্রে শিকার করিয়া লাশ ফেলিয়া যায়। শুনা যায় লাশ বাসী হইলে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে না। জনৈক অভিজ্ঞ শিকারীর বর্ণনায় জানা যায় যে, ব্যাঘ্রে মানুষ শিকার করিলে সর্বপ্রথম উহার রক্ত পান করে এবং লাশ রাখিয়া দেয়। পরে সুস্থ হইয়া শিকারের মাংস ভক্ষণ করে। একটি ব্যাঘ্রে সাধারণতঃ একজন মানুষের সমস্ত মাংস খাইতে পারে না বা খায় না, সেইজন্য অনেক সময় মানুষের অর্ধভুক্ত লাশ

বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন কোন অংশ জঙ্গলে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে এই ধরনের অর্ধভুক্ত লাশের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করা হয়।

ব্যাঘ্রের লালা বিষাক্ত পদার্থ। একবার জনৈক শিকারী ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলে শিকারীর পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর গায়ের উপর ব্যাঘ্র পড়িয়া যায়। ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইলে অনবরত মুখ দিয়া সাংঘাতিক ভাবে লালা পড়িতে থাকে। সঙ্গীর গাত্র বাঘের লালায় ভরিয়া যায়। এই লালায় খুব দুর্গন্ধ। সাবান দিয়া ভাল করিয়া ধৌত করিলেও উহার দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। এইরূপ লালা মানুষের গায়ে লাগিলে প্রাণে বাঁচা দুষ্কর। এহেন বিপদেরও ঔষধ সুন্দরবনের অভিজ্ঞ শিকারীরা জানে। ঐরূপ ব্যক্তিকে জল দ্বারা ভালভাবে স্নান করাইয়া মানুষের বিষ্ঠা গায়ে মাখাইয়া প্রলেপ দিলে অনেক সময় বাঁচিবার আশা থাকে। পূর্বোক্ত লোকটি লালার বিষে জর্জরিত হইয়া শেষ পর্যন্ত গাত্র পচিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত ব্যাঘ্রের গাত্র হইতেও ভীষণ দুর্গন্ধ বহির্গত হয়।

জঙ্গলে ব্যাঘ্র আছে কিনা অভিজ্ঞ ও সুচতুর শিকারীরা তাহা বুঝিতে পারে। গভীর ও নিস্তব্ধ জঙ্গল। ব্যাঘ্রের অবস্থান থাকিলে সেখানে নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন থম্‌থম্ করিতে থাকে। নিঝুম নিরালা বনে উহা বিশেষভাবে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। গভীর অরণ্যের বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, বিহঙ্গম, আলো, বায়ু প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে শিকারীর অন্তরে ব্যাঘ্রের অবস্থানের একটি নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়া থাকে। নির্জন বনের মধ্যেও ব্যাঘ্রে বিশেষ করিয়া নরখাদকে বাতাসের সাহায্যে মানুষের অবস্থান বুঝিতে পারে। সেজন্য শিকারীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। এমনভাবে শিকারীরা চলিতে চেষ্টা করে যেন তাহাদের পদশব্দ দূরের কথা, গাত্র ঘেঁসিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাও ব্যাঘ্রের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ না করে। তজ্জন্য সুন্দরবনের শিকারীরা সাধারণতঃ ধূমপান করিতে পারে না। ধুঁয়ার গন্ধ পাইলে ব্যাঘ্রকুল সাবধানতা অবলম্বন করে। অভিজ্ঞ ঝানু শিকারীরা নৈশ অন্ধকারেও সেইজন্য নির্জনে নিঃশব্দ অবস্থায় একাকী শিকারের সন্ধান করে। ব্যাঘ্র শিকারের জন্য শিকারীকে অমানুষিক পরিশ্রম, অনাহার, অনিয়ম, কালক্ষেপ, অর্থক্ষয় এবং অসাধ্য সাধন করিতে হয়। তদুপরি শিকারীদের জীবনাশঙ্কা আছেই।

অধুনা এক অভিনব উপায়ে ব্যাঘ্র শিকারীরা শিকার করিয়া থাকে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে শিকারী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সতর্কতার সহিত আসন গ্রহণ করে। অনেক সময় সে কাপড় জড়াইয়া দেহ বৃক্ষের সন্ধে বাঁধিয়া রাখে যাহাতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ নীচে পড়িয়া না যায়। বন্দুকের পাল্লা ঠিকমত মাপিয়া একটি ছাগলের ছানা নিকটেই বাঁধিয়া রাখা হয়। ছাগলছানার ডাক শুনিয়া সময় সময় ব্যাঘ্র আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে এবং সেই সুযোগে শিকারী গুলিবিদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিয়া থাকে।

ব্যাঘ্র শিকারীরা দিবারাত্র সর্বসময়ে শিকার অন্বেষণ করে। নৈশ অন্ধকারে ব্যাঘ্রের দুই চক্ষু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে। উহার উপর টর্চের আলো পড়িলে ব্যাঘ্র সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং একটুও নড়িতে পারে না। এমতাবস্থায় শিকার সহজে হস্তগত

হয়। টর্চের আলো ব্যাঘ্রের চক্ষুদ্বয়ের উপর হইতে অপসারিত হওয়া মাত্র সে পলায়ন করিয়া থাকে। নৈশ অন্ধকারে হরিণেরও অনুরূপ অবস্থা হয়। বিদেশাগত রাজ অতিথিদের শিকারের জন্য প্রায়শঃ মাচাং ও উহার নিকটে ছাগল বাঁধিয়া রাখা হয়।

সুন্দরবনের মানুষখেঁকো বাঘ সম্পর্কে তৎকালীন বনবিভাগের ডেপুটি কনজারভেটর স্যার হেনরী ফ্যারিংটন লিখিয়াছেন, "সুন্দরবনের স্থানীয় শিকারীরা সাধারণতঃ গাদা বন্দুক ব্যবহার করে এবং অনেক সময়ে ক্ষুদ্রকায় ছিটা দ্বারা গুলি করিয়া থাকে। ঐ গুলি গাত্রে লাগিলেও ব্যাঘ্র মরে না। পক্ষান্তরে ব্যাঘ্র অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সুন্দরবনের হরিণকুলকে এক প্রকার শেষ করিয়া দেওয়ার জন্যও ব্যাঘ্রের মনুষ্য ভক্ষণের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হরিণ দুষ্প্রাপ্য হইলে ব্যাঘ্রের নররক্ত পানের তৃষ্ণা উগ্র হয়। ব্যাঘ্র সাধারণতঃ অন্য খাদ্য পাইলে মনুষ্য ভক্ষণ হইতে বিরত থাকে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "প্রকৃত নরখাদকও হরিণ পাইলে সচরাচর মনুষ্য আক্রমণ করে না। যে সমস্ত জঙ্গলে স্থানীয় শিকারীদের আনাগোনা অত্যধিক, সেখানকার নরখাদকেরা অতিমাত্রায় হিংস্র হইয়া পড়ে।"

নররক্ত ব্যাঘ্রের প্রিয় সুস্বাদু খাদ্য। নররক্ত পানকারী ব্যাঘ্র মানবরক্তের নেশায় পাগল হইয়া যায়। উহার বুদ্ধিও প্রখর হয়। দেহ সংকুচিত করিয়া অতীব সংগোপনে মানুষ আক্রমণ করে।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া মানুষখেঁকো ব্যাঘ্রের দাপট ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয় পর্যটক বার্নীয়ার সুন্দরবনের ব্যাঘ্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে নিশা যাপনকালে নদী তীরে বিশেষ সাবধানতার সহিত বৃক্ষে নৌকা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। দড়ি লম্বা করিয়া বা নোঙ্গর ফেলিয়া তীরভূমি হইতে কিছুদূরে নৌকা রাখিতে হয়। অনেক সময় তীরবর্তী নৌকা হইতে ব্যাঘ্রে লম্ফ দিয়া মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষকে এই হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়া থাকে। দেশীয় কাঠুরিয়াদের নিকট হইতে শুনিয়া বার্নীয়ার তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নৌকার মাঝিদের নিকট শুনিয়াছেন যে, নৌকার মধ্যে যে মানুষটি নাদুসনুদুস এবং সর্বাপেক্ষা স্থূলকায় তাহাকেই ব্যাঘ্রে মুখে করিয়া লইয়া যায়। গল্পের শেষাংশ সঠিক নহে এবং অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করি। দিনের বেলায় মানুষ যখন জঙ্গলে কার্যরত থাকে, তখন কোন কোন সময়ে ব্যাঘ্রে কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যাঘ্রে যাহাকেই লক্ষ্য করে তাহাকেই পরে আক্রমণ করিয়া থাকে।

বার্নীয়ার সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে পাক ভারত পর্যটন করেন। তাঁহার বিবরণী লিখিত হইয়াছিল এখন হইতে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে। এই ধরনের ঘটনা এখনও ঘটিয়া থাকে। আমরা স্বরূপকাটীর জনৈক বৃদ্ধ বাওয়ালী সর্দারের বর্ণনায় জানিয়াছি যে, কয়েকবৎসর পূর্বে এক রাত্রিতে বাওয়ালীরা সংখ্যায় ৭ জন এক বড় নৌকায় দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। গভীর রাত্রিতে জঙ্গল হইতে ব্যাঘ্র নৌকার উপর লম্ফ দিয়া ভীষণ ধাক্কায় দরজা ভাঙ্গিয়া একজনকে মুখে করিয়া আবার লম্ফ দিয়া জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়।

বিগত ইং ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শেখের খালের উত্তর তীরে জনৈক ব্যক্তি গোল গাছ কাটিতেছিল। একটি ব্যাঘ্র হঠাৎ আসিয়া লোকটির মস্তকে এক থাপ্পড় মারে। ইহাতে সে মাটিতে পড়িয়া যায়। পার্শ্ববর্তী সন্ধীরা এমন সময় দা, কুঠার সহ আসিয়া পড়িলে ব্যাঘ্রটি পলায়ন করে। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে চিকিৎসার জন্য গোড়ইখালী বাজারে লইয়া আসে। সে মস্তকে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ করার সন্দে সন্দেই তাহার মৃত্যু হয়। বাঘের নখও বিষাক্ত, সেইজন্য সম্ভবতঃ বিষে জর্জরিত হইয়া লোকটির মৃত্যু ঘটে। ব্যাঘ্রটি কেন তাহাকে থাপ্পড় মারিল? উহাকে সে সহজেই ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিত। পূর্বেই বলিয়াছি শিকারের পূর্বে ব্যাঘ্রে অনেক সময় শিকারের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রে মানুষ আক্রমণের পূর্বে এইরূপ থাপ্পড় মারিয়া থাকে। এইরূপ আক্রমণে মানুষ পড়িয়া যায়। তখন সে সহজে কামড়াইয়া ধরিয়া প্রস্থান করে। ইহাই ব্যাঘ্রের অন্যতম মনুষ্য আক্রমণ পদ্ধতি।

সুসভ্য মানব জাতির জীবনে যেরূপ প্রেমের স্পন্দন অনুভূত হয়, জন্দলের হিংস্র জন্তুরও তদ্রূপ পাশবিক প্রেমভাব জাগিয়া থাকে। যৌন বিজ্ঞানীরা বলেন, ঋতুর পরিবর্তনে এবং চন্দ্রের গতির সন্দে কোন কোন নির্ধারিত সময় যৌনক্ষুধা মানুষের অন্তরে কমবেশী প্রবল হইয়া থাকে। বাংলাদেশের বসন্তকাল প্রকৃতির এক অভিনব অবদান। ঋতুরাজ হিসাবে বসন্তের আদর এ দেশে সর্বাধিক। বৃক্ষের ডালে ডালে কোকিলের কুহুতানে হৃদয় মন আন্দোলিত হয়। দক্ষিণের ঝিরি ঝিরি বাতাস অন্তরে অপরূপ আনন্দ দান করে। বৎসরের এই সময় অর্থাৎ শীতের শেষে এবং বসন্ত সমাগমে ব্যাঘ্রের ডাক শ্রুত হয় অত্যধিক। বাঘিনীর সহিত ব্যাঘ্র সবসময় একত্রে থাকে না। যে যাহার মত খাদ্য অনুসন্ধান করিয়া স্বাধীনভাবে জন্দলে ঘোরাফেরা করে। ব্যাঘ্র বাঘিনীর মিলন আকাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। উভয়ে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য পাগল প্রায় হইয়া উঠে। বাঘিনীর সাক্ষাৎ পাইবার উদগ্র নেশায় ব্যাঘ্র বন হইতে বনান্তরে ছুটিয়া বেড়ায়।

ব্যাঘ্র যে পথে চলিবে সেই পথের পদ-চিহ্ন ধরিয়া আবার বরাবর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিবে। এই পদচিহ্নকে শিকারীরা পাগমার্ক বলে। ব্যাঘ্রের এইরূপ চলাচলের পথে শিকারীরা "কল্‌পাতা" পদ্ধতিতে শিকার করিয়া থাকে।

সুন্দরবনে "কল্‌পাতা" শিকার বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ব্যাঘ্রের চলাচল পথে শিকারী গুলি পুরিয়া বন্দুক রাখিয়া দিবে। একটি তে-কাঠির উপর মাপমত উঁচু করিয়া বন্দুকের অগ্রভাগ রাখিবে। শিকারীদের নিকট হইতে জানা যায় যে ব্যাঘ্রের থাবার চিহ্নের মাপ ধরিয়া প্রমাণ মত উঁচু করিয়া বন্দুক রাখিতে হয়। ট্রিগারের সন্দে কাল সুতা বাঁধিয়া পথের উপর আড়াআড়িভাবে একটু উঁচু করিয়া টানা দিয়া রাখিবে। ব্যাঘ্র সেই পথে ফিরিবার সময় পায়ে সুতার টান লাগিলেই বন্দুক আওয়াজ হইয়া যাইবে। কল্‌পাতা পদ্ধতিতে সর্বদা কৃতকার্য হওয়া যায় না বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু তাহা

ঠিক নহে। এই ধরনের ব্যাঘ্র শিকার পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে এবং অধিকাংশ শিকারী এই পন্থায় ব্যাঘ্র শিকার করে। সামনাসামনি ব্যাঘ্র শিকার অপেক্ষা ইহা অধিকতর সহজ। কল্‌পাতা শিকারে মাপঝোক ভুল হইলে শিকার পড়ে না। আওয়াজের পর শিকারীরা অন্য একটি বন্দুক হস্তে ব্যাঘ্র পড়িয়াছে কিনা খোঁজ করে। এই সময় শিকারী আহত বাঘ শিকার করে বা দৈবাৎ ব্যাঘ্রেও শিকারীকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, শিকারী সাধারণতঃ জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ করিতে থাকে। সম্মুখের পদদ্বয়ের দূরত্ব দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে ব্যাঘ্র ছোট না বড়। বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যাঘ্র পাওয়া যায় না। আবার অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়।

গহীন অরণ্যে পুরাতন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অন্যান্য স্থানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুউচ্চ ভূমি। এই সমস্ত স্থানে ব্যাঘ্রের আনাগোনা খুব বেশী। আমরা একদিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে শেখের খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া প্রায় দেড় মাইল পদব্রজে কালীবাড়ী, দুর্গ ও বহু ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই। আমাদের সঙ্গী শিকারীরা মধ্যপথে গিয়া শব্দ করিতে নিষেধ করে। কেননা তাহারা ব্যাঘ্র শিকার করিবে। আর আমরা চাই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় সমূহের সন্ধান লইতে। তাহাদের নেশা ব্যাঘ্র শিকার। আমরা চাই কোন প্রকারে ঐরূপ ভয়াবহ স্থানে ব্যাঘ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়। আমরা কয়েকজন শব্দ করিতে বলি, তাহারা বাধা দেয়। অবশেষে আমাদেরই জয় হইল। একজন সুন্দরী বৃক্ষে কুঠার দ্বারা আঘাত করায় বনমধ্যে বিকট শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। আমাদের সঙ্গী একজন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই আওয়াজে মন্দিরের মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে যে ব্যাঘ্র ছিল সরিয়া পড়িল। আমরা সেখানে যাইয়া সদ্যাগত ব্যাঘ্রের অসংখ্য পদচিহ্ন দেখিলাম। আমাদের শিকারী ডাক্তার সাহেব আফ্‌সোস্ করিতে লাগিলেন। আমরা উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। এই স্থানটি দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল। সেইজন্য ঝানু শিকারীরাও এখানে আসিতে ভয় পায়। বনবিভাগের সাহসী কর্মচারীরাও সচরাচর এখানে প্রবেশ করে না। এখানে হো'দো ও হেন্তাল বৃক্ষ অত্যধিক। এইরূপ জঙ্গলই বাঘের আবাস ভূমি।

একবার এক শিকারী ব্যাঘ্রের ছানা শিকার করিয়াছে। বাঘিনীর বাচ্চার প্রতি খুব দরদ। শিকারী বাচ্চা সহ নৌকায় চম্পট দিয়াছে। নদীর মধ্যখানে আসিয়া দেখিতে পাইল বাঘিনী হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। উহার চক্ষু দিয়া যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। বলিষ্ঠ বাহুর মাংসপেশীগুলি ক্রোধান্মত্ত অবস্থায় দুলিতেছে। গায়ের লোমরাশি খাড়া হইয়াছে। চোখের উপর কাল ভ্রু-দ্বয় উঠানামা করিতেছে। করুণ ও আবেগময়ী গর্জনের সঙ্গে মুখ দিয়া অবিরল ধারে লালা নির্গত হইতেছে। স্বচক্ষে এহেন অবস্থা দর্শন না করিলে এরূপ ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা করা দুষ্কর।

বাচ্চার প্রতি ব্যাঘ্রের লেশ মাত্র দয়া নাই। স্ত্রী ও পুরুষ কুমীর উহাদের বাচ্চা খাইয়া ফেলে। ব্যাঘ্র বাচ্চা সামনে পাইলে নিশ্চিন্তমনে উদরস্থ করে। কিন্তু বাঘিনীর মমতা

মায়ের ন্যায়। বাঘিনী বাচ্চাকে নয়নের সম্মুখে রাখে এবং খুব সতর্কতার সহিত উহাকে পাহারা দেয়। ব্যাঘ্র আসিলে বাঘিনী বাচ্চাকে সরাইয়া রাখে এবং উহাকে পথ ভুলাইয়া অন্যত্র সরাইয়া দিয়া আবার স্বীয় বাচ্চার নিকটে ফিরিয়া আসে। প্রবীণ শিকারীরা কখনও ব্যাঘ্রের বাচ্চাকে শিকার করে না। বাচ্চা শিকারীকে বাঘিনী জীবন দিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। শুনা যায় কোন কোন সময় নৌকায় পড়িয়া বাঘিনী বাচ্চা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ; আবাব বহু মাইলব্যাপী শিকারীর নৌকার পিছনে ধাওয়া করিয়াছে।

সুন্দরবনের নরখাদক সম্পর্কে অসংখ্য চাঞ্চল্যকর কাহিনী শ্রুত হয়। ব্যাঘ্রে একবার নররক্ত পান করিলে উহার লোভ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাগল হইয়া সে মানুষের সন্ধানে ছুটাছুটি করে। বনবিভাগের জনৈক অভিজ্ঞ কর্মচারী বলিয়াছেন যে, মানুষের রক্ত পানের পর বাঘের ধীশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে তখন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। এই ধরনের নরখাদক শিকার অতীব কঠিন। এই সমস্ত ব্যাঘ্র দিনের বেলায় কোন লোককে জন্দ্বলের মধ্যে নিরিখ করিলে রাত্রে তাহাকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আক্রমণ করিবেই। দেহে গুলি লাগিলে উহাদের কিছু হয় না। মস্তকের গুলিতেও বাঘ কোন কোন সময় আপাততঃ বাঁচিয়া যায়। অবশ্য পরে মারা যায়।

গুলি করা ব্যাঘ্র পলায়ন করিলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শিকারী সাধারণতঃ খোঁচ বা পাগমার্গ দেখিয়া উক্ত ব্যাঘ্রের পিছনে ধাওয়া করে। অনেক দূরে যাইয়া প্রবীণ শিকারী বুঝিতে পারে ব্যাঘ্র চক্র দিয়া চলিতেছে। এই সময় অসাবধানতা অবলম্বন করিলে জীবনের সমূহ বিপদ আছে। চক্রদান অভিজ্ঞ নরখাদকের এক অভিনব কৌশল। সাধারণ ব্যাঘ্র এসব জানে না। অভিজ্ঞ শিকারীর ন্যায় মানুষখেঁকো ব্যাঘ্রে এই বিদ্যা আয়ত্ব করে। ব্যাঘ্র যদি জানিতে পারে শিকারী পিছনে ধাওয়া করিয়াছে, তখন সে পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় লুকাইয়া ওত পাতিয়া থাকে না। এইরূপ করিলে ঝানু শিকারী খুব সাবধানতার সহিত খোঁচ অনুসরণ করিয়া সামনা-সামনি ব্যাঘ্রকে গুলিবিদ্ধ করিতে পারিবে। সেইজন্য মানুষখেঁকো কিছুদূরব্যাপী বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। এইভাবে বাঘে মানুষের বুদ্ধির কলাকৌশলের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। ঝানু শিকারীর সামান্যতম মতিভ্রম ঘটিলে পরাজয় অনিবার্য।

গভীর অরণ্যানীর মধ্যে সহসা দিক হারাইবার সম্ভাবনা বেশী। সাধারণ শিকারীর পক্ষে সে সোজা না গোলাকারে চলিতে থাকে বোঝা মুশকিল। শিকারের নেশায় সে কোন্ দিকে যায় খেয়াল করিতে পারেনা। সুন্দরবনের চতুর্দিকে একই গাছ, একই দৃশ্য, তদুপরি যদি সূর্য মাথার উপর আসে তাহা হইলে দিক ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আরও অধিক। নরখাদক ব্যাঘ্র এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। সে একটি চক্র ঘুরিয়া শিকারীর পিছনে পড়িয়া যায়। শিকারী ভাবে ব্যাঘ্র তাহার সম্মুখ দিয়া চলিতেছে। কিন্তু ব্যাঘ্র ততক্ষণে তাহার পিছন হইতে অতর্কিতে ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। ব্যাঘ্রের চক্র দেওয়ার বিষয় অভিজ্ঞ শিকারী বুঝিতে পারে।

সুন্দরবনের সীমান্তে ঐতিহাসিক বেতকাশী গ্রাম। উহার পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বৃদ্ধের নিকট হইতে জানা যায় যে, তাহারা একখানি নৌকাযোগে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত নদীতে মৎস্য ধরিতে যায়। এই বৃদ্ধের জীবনে বিভিন্ন সময় তাহারই সম্মুখে চার ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া উদরস্থ করিয়াছে, তবুও বৃদ্ধ মৎস্য শিকার বন্ধ করে নাই। একদা মর্জত নদীর তীরে কেওড়াসুতীর জঙ্গলে তাহারা ৪ জনে মৎস্য ধরিতে যায়। শীতের রাত্রি, ৪ জনে পরপর কাঁথা গাত্রে দিয়া শয়ন করিয়াছে। প্রথম তিনজন বাদ দিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে অকস্মাৎ ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে এবং উহার হিংস্র থাবায় গুরুতর আঘাত পাইয়া নাড়ীভূঁড়ি বাহির হইয়া যায়। ব্যাঘ্র দন্ত দ্বারা ঐ ব্যক্তির গাত্রের কাঁথা লইয়া চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি নিমেষের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

এখন প্রশ্ন—ব্যাঘ্রে প্রথম তিনজনকে আক্রমণ না করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে কেন আক্রমণ করিল? শিকারীরা যেমন ব্যাঘ্রের অনুসরণ করে, তেমন মানুষখেঁকোরা শিকারের জন্য মানুষের গতিবিধি অতীব সন্তর্পণে আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করে। পূর্বাহ্নে সে যাহাকে লক্ষ্য করিবে তাহাকেই আক্রমণ করিবে, অন্য কাহাকেও নহে। উহাদের হিংস্র লালসা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আপতিত হয় এবং যে-কোন প্রকারে তাহাকে হত্যা করা ব্যাঘ্রের নেশায় হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য ব্যাঘ্র স্বীয় লক্ষীভূত ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিয়া থাকে।

ব্যাঘ্রও শিকারীর ন্যায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। একদা বাওয়ালীদের এক নৌকায় একজন জ্বরাক্রান্ত হয়। ঐ লোকটিকে দিবাভাগে বৃক্ষছেদন করার সময় ব্যাঘ্রে লক্ষ্য করিয়াছে। সঙ্গীরা সন্ধ্যার পর মস্তকে পানি ঢালিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। এমন সময় ব্যাঘ্র অতীব সন্তর্পণে নৌকায় প্রবেশ করিয়া খোলের নীচে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে এবং সুযোগমত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির উপর পতিত হইয়া উহাকে আক্রমণ করে এবং স্কন্ধ কামড়াইয়া ধরিয়া জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়। এই ধরনের দুর্ঘটনার কথা মধ্যে মধ্যে শ্রুত হয়।

ব্যাঘ্র অতীব হুশিয়ার জন্তু। কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতের শব্দের সহিত শব্দ মিলাইয়া পা ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কোন কোন সময় কাঠুরিয়াকে এমনই সতর্কতার সহিত আক্রমণ করে যে সে ঘুণাক্ষরেও ব্যাঘ্রের উপস্থিতি বুঝিতে পারে না। বাওয়ালীদের গাত্রের উপর বৃক্ষ পতিত হয় কিনা সেদিকে খেয়াল রাখিতে হয়। এমনই অসাবধান মুহূর্তে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে।

চাঁদপাই রেঞ্জে একটি ব্যাঘ্র একদল কাঠুরিয়ার মধ্যে একজনকে পূর্ব হইতে নিরিখ্ করিয়া অনুসরণ করিতে থাকে। ব্যাঘ্রটি অন্য পারে ছিল। উহার একমাত্র লক্ষ্য উক্ত লোকটি। সুযোগ পাইয়াও সে অন্য কাহাকে আক্রমণ করিল না। অতঃপর ব্যাঘ্র পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া খাল পার হইবার জন্য লম্ফ দিয়া খালের মধ্যে কর্দমাক্ত স্থানে পড়িয়া গেল। সে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় লম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু এবারও

কাদার মধ্যে নিপতিত হইল। পূর্বস্থানে গিয়া ব্যাঘ্রটি গোঙাইতে লাগিল এবং মুখ দিয়া অবিরল ধারে লালা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্যাঘ্রের ভীম গর্জনে বনস্থলী প্রকম্পিত হইল। ব্যাঘ্রটি এইভাবে আরও কয়েক বার লম্ফ দিয়া বিফল মনোরথ হইল। ব্যাঘ্রের আক্রোশ ও লক্ষ্য সেই ব্যক্তি। শিকারের নেশা চাপিলে এই হিংস্র জন্তু অধিকতর হিংস্র হয়। ইহার ক্রোধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধূমায়িত হইতে থাকে। গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যাঘ্রটির মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণ লালা নির্গত হয়। উহার পরিমাণ প্রায় এক কলসীপুর্ণ হইবে। খালের প্রতিবন্ধকতার জন্য লোকটি প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও উহার শিকার পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ বনবিভাগের কর্মচারী ও স্থানীয় শিকারীদের নিকট হইতে বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হইয়াছি। একদা জনৈক কর্মচারী মোটর লঞ্চ যোগে শিবসা নদীর মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় একটি বাঘিনী সাঁতরাইয়া নদী পার হইতেছিল। এ সুযোগে তিনি ব্যাঘ্রের মস্তকে গুলি করিয়া উহাকে শিকার করেন। ব্যাঘ্রটি যখন নদীমধ্যে ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময় দড়ি বাঁধিয়া উহাকে লঞ্চের উপর উঠানো হয়। এই হিংস্র জন্তুটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি। এই ধরণের সহজ শিকারের কথা আর শুনা যায় নাই।

উপরোক্ত অফিসারের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ব্যাঘ্রকে গুলি করিলে বন্দুকের আওয়াজ অনুসরণ করে। গুলি বিদ্ধ হইলে, সে উদগ্র নেশায় পাগলপ্রায় হইয়া উঠে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া সে শিকারীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। ব্যাঘ্রের প্রতি-হিংসাবৃত্তি তখন চরম আকার ধারণ করে। গুলির আঘাতে ব্যাঘ্র না পড়িলে শিকারীর জীবন আশঙ্কা প্রবল হইয়া পড়ে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা সুপতি ফরেষ্ট অফিসে বাওয়ালীরা সংবাদ দিল যে, অদূরে একটি ব্যাঘ্র ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ কার্তুজ ও বন্দুকসহ তাঁহারা ডিঙ্গি নৌকায় ব্যাঘ্র শিকারে যাত্রা করেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ব্যাঘ্রটি নদীতীরে লম্বালম্বিভাবে শুইয়া আছে। সঙ্গী ভদ্রলোক গুলি করিলেন, কিন্তু উহাতে বাঘ পড়িল না। পরন্তু সে তীরবেগে শিকারীর দিকে ছুটিয়া আসিল। শিকারীরা নদীর মধ্যে, সেজন্য ব্যাঘ্রটি তীর পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ব্যাঘ্র আক্রান্ত হইলে কি প্রকারে সোজা তীরবেগে শিকারীকে আক্রমণ করে, তাহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন।

অন্য আর এক বর্ণনায় জানা যায়, এই হিংস্র জন্তু সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিহিংসা বা আক্রোশ হইলে সে মারমুখো হইয়া উঠে। হয় নিজে মরে না হয় শিকারের স্কন্ধ হইতে রক্তপান করিয়া প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

একদা দুইজন কাঠুরিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করায় উহাদের মধ্যে একজনকে ব্যাঘ্রে নজর করিয়াছে। ঐ ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গী একটু দূরে ছিল। সে দুর্দমনীয় সাহসের সহিত কুঠার দ্বারা হিংস্র জন্তুটিকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে

ব্যাঘ্রে কামড় দেয়। ব্যাঘ্রে শুধু কামড় দিলে মানুষ মরে না, ঝট্‌কানি না দেওয়া পর্যন্ত। কুঠারের আঘাতে ব্যাঘ্রটি তখন সরিয়া পড়ে। হংসরাজ নদীর তীরে ধোন্ধল কূপ অফিসে ঐ দুইটি লোক আসিয়া এই ঘটনা বর্ণনা করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ব্যাঘ্রাহত লোকটিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রটি উহাদের নৌকা অনুসরণ করিতে করিতে দেড় মাইল দূরবর্তী কূপ অফিসের পিছনে অতীব সংগোপনে বৃক্ষের নীচে বসিয়া সেই দুইটি লোককে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। বাপরে বাপ! কি সাংঘাতিক জিদ! প্রতিটি কূপ অফিসের পিছনে প্রায়ই একটি খাল থাকে এবং তথায় লোকে নৌকা রাখে। পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তির নৌকাও সেইস্থানে রাখিয়াছে। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রটি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হিংস্র লালসায় উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে। শিকার হস্তচ্যুত হওয়া এবং কুঠারাঘাতের প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঘ্রটি মর্মে মর্মে নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিতেছে। এমতাবস্থায় ব্যাঘ্রটিকে একজন বোটম্যান বৃক্ষতলে পাইয়া কূপ অফিসের সুউচ্চ টোন্দের উপর হইতে গুলি চালনা করে। মস্তকের আঘাতে উহার ব্যাঘ্রলীলা সান্দ্ব হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, কুঠার আঘাত-প্রাপ্ত সেই বাঘ।

খুলনার কৃতি সন্তান মরহুম জালালউদ্দীন হাসেমী। একদা একটি ব্যাঘ্র তাঁহার একখানি পা কামড়াইয়া ধরে। ফলে দেহ হইতে পদখানি পৃথক হইয়া যায়। পরে আজীবন তিনি একপায়ে ভর করিয়া লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করিয়াছেন। হাসেমী সাহেব বলিতেন ঃ

এক ঠ্যাং দিয়েছি বাঘের মুখে
আর এক ঠ্যাং দিব ইংরেজের মুখে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইংরেজ জাতির অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি এই কথা বলিতেন।

'আঁড়ি' না করিলে অকস্মাৎ ব্যাঘ্রে শিকার ধরিতে পারে না। শিকারের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণকেই আঁড়ি বলা হয়। ব্যাঘ্রে প্রায়ই নদী পাড়ি দেয়। সে সোজাসুজি নদী পার হইবে। স্রোতের বেগে একটু সরিয়া গেলে আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে মাপঝোক ঠিক করিয়া সোজা পথে যাইবে। একটুও বাঁকিবে না।

ব্যাঘ্র শিকার কাহিনী : পাইকগাছা গ্রামের গাজী বাহাদুর আলী, বর্তমান বয়স ৮০ বৎসর (১৯৬৭ সাল)। ইনি একজন প্রবীণ ব্যাঘ্র শিকারী। জীবনে বহুবার সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়াছেন। হরিণ ও ব্যাঘ্র শিকারে দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর তিনি নৌকাযোগে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে শিকার করিয়া থাকেন। শিকার ব্যাপদেশে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি এই লেখকের সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন—

—ভদ্র নদী ঝনঝনিয়া হইয়া হাতধাবড়ায় বিলীন হইয়াছে। ঝনঝনিয়ার পশ্চিম পারে ত্রিমোহনায় কেওড়াবুনের চর অবস্থিত। হরিণ শিকারের জন্য অতি প্রত্যুষে সেই চরের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটি কেওড়া বৃক্ষে আরোহণ করি। এমন সময় উত্তর দিক হইতে একটি প্রকাণ্ড রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্র ডাকিতে ডাকিতে ঐ বৃক্ষের সম্মুখে একটি মরা কেওড়া বৃক্ষের উপর উপস্থিত হয়। আমি ও আমার সঙ্গী দেখিলাম বাঘ হাতা দিয়া আলস্য ছাড়িতেছে। কিন্তু আমাদের দেখে নাই।

—আমি সঙ্গীকে হুশিয়ার করিয়া দিলাম—গুলি করার সঙ্গে যেন বৃক্ষ হইতে ভূপতিত না হয়। পড়িলে ব্যাঘ্রে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে পারে। দোনালা বন্দুকের ডাহিনের নলায় মুর্গি শিকারের কার্তুজ ছিল, ব্যস্ততার জন্য তাহা আমার স্মরণ ছিল না। তাহা দ্বারা গুলি করিলে ব্যাঘ্রের ফুসফুসে আঘাত লাগে। ব্যাঘ্র ভীষণ গর্জন করিয়া লম্ফ প্রদান করিলে আমার সঙ্গী ভীত হইয়া প্রস্রাব করিয়া দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোথাকার পানি? সে বলিল—ভয়ে প্রস্রাব করিয়া দিয়াছি।

—আমি তখন বন্দুকসহ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম ব্যাঘ্রের গাত্র হইতে অবিরল ধারে রক্ত নিঃসৃত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যাঘ্র যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেইদিকে যাইতে লাগিল। আমি বন্দুকসহ দুইরশি উহার পশ্চাদ্ধাবন করি। আমি ভুল করিয়াছি বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দিন বৃক্ষপোরি অবস্থান করি।

—নলিয়ান অফিস হইতে ছাড়পত্র লইয়া একবার বুজবুনিয়া খালের শেষদিকের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করি। উত্তর দিকে মার্গির চর। হরিণের খোঁচ ধরিয়া শুলোর মধ্য দিয়া চলিতে থাকি। সঙ্গে ভোজালী বন্দুক। বওয়ালী কর্তৃক গোল গাছ কাটার শব্দ শ্রুত হইল। ইত্যবসরে হুড়মুড় শব্দে ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ লোকটিকে ধরিয়া বুকের তলে ফেলিয়া দিয়াছে। আমি দেখিতেছি যে, ব্যাঘ্রের আক্রমণে লোকটি চিৎ হইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। উহার স্কন্ধে ব্যাঘ্রে কামড় দিয়াছে। ব্যাঘ্র উঁকি মারিয়া দেখিতেছে—পার্শ্বে কোন মানুষ আছে কিনা?

আমি গুলি করার জন্য বন্দুক ধরিয়াছি। কিন্তু তাহাতে মানুষ মারা যাইতে পারে সেই ভয়ে কার্তুজ বাহির করিয়া দুঃসাহসের সহিত ব্যাঘ্রের গাত্রে বন্দুকের কুঁদো দিয়া সজোরে আঘাত করি। নাকের উপর আঘাত লাগিয়া ব্যাঘ্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। লোকটি এহেন অবস্থায় মৃতের ন্যায় অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যাঘ্র মরিয়াছে কিনা সে বিষয় আমি সন্দেহ পোষণ করিতেছি। আমি বন্দুক দ্বারা আর একটি আঘাত দিতে উদ্যত এমন সময় ব্যাঘ্র উঠিয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া যায়।

—ব্যাঘ্রাক্রান্ত লোকটির হাতে তখনও দা ছিল। বেহুশ অবস্থায় সে আমাকে আঘাত করিতে পারে মনে করিয়া তাহার হাতের দা কাড়িয়া লইলাম। বুকে হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে হুশ হইল। আমি দোয়া কালাম পড়িয়া ইহাকে ফুঁক দিতে লাগিলাম। তাহার উত্থানশক্তি রহিতপ্রায়। উহাকে বগলের মধ্যে ফেলিয়া খালের তীর

দিয়া পথ চলিতে থাকি। কিছুদূর গিয়া দেখি একজন লোক ভাত রান্না করিতেছে। উহার অন্য দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের সঙ্গে লইয়া ব্যাঘ্র আক্রমণের স্থান দেখাই। ব্যাঘ্রের লালা লোকটির গাত্রে জড়াইয়া গিয়াছে। গরম পানি দ্বারা উহা ধৌত করিতে বলিলাম। আরো পরামর্শ দিলাম যদি জ্বর আসে তবে যেন আমাকে খবর দেয়। উহার হস্তপদ বাঁধিয়া চীৎ করিয়া শোয়াইয়া দিতে বলিলাম। অনেক সময় ব্যাঘ্রাক্রান্ত ব্যক্তির 'চমচমা' রোগ হয় অর্থাৎ বেহুস অবস্থায় বলে এরে বাঘে খেল, বাঘে ধরলো, ঠ্যাকা ইত্যাদি।

—সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়া দেখি ঐ লোকটি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। ভাত খাইতে নিষেধ করিলাম। চিড়ে খাইতে উপদেশ দিলাম। অন্য দুই ভাই বলিল—"আমাদের ভাইকে এহেন বিপদের মধ্য হইতে জীবন রক্ষা করিয়াছেন. আপনার বন্দুকের কুঁদোর মূল্য কত?" কুঁদোর দাম ১০০, তাহারা আমাকে ৯০ টাকা দিল।

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের অধীনে কয়েকশত লোক বার মাস সুন্দরবনের বৃক্ষছেদনে রত থাকে। তাহাদেরও বিপজ্জনকভাবে ভয়-ভীতির মধ্য দিয়া বন্য জীবন অতিবাহিত করিতে হয়! চিরসবুজ দুবলা দ্বীপের পার্শ্বে এই সমস্ত কাঠুরিয়াদের কাঠ কাটার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়। ইহাদের উপস্থিতিতে নির্জন দুবলা দ্বীপও জনকোলাহলময় হইয়া ওঠে।

১৯৬৭ সাল, বৃক্ষছেদনের সময় একটা মানুষখেঁকো ব্যাঘ্র কয়েকজন কাঠুরিয়াকে উদরস্থ করিয়াছে। সমগ্র দুবলা অঞ্চলের কাঠুরিয়াদের মধ্যে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। জানুয়ারী মাসে ঐ মানুষখেঁকো বাঘিনী গোলপাতা কাটার সময় একটি লোককে ভক্ষণ করে। বরিশালের চেরাগ আলী নামক এক ব্যক্তির অর্ধভুক্ত লাশ দুই দিন পরে উদ্ধার করা হয়।

এই সময় নিউজপ্রিন্টের কাঠুরিয়াগণ ঐ এলাকায় কাঠ কাটিতে আরম্ভ করে। উক্ত বাঘিনী তাহাদের মধ্যে উৎপাত করিয়া শেষ পর্যন্ত আশাশুনি থানার কল্যাণপুর গ্রামের ফরমান গাজী নামক একজন কাঠুরিয়াকে ধরিয়া লইয়া জঙ্গল মধ্যে উধাও হয়। ফরমান গাজী যখন গভীরভাবে নিজ কাজে নিবিষ্ট ছিল সেই অসাবধান মুহূর্তে ব্যাঘ্রে তাহাকে আক্রমণ করে। লেফটেন্যান্ট জিয়াউল হক তাহার অর্ধভুক্ত লাশ উদ্ধার করেন।

ইহার পরও উক্ত বাঘিনী ভীষণ অত্যাচার শুরু করিলে কাঠুরিয়াদের মধ্যে এমনই আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, নিউজপ্রিন্ট মিলের কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। শ্রমিকগণ জঙ্গলে প্রবেশ করিতে ভীত হইয়া পড়ে। পেশাদার শিকারীদের নিযুক্ত করিয়াও ব্যাঘ্র মারা পড়ে না। কাঠুরিয়াদের ঐ স্থান হইতে দুই মাইল প্রশস্ত পশর নদীর অন্যতীরে নিরাপদ স্থানে বৃক্ষছেদনের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু বাঘিনী সাঁতরাইয়া নদী পারে ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া মানুষ ধরার জন্য সংগোপনে ওত পাতিতে থাকে।

পশর নদী ও জগলুল খালের সন্দ্বম স্থানে জন্দ্বলের পার্শ্বে কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া ৩০০ শ্রমিকের সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বাঘিনী সেখানে থাকিয়া একজনকে সজোরে আক্রমণ করিয়া আহত করে এবং অন্য একজনকে মাচান হইতে নীচে নামাইয়া আনে। অসীম সাহসিকতার সহিত সমস্ত শ্রমিকরা লাঠিসোঠাসহ বাঘিনীর উপর আক্রমণ করিলে সে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। আহতদের পরে চিকিৎসা করা হয়।

বাসস্থানে সুউচ্চ কুঁড়েঘরে ব্যাঘ্রের অকস্মাৎ নৈশ আক্রমণে সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বাঘিনীও নররক্ত পানের আশায় পাগলপ্রায় হইয়া ওঠে এবং পুনরায় শিকারের সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

৯ই আগষ্ট সুপারইনটেন্ডেন্ট জিয়াউল হক কার্য পরিদর্শনকালে উক্ত বাঘিনী তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকে। তিনিও ঐ বাঘিনী শিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত মানুষখেঁকো বাঘিনী মিঃ হকের দিকে মারমুখো হইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত, ইত্যবসরে দক্ষ শিকারী মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া রাইফেল দ্বারা গুলি করেন। বাঘিনী খাজুরবাড়ীর খালের মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িয়া গেলে উহার ব্যাঘ্রলীলা শেষ হইয়া যায়। একখানি দ্রুতগামী যন্ত্রচালিত নৌকায় মানুষখেঁকো বাঘিনীর লাশ ঘাটে ঘাটে ঘুরাইয়া সকলকে দেখান হয়! সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। মিঃ হকের ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। শিকারী লেখকের কাছে এই ঘটনার চাক্ষুস বিবরণী দিয়াছেন।

আট

বাঘে-মানুষে যুদ্ধ

সুন্দরবনের নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী, শিকারী, বাওয়ালী, মধু সংগ্রহকারী মৌয়াল প্রভৃতি মানুষ চিরদিন ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণ করে। কথায় বলে, "ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর।" শুধু কুমীর ও ব্যাঘ্র নহে, হাঙ্গর, বিষাক্ত সর্পও মানব জাতির ভয়াবহ শত্রু। ব্যাঘ্রের ন্যায় মানুষের মহাশত্রু সুন্দরবনে আর নাই। এই হিংস্র জন্তুর সহিত চিরদিন মানুষ যুঝিয়া আসিতেছে। সুন্দরবনের মানুষ কিভাবে ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং শিকারের সময় ব্যাঘ্রে কিভাবে মানুষ লইয়া খেলা করে সে সম্পর্কে আমবা কতিপয় জাজ্জ্বল্যমান ঘটনার উল্লেখ করিব। বাঘে মানুষ শিকার করিয়া থাকে। এইরূপ বাঘে ও মানুষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জেলার সীমান্তে সুপতি ফরেষ্ট ষ্টেশন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই এলাকার অধীন ৫ নম্বর ঘেরে ব্যাঘ্রের ভয়ানক উপদ্রব হয়। সেই জন্য মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালদের উক্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইত। একদল মৌয়াল— সংখ্যায় পাঁচ জন। তাহারা মনে করিল যে ঐ জঙ্গলে যখন অন্য কেহ যায় নাই তখন প্রচুর মধু তথায় পাওয়া যাইবে। ব্যাঘ্রভীতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অতিলোভের বশবর্তী হইয়া তাহারা মধু সংগ্রহের জন্য সেই জঙ্গলে প্রবেশ করে। জঙ্গল মধ্যে তাহাদের একজনকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া মস্তকের পিছনে ও কপালে দুইপাটী দাঁত বসাইয়া দেয়। ব্যাঘ্রের হিংস্র কামড় ও ঝট্‌কানিতে মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সঙ্গী চারিজন সজোরে লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে থাকায় মৃতের লাশ ফেলিয়া ব্যাঘ্রটি আর একজনকে আক্রমণ করিল। পুনরায় সকলে লাঠি দ্বারা ব্যাঘ্রের সঙ্গে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় লোকটিকে বাঁচাইতে সক্ষম হইল। এইভাবে বীরত্বের সহিত এহেন হিংস্র জন্তুর সঙ্গে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিয়া তাহারা মৃত সঙ্গীর লাশ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই ধরনের বাঘে-মানুষে লড়াই সুন্দরবনে বিরল নহে।

কপোতাক্ষী ও খোলপেটুয়া নদীর সঙ্গমস্থলে ঘড়িলাল পুলিশ ক্যাম্প এবং উহার দক্ষিণে গোলখালী ও আংটীহারা গ্রাম। ইহার দক্ষিণে কোন লোকালয় নাই। শুধু বন আর বন। ইহার পশ্চিমে নদী এবং নদীতীরে সুন্দরবন এবং ব্যাঘ্রের লীলাভূমি। এতদঞ্চলের কোন কোন গ্রাম শুধু ক্ষুদ্র একটি খালের দ্বারা সুন্দরবন ও লোকালয়ের সীমা নির্দেশ করিতেছে। এই সমস্ত সীমান্তবর্তী গ্রামে কোন কোন সময়ে ব্যাঘ্র আসিয়া গরু, ছাগল ধরিয়া লইয়া যায়। খবর পাইলে জনগণ দলবদ্ধ হইয়া লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত

হইয়া ব্যাঘ্র আক্রমণ করে। এপারে মানুষ, ওপারে বাঘ, মাঝে একটি ক্ষুদ্র খাল। ব্যাঘ্রের সন্দ্বে লড়াই করিয়া ইহারা জীবনধারণ করে। বিপদের মধ্যে চিরদিন বসবাস করিলেও ইহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় না।

খোলপেটুয়ার পূর্বতীরে চাঁদনীমুখো গ্রাম, পশ্চিম তীরে গভীর অরণ্যানী। কোন কোন সময়ে গ্রামে ব্যাঘ্র আসিয়া থাকে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। বুড়ীগোয়ালিনী অফিসের পার্শ্বস্থ জন্দ্বলে একটি ব্যাঘ্রে তিন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে। অকস্মাৎ ব্যাঘ্রটি উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি গো-বৎস আক্রমণ করে। এই সংবাদে গ্রামের লোকেরা ছুটিয়া ব্যাঘ্রটিকে তাড়া করিয়া আক্রমণ করে। চরের উপরিস্থিত জন্দ্বলে ব্যাঘ্রটি লুকাইয়া থাকে। নদী তীরের ভেড়ীর উপর দাঁড়াইয়া ১৮টি গুলি করা হয়। অসংখ্য লোকে এই দৃশ্য দেখিতে থাকে। ঘন বৃক্ষাদির জন্য গুলি ব্যাঘ্রের গাত্রে লাগে না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে শিকারী মেহের শেখ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আসন গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ৫/৬ জন লোক লাঠি দ্বারা ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে ৩ জনকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া আঘাত করে, আক্রান্ত ব্যক্তিদের একজন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষ পর্যন্ত মেহের শেখ গুলী করিয়া ব্যাঘ্রটিকে মারিয়া ফেলে।

সুন্দরবনের সন্নিকটে ঝানু শিকারী ডাক্তার তমিজউদ্দীনের বাড়ী। গ্রামের নাম গোড়ইখালী। মাঝখানে একটি বিল—এপারে লোকালয় এবং অন্যপারে ব্যাঘ্র ও হরিণের লীলাক্ষেত্র গভীর বনানী। এই শিকারী জীবনে কয়েকবার ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছেন এবং তাঁহার হাতেও কয়েকটি হিংস্র ব্যাঘ্র মারা পড়িয়াছে। ব্যাঘ্রভীতি তাঁহার অন্তরে নাই। হিংস্র জন্তুর নাম শুনিলে শিকারী আনন্দে নাচিয়া উঠেন। শিকারের নেশা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি শিকারের একটি চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়াছেন।

"ইং ১৯৬০ সালের আগস্ট মাস। শিবসা নদীর পূর্ব তীরে বিখ্যাত শেখেরট্যাকের জন্দ্বল। ইহার উত্তর পার্শ্বে বাদিয়ার খাল। উহার দক্ষিণ তীরে আমি একটি বন্য মুরগী লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। এমন সময় খালের পার্শ্বে রঙীন কম্বল গায়ে কেহ শুইয়া আছে মনে হইল। অচিরাৎ বুঝিতে পারিলাম একটি ব্যাঘ্র শায়িত অবস্থায়। কালবিলম্ব না করিয়া ব্যাঘ্রটিকে গুলি করিলাম। গুলির আঘাতে সে ভীষণ গোঁ গোঁ শব্দে চিৎকার দিল। এই হিংস্র চিৎকারে যেন সমগ্র বনভূমি প্রকম্পিত হইল। ব্যাঘ্রের গোঙানি আর হিংস্র চাহনি মিলিয়া এক ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার গুলি করায় ব্যাঘ্র পড়িয়া গেল। ব্যাঘ্র মৃত জানিয়া উহার সন্নিকটে গিয়া বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা উহার দেহে ধাক্কা মারি। সেই ধাক্কায় ব্যাঘ্রটি গর্জন করিয়া আমাকে আক্রমণ করে। আমিও বন্দুক দ্বারা সাহসের সহিত উহা প্রতিহত করি। সৌভাগ্যক্রমে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে আপনা আপনি গুলি হইয়া ব্যাঘ্রের গাত্রে আঘাত লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আজিও সেই ভীম গর্জন, সেই ভয়াবহ মূর্তি, হিংস্র চাহনি, সেই গোঙানি এবং সেই আক্রমণের কথা মনে করিলে আমি শিহরিয়া উঠি। ব্যাঘ্রের আলোচনা করিলে সেই

ভয়াবহ দৃশ্যের কথা অন্তরে জাগরূক হয়। এ জীবনে সে দৃশ্য ভুলিবার নহে।" শিকারী ব্যাঘ্রের মস্তক শুকাইয়া সযত্নে গৃহে রাখিয়া দিয়াছেন এবং উহার দন্তগুলি দ্বারা একখানি সৌখিন ছড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন।

উক্ত শিকারীর বর্ণনা হইতে জানা যায়—তিনি একদা ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ভদ্রানদীর তীরে বাইনতলা দোয়ানের মুখে জনৈক সন্দীসহ বৃক্ষে আরোহণ করিতে উদ্যত, এমন সময় অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ব্যাঘ্রের সন্ধান করিবার পূর্বেই ব্যাঘ্র তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়াছে। ব্যাঘ্র দর্শনে সন্দীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সে কুমীর হান্দরের আক্রমণ ভুলিয়া নদীমধ্যে ঝম্প দিয়া কোন প্রকারে সাঁতরাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। "বন্ধুর পশ্চাৎ অপসারণে আমিও বিব্রত হইয়া পড়ি এবং একটু ঘুরিয়া গোল গাছের পিছনে দাঁড়াইয়া দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া বন্দুক তুলিয়া ব্যাঘ্রের দিকে লক্ষ্য করি। এতদ্দর্শনে উক্ত হিংস্র জন্তুটি ভীষণ বেগে স্বীয় লেজ ঘুরাইতে থাকে এবং ভীম রবে বার বার গোঙানি দেয়। ব্যাঘ্রের মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। সে কি বিকট মূর্তি! উহার হিংস্র চাহনিতে আমিও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে গুলি করাও সম্ভব নয়। গুলি করিলে রক্ষা ছিল না। আমি ব্যাঘ্রের গর্জনে ভীত এবং ব্যাঘ্র বন্দুক দর্শনে সন্ত্রস্ত। অনোন্যপায় হইয়া আমিও বন্দুক সহ নদীতে পড়িয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হই।

আরজান সর্দার নামক জনৈক বৃদ্ধ শিকারীর বাড়ী পাইকগাছা থানার অন্তর্গত চৌকুনী গ্রামে। অভাবের তাড়নায় আরজান স্বীয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া শিবসা নদীর পূর্ব তীরে সুতারখালী গ্রামে বসবাস করিত। আরজান ১৯৬৭ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই দুর্জয় শিকারী সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনা যায়। একদা উক্ত শিকারী ব্যাঘ্র শিকারের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকার হাঁড়ি এবং বেত সহ জন্দলে প্রবেশ করে। আরজান কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। কয়েক মিনিট অন্তর এই কৃত্রিম গর্জন চলিতে থাকে। আরজানের কৌশলে ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কেমন করিয়া সে গুলি করিবে? সে দেখিল বাঘ্রটি ছটফট করিতেছে এবং উহার সর্বান্দ দুলিতেছে। ব্যাঘ্র প্রমত্ত পাগল, এক নিমেষও অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। ব্যাঘ্রকে রুখিবার ক্ষমতা আরজানের নাই। পক্ষান্তরে উহাকে গুলিবিদ্ধ করিতে না পারিলে শিকারীর রক্ষা নাই। হিংস্র ব্যাঘ্র তাহাকে শেষ করিয়া দিবে। আরজান হাঁড়ি টানিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় আওয়াজ তুলিল। ব্যাঘ্র বাঘিনীর সাক্ষাতের জন্য উন্মত্ত। সে খালের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আরজান হাঁড়িতে আবার টান দিল। ব্যাঘ্রও তাহার দিকে আগাইয়া আসিল। শিকারী এবার স্বীয় মুখ দিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল এবং বন্দুক উঁচু করিয়া ধরিল। ব্যাঘ্র মাত্র ১০ হাত দূরে। সে মদমত্ত অবস্থায় শিকারীর দিকে তাকায়। বীরত্বের সহিত আরজান গুলিবিদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্রটিকে মারিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে।

অন্য আর একটি ঘটনা হইতে জানা যায় যে, আরজান তাহার এক সঙ্গীকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। ব্যাঘ্র অন্যূন ১২ হাত দূরে। শিকারীকে দেখিবামাত্র ব্যাঘ্র দুই বাহুর উপর দাঁড়াইয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। শিকারী ও ব্যাঘ্র একে অন্যের দিকে তাকাইতেছে। উভয়েই হতভম্ব এবং উভয়েরই চক্ষু হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। শিকারী বীর-বিক্রমে পলকহীন নেত্রে ব্যাঘ্রের দিকে তাকাইয়া আছে। ব্যাঘ্রের গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে শিকারী জোরে গালাগালি করিতেছে। হিংস্র জন্তুর মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছে। ব্যাঘ্র গজ্‌গজ্‌ শব্দ করিতেছে। ব্যাঘ্র যেমন গোঁ গোঁ শব্দ করে শিকারীও অবিকল সেইরূপ শব্দ করে। বাঘ গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে বীভৎসভাবে গাঁক্‌ করিয়া উঠে। শিকারীও তেমনি গাঁক্‌ করিয়া উঠে। শিকারী গুলি করা সমীচীন মনে করিল না। ব্যাঘ্র ও শিকারী শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ভিন্নমুখী হইয়া প্রস্থান করিল।

সুন্দরবনের পার্শ্বেই বিখ্যাত শিকারী চিকন গাজীর বাড়ী। অমাবস্যার সময় স্রোতাবেগ অত্যধিক। নদীতে কানায় কানায় জোয়ারের জল—ভরা ভাদরের ভরা নদী। খাল নালার অবস্থাও তদ্রূপ। বহুদিন আগের কথা—শিকারী চিকন গাজী একটি গাদা বন্দুক হস্তে তেঁতুলতলার খাল অতিক্রম করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। সম্মুখে অসংখ্য হ'দো গাছের ঝোপ, যাহার নীচে ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকে। নিঝুম নিরালা বন, চারিদিক যেন থমথম করিতেছে। জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে শিকারীর অন্তরে এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইল। সে মনে করিল এইখানেই ব্যাঘ্র লুক্কায়িত আছে। ব্যাঘ্রের কথা মনে করিয়া তাহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল। আজ তাহার নসিব মন্দ। গাদার বন্দুকে ব্যাঘ্র শিকার দুরূহ ব্যাপার। সে দ্রুত এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিল। দেখিতে পাইল নিকটেই একটি ব্যাঘ্র ওৎ পাতিয়া শুইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে মস্তক নাড়াইতেছে। শিকারী ভীত ও সন্ত্রস্ত—চিন্তায় তাহার অন্তর ব্যাকুল। বিশেষ চিন্তা, গাদার বন্দুক এবং গুলি যদি ঠিকমত না লাগে! শক্ত ডাল হইতে সে বৃক্ষের পাতা নড়াইয়া শব্দ করিল। ইহাতে ব্যাঘ্র মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবা মাত্র শিকারীর অব্যর্থ গুলি উহার কপালে লাগিয়া গেল। লৌহনির্মিত খেপলা জালের কাঠির দ্বারা সে গুলি করিয়াছিল। গুলির আঘাতে ব্যাঘ্রটি ভীষণ গর্জন করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। ইহাতে যেন চারিদিকের জঙ্গল প্রকম্পিত হইল। দেখা গেল, গুলি কপালে লাগিয়া স্কন্ধের পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়াছে এবং উহার ব্যাঘ্রলীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

সুন্দরবনের সংলগ্ন অসংখ্য গ্রাম আছে। একদিকে সুন্দরবন অন্যদিকে লোকালয়। এই সমস্ত গ্রামের লোকে ঘরে বসিয়া সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও হরিণের ডাক শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে! অনুরূপভাবে ব্যাঘ্র ও হরিণে জঙ্গলের মধ্য হইতে জনকোলাহল শুনিয়া থাকে। কোন কোন সময় গ্রামে ঢুকিয়া ব্যাঘ্র গবাদি পশু আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়।

জনৈক বিখ্যাত শিকারীর বর্ণনায় জানা যায় যে, সে একদিন দুইজন সঙ্গীসহ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। অকস্মাৎ তাহারা একজোড়া বৃহৎকায় বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সঙ্গীদ্বয় ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত হইয়া একে অন্যকে জড়াইয়া বিকট চিৎকারে বনভূমি কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। ব্যাঘ্র দুইটি শিকারীর দিকে হিংস্র চাহনী এবং শিকারীও ব্যাঘ্রদ্বয়ের দিকে তেমনই ভাবে একনেত্রে তাকাইয়া আছে! সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। শিকারী দুর্জয় সাহসের সহিত ব্যাঘ্রদ্বয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত এমন সময় উহারা ভীষণভাবে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে অরণ্যানীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

মেহের গাজী : মেহের গাজী সুন্দরবনের দুর্জয় শিকারী। গাবুরা ১০নং সোরা গ্রামে তাহার বাড়ী। সুন্দরবনখ্যাত শিকারী বংশে মেহেরের জন্ম। জঙ্গলের সন্নিকটে বাড়ী, জঙ্গলই তাহার কর্মক্ষেত্র এবং জঙ্গলেই তাহার মৃত্যু। চাঞ্চল্যকর ও ভয়াবহ কাহিনীর সহিত মেহেরের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মেহের আজীবন ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। বহু ব্যাঘ্রের ব্যাঘ্রলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। বিভিন্ন সময় ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে ব্যাঘ্রের হাতে প্রাণ দিয়াছে।

মেহেরের পিতাও খ্যাতনামা শিকারী ছিল। নাম কিনু গাজী। ব্যাঘ্রভীতি যেখানে দেখা দিত কিনু গাজী সেখানেই উপস্থিত হইত। কিনু গাজীরা চারি ভাই। অন্য ভাইদের নাম ইসমাইলগাজী, পাচু গাজী ও ঝড়ু গাজী। তাহারা প্রত্যেকেই ব্যাঘ্র শিকারে দক্ষ। ইতিহাসে আমরা সাধারণতঃ রাজা, মহারাজা, বীর যোদ্ধা ও সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি। এই একটি দীন দরিদ্র পরিবার সুন্দরবনের অধিবাসী। বাড়ীতে কুঁড়ে ঘর। সেখানেও আরামে থাকা জোটে না। সর্বদা এই বংশের সন্তানেরা গহীন অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের জীবনেতিহাস যেমন চাঞ্চল্যকর ও ভয়াবহ, তেমনই মধুর। গরীব হইয়াও মানুষ অভ্যাসক্রমে কতদূর দুর্জয় ও সাহসী হইতে পারে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ইহাদের জীবনালেখ্য। চমকপ্রদ গল্প বা কাহিনী নহে—উহা নিখুঁত ইতিহাস। সুন্দরবনের ইতিহাস পুস্তকে এইরূপ একটি বংশের কতিপয় বীর সন্তানের কথা সংযোজন করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। ইহাদের বাড়িতে গিয়াছি। একাধিকবার গ্রামে বসিয়া দিবারাত্র ভয়াবহ ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট হইতে সেগুলি যাচাই করিয়াছি। এখন একে একে সে ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

কিনু গাজীর দুই পুত্র—মেহের গাজী ও নিজামদি। উভয় ভ্রাতা ঝানু শিকারী, প্রত্যেকে ৫০টির অধিক ব্যাঘ্র শিকারের গৌরব অর্জন করিয়াছে। সুন্দরবনে এপ্রকার পেশাদার শিকারীর সংখ্যা বিরল। মেহেরের পুত্র হাল জামানার সেরা শিকারী পচাব্দী গাজী। পচাব্দীর ভাই হাসেমও শিকারী। উভয় ভ্রাতা সরকার কর্তৃক ব্যাঘ্র শিকারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। বার মাসের অধিকাংশ সময় তাহারা জঙ্গলে থাকে। মেহের, নিজামদি ও পচাব্দী এই তিনজন প্রধান শিকারীর বিষয়ই আমরা বর্ণনা করিব।

মেহের জীবনে অসংখ্য ব্যাঘ্র শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। বনবিভাগের কর্মচারী ও জনসাধারণের নিকট সে সুপরিচিত। দুঃসাহসী মেহের জীবনে বহুবার সরকার হইতে তাহার কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কল্‌পাতা শিকারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মেহের এই পদ্ধতিতে শিকারে দক্ষ। কপোতাক্ষ ফরেষ্ট ষ্টেশনের পার্শ্বে আংটিহারা। গ্রামের দক্ষিণে সিংহের গভীর জঙ্গল। ১৩৫২ সাল। ব্যাঘ্রের অত্যাচার সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। গ্রামে ঢুকিয়া ব্যাঘ্রে ছাগল ও কুকুর ইত্যাদি ধরিয়া লইয়া যায়। অবশেষে মেহেরের ডাক পড়ে। দুইদিন কল্‌পাতিয়া বাঘ পড়ে না। শেষ দিনে পুনরায় মেহের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কল্‌পাতিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। মেহেরের সঙ্গী তাহার সুযোগ্য ভ্রাতা নিজামদী ও পুত্র পচাব্দী গাজী। গভীর রাত্রিতে গুলির শব্দ শ্রুত হয়। অনুমিত হইল গুলির আঘাতে ব্যাঘ্র পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঘ্রের সামনের পায়ে গুলি লাগিয়াছিল। কিন্তু ব্যাঘ্র মরে নাই। সে ক্ষিপ্ত হইয়া শিকারীকে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। গুলি খেকো ব্যাঘ্র শিকারীকে আক্রমণ করিবার জন্য মদমত্ত হইয়া উঠে! হিংস্র জন্তুর হিংস্র স্বভাব ক্রমাগত বর্ধিত হইতে থাকে। জঙ্গলের তিন প্রধান তিন ঘন্টা পরে শেষ রাত্রিতে শিকারের স্থানে উপস্থিত হইয়া আহত ব্যাঘ্রটিকে খুঁজিতে লাগিল। শিকারীদের দর্শনে ব্যাঘ্রটি দৌড় দিল। শিকারীরাও ব্যাঘ্রের পিছন পিছন কর্দমাক্ত ও জঙ্গলময় স্থানের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এই সময় ধূর্ত ব্যাঘ্র চক্র দিয়াছে। ঝানু শিকারীগণ বুঝিয়াও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

এই চক্র নরখাদকের এক অভিনব কৌশল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। চক্র দিবার পর মানুষখেঁকো ব্যাঘ্র শিকারীর পশ্চাতে পড়ে। আবার অধিকতর ধূর্ত ব্যাঘ্র চক্র না দিয়া অতীব কৌশলে সোজা গিয়া শিকারীর পিছনে পড়ে। এই অবস্থায় শিকারীকে মহাবিপদে পতিত হইতে হয়। অনেক সময় ঝানু শিকারীও বুঝিতে পারে না ব্যাঘ্র তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তেমনই ধূর্ত ব্যাঘ্রও বুঝিতে পারে না শিকারী উহার পশ্চাতে বুদ্ধি-কৌশল ও দক্ষতায় একে অন্যের সহিত সর্বদা প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। অস্ত্রধারী ও ঝানু শিকারীদের নিকট ব্যাঘ্রভীতি নাই বলিলে চলে। আবার কত নিরীহ লোক ব্যাঘ্রের হাতে প্রাণ দিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের বিশ্বাস, গড়পড়তা যত ব্যাঘ্র প্রতি বৎসর মানুষের হস্তে মরে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষ ব্যাঘ্রের হাতে মারা পড়ে।

যাহা হউক, হ'দোগাছের জঙ্গলে ব্যাঘ্রটি লুকাইয়া থাকে। তিনজনে ব্যাঘ্রের খোঁজে ব্যস্ত এমন সময় অকস্মাৎ লুক্কায়িত ব্যাঘ্রটি লম্ফ দিয়া মেহেরকে আক্রমণ করিয়া তাহার মুখমণ্ডলের ডানদিক উপড়াইয়া দেয়। মস্তক হইতে ঠোঁট পর্যন্ত বক্রভাবে মেহেরের মুখমণ্ডলের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ বাঘের কামড়ে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মেহের ও নিজামদীর হাতে দুইটি বন্দুক এবং পচাব্দীর হাতে লাঠি। দুঃসাহসী মেহের এহেন ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা জ্ঞান হারায় নাই। দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া পুত্র পচাব্দীকে বলিতে থাকে, "আমি মরিব না, তুই নিজামদীকে দেখ।" ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত

ব্যাঘ্রে নিজামদীকে আক্রমণ করিয়াছে। ঝানু শিকারীরা জানে যে, দেহে বা মস্তকে ব্যাঘ্র কামড়াইলে মানুষের জীবনাশঙ্কা অত্যধিক। কিন্তু হস্তপদ কামড়াইলেও মানুষ বাঁচিয়া যায়। নিজামদী উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা ব্যাঘ্রের প্রাথমিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বাম হস্তের কনুই আগাইয়া দেয়। মুহূর্ত মধ্যে হিংস্র ব্যাঘ্র তাহার হস্তে গুরুতর কামড় দিয়া সরিয়া পড়ে। ব্যাঘ্রের কামড়ে নিজামদীর বাম হাতখানা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সে জীবনে বাঁচিয়া যায়। নিজামদী এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বাম হস্ত খণ্ডিত হইবার পরও সে একহস্তে একাকী বন হইতে বনান্তর ঘুরিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

ব্যাঘ্রের আক্রমণে মেহেরের কয়েকটি দাঁত ও চোয়ালের একাংশ উড়িয়া যায়। ডান পার্শ্বের কয়েকটি দাঁত উপড়াইয়া গেলেও দুইটি মাড়ির দাঁত বাঁচিয়া যায়। তাহার ঠোঁটের একাংশও ব্যাঘ্রে লাইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসার পর মেহের কোনপ্রকারে জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু সে প্রায় অচল হইয়া পড়ে। গাল হা করিয়া কিছু খাইতে পারিত না। ছোট ছেলে-মেয়েরা ভাত চট্‌কাইয়া চামচ দ্বারা তাহার গালে প্রবেশ করাইয়া খাওয়াইত। মুখ দিয়া লাল পড়িত। সে ভালভাবে কথা বলিতে পারিত না। তাহার চক্ষুদ্বয় কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল। ১৩৫৭ সাল পর্যন্ত মেহের যতদিন বাঁচিয়াছিল, উহার মধ্যেও সে ব্যাঘ্র শিকারে নিরস্ত হয় নাই। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কত অনুরোধ করিয়াছে, "মেহের ভাই! তুমি আর ব্যাঘ্র শিকারে যাইও না—এভাবে এখন বনে গেলে তোমার আর রক্ষা নাই।" মেহেরের স্ত্রী কত অনুরোধ করিয়াছে। সে তাহা কখনও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বনবিভাগের সাহেবরা বলিতেন ঃ "মেহের, ব্যাঘ্র শিকার ছাড়িয়া দাও, জীবনে কত ব্যাঘ্র মারিয়াছ, ইহাতেও তোমার তৃপ্তি হয় নাই? তুমি জঙ্গলে আসা বন্ধ কর।" মেহের বলিত ঃ "আমাকে তো বাঘেই খেয়েছে, আমি বাঘের বংশ ধ্বংস করে ছাড়বো।" উপরোক্ত দুর্ঘটনার পরও মেহের সাতটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছে। মেহেরের মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় ব্যাঘ্র শিকারের পর সে খুলনা শহরে আসিয়া হাসিমুখে পুরস্কার লইয়া যাইত। বিচিত্র মেহেরের জীবনালেখ্য।

মেহেরের চাচা ইস্‌মাইলও বিখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারী। দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্যাঘ্র গুরুতর আক্রমণ করিয়া অঙ্গহানি করিয়া দিয়াছে তজ্জন্য ইস্‌মাইলের চোখে নিদ্রা নাই। সে ইহার প্রতিশোধ কি করিয়া লইবে? ইস্‌মাইল বীরের ন্যায় হুংকার দিয়া বলিল, "কেয়ছা বাঘ না দেখিয়া ছাড়িব না।" গ্রামবাসীরা তাহাকে জঙ্গলে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু ইস্‌মাইল সে নিষেধে কর্ণপাত করিল না। সে বন্দুকসহ পূর্বোক্ত সিংহের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্র শিকারের জন্য কল্ পাতিতে যায়। এমন সময় হঠাৎ ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ইস্‌মাইল এইভাবে ব্যাঘ্রের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

বিশ বছর আগের কথা। উপরোক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ব্যাঘ্র শিকারী মেহের তিনজন সঙ্গীসহ পাঙাশিয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া খালের মধ্যে

নৌকাপরি নিশাযাপন করে। কার্তিক মাস, শীত তেমন পড়ে নাই। শেষ রাত্রিতে ব্যাঘ্রের ডাক শুরু হয়। মেহের বৃক্ষের উঁচু ডালে আরোহণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ভন্দিতে ডাকিতে আরম্ভ করে। ডাক শুনিয়া ব্যাঘ্র নিকটে আসে। কিন্তু ব্যাঘ্রে মানুষের ঘ্রাণ পাইয়া চলিয়া যায়। বৃক্ষ হইতে মেহের নৌকায় চলিয়া আসে। শিকারী আবার জন্দলে প্রবেশ করে। খুঁজিতে খুঁজিতে ব্যাঘ্র মাত্র কয়েক হাত দূরে দৃষ্টিগোচর হয়।

মেহের কালবিলম্ব না করিয়া ব্যাঘ্রের দিকে গুলি ছুড়িয়া মারে। ব্যাঘ্র ভীম গর্জনে মেহেরের উপর পতিত হয়। ব্যাঘ্র হা-হা করার সন্দে সন্দে মেহের বন্দুকের ব্যারেল উহার গালে ঢুকাইয়া দেয়। মেহের দুর্দমনীয় সাহসের সহিত বামহস্তে বন্দুকের ব্যারেল চাপিয়া ধরে এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া ব্যাঘ্রের কোমর ধরিয়া অনবরত ঘুরাইতে থাকে। সন্দীরা ভীষণ চিৎকার দিলে ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া ছুটিয়া পালায়। মেহের ব্যাঘ্রের ধাক্কায় নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়।

শিকারের নেশায় মেহের পাগল। ব্যাঘ্র শিকার না করিয়া বাড়ী ফিরিবে না। কি করিয়া সে গ্রামে মুখ দেখাইবে? জিদী মেহের ব্যাঘ্র শিকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—এ প্রতিজ্ঞা সে ভন্দ করিতে পারে না। পরদিন মেহের অন্য একটি ব্যাঘ্রের সন্ধান পায়। গুলি করা মাত্র ব্যাঘ্রটি দৌড় দেয়। মেহের ব্যাঘ্রের পিছনে ধাওয়া করে এবং পর পর আরও তিনবার গুলি ছুঁড়িয়া মারে। এইভাবে ক্রমাগত সে কয়েকদিন ঐ ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিতে থাকে। সাধারণ গাদার বন্দুক। উহা দ্বারা তাড়া করিলে ব্যাঘ্রে তাহাকে তাড়া করে। শিকারী সন্দীদের লইয়া নৌকায় ফিরিয়া আসে। পরদিন গভীর জন্দলে ব্যাঘ্রের অনুসন্ধানে মেহের ব্যস্ত, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র হাঁ-হাঁ করিতে করিতে তাহাকে আক্রমণ করে। অনোন্যপায় হইয়া মেহের বন্দুকের কুঁদো ব্যাঘ্রের গালের মধ্যে পুরিয়া দিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসে। একটু পরেই ব্যাঘ্রটি বন্দুক উগরাইয়া ফেলিয়া দেয়। কিছু পরে মেহের বন্দুক কুড়াইয়া আবার ঠিক করিয়া রাখে। ইতিমধ্যে নৌকার চাউল ফুরাইয়া গিয়াছে। এক সের চাউল দ্বারা ৪ জন লোক চারদিন কাটাইয়াছে। সকলেই প্রায় অনাহারী। জিদী মেহের ব্যাঘ্র না মারিয়া বাড়ী ফিরিবে না। সেই সময় মেহেরের পিতা কিনু গাজী জীবিত ছিল। বৃদ্ধ কিনু গাজী সংবাদ পাইয়া পুত্রের সহিত যোগ দেয়। অতঃপর তেরটি গুলি করার পর পিতা ও পুত্রের হস্তে ব্যাঘ্রটি নিহত হয়।

সুন্দরবনের যেখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব দেখা দিত সেখানে দুর্জয় ব্যাঘ্র শিকারী মেহেরের ডাক পড়িত। বনবিভাগ হইতে মেহেরকে বন্দুক ও কার্তুজ সরবরাহ করা হইত। একবার মেহের সরকারী ও নিজস্ব বন্দুকসহ ডিন্দিমারীর জন্দলে যায়। মেহের এখন বার্ধক্যে পতিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সাল, মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বের কথা। এই সময় আত্মীয়-স্বজন তাহার মৃত্যু সন্নিকটে বুঝিতে পারিয়া ব্যাঘ্র শিকারে তাহাকে সাহায্য করে না। ক্রোধে ও ক্ষোভে বৃদ্ধ শিকারী গজ্ গজ্ করিতে থাকে। ব্যাঘ্র শিকারের সন্দী হিসেবে কেহই সাড়া দেয় না। শেষ পর্যন্ত মেহের দুইটি শিশুকে সন্দে লইয়া জন্দলে প্রবেশ

করে। যে নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, আমরণ তাহা অটুট থাকিবে। জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে নৌকা হইতে হাত ধরিয়া জঙ্গলে উঠান হয়। বৃদ্ধ একটিমাত্র চোখে সামান্য দেখিতে পায় ব্যাঘ্রের চলাপথের পাগ্‌মার্ক। শিকারী সেখানে বন্দুক পাতিয়া রাখে। গভীর নিশীথে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। ভোরবেলা তাহারা যাইয়া দেখে একটি বৃহৎকায় বাঘিনী মরিয়া পড়িয়া আছে। অতঃপর সকলে ধরাধরি করিয়া ঐ বাঘিনীকে নৌকায় আনিয়া রাখে।

একটু পরে জোড়া ব্যাঘ্রের অন্যটি বাঘিনীর খোঁজে ডাকিতে আরম্ভ করে। ব্যাঘ্রের আগমন শুনিয়া মেহের আনন্দ ও নেশায় নাচিয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ তীরে অবতরণ করিয়া ব্যাঘ্রটি যেদিকে ডাকিতেছিল, মেহের সেদিককার জঙ্গলে অগ্রসর হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্যাঘ্র পাওয়া গেল না। নিশা সমাগমে মেহের দুইটি শিশুকে সঙ্গে লইয়া হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে ব্যাঘ্রের চলাপথে কল পাতিয়া রাখিয়া আসে। ব্যাঘ্র যে পথ দিয়া যায়, সেইপথ দিয়া আবার ফিরিয়া আসে এবং সেই চলাপথেই কলপাতা পদ্ধতিতে শিকারের সহজ উপায়। জরাজীর্ণ মেহের কল পাতার সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ীতে মুখ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ডাক শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও ডাকিতে ডাকিতে বন্দুকের নিকটবর্তী হয়। মেহের ব্যাঘ্রের আগমন জানিতে পারিয়া নৌকায় আরোহণ করে এবং নদীর মধ্যে নৌকায় বসিয়া অতীব সতর্কতার সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকের আওয়াজ হয়। ব্যাঘ্রের গায়ে গুলি লাগে। কিন্তু ব্যাঘ্র মরে নাই। পাগমার্ক দেখিতে দেখিতে মেহের ব্যাঘ্রের অনুসরণ করে। খালের তীর দিয়া কিছু দূর গিয়া শিকারী দেখিতে পায়, ব্যাঘ্র শুইয়া আছে। গুলিখেকো ব্যাঘ্র শিকারী দর্শনে ভীষণভাবে গোঁ-গোঁ করিয়া উঠে। গোঁ-গোঁ করিবার পর গাঁক্ করিয়া মেহেরকে আক্রমণ করে। মেহের লম্ফ দিয়া খালের কাদার মধ্যে পড়িয়া যায়।

সুন্দরবনের কাদা যাহারা না দেখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বুঝা মুশকিল। এই কাদায় নামা মাত্র পদদ্বয় প্রায় এক ফুট বসিয়া যায়। কাদা হইতে পা পৃথক করিতে বেশ কষ্ট হয়। সুন্দরবনের কাদা সহজে ছাড়ান যায় না। সেইজন্য রসিক লোকে উহাকে প্রেম কাদা বলিয়া উপহাস করে। খালের কাদায় মেহেরের সর্বাঙ্গ ভরিয়া যায়। পিছনের ছেলেটি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়ে। শিশু দুইটি নৌকায় ক্রন্দন করিতেছে। এমন সময় মেহের কর্দমাক্ত অবস্থায় আসিয়া উহাদিগকে গালিবর্ষণ করে। সে নৌকা লইয়া পুনরায় সেখানে যায়। খালের পার্শ্ব দিয়া বৃদ্ধ শিকারী হাঁটিতে থাকে। তাহার চলার পথে কাদার চট্ পট্ শব্দ হয়। ক্রোধান্ধ ব্যাঘ্র হা হা করিতে করিতে লম্ফ দিয়া খালের কাদার মধ্যে পড়িয়া যায়। ব্যাঘ্রের পা কাদায় আটকাইয়া গিয়াছে। সে ক্রোধে পাগলপ্রায়। মানবরক্তের নেশায় ব্যাঘ্র ছুটাছুটি করিতে থাকে। ব্যাঘ্রে কাদা ছিটকাইতেছে। মেহের কাদার মধ্যে গুলি করিয়া দেয়।

মেহেরের গায়েও কাদা এবং কাদার মধ্যে পড়িয়া সেও নড়িতে পারিতেছে না। শিকারী ও শিকারের অবস্থা কর্দম নিপতিত গর্দভের ন্যায়। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে

পিছনের ছেলেটি মেহেরকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। সেই অবস্থায় মেহের পুনরায় গুলি করিয়া দেয়। ব্যাঘ্রে সর্বশক্তি দিয়া শিকারীকে আক্রমণ করে। মেহের ব্যাঘ্রের গলার মধ্যে দুর্জয় সাহসের সহিত বন্দুকের ব্যারেল প্রবেশ করাইয়া দেয়। ভাগ্যক্রমে বন্দুকে গুলি পোরা ছিল তাহাতে আওয়াজ হইয়া যায়। ব্যাঘ্র-মানুষের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাজীর্ণ মেহের জয়লাভ করে। গুলির আঘাতে ব্যাঘ্র শেষ পর্যন্ত মরিয়া যায়। জোড়া ব্যাঘ্র অর্থাৎ ব্যাঘ্র ও বাঘিনীকে মারিয়া মেহেরের সে কি আনন্দ! জীবনযুদ্ধে মেহের আজ জয়ী। নিহত ব্যাঘ্রদ্বয়কে শিকারী বনকরের অফিসে উপস্থিত করে। সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া শতমুখে মেহেরের প্রশংসা করিতে থাকে। সর্বত্র ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ডিন্দিমারীর জঙ্গলে মেহের আর একটি মানুষখেঁকো ব্যাঘ্রকে কল পাতিয়া শিকার করে। এই সময়ের মধ্যে মেহেরের একটি চক্ষু, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তখন সে প্রায় অন্ধ। ১৩৫৭ সালের ঘটনা। উপরোক্ত তিনটি ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ১২০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়া মেহের আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। তাহার প্রশংসা সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে মেহেরের বড় সাধ হয়। ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস করিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য।

মেহেরের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। ব্যাঘ্র শিকারের উন্মাদনা যৌবনের চেয়ে বার্ধক্যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। পচাব্দী ব্যাঘ্র শিকারের পাশ পাইয়াছে। ছেলে ব্যাঘ্র শিকারে যাইতেছে শুনিয়া মেহের মহাখাপ্পা। হাতে পাইলে তাহাকে ধরিয়া মারে আর কি! ছেলে বলে, "বাপ, তুমি মরণকালে আর বাঘ মেরো না। এ বুড়ো বয়সে শিকারে গেলে লোকে তোমাকে নিন্দে করবে। তোমার পাগলামীর জন্য সমাজে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। অন্তিমকালে এ নেশা ত্যাগ কর।" বৃদ্ধকে কিছুতেই নিরস্ত করা যায় না। মেহের ছেলের কাছে আসিয়া জোরপূর্বক ব্যাঘ্র শিকারের পাশ কাড়িয়া লয়। পিতৃভক্তির জন্য পচাব্দীও কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু গ্রামের কেহই এবার মেহেরের সঙ্গে যাইতে রাজী হয় না।

আংটীহারা গ্রামের মাদার শেখ। শতাধিক মাইল দূরে সুপতি ফরেষ্ট ষ্টেশনের নিকট ব্যাঘ্র শিকারের জন্য সে একদিন কল পাতিয়া রাখে। মেহেরও শেষ ব্যাঘ্র শিকারের জন্য ঐ জঙ্গলে উপস্থিত ছিল। গভীর রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। ভোরবেলা জরাজীর্ণ মেহের ও মাদার সেই ব্যাঘ্র খুঁজিতে আরম্ভ করে। দুপুর পর্যন্ত অনুসন্ধানের পর অবশেষে বন্দুক হস্তে মাদার খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে ব্যাঘ্রের সন্নিকটে উপস্থিত। ব্যাঘ্রের গায়ের সঙ্গে মাদারের পা স্পর্শ করিয়াছে এমন সময় হিংস্র ব্যাঘ্রের আক্রমণে মাদারের মাথার খুলি উড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে জীবন-প্রদীপ নিভিয়া যায়। এই সময় বৃদ্ধ শিকারী মেহের মাদারের হাতের বন্দুক ধরিতে যায়, অমনি মানুষখেকো ব্যাঘ্র তাহার হস্ত কামড়াইয়া দেয়। সকলে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে নৌকায় আনিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ীতে লইয়া আসে। ব্যাঘ্রের দাঁতের বিষে বৃদ্ধ শিকারীর হাতখানা পচিয়া যায়।

বাড়ী পৌঁছিবার দুইদিন পর শেষ পর্যন্ত এই দুর্জয় শিকারী জীবনসায়াহ্নে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। মরণকালে মেহের পচান্দীকে বলিয়া গিয়াছিল, "তুমি ব্যতীত আমাকে আক্রমণকারী বাঘ দুইটিকে অন্য কেহই মারিতে পারিবে না। তোমার উপর এ কাজের ভার দিয়া আমি পরকাল যাত্রা করিতেছি।" আজীবন বহু ব্যাঘ্র শিকারের পর জীবন সায়াহ্নে ব্যাঘ্রের হাতেই মেহেরের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। এদেশের লোকেরা বলে সাপুড়ে সাপের হাতে মরে আর বাঘুড়ে মারা পড়ে বাঘের হাতে।

নিজামদী : মেহেরের ভ্রাতা নিজামদী—তাহার বাম হস্ত ব্যাঘ্রে খাইয়াছে। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে সেও দক্ষিণ হস্তে বন্দুক ধরিয়া একাকী ব্যাঘ্র শিকার করিতে পারে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভ্রাতা মেহেরের ন্যায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। এক হস্ত পঙ্গু হইবার পর লোকে মনে করিয়াছিল, নিজামদী আর শিকার করিতে পারিবে না। ব্যাঘ্রের সহিত তাহার খেলা শেষ হইয়াছে। নিজামদীর বৃদ্ধাবস্থা—এখনও সে শিকারে অভ্যস্ত। নিজামদী গ্রাম্য ব্যক্তিদের মোকাবেলা আমাদের ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনী শুনাইয়াছে। উহার কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

—"বিশ বৎসর আগের কথা, যমুনা নদীর পার্শ্বে, তিনজন সঙ্গীসহ একটি গাদার বন্দুক লইয়া ব্যাঘ্র শিকারের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করি। আমিও জনৈক সঙ্গী দ্বিপ্রহরের সময় ব্যাঘ্রের ডাক শুনিয়া কল পাতিয়া রাখিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে ডাকিতে আরম্ভ করি। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বন্দুকের আওয়াজ হয়। ভোরবেলা যাইয়া দেখি ব্যাঘ্রের দুইখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঘ লাফ দেয়, আবার পড়িয়া যায়। বৃহৎকায় বাঘ, আমরা নিকটবর্তী হইতে পারিতেছি না। ঘন বৃক্ষের জন্য গুলি করাও সম্ভব হইতেছে না। সেদিন ফিরিয়া আসি।

—পরদিন সকালে আমি ও মহিম গাজী ব্যাঘ্রের সন্ধানে উক্ত জঙ্গলে প্রবেশ করি। মনে করিলাম ইতিমধ্যেই ব্যাঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন ধরিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম ব্যাঘ্রটি ঘুরিতেছে এবং অতীব সংগোপনে আমাদের দিকে তাকাইতেছে। ব্যাঘ্র আঠার প্রকার সুরে ডাকিতে পারে। সে তখন মানুষের ন্যায় শিস দিতেছে। মাত্র একপায়ের চলা পথ। ঘন বৃক্ষরাজির জন্য দক্ষিণে বামে যাইবার উপায় নাই। আমি বলিলাম মানুষে ঐ প্রকার শিস দেয়। সঙ্গী বলিল পাখী, আমি পুনরায় বলিলাম, পাখী নয়, বড় শিয়াল। ব্যাঘ্র আমাদিগকে ভয় দেওয়ার জন্য দাঁতে দাঁত দিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতেছে। মানুষখেঁকো ব্যাঘ্রের এ এক অভিনব চাতুরী। ব্যাঘ দেখা যাইতেছে না। আমরা ভয়ে চিন্তিত হইয়া পড়ি। ব্যাঘ্রের দন্ত ঘর্ষণের শব্দ শ্রুত হইল। আমরা বসিয়া লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় ব্যাঘ্র আমাকে লম্ফ দিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত। লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ একটু ঘুরাইলেই গুলি ছুড়ি। আমার সঙ্গী বাঘ তাড়া করিলে সে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে।

আমরা দুইজনেই ব্যাঘ্রের পেটের তলে পড়িয়া গিয়াছি। কি ভয়ংকর অবস্থা। ব্যাঘ্র সন্ধীর মস্তক কামড়াইয়া ঝট্‌কানি দিয়া লম্ফ প্রদান করিল এবং পার্শ্বে পড়িয়া সন্ধে সন্ধে সন্ধীর জীবনলীলা সান্ধ হইল। ব্যাঘ্রের দেহ আমার গায়ের উপর। বন্দুক দিয়া আঘাত করিলে ব্যাঘ্রের একটি দাঁত ভান্ধিয়া যায়। গভীর জন্ধলে আমি একা মানুষখেঁকো ব্যাঘ্রের সন্ধে যুঝিতেছি। এই ভয়াবহ বিপদের কথা কল্পনা করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমি অতি কষ্টে সন্ধীকে ধরি এবং সন্ধে সন্ধে ব্যাঘ্রকে গুলি করি। অতঃপর সন্ধীর লাশ ঘাড়ে করিয়া বন্দুক সহ নৌকার দিকে যাইতে থাকি। গুলি খাইয়া বাঘ আমার পথে আসিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনোন্যপায় হইয়া লাশ রাখিয়া একা নৌকায় যাই। চিন্তা করিতে লাগিলাম যদি নৌকার লোকে আমার গাত্রে রক্তমাখা দেখিতে পায় তবে কিছুতেই লাশ আনিতে উপরে যাইবে না।

—রক্ত ঢাকা দেওয়ার জন্য আমি গাত্রে কাদা মাখাইলাম। ব্যাঘ্রের গোঙানিতে নৌকার সন্ধীরা ভয়ে সরিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের ডাকিতে লাগিলাম। বাঁকের মাথায় গিয়া উহাদের সাক্ষাৎ পাই। কর্দমাক্ত ও রক্তাক্ত দেহ দেখিলে উহারা ভয়ে নৌকা ভিড়াইবে না সেইজন্য গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "গায়ে কাদা কেন? তোমার সন্ধী কই?" আমি বলিলাম ঃ "আমি বাঘ মারিয়াছি। সে লোক সেখানেই আছে, চল বাঘ লইয়া আসি।" তখন তাহারা আমাকে ভাত খাইতে বলিল। বাদাবনের লোকে বলে রান্না ভাত না খাইয়া জন্ধলে যাওয়া নিষেধ। ইহাতে বিপদ আসিতে পারে। আমি বলিলাম, "তোমরা খাও।" কিন্তু আমিও খাই না, ওরাও খায় না। আমার অন্তর চাপা দুঃখ ও যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতেছে। মর্ম বেদনায় মন ভারাক্রান্ত ও অস্থির। আমি না কাঁদিয়া পারিলাম না। তাহারা সন্ধীর মৃত্যুর খবর জানিয়া গেল।

—সন্ধীরা বলিল ঃ "আমরা যাইতে পারিব না।" বিপদ আমার। লোকে বলিবে জন্ধলে লইয়া গিয়া সন্ধীকে খুন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এই ধরনের প্রকৃত ঘটনাও সুন্দরবনে ঘটিয়া থাকে। আঠারবাকীর দোয়ানে—দুইখানা গোলকাটা নৌকার মাঝিদের পাইয়া বলিলাম "বাঘ মারিয়াছি, আনিতে যাইতে হইবে।" আমি নিরুপায় অবস্থায় তাহাদের জুলুম করিয়া বন্দুকের ভয় দেখাইয়া সন্ধে লইলাম। যাইয়া দেখি ব্যাঘ্রও সেখানে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। সন্ধীর লাশ ও মরা ব্যাঘ্র লইয়া নৌকায় আসিলাম। ফরেষ্ট অফিস হইতে লাশ দাফন করার হুকুম হইল। এই ব্যাঘ্র শিকারে আমি ২০০ টাকা পুরস্কার পাই।

একবার নিজামদী, মেহের ও অন্য একজন সন্ধীসহ সুবলা নদীর তীরে এক জন্ধলে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য প্রবেশ করে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বের কথা—হিন্দুস্তানের সীমান্তে এই জন্ধল অবস্থিত। সমুদ্র তীরের এই জন্ধলে ২৫ জন লোককে এক মাসের মধ্যে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে। প্রবাদ—এখানে মানুষ জন্ধলে প্রবেশ করিলে আর ফিরিবার কোন আশা নাই। মানুষখেকো ব্যাঘ্রের এইরূপ ভয়াবহ উপদ্রব অশ্রুতপূর্ব। সমগ্র এলাকা

ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত। ভ্রাতৃদ্বয় এই ব্যাঘ্র শিকারে নিমন্ত্রিত হইয়াছে। নৌকার শব্দ পাইলে মানব রক্তের নেশায় ব্যাঘ্র ছুটিয়া আসিবে। সূর্যাস্তের প্রাক্কালে বর্ষার পানি ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র নৌকা। খাদ্যেরও অভাব পড়িয়াছে। শিকারীদের অন্তরে কি এক ভাবের উদয় হইল। তাহাদের অন্তর ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। চারিদিক নিঝুম অথচ থম্ থম্। নিকটেই ব্যাঘ্রের উপস্থিতি অনুমতি হইল। অতঃপর তাহারা সতর্কতার সহিত নৌকায় আসন গ্রহণ করে। একটি ব্যাঘ্র নদী পার হইবার জন্য ঝাঁপ দিয়া কিছুদুর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। শিকারীরা মনে করিল হরিণ। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র শিকারীদের দেখিতে পাইয়াছে এবং তাহাদের ধরিবার জন্য নৌকার সোজা অগ্রসর হইতেছে। এইবার নিশ্চিত ব্যাঘ্র বুঝিতে পারিয়া শিকারীরা বন্দুক ধরিল। বাঘ দুলিতেছে, সে লম্ফ দিয়া লোক শিকার করিবে। মেহের ও নিজামদী একই সন্ধে গুলি করিল। গুলিতে ব্যাঘ্রের পিঠের হাড় ভান্দিয়া গেল। উন্মত্ত ব্যাঘ্র এত জোরে মাটি ছিটকাইল যে, তাহাতে সেখানে একটি বড় গর্ত হইয়া গেল। গর্তের মধ্যে ব্যাঘ্র দেখা গেল না। সেজন্য পুনরায় গুলি করা হইল না। ব্যাঘ্রের হাড় ভান্দিয়া মটাশ মটাশ শব্দ হইতেছে।

সেখানেই শিকারীরা নিশাযাপান করিল। পুরস্কারের খ্যাতি ও ব্যাঘ্র শিকারের নেশা। শিকারীরা ভোরবেলা সেখানে গিয়া দেখে ব্যাঘ্র নাই। সে হাতা দিয়া দেহকে জন্দলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। বড় দাগ ধরিয়া শিকারীরা চলিতে লাগিল। ব্যাঘ্র শুইয়া আছে দেখা গেল। ঘন বৃক্ষের জন্য গুলি করা সম্ভব হইল না। ব্যাঘ্রও শিকারীদের দেখিয়াছে। নিজামদী বলিল তাড়া করিয়া ব্যাঘ্র মারিতে হইবে। ব্যাঘ্র শ্রান্ত ও ক্লান্ত। মারিমারি করিয়াও মারা হয় না। গুলি ব্যর্থ হইলে শিকারীদের রক্ষা নাই। পিঠের হাড় জোড়া লাগায় ব্যাঘ্র জোরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্যাঘ্র আবার লাফাইতেছে। ক্লান্ত শিকারীরা বিশ্রামের জন্য নৌকায় ফিরিয়া আসে। পরদিন সেই স্থানে গিয়া শিকারীরা দেখিতে পায় ব্যাঘ্রের হাড় আবার খুলিয়া গিয়াছে, হাড় মটাশ মটাশ করিতে লাগিল। বিশ হাত দূরে ব্যাঘ্র দেখা যাইতেছে। ব্যাঘ্র দৌড় দিলে শিকারীরা পিছু ধাওয়া করিল। গুলি লাগিয়া ব্যাঘ্র পড়িয়া গেল। আর এক গুলি খাইয়া ব্যাঘ্র ছটফট করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রের দেহ রক্তাক্ত হইল। শিকারীদের একজন ব্যাঘ্রের দিকে যাইতেছিল ; তখন ব্যাঘ্র তাহাকে তাড়া করিল। এইবার মরণোন্মুখ ব্যাঘ্র মহাবিক্রমে শিকারীদের আক্রমণ করিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে যন্ত্রণায় শুইয়া পড়িয়াছে। ব্যাঘ্রের গোঙানিতে জন্দল প্রকম্পিত হইতেছে। উহার শরীরে আর শক্তি নাই। নিজামদী ও মেহেরের গুলিতে উহার ব্যাঘ্রলীলা শেষ হইয়া গেল।

পচাব্দী : পচাব্দীর পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়াছি—সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র বটে। তাহার বয়স ৪৫ বৎসরের কিছু বেশী। বাল্যবেলা হইতে বাপ ও চাচার সন্ধে জন্দলে যাতায়াতে অভ্যস্ত। সে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে একাকী বাঘ মারিয়া আসিতেছে। রায়মন্দল হইতে সুপতি অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমা পর্যন্ত জন্দলের প্রতিটি স্থান, নদীনালা, গভীর জন্দল, বৃক্ষলতা সবই তাহার নখাগ্রে। সে বনবিভাগের বি. এম. বা

বোটম্যান। বোটম্যানের চাকুরী নামমাত্র। ব্যাঘ্র শিকারের জন্যই তাহাকে রাখা হইয়াছে। বাওয়ালী বা মৌয়ালদের উপর যেখানেই ব্যাঘ্রের আক্রমণ হয় সেই জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য তাহাকে প্রেরণ করা হয়। ব্যাঘ্র শিকারে সে সিদ্ধহস্ত। এ পর্যন্ত এই অল্প বয়সে সে সর্বমোট পঞ্চাশটির অধিক ব্যাঘ্র শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। প্রতিটি ব্যাঘ্র শিকারের সার্টিফিকেট তাহার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। শিকারের অদ্ভুত কৌশল জানে পচাব্দী।

দরিদ্র পরিবার, পেটের দায়ে পচাব্দী চাকুরী করে। বউ কিছুতে জঙ্গলে যাইতে দিতে চায় না। সে তাহাকে বলে ঃ "গ্রামের অন্যান্য লোকের যেভাবে সংসার চলে আমারও সেইভাবে চলিবে। তুমি আর বাঘ মারিতে জঙ্গলে যাইও না।" মা ও স্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিয়া পচাব্দীকে নিষেধ করে। সে তাহা ভ্রূক্ষেপ করে না। ব্যাঘ্র শিকারের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং তাহার এই পেশা ত্যাগ করা দুষ্কর। বাপ-চাচাকে ব্যাঘ্রে খাইয়াছে। দাদা ইস্‌মাইল বাঘের পেটে গিয়াছে। সে ভয়ে পচাব্দী ভীত নহে। তবে বি. এম.-এর চাকুরী—নদীর উপর বার মাস অবস্থান করিতে হয়। লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। নদী-খালের মধ্য দিয়া বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সে চাকুরীর উপর মাঝে মাঝে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। শিকারী হিসাবে পচাব্দী বংশের নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নিজামদী বৃদ্ধ, সেই জন্য পচাব্দীর উপরই অধিক চাপ আসে। উপরওয়ালারা আসিলে পচাব্দীর ডাক পড়ে। কোন কোন সময় পচাব্দী ব্যাঘ্র শিকার করে, অন্যে নাম কিনিয়া লয়। রাধানাথ শিকদারের এভারেষ্ট আবিষ্কারের ন্যায়।

পচাব্দীর শিকার কৌশল ও দক্ষতা পিতৃদত্ত। দিনের পর দিন তাহার ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনী শুনিয়াছি। লোকটি সৎ ও সাদাসিধে—বজ্জাতির ধার ধারে না! কথার ভিতর কোন অলংকার নাই। আস্তে আস্তে মোলায়েম ভাষায় কথা বলে। বাজে কথার ধার ধারে না। কথার চেয়ে কাজ করে বেশী। তাহার বাড়ীতে গিয়াছি। সে খুলনায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিয়া জঙ্গলের অসংখ্য কাহিনী শুনাইয়াছে। পচাব্দীর ফটো অনেকে আনিয়াছে। অথচ কেহই তাহাকে একটি ফটো দেয় নাই। তাহার ইচ্ছা একটি ফটো সংগ্রহ করে। আমরা তাহাকে কয়েকটি ফটো দিয়াছি। ফটো পাইয়া পচাব্দীর সে কি আনন্দ!

ব্যাঘ্রের বিভিন্ন প্রকার কৌশল ও ছলচাতুরী পচাব্দীর জানা আছে। কলপাতা শিকারে সে বিশেষ দক্ষ। সাধারণতঃ ব্যাঘ্রের উচ্চতার তারতম্য অনুসারে ২৪'' ২৫'' বা ২৬'' উঁচু করিয়া বন্দুক পাতিতে হয়। এমনই দক্ষ যে পাগমার্ক দেখিলে সে ব্যাঘ্রের আকৃতি অর্থাৎ উচ্চতা ও দৈর্ঘ ঠিকভাবে ধরিয়া লইতে পারে। পচাব্দী হাঁড়ি মুখে দিয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃত ব্যাঘ্রের ন্যায় ডাকিতে পারে। সে এই পদ্ধতিতে দুই তিন মাইল দূর হইতে বাঘ ডাকিয়া নিকটে আনিতে পারে। কোন্ জঙ্গলে বাঘ আছে, অবস্থা দেখিয়া সে তাহা বলিতে পারে। আজীবন অভিজ্ঞতার দ্বারা সে এই বিদ্যা অর্জন করিয়াছে।

পচাব্দীর জীবনের বড় কৃতিত্ব সে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিল। সুন্দরবনের আর কোন শিকারী এইরূপ কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। পচাব্দীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎলাভের আশায় সে কৃত্রিম উপায়ে বাঘিনীর ন্যায় ডাকিয়া থাকে। তখন ব্যাঘ্র এইরূপ স্থানে আসিয়া বাঘিনীর সহিত মিলন নেশায় ভীষণভাবে গোঙাইতে থাকে এবং পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করে! যে সমস্ত ব্যাঘ্র আপনা আপনি ডাকে তাহারাও ঐরূপ পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ব্যাঘ্র অত্যধিক ডাকিয়া থাকে। সাধারণতঃ আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ব্যাঘ্র ডাকে। বসন্তকালেও ব্যাঘ্রের ডাক শ্রুত হয়। উপরোক্ত সময়ই ব্যাঘ্র শিকারের উপযুক্ত।

পচাব্দী শিকারের খুঁটিনাটি সবকিছু আয়ত্তে আনিয়াছে। ধূর্ত ব্যাঘ্রে যদি বুঝিতে পারে তাহাকে শিকারের জন্য কল্‌পাতা হইয়াছে, তবে সেই ব্যাঘ্র এত হুশিয়ার হয় যে কলপাতার কাছে গিয়া বৃক্ষের ডাল ভাঙিয়া মুখে করিয়া উহা দ্বারা সূতা টানিয়া লইবে এবং তাহাতেই বন্দুকের গুলি হইয়া যাইবে। অথচ ব্যাঘ্রের গায়ে লাগিবে না। কোন কোন সময় ব্যাঘ্র দাঁত দিয়া সূতা ধরিয়া বন্দুক ভান্দিয়া সেখানে বসিয়া থাকে। অধিকতর ধূর্ত বাঘ দাঁত দিয়া বন্দুকের ট্রিগার নড়াইয়া দেয় এবং তাহাতেই বন্দুকের আওয়াজ হইয়া যায়। ব্যাঘ্র সেই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে এবং শিকাবীকে সুবিধা পাইলে আক্রমণ করিয়া খতম করে।

সুন্দরবনের সর্বত্র কাদার উপর দিয়া ব্যাঘ্র এমন সতর্কতার সহিত চলাফেরা করে যে মোটেই কোন শব্দ হয় না। কিন্তু মানুষ চলার সময় চট্‌পট্‌ শব্দ হইতে থাকে। কোন প্রকার দৈবাৎ শব্দ হইলে ব্যাঘ্র স্বীয় পায়ে দংশন করে। নিজ ভুলের মাশুল সে নিজের উপর দিয়া আদায় করে।

পচাব্দীর মতে ব্যাঘ্র মরিবার পূর্ব পর্যন্ত মরিয়া হইয়া শিকারীকে মারিবার চেষ্টা করে। মরিয়া গেলেও ব্যাঘ্রের মুখ শিকারীর দিকে থাকে। ব্যাঘ্রের ঘুম সাংঘাতিক। শিকারীরা কখনও ঘুমন্ত ব্যাঘ্রকে শিকার করে না। কারণ উহার গুলি ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেইজন্য শিকারীরা বৃক্ষে আঘাত হানিয়া শব্দ করিয়া ব্যাঘ্রের ঘুম ভান্দাইয়া পরে গুলি করে। শিকারীরা ব্যাঘ্রকে মুখোমুখি গুলি করে না। মুখ একটু ঘুরাইলেই গুলি করিয়া থাকে।

সিংহের জন্দলের ব্যাঘ্রটি পচাব্দীর পিতা ও চাচাকে গুরুতর জখম করে এবং দাদা ইসমাইলকে ভক্ষণ করার পর স্থানীয় লোকেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। চতুর্দিক এমনভাবে আতঙ্কিত হয় যে, কেহই সে জন্দলে প্রবেশ করে না। সুপতির যে জন্দলে মাদার সেখ ও মেহেরকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে সেখানেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান। দুর্জয় শিকারী মেহেরের মৃত্যুতে সর্বত্র ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। মরণকালে মেহের পচাব্দীকে বলিয়া গিয়াছিল ঃ—"তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই ব্যাঘ্র দুইটিকে মারিতে পারিবে না।" সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পচাব্দী আল্লার নাম স্মরণ করত জন্দলে প্রবেশ

করিয়া উপায় স্থির করিতে থাকে। সিংহের জন্দলস্থ ব্যাঘ্রের গুলির আঘাত বিফল হইলে গ্রামে ঢুকিয়া গরু কুকুর, ছাগল ইত্যাদি আক্রমণ করিত। নররক্ত পানকারী বাঘই মানুষখেঁকো হইয়া যায়। একবার বাঘে গরু বা মানুষের রক্ত পান করিলে সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। পচাব্দী দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে সিংহের জন্দলে গিয়া কল পাতিয়া আসে। রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। সকালে যাইয়া দেখে ব্যাঘ্র মরিয়া রহিয়াছে এবং উহার গায়ে পূর্বেকার গুলির ক্ষতচিহ্ন। পচাব্দী পিতৃ আদেশ পালন করিয়া পিতৃহন্তার প্রতিশোধ লইয়াছে।

পূর্ববর্ণিত সুপতির বাঘ মারিতেও পচাব্দীর ডাক পড়ে। সে সেখানে গিয়া ঐ ব্যাঘ্রকে মারিবার জন্য ১৫ হাত উচ্চ একটি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তথায় অতীব সন্তর্পনে অপেক্ষা করে। পচাব্দী দুই দিন মঞ্চোপরি বসিয়া হাঁড়িতে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় ডাকিতে থাকে। মুখে হাঁড়ি দিয়া ডাকিতে ডাকিতে ব্যাঘ্রটি সেইস্থানে আসিয়া পড়িবামাত্র উহাকে গুলি করিয়া মারা হয়। উহারও গায়ে পূর্বেকার গুলির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় পচাব্দীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র বটে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে পারিয়া পচাব্দীর আনন্দ আর ধরে না। সে আজ তৃপ্ত। মন তার আনন্দে ভরপুর।

সুন্দরবন এক মনোরম দেশ। দেশ বিদেশ হইতে কত পর্যটক সুন্দরবন পরিদর্শন করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জাপান, কানাডা, আমেরিকা, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য লোকেরা সুন্দরবনে আসিয়া শিকার করেন। পাশ্চাত্যের লোকেরা সাধারণতঃ সুউচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া সস্ত্রীক ও দলবলসহ একত্রিত হইয়া শিকার করিয়া থাকেন। বিদেশীয় পর্যটক আসিলে পচাব্দী ও নিজামদীর ডাক পড়ে। বেশী দিনের কথা নয়। শরণখোলা রেঞ্জের অন্তর্গত শেলা নদীর তীরে হরমল জন্দল। জনৈক শিকারী এক সুউচ্চ মঞ্চে বসিয়া কিছু দূরে ছাগল বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। ছাগলের ডাক শুনিয়া বাঘ আসিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে ছাগল খায় না। বাঘে মানুষের গন্ধ পাইয়াছে, ধূমপানের গন্ধ উহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। ব্যাঘ্র চুপি চুপি অতীব সতর্কতার সহিত মানুষ খাইবার জন্য মই দিয়া উঠিয়া সেই মঞ্চের নিকটবর্তী হইয়াছে। শিকারীরা সেই মঞ্চ হইতে বন্দুকের কুঁদো দিয়া ব্যাঘ্রের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাঘ্র দ্রুত সেই মই দিয়া নীচে সরিয়া যায়। কেহই উহাকে গুলি করিতে পারে না। গভীর নিশীথে ছাগলের ডাক শুনিয়া পুনরায় ব্যাঘ্র আসে। তিন-চারটি গুলি করার পরও ব্যাঘ্র পড়ে না। ব্যাঘ্রের কামড়ে ছাগলছানা মারা যায়। ভোরবেলা ব্যাঘ্রে ছাগল খাইতে আসে। তখন গুলি করিয়া ব্যাঘ্রটিকে মারা হয়। এই ঘটনার পর গেউয়া গাছ মার্কা দেওয়ার সময় বেতমুড়ীর জন্দলে একজন বাওয়ালীকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। পচাব্দী সেই জন্দলে একে একে তিনটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। ঐ তিনটির মধ্যে একটি বাঘিনী। বাঘিনীকে গুলি করার

পর শিকারী অপেক্ষা করিতে থাকে। একটু পরে দেখা গেল বাঘিনীর লাশ একটি ব্যাঘ্র আসিয়া কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছে। ঝানু শিকারী পচাব্দী বৃক্ষের উঁচু ডালে বসিয়া গুলি করিয়া উক্ত ব্যাঘ্র শিকার করে। পর পর চারটি ব্যাঘ্র মারায় সুন্দরবনে পচাব্দীর ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। ইহা বিস্ময়কর বীরত্ব কাহিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল ওমরাহ্ খান সদলবলে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র শিকারে গিয়াছিলেন। পচাব্দীও সঙ্গে যায়। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলে অকস্মাৎ একটি নরখাদক শিকারীদের আক্রমণ করে। মোটর লঞ্চের সারেঙ উহার পেটের তলে পড়িয়া যায়। ব্যাঘ্রটি পূর্ব হইতেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। কি ভয়ংকর অবস্থা! লোকটির জীবনের আশা নাই। সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমন ভয়াবহ আক্রমণ যে সকলকেই ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা হইল। জঙ্গলের এহেন ভয়ংকর অবস্থা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই কল্পনা করিতে পারে। পচাব্দী দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া গুলি ছুড়িয়া মারে। তাহার অবধারিত গুলির আঘাতে ব্যাঘ্রটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এমন সতর্কতার সহিত গুলি করা হইয়াছিল যে উহা অন্য কাহারও গায়ে লাগে নাই। জঙ্গলব্যাপী পচাব্দীর সুখ্যাতি পড়িয়া যায়। ওমরাহ্ খান পচাব্দীকে সঙ্গে করিয়া যশোর মিলিটারী ক্যাম্পে লইয়া যান। উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ পচাব্দীর বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া সকলেই তাহার সহিত করমর্দন করেন। দরিদ্র শিকারীর আনন্দ আর ধরে না। পচাব্দী মনে করিল তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে। করাচির উষ্ট্র চালক বসির ভাগ্যক্রমে সম্মান পায়। আর পচাব্দী জীবনপাত করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। ওমরাহ্ খানের অনুমোদনক্রমে খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কৃতিত্বের চিহ্নস্বরূপ তাহাকে একটি দো-নালা বন্দুক পুরস্কার দেন।

বাংলার গভর্ণর সুন্দরবন পরিদর্শনে আসিতেছেন। পূর্বেই পচাব্দীকে আনিয়া খুলনা শহরে রাখা হইল। পচাব্দীর আশা এইবার কিছু পুরস্কার পাইতে পারে। তাহার বর্ণনায় জানা যায় গভর্ণরের সুন্দরবন ভ্রমণকালে সে সর্বদা তাহার সহিত ছিল। তাহার সুখ-দুঃখের কাহিনী গভর্ণরকে শুনাইয়াছে। গভর্ণর পচাব্দীকে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় লইয়া যান এবং টেলিভিশান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। এইবার এই বন্য ব্যাঘ্র শিকারীকে দেখা গেল টেলিভিশানের পর্দায়। পচাব্দী টেলিভিশানে দেখাইল কেমন করিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিতে হয়—কেমন করিয়া বাঘে ডাকে ইত্যাদি। ব্যাঘ্রের ডাক অনুকরণে পচাব্দীর সর্বত্র ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। খুলনায় ফিরিয়া এই দুর্জয় শিকারী টেলিভিশানের বিষয় আমাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করে। সে সার্টিফিকেটখানা সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক পচাব্দী—দেশ-বিদেশে এইভাবে তাহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। ধন্য তাহার দুঃসাহসী বন্য জীবন।

দুবলার দ্বীপ বা দুবলার ট্যাকে বাসা করিয়া চট্টগ্রামের ধীবরকুল মৎস্য ধরে। সুন্দরবনের লোকেরা ইহাকে জেলের ট্যাকও বলে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এক সময়ে এখানে ব্যাঘ্রের ভীষণ উৎপাত শুরু হয়। এই সংবাদে সরকারের তরফ হইতে পচাব্দীকে সেখানে প্রেরণ

করা হয়। দিনের বেলা পচাব্দী জঙ্গলে কল পাতিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। শিকারী একটি বন্দুক হাতে করিয়া পরদিন জঙ্গলে প্রবেশ করে। দুইজন সন্ধীকে নৌকায় রাখিয়া পচাব্দী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে ; এমন সময় বৃহৎকায় একটি ব্যাঘ্র হিংস্রভাবে হাঁ হাঁ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। সে কি ভয়ংকর চাহনি! এহেন ভীমমূর্তি দর্শনে সন্ধীরা নদীমধ্যে নৌকা ভাসাইয়া দেয়। পচাব্দীর দুর্ভাগ্য—বন্দুকের কলকব্জার গোলযোগে কিছুতেই আওয়াজ হয় না। ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া মাত্র কয়েক হাত দুরে আসিয়া পড়িল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও গুলি হইল না। পচাব্দী ব্যাঘ্রকে ভয় দেওয়ার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অতীব সাহসের সহিত বন্দুক নড়াইতে থাকে। দুর্জয় শিকারী এহেন অবস্থার মধ্যে প্রায় বেহুশ হইয়া পড়িল। পিছনে তাকাইয়া দেখে সন্ধীরা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পচাব্দী আল্লা আল্লা করিয়া ধুকিতে থাকে। জীবনের ক্ষীণ আশাটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে। ব্যাঘ্রের আক্রমণ আজ সে কি করিয়া প্রতিহত করিবে? কোন মতেই তাহার নিস্তার নাই। পচাব্দী গুলি পুরিতে থাকে এবং একটু একটু করিয়া অতীব সতর্কতার সহিত পিছু হটিতে থাকে।

এইভাবে সে প্রায় এক রশি হটিয়া যায়। বাঘও আর নড়ে না। পচাব্দী বন্দুক ফেলিয়া খালের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করে। এদিকে খবর হইয়াছে যে, দুর্জয় শিকারীকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে পচাব্দী নৌকার সন্ধান পায়। নৌকায় বিশ্রাম করিয়া একটি বন্দুক সহ সেই বাঘকে শিকারের জন্য পুনরায় সে জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু এবার সে ব্যাঘ্রটিকে দেখিতে পাইল না। হিংস্র জন্তুর সে চাহনি, সে গোঙানি এবং মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে দেখিলে কে ভীত ও সন্ত্রস্ত না হইয়া পারে? পচাব্দী সে কথা মনে করিয়া এখনও শিহরিয়া উঠে। জীবনের ভয় সকলেরই আছে। এ সুন্দর ভুবনে কি কেহ সহজে মরিতে ইচ্ছা করে?

পচাব্দী পুষ্পকাটীর জঙ্গলে বোটম্যানের চাকুরীতে কার্যরত ছিল। একদিন বাওয়ালীরা খবর দিল বাঘ তাহাদের নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মাঝিদের সতর্কতার জন্য বাঘ নৌকায় উঠিতে পারে নাই। পচাব্দী একজন সন্ধী লইয়া বন্দুকসহ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বানরের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। বাওয়ালীরা বৃক্ষে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় পচাব্দীও সেইরূপ শব্দ করিতে থাকে যাহাতে ব্যাঘ্রে বাওয়ালী ভাবিয়া তথায় আসিবে। দেড় ঘন্টা পর একটি ব্যাঘ্র তথায় আসিয়া দেড় রশি দূরে দাঁড়ায়। ব্যাঘ্র শিকারীকে দেখিয়া বৃক্ষের উপর লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু শিকারী ব্যাঘ্র দেখিতে পায় নাই। শিকারী পরে ব্যাঘ্র দেখিতে পায়। কিন্তু তথা হইতে গুলি করা খুব অসুবিধা। অবশেষে সুযোগ আসিল। ব্যাঘ্রের বৃহৎকায় চক্ষু, সামনাসামনি গুলি করা যায় না। মস্তক একটু ঘুরান মাত্র পচাব্দী বন্দুকের গুলি ছুড়িয়া মারিল। গুলির আঘাতে ব্যাঘ্র উন্মত্ত হইয়াছে। সে ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় কামড় দিয়া বৃক্ষের বাকল ছিঁড়িয়া ফেলিল। পরে নিজের হস্ত-পদ জোরে কামড়াইতে লাগিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি করা হইল। চতুর্থ ও শেষ গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে পচাব্দীর দোনালা বন্দুকের বাম ব্যারেল ফাটিয়া যায়। বাঘেরও ব্যাঘ্রলীলা সাঙ্গ হয়।

সুন্দরবনের এই দুর্ধর্ষ শিকারী এখন রূপকথার নায়ক। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের পাতায় তাহার বীরত্বের সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার সম্পর্কে যে-সব খবর প্রকাশিত হয় উহার মধ্যে দুই-একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

পঞ্চাশতম নরখাদক ব্যাঘ্র শিকার : "বুড়ী গোয়ালনী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস (সুন্দরবন), ২রা এপ্রিল ১৯৬৫—গত দুইমাসে ২৩ জন মানুষ মারার পর গত সপ্তাহে একটি নরখাদক রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকারীর গুলিতে মারা পড়িয়াছে। বাঘটি শিকার করিয়াছেন স্থানীয় শিকারী পচাব্দী গাজী। ইহা পচাব্দী গাজীর অর্ধশততম রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার। এ-বৎসর ইতিপূর্বে পচাব্দী আরও দুইটি নরখাদক রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করিয়াছেন। নিহত বাঘটিকে এই রেঞ্জ অফিসে আনার পর মাপিয়া দেখা যায়, লেজসহ উহার দৈর্ঘ্য পৌনে বারো ফুট।

নরখাদকটি চলতি মওসুমে এই রেঞ্জের কয়েকটি লাটে এমনই তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করে যে, বাঘের ভয়ে বাওয়ালীরা জঙ্গলে কাঠ ও গোলপাতা কাটা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে ঐ এলাকায় বনবিভাগের আয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। বাঘ রাত্রে বাওয়ালীদের নৌকায় হানা দিয়া নিদ্রিত অবস্থায় কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া যায়। দিনের বেলায়ও ঐ বাঘ কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রহকারী বাওয়ালী দলের উপর অতর্কিতভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানুষ ধরিতে আরম্ভ করে। এইভাবে ক্রমাগত মানুষ মারিতে মারিতে বাঘটি দুঃসাহসী ও নরমাংসলোলুপ হইয়া উঠে এবং জঙ্গলে বাওয়ালীদের কুঠারের শব্দ পাইলেই সেই দিকে যাইয়া শিকার ধরিতে থাকে। শেষের দিকে হিংস্র জন্তুর দৌরাত্ম্য এতই বৃদ্ধি পায় যে, আতঙ্কিত বাওয়ালীরা জঙ্গলে যাওয়া ত্যাগ করে। এই সংবাদদাতা গত মাসের প্রথম দিকে সুন্দরবনের উক্ত অঞ্চলে গমন করিলে গোলপাতা সংগ্রহকারী বাওয়ালীরা নরখাদকটিকে অবিলম্বে মারার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জান বাঁচাইবার জন্য অনুরোধ করে। সে সময় পর্যন্ত বাঘটির হাতে প্রায় বিশ জন প্রাণ দিয়াছে বলিয়া তাহারা জানায়। বনবিভাগ বাওয়ালীদের নিরাপত্তা বিধান ও নিজেদের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাঘটিকে শিকার করার জন্য সচেষ্ট হইলেও ধূর্ত শ্বাপদ বহুদিন তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নিজের দাপট অব্যাহত রাখে। বাঘটি কয়েক মাইল দূরে যাইয়া এবং অনেক সময় অলক্ষ্যে বাওয়ালীদের অনুসরণ করিয়া শিকার ধরিতে থাকে।

গতমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুন্দরবন সফরকারী জার্মান টেলিভিশান দল নরখাদক বাঘটির কাহিনী শুনিয়া এই রেঞ্জে আগমন করেন। তাহাদের সহিত কয়েকজন অভিজ্ঞ শিকারীও ছিলেন। কিন্তু সুচতুর বাঘ তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াও শিকার ধরিতে থাকে। ইতিমধ্যে বনবিভাগও বাঘটিকে মারার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। খুলনার ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার জনাব এ. আলীম এবং বুড়ী গোয়ালনীর রেঞ্জ অফিসার জনাব এস, এ, হাকিম বাঘটিকে সন্ধান ও শিকারের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে দক্ষ শিকারী দল আনয়নের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের তলবক্রমে পচাব্দীও বাঘের সন্ধানে গমন করেন।

কিন্তু দুর্গম জঙ্গলে বাঘের থাবার চিহ্ন অনুসরণ করিয়া একাদিক্রমে দশ দিনের সন্ধানে নরমাংসলোলুপ প্রাণীকে প্রলুব্ধ করার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও পচাব্দী যখন প্রায় হতাশ হইয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় অর্থাৎ গত মাসের শেষ সপ্তাহে বাঘটি আঠারোবেকী এলাকায় ৪৮ নং লাটে তাহার ২৩তম শিকার ধরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। সন্ধে সন্ধে পচাব্দী উক্ত স্থানে গমন করেন। পরদিন জঙ্গলের মধ্যে নিহত ব্যক্তির লাশ অর্ধভুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ শিকারী পচাব্দী বুঝিতে পারেন যে, বাঘ তাহার শিকারের অবশিষ্টাংশ ভক্ষণের জন্য আবার লাশের নিকটে আসিবে। সুতরাং অদূরে একটি ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া তিনি লাশটিকে পাহারা দিতে থাকেন। এইভাবে প্রায় ৮/১০ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর পচাব্দী বাঘের আগমন সংকেত বুঝিতে পারিয়া বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে থাকেন। বাঘ বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দে লাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকার সময় বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিলে পচাব্দী ঝোপের ভিতর হইতে পর পর দুইটি গুলি ছোঁড়েন। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যে নরখাদক বাঘটি সন্ধে সন্ধে ভুতলশায়ী হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

বাঘ নিহত হওয়ার পর সন্ধে সন্ধে উক্ত রেঞ্জ অফিসে এবং সেখান হইতে রেডিওগ্রামে খুলনাস্থ ডিভিশনাল অফিসে জানাইয়া দেওয়া হয়। খুলনার ডি. এফ. ও. নরখাদকের শিকারী পচাব্দীকে যথাযথভাবে পুরস্কার দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত খুলনা বিভাগের কমিশনার জনাব আবুল এহসানও তাঁহাকে নগদ পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

প্রসন্ধতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পচাব্দীর পিতা মেহেরালী গাজীও বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। তিনি নিজের জীবনে ৫৩টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করার পর শেষ পর্যন্ত বাঘের হাতেই প্রাণ দেন।

রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক পচাব্দী : "খুলনা, ২৪শে এপ্রিল। পচাব্দী নামটি সুন্দরবনের গল্পকথার নায়কে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত, এই নামটি সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের নিকটও আতঙ্কের কারণ।

পচাব্দী গাজী সম্প্রতি সুন্দরবনের বুড়ী গোয়ালনী রেঞ্জে একটি বার ফুট দীর্ঘ বাঘ মারিয়াছেন। খুলনা বিভাগীয় বন অফিসার জনাব এ. আলীম বলেন যে, সুন্দরবনের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যতগুলি বাঘ মারা হইয়াছে ইহা তার মধ্যে দীর্ঘতম। তিনি আরও বলেন যে, ইহা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ বাঘ।

গত দুইমাস ধরিয়া এই মানুষখেঁকো বাঘটি সুন্দরবন এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল এবং এ পর্যন্ত ২১ জনের প্রাণনাশ করিয়াছে। এই বাঘটিকে পচাব্দী গাজী মারিয়াছেন।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এই বীর শিকারীর বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবুল এহসান গত সন্ধ্যায় তাঁহাকে আড়াই শত টাকা পুরস্কার দান

করেন। পচাব্দী বাঘ শিকারী পরিবারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহও বাঘ মারিতেন, আর সেই বাঘের ছাল বিক্রয় করিয়াও সরকারের নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। একদিন এমনি বাঘ শিকার করিতে যাইয়া গাজীর পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য প্রাণ হারাইয়াছেন।

পচাব্দী গাজী এক্ষণে খুলনা বন কর্তৃপক্ষের অধীনে বোটম্যানের চাকুরী করিতেছেন এবং মাসে মাত্র ৮০্ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন। তিনি ৫৫ সাল হইতে এই কাজই করিতেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই ৫০টি বাঘ মারিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার পিতা বাঘের হাতে প্রাণ হারানোর পূর্বে ৫৬টি বাঘকে মারিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পচাব্দী ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনম্র স্বভাবের। বিস্ময়ের কথা পচাব্দী আর বাঘ মারিবেন না বলিয়া এই সংবাদদাতাকে জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে এবার শিকারে গেলে বাঘের হাতে তাঁহার প্রাণ যাইবে। তাঁহার পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য সকলেই মৃত্যুর পূর্বে অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই। তিনি তাই আর ভাগ্য পরীক্ষা করিতে চাহেন না।"

বাঘে মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও দুই-একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করিয়া আমরা এ প্রসন্দ্ব শেষ করিব।

জয়নদ্দি মিস্ত্রী : কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত গড়াইমহাল গ্রামে বিখ্যাত শিকারী জয়নদ্দি মিস্ত্রীর বাড়ী। জীবনে সে ৯৬টি বাঘ মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে একটি অতি বৃহৎ, লেজসহ ১১ হাত লম্বা। এইরূপ বৃহৎকায় বাঘের কথা পূর্বে শুনা যায় নাই। শিকারী পরবর্তী বাঘ মারিবার জন্য জন্দ্বলে কল পাতিয়া রাখে। শেষ রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। শিকারী সাধারণতঃ আওয়াজের কিছুক্ষণ পরে জন্দ্বলে প্রবেশ করে। কিন্তু জয়নদ্দি শিকারের নেশায় একটুও দেরী সহ্য করিল না। সে অন্য একটি বন্দুকে গুলি পুরিয়া জন্দ্বলে প্রবেশ করে। সন্দ্বে তার ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ই বাঘ দেখিয়াছে। গুলিতে জানোয়ারের সামনের পা ভান্দ্বিয়া গিয়াছে এবং অবিরলধারে উহর মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। প্রথম গুলি বাঘের গায়ে লাগিল না। দ্বিতীয় গুলি বাঘের গাত্র স্পর্শ করা মাত্র ভীমবেগে শিকারীকে আক্রমণ করিয়া তাহার শরীর কামড়াইয়া ধরিয়াছে। এমতাবস্থায় শিকারী ভ্রাতুষ্পুত্রকে গুলি পুরিয়া দিতে বলিল, কি দুর্জয় সাহস! ভ্রাতুষ্পুত্র দা দিয়া বাঘকে সজোরে কোপাইতে লাগিল। কিন্তু বাঘ শিকারীকে কিছুতেই ছাড়ে না। জয়নদ্দি বাঘের মুখে থাকিয়াও কৌশলে বন্দুকের ব্যারেল উহার গালে পুরিয়া দিল। ভ্রাতুষ্পুত্র একেবারে বেহুস। বাঘও হাঁ ছাড়িয়া দিবার পর মরিয়া গেল। কি অসীম সাহস! সাধারণ লোকের পক্ষে এহেন অবস্থা কল্পনাতীত। বাড়ীতে আসিয়া তিনদিন পরে বীর শিকারী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মরণকালে শুধু বলিত ঃ "আমাকে বাঘে ধরলো, ওরে বাঘে ধরলো।" এইভাবে প্রলাপ বকিতে বকিতে সে মরিয়া গেল। তাহার বড় সাধ ছিল ১০০ বাঘ মারিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিবে। কিন্তু সেঞ্চুরী করিতে তিনটি বাকী রহিয়া গেল।

বনাঞ্চলে জয়নদ্দি মিস্ত্রীর খ্যাতি ছড়ইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে ৯৭টি বাঘ শিকারের কাহিনী অতিরঞ্জিত। সুন্দরবনের বাঘ শিকারের ইতিহাসে পচাব্দীর পিতা মেহের গাজীই সর্বাপেক্ষা দুর্জয় শিকারী। তাহার সম্পর্কেও একশত বাঘ শিকারের প্রমাণ নাই। সামান্য একটি মাত্র বাঘ শিকার নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কার্য এবং বীরত্বের কথা। পচাব্দী ৫০টি এবং তাহার পিতা মেহের ছাপান্নটি বাঘ শিকার করিয়া পিতা পুত্রে যে অভিনব রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বনাঞ্চলের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

শেষ চাঞ্চল্যকর কাহিনী : শ্যামনগর থানার অধীন সুন্দরবন সংলগ্ন এক গ্রাম। এই গ্রামের দুই সহোদর ভ্রাতা খ্যাতনামা শিকারী। উভয়ে যুবক, ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা বনে-জন্দলে শিকার করিয়া বেড়ায়। একে অন্যকে ভক্তি ও স্নেহ করে প্রচুর। প্রায় সর্বদা দুই ভাই একত্রে বসবাস করে। একত্রে চলাফেরা করে। ভ্রাতৃস্নেহ দর্শনে তাহাদিগকে লোকে বলে, যেন রাম লক্ষণ।

একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনজন সন্দ্বীসহ শিকারের জন্য জন্দলে প্রবেশ করিয়াছে। অকস্মাৎ ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। সন্দ্বীরা আসিয়া বাড়ীতে তাহার এই অপমৃত্যুর সংবাদ দেয়। অন্য ভ্রাতা এহেন মর্মন্তুদ সংবাদে পাগল প্রায়। প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে সে বীরনাদে হুংকার ছাড়িয়া জন্দলে যাত্রা করে। সে এই প্রতিজ্ঞা করে যে, ভ্রাতাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে ছিনাইয়া আনিতে না পারিলে গ্রামে ফিরিবে না। কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে? কি কঠিন প্রতিজ্ঞা! ইহাও কি সম্ভব? জন্দলে প্রবেশ করিয়া সে সন্দ্বীদের বলিল, কোন্ স্থান হইতে আমার প্রাণের ভাইকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই স্থান আমাকে দেখাইয়া দাও। যথাস্থানে গিয়া সে একাকী জন্দলের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিঝুম নিরালা বন, চারিদিক থমথম। লোকটির সন্দ্বে কেহই নাই। একদিকে ভ্রাতার মৃত্যুর হৃদয়বিদারক খবর, অন্যদিকে প্রতিশোধ গ্রহণের উদগ্র নেশা। লোকটি কণ্টকময় জংলী-পথ অতিক্রম করিয়া এক প্রকাণ্ড ময়দানে উপস্থিত হইল। ময়দানের পার্শ্বে গভীর জন্দল। পশুপক্ষীরও কোন শব্দ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ অথচ থমথমে ভাব দেখা গেল, ভাইয়ের লাশ সেখানে পড়িয়া আছে। অতঃপর সে বন্দুক হস্তে এক সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ পরেই উক্ত লাশ ভক্ষণ করিবার জন্য ব্যাঘ্রটি সেখানে আসিল। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রের নাসারন্ধ্রে মানুষের গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে। ব্যাঘ্রটি ইতস্ততঃ করিয়া মনে করিল যে উহা সেই মরা মানুষেরই গন্ধ। মানুষের ন্যায় বাঘেরও মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে। ব্যাঘ্রটি লাশ মুখে করিয়া উর্ধ্বে তুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে।

দিনমণি অস্তাচলে গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করিয়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এমন সময় গভীর অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বন্দুক ডাকিয়া উঠে। শব্দ এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হইল যে, সমগ্র বনানী কাঁপিয়া উঠিল। গুলি খাইয়া ব্যাঘ্রটি ধপাশ করিয়া পড়িয়া যায়। একটি মাত্র বুলেটের আঘাতে সেই ভয়াবহ হিংস্র জন্তুর জীবন প্রদীপ নিভিয়া যায়।

অসমসাহসী বীর শিকারী ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃশোক লাঘব করে। শিকারী তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রটির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করত প্রিয়তম ভ্রাতার লাশ স্কন্ধে করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে। দেশের সর্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া যায়। চারিদিকেই দুর্জয় সাহসের খ্যাতি মুহূর্ত মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই সংবাদে দেশের মানুষ আশ্চর্যান্বিত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে থাকে। সত্যই বাদা অঞ্চলের মানুষ দুঃসাহসী ও দুর্জয়।

পচাব্দীর শেষ শিকার ও স্বপ্ন : পচাব্দীর শেষ শিকার সম্পর্কে সংবাদপত্রে যেরূপ প্রকাশিত হয় তাহা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পচাব্দী এই লেখকের নিকট যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে তাহা সঠিকভাবে এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

—আঠারবেকীর জঙ্গল। বার ফুট দীর্ঘকায় একটি মানুষখেঁকো রয়াল বেঙ্গল বাঘ। এই হিংস্র জন্তু এক বৎসর যাবৎ অন্যূন ৫০ জন মানুষকে উদরস্থ করিয়া এমনই বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে যে, বাওয়ালীদের জঙ্গলে উঠা একরূপ বন্ধ। মৎস্যজীবী, মৌয়াল, বাওয়ালী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষ ঐ বাঘে ভক্ষণ করিয়াছে। জঙ্গলব্যাপী ত্রাস সৃষ্টি হইয়াছে। জার্মান টেলিভিশন দল, আমেরিকান শিকারী প্রভৃতি সকলেরই ব্যাঘ্র শিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

—টেলিভিশন দল নৌকা হইতে ব্যাঘ্র দেখিতে পায়, কিন্তু গুলি করার সুযোগ পাওয়া যায় না। ব্যাঘ্র মানুষের গন্ধ পাইয়া নৌকার দিকে হাঁ হাঁ করিতে করিতে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পরক্ষণেই গুলির ভয়ে প্রস্থান করে। বৃক্ষের জন্য গুলি করা সম্ভব হয় না।

—সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যাঘ্র শিকারের জন্য বনবিভাগ আমাকে গোলপাতা কুপের বোটে রাখিয়া দেয়। তিন দিনের মধ্যে গোলপাতা কুপের একটি লোককে ব্যাঘ্রে উদরস্থ করে। উহাকে রক্ষা করার জন্য একদল বাওয়ালী বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বিফল মনোরথ হয়। বাঘ জোরপূর্বক লোকটিকে লইয়া উধাও হয়।

—আমি ঐ জঙ্গলে যাইবার জন্য আদিষ্ট হই। দুপুরবেলা সেখানে গিয়া সমস্ত কিছু শ্রবণ করি। আমি তথাকার খালের মধ্যে নামিয়া মুখ বাহির করিয়া শিকার অন্বেষণ করিতে থাকি। খালের তীরে হতভাগা বাওয়ালীর অর্ধভুক্ত লাশ উদ্ধার করি। উহার দক্ষিণ পায়ের অর্ধেক ও পেট বাঘে ভক্ষণ করিয়াছিল।

গ্রীষ্মকাল, দুপুরের খররৌদ্র। ব্যাঘ্র অন্যত্র গিয়াছে। আমি লাশের স্থান হইতে একরশি দূরে খালের মধ্যে চুপ করিয়া ঝোপের আড়ালে অবস্থান করি। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার কালো ছায়া বিস্তার করে নাই। এমনই এক মুহূর্তে দেখা গেল মানুষখেঁকো উক্ত অর্ধভুক্ত লাশের দিকে আসিতেছে এবং মুখ চতুর্দিকে ঘুরাইয়া দেখিতেছে কেহ উহার পিছনে আছে কি না? হিংস্র ব্যাঘ্র অর্ধভুক্ত লাশের কাছে নরমাংস ভক্ষণের জন্য আসে। এমন সময় একটি বন্য মোরগ ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত হইয়া কড় কড় শব্দ করিতে

করিতে দৌড় দেয়। ব্যাঘ্র সেই দিকে নজর দিয়াছে। একটু ঘাড় ঘুরাইলেই আমি গুলি ছুঁড়ি। একটি মাত্র গুলির আঘাতে ব্যাঘ্র পড়িয়া গেলে উহার মস্তক হইতে মগজ বাহির হইয়া যায়।

—বাঘের ব্যাঘ্রলীলা শেষ। এই আমার সর্বশেষ ব্যাঘ্র শিকার। বাওয়ালীর অর্ধভুক্ত লাশ ও মরা মানুষখেঁকো বাঘসহ বহু বাওয়ালী সঙ্গে করিয়া বুড়িগোয়ালনী অফিসে উপস্থিত করি। তখনই বেতারযোগে খুলনায় সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

—উপরোক্ত বীরত্বব্যঞ্জক কার্য করার পর আমি জঙ্গলের মধ্যে এক রাত্রিতে নৌকাপরি ঘুমাইয়া থাকি। ঘুমের মধ্যে মরহুম আব্বা আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি বলিলেন, এখানে বাঘ মারিস না। পরদিন সকালবেলা যে স্থানে বাঘে মানুষ খাইয়াছে সেইস্থান বহু লোকজন সহ পরিদর্শন করি এবং সবকিছু শুনি। দিবাগত রাত্রে নৌকায় সকলের সঙ্গে শুইয়া পড়ি। চারিদিকে গভীর জঙ্গল। নিরিবিলি নিশীথে আমরা নৌকাপারি কয়টি প্রাণী শায়িত এমন সময় আবার স্বপ্নে দেখিঃ

—আমার আব্বা সুন্দরবন খ্যাত ব্যাঘ্রশিকারী মরহুম মেহের গাজী বলিতেছেন যে, তোকে বাঘ শিকার করিতে নিষেধ করিয়াছি। তবুও তুই আবার জঙ্গলে উঠলি কেন? আব্বা আমাকে ঘুমের মধ্যে বেদম প্রহার করিলেন। প্রহারের জন্য আমি জঙ্গলে ঘুমের ঘোরে কাঁদিতেছিলাম। সঙ্গীরা আমার কান্নায় জাগিয়া গিয়াছে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ি এবং জাগিয়া দুই তিন গ্লাস পানি পান করিয়া সুস্থ্য হই। আমি জাগ্রত অবস্থায় কিছুক্ষণ প্রায় অজ্ঞান। সেইদিন হইতে আমি আর বাঘ শিকার করি নাই।

—এই স্বপ্নের বহু দিন পরে একবার হরিণ শিকারের জন্য কলাগাছিয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করি। আমি শিকারের জন্য বৃক্ষে আরোহণ করি। একটু পরে দেখি একটি বাঘ ঐ বৃক্ষের তল দিয়া যাইতেছে। সুযোগ সত্ত্বেও আমি ঐ বাঘকে গুলি করি নাই। এখন হইতে আমি আব্বার নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলিব। ইহার ব্যাতিক্রম কোন কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এইভাবে পচাব্দীর বীরত্বপূর্ণ জীবন নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

সুন্দরবনে রোমাঞ্চসৃষ্টিকারী ব্যাঘ্র শিকারী আজ বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইয়াছে (১৯৭৪)। তবুও তাঁর ভাবভঙ্গী ও চালচলন সরল-সহজ ও বীরত্বব্যঞ্জক।

নয়

সুন্দরবনের জলদস্যু

অতীত জীবনের ন্যায় অধুনাকালেও সুন্দরবনে জলদস্যুর বিভীষিকা বিদ্যমান। লোকালয় ও জঙ্গলের নদীনালায় নিরীহ ব্যক্তিরা উহাদের কবলে পতিত হইয়া নির্যাতন ভোগ করে। জলদস্যুরা মধ্যে মধ্যে জঙ্গলে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। বনচারিদের নিকট ইহাদের গোপন অবস্থিতি রয়াল বেঙ্গল টাইগার অপেক্ষা কম ভয়াবহ নহে।

দস্যুবৃত্তির পক্ষে সুন্দরবনে এক অতি উত্তম ক্ষেত্র। এখানে জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা করিয়া বনাঞ্চলে আত্মগোপন করা সহজ। জঙ্গলাভ্যন্তরে নদীনালার প্রাচুর্য। তন্নিমিত্ত দ্রুত পলায়নের পথও সুগম। দক্ষ দস্যুদের নিকট গহীন অরণ্যের নৌপথও অজানা থাকে না। কোথায় নৌকা রাখিতে হয়, কোথায় স্থলপথে পদব্রজে চলিতে হয়, কোথায় দস্যুবৃত্তির ক্ষেত্র উত্তম সবই তাহাদের নখাগ্রে।

মধ্যে মধ্যে জলদস্যুরা সুযোগমত গ্রামাঞ্চলে আসিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি সমাপনান্তে উধাও হয়। পুলিশ বা বনবিভাগের কর্মচারীরা সহসা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া ডাকাতদের গ্রেফতার করিতে অপারগ হয়।

সুন্দরবনাঞ্চলে ডাকাতির সংখ্যা অত্যধিক। বহু ডাকাতির খবর থানায় পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। বনবিভাগ ও পুলিশের সঙ্গে জলদস্যুদের গুলি বিনিময়ের কথাও শ্রুত হয়। জঙ্গলে একবার একজন দক্ষ পুলিশ কর্মচারী সশস্ত্র জলদস্যুদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন রক্ষা করেন।

পঞ্চদশ ষষ্ঠদশ শতক হইতে সুন্দরবনের জলদস্যুর বিভীষিকা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেযুগে মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের কুখ্যাতি সর্বত্র পরিব্যপ্ত ছিল। এই দ্বিজাতীয় লোকেরা একযোগে পূর্ব-পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া দক্ষিণবঙ্গে একত্র হইত। ইহারা বর্গী ও ঠগীদের ন্যায় যত্রতত্র দস্যুবৃত্তি করিয়া দক্ষিণবঙ্গে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। একটি পৃথক অধ্যায়ে মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের কথা বলিয়াছি।

মগ-ফিরিঙ্গিদের সহিত স্থানীয় জলদস্যুরাও যোগদান করিত। এই ত্রিদলীয় দুর্বৃত্তদের সমন্বয়ে—দক্ষিণবঙ্গ তথা সুন্দরবন অঞ্চলে ভয়াবহ জলদুস্য দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের দ্বারা নরহত্যা, নারীহরণ, লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপকার্য অবাধভাবে চলিত। এই সমস্ত কারণে এককালে এদেশ মগের মুল্লুকে পরিণত হইয়াছিল। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে সে এক মর্মস্পর্শী অধ্যায়।

মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা দেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করার পরও তাহাদের কিছু কিছু শিষ্য এদেশে থাকিয়া যায়। ডাকাতির বিভিন্ন প্রকার কলাকৌশল তুর্ক আফগান আমল

হইতে এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন কারণে দেশে জলদস্যুদের দল সৃষ্টি হয়। ঘন বসতির অভাব, নির্জন বনানী, বিশালকায় ও প্রলয়ংকর নদ-নদী, অসংখ্য খালবিল, দ্রুত পলায়নের সুযোগ-সুবিধা, আর্থিক অনটন, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, শাসনব্যবস্থার শিথিলতা প্রভৃতি নানা কারণে দস্যুদলের প্রতিষ্ঠা হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের একান্ত অভাব। কেহ নিরন্ন, আবার কেহ প্রাসাদোপম অট্টালিকার মালিক। এই অসহায় ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত, উহার উপর সমাজের অমানুষিক অত্যাচারও এজন্য কম দায়ী নহে। মানুষ অর্থ সঞ্চয় করিয়া মৃত্তিকাগর্ভে লুকাইয়া রাখে। ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখে না। অত্যাচার ও নিস্পেষণে ধনীদের বিরুদ্ধে তাহাদের মন বিষাক্ত হইয়া কেহ কেহ দস্যুদলে প্রবেশ করিয়া থাকে। আবার বনবিভাগের আইন-কানুন অমান্য করিয়া সুন্দরবনের জন্তু শিকার, কাঠ সংগ্রহ ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ করিয়া ধীরে ধীরে চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে। অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে তাহারা ভীষণকায় দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাচীনকালীন জলদস্যুদের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধকালে সুন্দরবনে দস্যুবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দস্যুদলের উপদ্রব চরম আকার ধারণ করে।

হিন্দু সমাজ সংস্কারক শ্রীচৈতন্য একবার কয়েকজন শিষ্যসহ সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের নদীপথ দিয়া পশ্চিমদিকে উড়িষ্যা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। পাঁচশত বৎসর পূর্বের কথা। শ্রীচৈতন্যের নৌকা আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছত্রভোগ হইতে পশ্চিমদিকে যাত্রা করে। জঙ্গলের ব্যাঘ্র কুমীর প্রসঙ্গে জলদস্যু ভীতির কথাও বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ কীর্তন গান গাহিতে আরম্ভ করেন। উহার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

অবুঝ নাবিক বলে হইল সংশয়
বুঝিলাম আজ আর প্রাণ-নাহি রয়।।
কুলেতে উঠিলে বাঘে লৈয়া যে পলায়
জলেতে পড়িলে যে কুমীরে ধরে খায়।।
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে
পাইলেক ধনপ্রাণ দুই নাশ করে।।
এতেক যাবৎ না উড়িয়া দেশ পাই
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাই।। —চৈতন্য ভাগবৎ

নিকোলাস পাইমেন্টার বিবরণে সুন্দরবনের জলদস্যুদের উল্লেখ আছে। জেসুইট মিশনারী দলের সদস্য ফেনসোকো ও এন্ড্রু এবং ফার্ণান্ডেজ ও সোসা বাকেরগঞ্জ ও খুলনা সফর করেন। কোচীন হইতে নৌকাপথে যাত্রা করিয়া আঠার দিন ভ্রমণের পর তাঁহারা বন্দে উপনীত হন এবং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপাদিত্যের আমন্ত্রণে তথায়

গমন করেন। সুন্দরবনকে তাঁহারা ভয়সঙ্কুল বনস্থলী (Horrid Jungle) বলিয়া অভিহিত করেন। পুরোহিতদের বিবরণে জানা যায় যে, সুন্দরবনের জলদস্যুরা তাঁহাদের প্রতি তীরাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল। অতি কষ্টে তাঁহারা জলদস্যুদের কবল হইতে রক্ষা পান সেকথাও লিপিবদ্ধ আছে।

দেশ বিভাগের পূর্বে এবং পরে জঙ্গলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অসংখ্য ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগর, আশাশুনি, পাইকগাছা, দাকোপ, রামপাল, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা, মঠবাড়িয়া, কাটালিয়া প্রভৃতি থানায় অহরহ জলদস্যুবৃত্তির কথা শ্রুত হয়। জলদস্যুরা শুধু সর্বস্ব অপহরণ করে না, নরহত্যায়ও লিপ্ত হয়।

আইনজীবী হিসাবে আমাকে অসংখ্য ডাকাতি মকদ্দমা পরিচালনা করিতে হইয়াছে। সেজন্য জলদস্যুদের কাহিনী একটু সুদীর্ঘ হইবে। দেশ বিভাগের সুযোগে জলদস্যুদেরও ভাগ হইয়াছে। ভারতের বহু অপরাধী বাংলায় আসিয়াছে এবং এখানকার অসংখ্য অপরাধী সীমান্তপারে পাড়ি জমাইয়াছে। সুন্দরবনের নদীনালার মধ্য দিয়া একসময় জলদস্যুদের অবাধ যাতায়াত ছিল। ধীরে ধীরে উহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে জলদস্যুদের আড্ডা আছে বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত কোন এক স্থানে একদল ভয়াবহ জলদস্যুদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। উহারা বাংলাদেশ হইতে ডাকাতি করিয়া সীমান্ত পারে আশ্রয় লইত। আবার ডাকাতদল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে ডাকাতি করিয়া এখানে আসিয়া উধাও হইত। এই সমস্ত জলদস্যু খুলনা ও বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডাকাতি করিয়া এখনও জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া থাকে। নির্দয় ও নৃশংস দস্যুরা নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ধনসম্পদ আহরণ করত সুন্দরবনের মধ্যে গিয়া উধাও হয়।

কুখ্যাত ডাকু বাছের ঢালী ঃ কুখ্যাত ডাকু বাছের ঢালী সুন্দরবনের ত্রাস। সে উভয় রাজ্যের সীমান্তে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইয়াছে। বাছের একালের দস্যু মোহন। বাছেরের দস্যুবৃত্তির বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা জলদস্যুদের বিষয় আলোচনা করিব।

নদীনালাই সুন্দরবনের একমাত্র চলাপথ। সেজন্য নৌকাই ডাকাতদের চলাফেরার একমাত্র বাহন। পাঁচ বা ততোধিক লোক লইয়া দস্যুদল গঠিত হয়। সাধারণতঃ ১০/১২ জন দস্যুও একটি দলের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহারা একত্র হইয়া দলের প্রধান বা সর্দার নির্বাচিত করে। একজন সহকারীও নির্বাচিত হয়। লাঠি, দা, বল্লম, গুলালবাঁশ, রামদা, সড়কী, নানা প্রকার বন্দুক, ছোরা, তরবারী, তীর-ধনুক ইত্যাদি ইহাদের প্রধান অস্ত্রশস্ত্র। ইহারা টর্চলাইট সঙ্গে রাখে। দুর্ধর্ষ ডাকাত দল রাত্রে হ্যাসাক লাইট জ্বালাইয়া বাড়ী আলোকিত করিয়াও ডাকাতি করে।

ডাকাতদের মধ্যে কেহ আবার অর্থশালী লোকের বাড়ীর সংবাদ আদান-প্রদান করে। তাহাদিগকে খোজারু বলা হয়। আর যাহারা ডাকাতির অর্থ গচ্ছিত রাখে তাহাদের 'থলেদার' বলে। কেহ নৌকা চালায়, কেহ নৌকা পাহারা দেয় আবার কেহ ডাকাতির সময় বাড়ীর আশে পাশে পাহারা দিতে থাকে। শেষোক্ত লোকেরা ডাকাতির সময় বাহির হইতে কাহাকেও ডাকাতির স্থানে প্রবেশ করিতে দেয় না।

দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা বন্দুক বা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা সর্বপ্রথম আক্রমণ করিয়া ভীতি প্রদান করে। ইহাতে অনেক সময় মানুষ খুন হইয়া যায়। অন্যদের ধরিয়া পিঠমোড়া দিয়া শোয়াইয়া রাখে। অধিকাংশ ধনীর বাড়ীতে লোহার আলমারীতে টাকা ও স্বর্ণ গচ্ছিত থাকে। সেজন্য ডাকাতেরা সর্বপ্রথম ত্রাস সৃষ্টি করিয়া লোহার আলমারী বা বাক্সের চাবি হস্তগত করে। প্রাণ-ভয়ে মানুষ ডাকাতদের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় আবার কেহ কেহ অর্থের মমতায় দুর্বৃত্তদের হাতে সন্ধে সন্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

ডাকাতেরা অধিক সময় একত্রে ডাকাতি কার্য চালিত করে না। তাহাদেরও ধরা পড়ার ভয় আছে। কোন কোন সময় ডাকাত ধরা পড়ে এবং বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়।

দেশ বিভাগের পর প্রথম প্রথম দেশে ডাকাতির হিড়িক পড়িয়া যায়। উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা ডাকাতের পাল্লায় পড়িয়া ডাকাতি শিক্ষা করিয়া এই জঘন্য পেশায় লিপ্ত হয়। ১৯৪৭ সালের পর সুন্দরবনাঞ্চলে কয়েকটি গ্যাং কেস হয়। একটি দলের ডাকাতেরা যদি একযোগে বহু সংখ্যক ডাকাতি করে বা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে দল গঠন করে উহাকেই দস্যুদল বা 'গ্যাং' বলা হয়। এইরূপ দলের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইলে ডাকাতি না করিয়াও আইনতঃ তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।

রামপাল থানায় দেশ বিভাগের পর এইরূপ একটি কুখ্যাত ডাকাতদল সংগঠিত হয়। তাহারা সুন্দরবনাঞ্চলে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। এই দলের লোকেরা পর পর কয়েক বছরের মধ্যে ৫০টির অধিক ডাকাতি করে। ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৪০০ ধারায় মোকদ্দমা রুজু হয়। দস্যুদলের প্রায় ২০০ লোক ধরা পড়িয়া বহুকাল যাবৎ কারাগারে আটক থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নির্দোষও ছিল। এই দলের তিনজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে কেস আশকরা করার জন্য রাজসাক্ষী করা হয়। তাহারা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী বা স্বীকারোক্তির দ্বারা বহু দোষী এবং কিছু সংখ্যক নির্দোষ ব্যক্তিকেও জড়াইয়া দেয়। রাজসাক্ষীরা মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলখানায় রাজার হালে থাকে। গুরুতর অপরাধ করিয়াও তাহারা দোষ স্বীকার করিয়া আইনের সাহায্যে ও প্রলোভনে পড়িয়া রাজসাক্ষী হইয়া নিজেদের রক্ষা করে। তাহারা পূর্ব-পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজসাক্ষীভুক্ত হইয়া আসামী ধরাইয়া দেয়। দস্যুদলের সদস্য সংখ্যা ছিল শতাধিক। তাছাড়া বন্দুক, গুলিগোলা, টর্চলাইট, রামদা, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্রের সাহায্যে যত্রতত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। রাজসাক্ষীদের স্বীকারোক্তির পর তদন্ত শুরু হয়।

সি. আই. ডি. বিভাগ এই দলের প্রায় ১০০ সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৪০০ ধারায় চার্জশীট দাখিল করে। মোট তেরশত সাক্ষীর নাম ধাম চার্জশীটের তালিকাভুক্ত হয়।

সরকার পক্ষে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করার জন্য আমি স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হই। দীর্ঘ বৎসরাধিক কাল ধরিয়া প্রায় ১৩০০ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। খুলনার তৎকালীন অতিরিক্ত দায়রা জজ মৌলবী তোফাজ্জল হোসেন বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এডভোকেট মৌলভী গোলাম আকবর খান আমাকে সাহায্য করেন।

মামলার বিচারে ৭০ জনের সশ্রম দণ্ডাজ্ঞা হয়, তন্মধ্যে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। হাইকোর্টে আপীলে কিছু কিছু দণ্ডাজ্ঞার রদবদল হইয়াছিল।

এত বড় একটি দস্যুদলের মামলা পরিচালনা করিবার সময় আমাকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সাক্ষীরা কেহ ডাকাতের পক্ষে কেহ ডাকাতদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিত। দৈনিক গড়ে ৭/৮ জন সাক্ষীর জেরা ও জবানবন্দী গ্রহণ করা হইত। আমার পক্ষে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব জানিবার সুযোগ জুটিয়া যায়। বিচারের সময় কোর্ট লোকে ভরিয়া যাইত।

এই মামলাটি এতদঞ্চলে অপরাধীদের মধ্যে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। ডাকাতদের মধ্যে কয়েকশ্রেণীর লোক দেখা যাইত। কেহ নরহত্যায়, কেহ বা লুটপাট পছন্দ করিত, কেহ আবার নারী ধর্ষণে লিপ্ত হইত। গুপ্তস্থানে ডাকাতেরা সাধারণতঃ কোন ষড়যন্ত্র করিত না। হাটের মধ্যে যেখানে জনসমাগম অত্যধিক এবং সবাই কর্মব্যস্ত উহারই মধ্যে ডাকাতদের গুপ্ত পরামর্শ চলিত। ফুটবল খেলার মাঠে অগণিত জনতা যখন খেলা দেখিতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে দস্যুরা পরামর্শ করিয়া উপায় স্থির করিত। কোন কোন সময় স্কুল প্রাঙ্গণে অসময়ে বসিয়া পরামর্শ করিত।

ডাকাতি করার সময় ডাকাতরা সনাক্ত হইবার ভয়ে মুখে পাউডার মাখিত। মাথায় গামছা বা পাগড়ী বাঁধিত। নকল দাড়িও ব্যবহার করিত। ডাকাতি করার সময় কেহ কাহারও নাম ধরিয়া ডাকে না। পাছে গৃহস্থেরা নাম জানিয়া রাখে। এজন্য ছোট বাবু, বড় বাবু, মেজ বাবু, ধলা বাবু, কালা বাবু প্রমুখ নাম দ্বারা একে অন্যকে সম্বোধন করিয়া থাকে।

বিচিত্র ধরনের অপরাধপ্রবণতা দস্যুদলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। পাপেরও বিচিত্র গতি। পাপী শেষ পর্যন্ত অপরকে ধ্বংস করিয়া নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রকৃতির লিখন। চোর ডাকাত যতই ধনসম্পদ লুটপাট করুক, কেহই ধনী হইতে পারে না। লোকে বলে চোরের বাড়ী দালান উঠে না।

পূর্বোক্ত গ্যাং কেসে অকথ্য জুলুমের কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। ডাকাতির সময় কতিপয় নারীর উপরও পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছিল। নারী সাক্ষীরা সে কথা কোর্টে প্রকাশ

করিয়া দেয়। কোন কোন নারী মান ইজ্জতের ভয়ে এসব কথা গোপনও করিয়া থাকে। আলমারী, বাক্স, সুটকেস, জানালা-দরজা ভান্ধা, মানুষের উপর আঘাত হানা, খুন, জখম, গুলিগোলা নিক্ষেপ ডাকাতদের সাধারণ নিয়ম।

সহজে টাকা বা গহনা না দিলে দস্যুদলের সদস্যরা আগুন লাগাইয়া মানুষ পোড়াইত। এমন কি কেরোসিন ঢালিয়া মানুষের গায়ে আগুন দেওয়ার কথাও শ্রুত হইয়াছে। এবম্প্রকারে মানুষের উপর যে অত্যাচার হয় তাহা সবিস্তারে লিখিয়া শেষ করা যায় না।

অধিকাংশ ডাকাতি রাত্রিতেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সুন্দরবনের মধ্যে দিনেও ডাকাতি হয়। বাওয়ালী বা দরিদ্র কাঠুরিয়াদেরও জলদস্যুরা রেহাই দেয় না। কোন কোন সময় অন্য নৌকার মাঝি ও কিষানদের ধরিয়া ডাকাতরা দল বৃদ্ধি করে। ডাকাতি করার পর আবার তাহাদিগকে জন্দ্বলের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। জলদস্যুরা ধুমপানের নামে আগুন চাহিয়া নৌকা ধরিয়া ডাকাতি করে। জেলেদের নৌকায় আক্রমণ করিয়া জাল, কাপড় ও পয়সা কড়ি লুটিয়া লয়। জন্দ্বলের নিরীহ ব্যক্তিদের উপরই ডাকাতদের লুটতরাজ চলে। নৌপথে ঢেউয়ের গর্জনে বাহিরে কোন চীৎকারের শব্দ শুনা যায় না, সে জন্য দস্যুরা নৌপথের সুযোগ গ্রহণ করে।

সুন্দরবনের একদল ভীষণকায় ডাকাতদের কথা আলোচনা করিব। এই কুখ্যাত ডাকুদলের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০ জন। ইহাদের মধ্যে ১৪/১৫ জনে বনাঞ্চলে এক ধনীর গৃহে এক লোমহর্ষক ডাকাতি করে। এই দলের লোকেরা সুন্দরবনে ডাকাতি করিতে অভ্যস্ত। সুন্দরবনই ইহাদের আশ্রয়স্থল। ডাকাতি করিয়া সেখানে গিয়া ডাকাতির সম্পদ ভাগ করাও সহজ। নানা কারণে বনস্থলীকেই তাহারা ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করে।

সুন্দরবনের সন্নিকটেই শ্যামনগর থানা। থানা হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হাজী মেহেরুল্লা গাজীর বাড়ী। বাড়ীতে একতলা দালান। হাজী সাহেব সহস্রাধিক বিঘা ধানের জমির মালিক। পূর্বে মহাজনী ব্যবসায়ও ছিল। অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী। ইং ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাস। এই সময় চিরদিন বনাঞ্চলের সর্বত্র নিদারুণ খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। ডাকাতরাও হাজী সাহেবের বাড়ী ডাকাতি করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। হাজী সাহেবের জনৈক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ও বাড়ীর একজন কিষান ডাকাতদের মধ্যে ছিল বলিয়া জানা যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। বাড়ীর সংলগ্ন মসজিদে হাজী সাহেব মগরেবের নামাজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় একদল ডাকাত চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে হাজী সাহেবের অন্দরমহলে ঢুকিয়া পড়ে। এইভাবে ডাকাতেরা হাজী সাহেবকে কৌশলে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া যায়।

হাজী মেহেরুল্লা দৌড়াইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ডাকাতেরা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। হাজী সাহেব বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র ডাকাতেরা তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। বাড়ীর এবং পার্শ্ববর্তী পুরুষ লোকেরা ভয়ে অন্যত্র চলিয়া গেল। হাজী

সাহেবের স্ত্রী গ্রাম্য সাদাসিধে মহিলা। ডাকাত দর্শনে হতবাক হইয়া রহিলেন। কোন কথাই বলিতে সাহস পাইলেন না।

ঐ সময় হাজী সাহেবের নাতনী জাহানারা নানার বাড়ীতে ছিল। জাহানারার নানী বহু পূর্বে মারা গিয়াছেন, হাজী সাহেব দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছেন। জাহানারার পিতা শহরের বাসিন্দা। তাহার বিবাহ হইয়াছে এক আইনজীবীর সঙ্গে। শহরের মেয়ে জাহানারা এক সন্তানের মা, লেখাপড়া বেশ জানে। হাজী সাহেবের উপর যে সময় মারাত্মক আক্রমণ চলিতেছিল তখন একমাত্র জাহানারাই ডাকাতদের বাধা দেয়। কিছুক্ষণ জাহানারা বীরত্বের সহিত ডাকাতদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া তাহার নানার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। ডাকাতদের নির্মম আঘাতে হাজী সাহেব মাটিতে পড়িয়া যান। জাহানারা কাতর নিবেদন করিয়া বলিতে থাকে, "আমার নানাকে মেরো না", "তোমরা আমার নানার প্রাণ রক্ষা কর, "দোহাই তোমাদের" ইত্যাদি। কিন্তু ডাকাতরা কি আর ধর্মের কাহিনী শুনিবার জন্য আসিয়াছে? একদিকে হাজী সাহেবকে মারিতে থাকে অন্যদিকে জাহানারাকে বলে, "বন্দুক কোথায় মাগি, এখনই বন্দুক বাহির করিয়া দে, নইলে তোরও শেষ।" জাহানারা বলেঃ "আমি এসেছি নানার বাড়ীতে, বন্দুক কোথায় আমি জানি না"। জাহানারার এক বছরের মেয়েকে ডাকাতরা খুন করিতে উদ্যত হয়। তখন জাহানারা একেবারে মুষড়িয়া পড়ে। এই সময় দস্যুরা জাহানারার পৃষ্ঠদেশে ও হস্তে আঘাত করিলে সে আহত হয়। ধস্তাধস্তির সময় জাহানারার গায়ের জামা ছিঁড়িয়া যায়। শেষ পর্যন্ত জাহানারা ঘর ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়।

ইত্যবসরে লোহার ডাণ্ডা দিয়া একজন ডাকাত হাজী সাহেবের মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করিলে হাজী সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম আঘাতে হাজী সাহেবের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হাজী সাহেবের সকরুণ চীৎকারের সময় দস্যুদের ভয়ে অন্য কেহ অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই।

ইহার পর দস্যুরা হাজী সাহেবের আলমারীর চাবি ও বন্দুক হস্তগত করে। ডাকাতদল ঘরে আলো জ্বালাইয়া লুটতরাজ শুরু করিয়া দেয়। তাহারা টাকা-পয়সা, গিনি ও স্বর্ণ এবং স্বর্ণালঙ্কার, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি আসবাবপত্র লুণ্ঠন করে।

দস্যুরা হাজী সাহেবের আজীবন সঞ্চিত ১২ সের স্বর্ণ এবং লক্ষাধিক টাকা লইয়া যায়। একটি ২২ ভরি ওজনের সোনার হার ডাকাতেরা লইতে পারে নাই। মোট ১০০ ভরির উপর স্বার্ণালঙ্কার ছিল। শত ও সহস্র টাকার নোট ছিল। অসংখ্য পুরাতন রূপার টাকা ছিল। মক্কা শরিফের দেরহাম ও দিনার ছিল। সোনার পাত ছিল। কাপড় চোপড় সমস্তই ডাকাতেরা লুটতরাজ করিয়া উধাও হয়।

পথিমধ্যে ডাকাতদল পলায়নের সময় বহু রূপার টাকা ও কতকগুলি গিনি ফেলিয়া যায়। পলায়নপর দস্যুদের এ এক অভিনব কৌশল। লোকে অর্থের লোভে পথে খোঁজ করিবে এবং ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করিবে না। এই ফাঁকে দস্যুরা পলায়ন করিতে সক্ষম হয়।

ডাকাতির সময় গ্রাম্য লোকেরা কাপুরুষের ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া ঘটনা দেখিতেছিল। ডাকাতদল চলিয়া যাওয়ার পর হাজী সাহেবের নিজস্ব লোকেরা অবশিষ্ট মালামাল আত্মসাৎ করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

সেই রাত্রেই ঘটনাস্থলে দারোগা আসেন। পরে দস্যুদলও ধরা পড়ে। তদন্তের পর হাজী সাহেবের বন্দুক সুন্দরবনের পার্শ্বে এক গ্রামের পুকুরের মধ্য হইতে একজন জলদস্যু বাহির করিয়া দেয়। হাজী সাহেবের মক্কাশরীফ হইতে আনিত চাদর, কতিপয় টাকা, গিনি এবং তাঁহার স্ত্রীর বেনারসী শাড়ীও পরে বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধার হয়। ৮টি গিনি ও কয়েক শত টাকার নোটও পাওয়া যায়।

কয়েকজন ডাকাত স্বীকারোক্তি করার ফলে মামলা সহজে আশকরা করা হয়। খুলনার অতিরিক্ত দায়রা জজ মহিবুল হক সাহেব বিচারকার্য পরিচালনা করেন। বিশজনের অধিক সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। ডাকাতদের সনাক্ত করার জন্য জেলখানায় সনাক্তকরণ প্যারেড করান হয়। পুরুষ সাক্ষীদের মধ্যে কেহই ডাকাতদের সনাক্ত করিতে পারে না। একমাত্র জাহানারাই কয়েক জন ডাকাত চিনিতে পারে।

দায়রা জজ আদালতে লোকে লোকারণ্য। জাহানারাই একমাত্র সাক্ষী যে ডাকাতদের চিনিয়াছে। বুদ্ধিমত্তাগুণে জাহানারা ঠিক ঠিকভাবে ডাকাতদের সনাক্ত করে। জাহানারার জবানবন্দীতে জজসাহেব ও জুরিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অধিকাংশ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। অসীম সাহসিকতার জন্য জাহানারা সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

মোকদ্দমায় ১২ জন আসামীর বিচার হয়, তন্মধ্যে সাত জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী না থাকায় তাহারা বেকসুর খালাস পায়। ডাকাতি ও নরহত্যার দায়ে অন্য আসামীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দশ বছরের কঠোর দণ্ডাদেশ হয়। জানা গিয়াছিল, যে ডাকাতের শেষ আঘাতে হাজী সাহেব মারা যান সাক্ষীর অভাবে সে খালাশ পাইয়াছে। এই লোমহর্ষক ডাকাতির মামলা পরিচালনা করিবার সুযোগও আমার হইয়াছিল।

আর একটি ভয়াবহ ডাকাতি হয় বাছেরের স্বগ্রাম গোবরায়। বাছের সুন্দরবনের ত্রাস। তাহার গ্রামে অন্য জলদস্যুদলের আগমন যেন বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। এই সময় বাছের খুলনা হাজতে ছিল। কেহ কেহ বলেন, বাছেরের লোকেরা দেশব্যাপী ত্রাস সৃষ্টি করা এবং যাহাতে কেহ বাছেরের বিরুদ্ধে সাক্ষী না দেয় সে জন্য এই ডাকাতি ও নরহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

সুন্দরবন সংলগ্ন কয়রা মদিনারাবাদ গ্রাম। উহারই পার্শ্বে গোবরা। কর্ণেল গ্যাষ্ট্রিলের রিপোর্টে কপোতাক্ষী তীরে গোবরা গ্রামের উল্লেখ আছে।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। দিনমণি অস্তাচলে গিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অকস্মাৎ ২ জন অপরিচিত লোক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। একজন সিঁড়ি বাহিয়া টালির ঘরের দোতলায় উঠিয়া

যায়। দস্যুদল সংখ্যায় প্রায় ১৫ জন ছিল। এই ডাকাতিতে বন্দুক, কুড়াল, রোলার, ছোরা, টর্চলাইট, রামদা, বল্লম, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

গৃহস্থ পক্ষে দুইজন এবং দস্যুদলের একজন মোট তিন জন নিহত এবং বহু সংখ্যক লোক আহত হয়। ডাকাতির পর ৪ জন নৌকাযোগে পাইকগাছা থানায় গিয়া এজাহার পেশ করে। গোপাল হাজী, মোসলেম, নূর আলী মিস্ত্রী ও মোসলেমউদ্দীন গাজী। ইহাদের প্রত্যেকের শরীরে নানা প্রকার জখম। এই ডাকাতিতে দুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

ডাকাতেরা আলমারী বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়া বহু সম্পত্তি লুটপাট করে। লক্ষাধিক নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার সম্ভার, অন্যান্য জিনিষপত্র, একটি রিভলভার ও একটি দোনালা বন্দুক লইয়া উধাও হয়। থানায় নিম্নোক্তভাবে এজাহার করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৩৯৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

—আমার নাম মোসলেমউদ্দীন গাজী,—পিতা মৃত হাজী মানিক গাজী, সাং গোবরা এই মর্মে এজাহার করিতেছি যে, আমার বাপ মানিক হাজী ডাকাত পড়িবার সময় দোতলায় ছিলেন। একজন ডাকাত দোতলায় উঠিলে আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলি। এই সময় অন্ধকারে বাড়ীর বাহির হইতে একটি গুলি আসিয়া আমার আব্বাজানের গায়ে বিদ্ধ হয় এবং সন্ধে সন্ধে পড়িয়া তিনি মারা যান। উক্ত লোকটি ড্যাগার দিয়া আমাকে খুন করিতে উদ্যত হয়। আমি দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া ড্যগার দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলি। তাহার রক্তাক্ত লাশ দোতলায় পড়িয়া থাকে।

—আমার ভ্রাতা কায়কোবাদ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তাঁহার দোনালা বন্দুক ধরিয়া আমি ডাকাতদের দিকে গুলি নিক্ষেপ করি। এইভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের ও ডাকাতদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। দস্যুদলের একটি গুলির আঘাতে আমার ডান উরুতে জখম হয়। ইতিমধ্যে একজন ডাকাত ভীষণভাবে চীৎকার করিয়া বলে ওরে, গেলামরে, মলামরে, ইত্যাদি। সম্ভবতঃ আমার গুলির আঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া সে এই স্পষ্ট চীৎকার দিয়াছিল। প্রাণ রক্ষার জন্য এই সময় আমি গুরুতর বিপদ উপলব্ধি করিয়া জানালার আড়ালে দাঁড়াই। ইতিমধ্যে বাহিরবাড়ী হইতে ডাকাতরা আমার ভাই চেয়ারম্যান কায়কোবাদকে ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে আনিতে থাকে ও তাঁহাকে মারপিট করিয়া বন্দুক বাহির করিয়া দিতে বলে। আমার ভ্রাতা দস্যুদের নির্মম প্রহারে চীৎকার করিয়া বলেনঃ "মোসলেম। যদি আমাকে চাস তবে ডাকাতদের হাতে বন্দুক দিয়া দে অন্যথা আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে।" বারবার এই কথা বলিতে থাকে। আমি ভাই-এর হুকুমে তাঁহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দোতলা হইতে বন্দুক ফেলিয়া দিই এবং নীচে গিয়া পলাইবার চেষ্টা করি। এই সময় কয়েকজন ডাকাত আমাকে ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিতে থাকে। একজন ডাকাতের খাকি হাফপ্যান্ট ও খাকি হাফ-সার্ট, হাতে রুল ও টর্চলাইট ছিল। তাহারা আমাকে বাঁধিয়া উপরে লইয়া যায়। চেয়ারম্যানকে ধরিয়া ডাকাতেরা তাঁহার উরুতে ছুরি বসাইয়া রক্তাক্ত করিয়া দেয়।

—জলদস্যুরা একটি লোহার সিন্দুক ভান্দিয়া সবকিছু লইয়া গিয়াছে। চেয়ারম্যানকে খুন করিয়া তাহারা বন্দুক ও রিভলভার লইয়া গিয়াছে। চাচা গোপাল গাজী মসজিদ হইতে নামাজ পড়িয়া বাড়ী আসিবার সময় ডাকাতরা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার ছেলে কোবাদ কোথায়"? কোবাদ পায়খানা হইতে আসিলে দস্যুরা উভয়কে বাঁধিয়া ফেলে এবং উপরে লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে কুড়াল দ্বারা আঘাত করিয়া লোহার সিন্দুক ভান্দিয়া নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার বাহির করে।

—কয়েকজন প্রতিবেশী আমাদের সাহায্য করিতে আসিয়া আঁহত হয়। অনুমান ১ ঘন্টা যাবৎ ডাকাতরা লুটতরাজ ও নরহত্যায় লিপ্ত থাকে। যাইবার সময় তাহাদের হাতের বন্দুক দ্বারা দস্যুদল চেয়ারম্যান কায়কোবাদকে নির্ম্মমভাবে খুন করিয়া প্রস্থান করে।

বন্দুক, রিভলভার প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র রাখা বিপজ্জনক। ইহাতে যেমন জান ও মাল রক্ষা করা যায়, তেমনই জীবনাশঙ্কাও প্রবল থাকে। নিজের বন্দুক দ্বারা গুলি করিয়া আত্মহত্যা করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আগ্নেয়াস্ত্র জনসাধারণের জন্য রক্ষক ও ভক্ষকের কার্য করিয়া থাকে।

ডাকাতির সময় পার্শ্ববর্তী পাড়া হইতে ৫টি বন্দুক সহ লোক জমায়েত হয়। কিন্তু ভয়ে তাঁহারা গুলি করিতে সাহসী হয় নাই। কায়কোবাদের স্ত্রী রিভলভার দ্বারা ডাকাতদের গুলি করিতে উদ্যত হইলে শাশুড়ী ভয়ে তাহাকে বাধা দেয়।

জলদস্যুদের পলায়নের পর বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। দস্যুরা বিদায়কালে মৃত ডাকাতের লাশ লইয়া উধাও হয়। ঐ লাশ পরে পাওয়া যায় সেজন্য পুলিশের পক্ষে মামলা আশকরা করায় বিশেষ সুবিধা হয়।

সুন্দরবনের পার্শ্বস্থ গ্রামাঞ্চলে এই লোমহর্ষক ডাকাতির পর ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দুইজন ডাকাত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকার করিয়া উক্তি করে। পরে তাহারা স্বীকারোক্তি ভান্দিয়া দেয়।

এই ডাকাতিতে একজন পুলিশ কনেষ্টবল অংশগ্রহণ করে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। তাহার বিরুদ্ধেও চার্জশীট দাখিল হইয়াছে। মোকদ্দমা বর্তমানে বিচারাধীন (১৯৭০)।

এখন আমরা সুন্দরবনের পার্শ্বস্থ লোকালয় হইতে গহীন অরণ্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত ডাকাতির কথা বলিব। সাতক্ষীরা রেঞ্জের মধ্যে পুষ্পকাটির জন্দল। এই জন্দলে ব্যাঘ্রের ভয় অত্যধিক। ইহার পার্শ্বেই দোবেকী গরান কুপ। একদল জলদস্যু, সংখ্যায় দশজন। দোবেকী গরান কুপে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ডাকাতি করিয়া তাহারা পুষ্পকাটিতে আসে।

জন্দলাভ্যন্তরে নদীমধ্যে বনবিভাগের বোট নন্দর করিয়া নৌকায় অফিসারের নববিবাহিতা স্ত্রীসহ মোট পাঁচজন লোক। সস্ত্রীক ফরেষ্টার, গার্ড ও মাঝি মল্লো। শেষ রাত্রে জলদস্যুরা নৌকা আক্রমণ করে। সুন্দরবনে ফরেষ্টারকে পিটেল বাবু বলা হয়। ডাকাতেরা কিছু দূরে তাহাদের নৌকা রাখিয়া জন্দলের মধ্য দিয়া পদব্রজে আসিয়া তীর

হইতে পিটেল বোট আক্রমণ করে। যেখানে নৌকা রাখা হয় সুন্দরবনের লোক উহাকে 'ডোরা' বলে। ডোরায় আসিয়া ডাকাতরা ফাঁকা আওয়াজ করিলে বাবুর পেটে ছাররা লাগে। তাঁহার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর মাথার খুলির উপর গুলি লাগিয়া এক গোছা চুল উঠিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রমহিলার মস্তক বাঁচিয়া যায়।

অকস্মাৎ নৈশ আক্রমণে নৌকার আরোহীরা ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ত্রস্তে সকলেই নৌকার খোলের মধ্যে পড়িয়া যায়। একটি গুলি দরজা ভেদ করিয়া যায়। জলদস্যুর কবলে সদ্যবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী। নিছক গল্প নহে, নিখুঁত ঘটনা। নৌকার মাথায় মাঝিরা ছিল। এক গুলিতে তাহার মাথার নীচের বালিশ ছিদ্র হইয়া যায়। সকলেই নিদারুণ বিপদের মধ্যে কাঁদাকাটি করিতে থাকে। এইরূপ ঘোরতর বিপদের মধ্যে না পড়িলে তাহাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা মুশকিল। তাহারা ডাকাতদের অনুনয় করিয়া বলে, "আমাদের সব নিয়া প্রাণে বাঁচাও, দোহাই তোমাদের, আমাদের প্রাণে মেরো না।"

—প্রত্যুত্তরে জলদস্যুরা বলে, তোমাদের মারবো না। নৌকার সরকারী বন্দুক ডাঙ্গায় ফেলে দাও। ডাকাতরা বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। নৌকা হইতে গুলি করিলে বৃক্ষের জন্য ডাকাতদের গাত্রে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। দায় পড়িয়া এহেন বিপদের মধ্যে নৌকা হইতে বন্দুক কুলে নিক্ষেপ করা হয়। দস্যুদল সকলেই সেই নৌকায় পড়ে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় সমস্ত লুটতরাজ করিয়া বন্দুকসহ উধাও হয়।

সুন্দরবনের বিখ্যাত শিকারী পচাব্দী। রয়াল বেঙ্গল বাঘের আতঙ্ক যে পচাব্দী সেও একদিন ডাকাতের কবলে পতিত হইয়াছিল।

আঠারোবেকী নদীর পার্শ্বে বজলার দোয়ানে। সেখানে এই ডাকাতি সংঘটিত হয় এক গভীর নিশীথে। পচাব্দী নিজে আমাদের কাছে সে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেঃ

—রাত্রি দুপুর। বজলার দেয়ানের মধ্যে আমরা প্রায় ৩০ জন লোক কয়েকখানি নৌকায় অবস্থান করি। বাওয়ালী ও অন্যান্য লোকও ছিল। গভীর নিশীথে খাওয়া শেষ করিয়া নৌকায় শুইয়া পড়ি। চারিদিকে নিঝুম নিরালা বন। গভীর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। নৌকায় কেহ অঘোরে ঘুমাইতেছে, কেহ জাগিয়া আছে আবার কেহ ধূমপান করিতেছে।

—এমন সময় ১৪ জন জলদস্যু দুইখানা নৌকায় আসিয়া আমাদের উপর হামলা চালায়। প্রথমেই তাহারা আমাদের নৌকা ঘিরিয়া ফেলে। আমাদের নিকট হইতে চাউল, জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা যাহা ছিল সব ছিনাইয়া লয়।

—প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া লুটপাট চলে। আমার নিকট বন্দুক ছিল, উহা শুকনা খালের কাদার-মধ্যে ফেলিয়া দি—। আমার সন্ধে ব্যাঘ্র শিকারের পুরস্কার ১৫০/- ছিল। আমি বড় নৌকার চরাটের মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করি। আমি খেয়াল করিয়া দেখিলাম ডাকাতদের মুখে গালপাট্টা, কাহাকেও চেনা যায় না। শুধু তাহাদের চোখগুলি দেখা যাইতেছে।

—আমাদের একজন জ্বরে কাতরাইতেছে। তার কাঁথার মধ্যে একটি সুটকেসে টাকা ছিল। আমাদের টাকা ও বন্দুক রক্ষা পাইল। সকলকে গামছা পরাইয়া অন্য যাহা কিছু ছিলো সর্বস্ব অপহরণ করিয়া জলদস্যুরা প্রস্থান করিল।

—এই ডাকাতদলের কাছে দুইটি বন্দুক ছিল। কিন্তু গুলি করে নাই। ডাকাতরা একে অন্যকে বড়বাবু, ছোটবাবু, কালুবাবু, পাগলাবাবু, মেজোবাবু প্রভৃতি ছদ্মনাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল।

—একবার টাকা না পাইয়া একজন দস্যুসর্দারকে বলিল, ও বড়বাবু, টাকাত বার করে না—ওকে আচ্ছামত বানাও, নৌকার ডালির উপর রাখিয়া মুন্ডু কাটিয়া দাও।

সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বেয়ালা-কয়লা নামে একটি দ্বীপ আছে। এমন নির্জন ও নিরালা স্থান জঙ্গলে বিরল। বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে এই স্থান দূরে নহে। এখানকার জঙ্গলময় স্থান সাধারণের অগম্য। তবুও বাওয়ালী এবং মৌয়ালরা কাঠ ও মধু সংগ্রহের জন্য ব্যাঘ্রভীতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেখানে গমন করে। বনবিভাগের একজন দারোগাকে সেখানে থাকিতে হয়। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, একজন গার্ড এবং মাঝিরা নৌকায় অবস্থান করে।

বেয়ালা-কয়লা দ্বীপের সংলগ্ন নদীতে নৌকায় উক্ত দারোগা অবস্থান করিতেছিলেন। বাবুর নববিবাহিতা পরমা সুন্দরী স্ত্রী, বয়স ১৭/১৮ বৎসর। দেশ বিভাগের কিছুদিন পূর্বের কথা। তখনও এখনকার ন্যায় জলদস্যুর বিভীষিকা জঙ্গলের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল।

বেলা ৪ ঘটিকা—অগ্রহায়ণ মাস। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া বিদায় লইতেছে। আগ্নেয়াস্ত্রসহ দিনের বেলায় ডাকাতদল নৌকা আক্রমণ করে। তাহাদের সঙ্গে চারিটি বন্দুক। ডাকাতদের সুবিধা, তাহারা তীরে ঘন বৃক্ষের আড়ালে—এদিক হইতে গুলি করিলে লাগে না। অথচ তাহারা নৌকার দিকে লক্ষ্য করিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিতে থাকে।

এহেন ভয়াবহ বিপদে সকলে ঘাবড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকে। মারে বাবারে রক্ষা কর। উপায়ান্তর না দেখিয়া নৌকার আরোহীরা জলদস্যুদের নিকট আত্মসর্মপণ করে। তখন দস্যুরা বলিল—তোমাদের বন্দুক ফেলে দাও। নিজেদের বন্দুক বাধ্য হইয়া তীরে ফেলিয়া দিতে হয়। ৭/৮ জন ডাকাত নৌকায় আরোহণ করিয়া টাকা-পয়সা, থালাবাটি, কাপড়-চোপড় সর্বস্ব লুন্ঠন করিয়া লয়। নিকটেই জলদস্যুদের ডিঙ্গি নৌকা ছিল। জোরজবরদস্তী করিয়া মেয়েটিকেও ডিঙ্গি নৌকায় অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বনের চাকুরীতে আসিয়া শেষ পর্যন্ত এই বিপদ্।

সকলে বিপদগ্রস্ত হইয়া কাঁদাকাটি করিতে থাকে। স্ত্রীকে উদ্ধার করিবারও উপায় নাই। দুইদিন পরে দুর্বৃত্তেরা মেয়েটিকে এক স্থানে ফেলিয়া যায়। পুলিশ উদ্ধার করিয়া তাহার স্বামীর খোঁজ করিয়া স্ত্রীকে প্রত্যপর্ণ করে। এই ডাকাতদল সীমান্তপারে পাড়ী জমায়। সবাই বলে বাছেরের দলের লোক। কেসের আশকারা হয় না।

মাদার বাড়িয়ার চর। নির্জন নিরালা বনভূমি। জনৈক লেখক এই ভীষণকায় স্থানকে Land of no return বলিয়াছেন। ১৯৫২ সালে এই জঙ্গলে ঢাকা জেলার অধিবাসী জহুরল হক ভূঞা বনবিভাগের দারোগা। তিনি সাতক্ষীরা রেঞ্জের অধীন মাদার বাড়ীয়ার

নদীতে গোলপাতা কুপে কার্যরত ছিলেন। ডাকাতরা দিনেরবেলা জন্দ্বলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নৌকায় গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। উক্ত দারোগা বাধ্য হইয়া একটি ছোট ডিঙ্গিতে বন্দুক রাখিয়া ঐ ডিঙ্গি ডাকাতদের দিকে ধাককা দিলে জলদস্যুরা নৌকায় আরোহণ করিয়া যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। তাঁহার স্ত্রীও ঐ নৌকায় ছিলেন। জলদস্যুরা তাহাকে কিছু বলে নাই। দরবার নামক একজন কুখ্যাত দস্যুসর্দার এই ডাকাতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। দরবার ডাকু বাছেরের গুরু।

আড়পান্দ্বাশিয়া ও খোলপেটুয়া নদীর সন্দ্বমস্থলে রাত্রে জলদস্যুরা নৌকায় পড়িয়া বনবিভাগের কর্মচারীদের যথাসর্বস্ব লুঠ করে। বোটম্যানের পেটে গুলি লাগিয়া সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। বনবিভাগ তাহার ভ্রাতাকে চাকুরী দিয়াছে এবং মাতাকে পেনসন দিতেছে।

পাপের যেমন বিচিত্র গতি। পাপীও তাহার পাপের রেখাসমূহ পশ্চাতে রাখিয়া যায়। সেজন্য একদিন না একদিন দস্যুরা ধরা পড়িবেই। পাপীর শাস্তি নিশ্চয়ই আছে। ইহকালেও আছে, পরকালেও আছে। এদেশে চলিত কথায় বলে—"দশদিন চোরের, একদিন গিরির" (গৃহস্থের)। কথাটি খুবই সত্য। মানুষ স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিবেই। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

পাকিস্তানের দস্যুরা ভারতে পলায়ন করিয়াও সব সময় রেহাই পায় না। তেমনি ভারত হইতে আগত দস্যুও এখানে ধরা পড়ে। কয়েকজন ভারতীয় যুবক পাকিস্তানে ডাকাতি করিয়া হিন্দুস্তানে পাড়ি জমাইত। এখানকার দস্যুদের সন্দ্বে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একবার ভারতের দুইজন যুবক ডাকাত ধরা পড়িয়া যায়। বিচারে তাহাদের কারাদণ্ড হয়।

সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ জলদস্যুবা জনসাধারণের নিকট বিভীষিকা বিশেষ। ব্যাঘ্র-কুমীর-হাঙ্গর অপেক্ষা ডাকুদের লোকে অধিক ভয় করে। চোরা শিকারীরাও অনেক সময় দস্যুতে পরিণত হয়। জলপথে নির্জনে ডাকাতি করিলে ধরা পড়ার ভয় কম। একে নির্জন বন, উহার উপর আবার জলপথ। ডাকাতদের পায় কে?

বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর জাহাজ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে টহল দেওয়ার জন্য বহু জলদস্যু সুন্দরবন এলাকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। নৌ-সেনাদের পাহারায় সুন্দরবনের ডাকাতি বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সুন্দরবনের ডাকাতদের সন্দ্বে চোরাচালানীদের বিশেষ সংযোগ আছে। উভয়ে উভয়ের বন্ধু। চোরাকারবারীরা দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে এবং জলদস্যুরা সুযোগ মত চোরাকারবারে লিপ্ত হয়। এই দুই দলের মধ্যে আবার জন্দ্বলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। জলদস্যুরা বাংলা-ভারতের চোরাচালানীদের দেখিলেই চিনিতে পারে এবং তাহাদের নিকট হইতে বখ্‌রা আদায় করিয়া ছাড়ে। লভ্যাংশ না দিলে চোরাচালানীদের উপর হামলা চলে।

সুন্দরবনে নদীপথে বিভাগপূর্বে অসংখ্য বাণিজ্যপোত কলিকাতা-আসাম যাতায়াত করিত। পাক-ভারত যুদ্ধের পর ইহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুন্দরবন ভ্রমণকালে অনেকে দিনের পর দিন ঘুরিয়া মানুষের মুখ দেখিতে পায় না। স্বপ্নঘেরা রহস্যময় এই দেশ। এখনও দেশ-বিদেশ হইতে কত প্রকার জলযান সুন্দরবনের নদী বাহিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করে তাহার ইয়ত্তা নাই। ডাকাতদের ন্যায় কালবাজারীরা জাহাজ ও নৌকাযোগে সাধারণের অগোচরে ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। গভীর জঙ্গলের জলপথ দুর্ধর্ষ কালবাজারীদের নখাগ্রে! আন্তর্জাতিক কালবাজারীরা মধ্যে মধ্যে সুন্দরবনে অবস্থান করে। বাকেরগঞ্জ ও খুলনার দক্ষিণে নদী ও সমুদ্র কালবাজারীদের যাতায়াতের পথ। শুল্ক ও পুলিশ বিভাগের বেড়াজাল ভেদ করিয়াও তাহারা ব্যবসায় চালায়। আবার কোন কোন সময় কালবাজারীদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। মগ-ফিরিঙ্গি দলের ন্যায় ব্যাপক না হইলেও দুর্ধর্ষ জলদস্যুরা এখনও সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি চালাইয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে।

এ পর্যন্ত বাংলা-ভারতের সুন্দরবনে যে সমস্ত জলদস্যুদলের সৃষ্টি হইয়া দেশব্যাপী আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে উহার মধ্যে পূর্ববর্ণিত পাইকগাছা থানাধীন গোবরা গ্রামের বাছের ঢালীর দলই সর্বপ্রধান। রূপকথার নায়ক, বনের বিভীষিকা এই বাছের ঢালী, যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

তৎকালীন সরকার এই দস্যু সরদারকে গ্রেফতার করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে। বহু চেষ্টার পরও পুলিশ এই কুখ্যাত জলদস্যু সরদারকে গ্রেফতার করিতে সক্ষম হয় নাই। বাছেরের বিরুদ্ধে বহু গ্রেফতারী পরোয়ানা। কিন্তু কোথায় তাহার সন্ধান মিলিবে? বড় বড় ডাকাতি করিয়া সে হিন্দুস্তানে পাড়ি দিয়াছে। সেখানেও তাহার দলবল আছে।

বাছের গেরিলা সৈন্যদের ন্যায় কৌশল অবলম্বন করিত। শুনা যায় যে, সে গভীর অরণ্যানীর মধ্যে নির্জন স্থানে সদলবলে লুকাইয়া থাকিত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ভারত সীমান্তে কোথাও লুক্কায়িত থাকিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া আবার ভারতে ফিরিয়া যাইত। দেশবিভাগের পর প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া বাছের উভয় বঙ্গের এক সমস্যা হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের সমস্যা গুরুতর কেননা এখানে তাহার বাড়ী। এখানকার পথঘাট ও ডাকাতি করার সুযোগ সুবিধা তাহার নখাগ্রে। সেজন্য এখানকার পুলিশের মাথাব্যথা অধিক। সুন্দরবনের সীমান্তে উভয় রাজ্যের জলদস্যুবৃত্তি সমস্যা লইয়া ২৪ পরগনা ও খুলনা জিলার পুলিশ কর্তাদের কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কুখ্যাত ডাকু বাছের। এইরূপ একটি সম্মেলনে বাছেরকে আন্তর্জাতিক জলদস্যু বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

বিভিন্ন পুস্তকাদিতে যে সমস্ত দস্যুবৃত্তির কল্পিত ও সঠিক কাহিনী শ্রুত হয়, বাছেরের কাহিনী উহা হইতে কোন অংশে কম রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক নহে। দস্যুবৃত্তিতে বাছের বিলাতের রবিন হুডের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক কাহিনীর নায়ক সে।

এই সুন্দরবনখ্যাত ডাকু সরদার বাছেরের সঙ্গে বাংলা পুলিশের এক সংঘর্ষ হয়। উক্ত সংঘর্ষে হাবিলদার ঈদ্রিস ও তাঁহার নৌকার দুইজন মাঝি বাছেরের গুলির আঘাতে নিহত হয়। হাবিলদার বাকেরগঞ্জ জিলার অধিবাসী এবং ঐ সময় তিনি পাইকগাছা থানার অন্তর্গত সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় বেতকাশীর পশ্চিমে ঘড়িলাল নামক পুলিশ ক্যাম্পের অধিনায়ক ছিলেন। বাছের স্থানীয় এক গ্রামে ডাকাতি করিয়া সুন্দরবনের মধ্যে সত্যপীরের খাল দিয়া নৌকারোহণ করিয়া যাইতেছিল। সেই সময় হাবিলদার ঈদ্রিস সংবাদ পাইয়া নৌকাযোগে বাছেরের নৌকার পিছু পিছু ধাওয়া করেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত হাবিলদার জলদস্যুদের অনুসরণ করিতে থাকেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন ডাকাতদল তাঁহার বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। কিন্তু ধূর্ত ডাকু সরদার পুলিশের আগমন পূর্বেই বুঝিতে পারিয়া অতি সন্তর্পণে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ওত পাতিয়া নৌকার মধ্যে বসিয়া থাকে। হাবিলদার নৌকাটি প্রকৃত ডাকাত দলের কিনা সে বিষয় নিশ্চিত হইয়া বন্দুক ছুড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় সুচতুর বাছের মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া হাবিলদারের দেহ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলে তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া যায়।

হাবিলদার ঈদ্রিসের সঙ্গে যতিন ও বিনোদ নামক দুইজন নৌকার মাঝির উপরও বাছের গুলি করে। যতিন ও বিনোদের গাত্রের গুলি ভেদ করিয়া হাবিলদারের গাত্রেও লাগে। রুধিরাক্ত কলেবর লইয়া হাবিলদার বীরদর্পে হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকাতদের উপর কয়েক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করেন এবং উহার আঘাতে ২ জন ডাকাত ধরাশায়ী হয়। ধূর্ত বাছের কোনপ্রকারে পলাইতে সক্ষম হয়। ডাকু বাছেরের গুলিতে খুলনা হাসপাতালে হাবিলদার ঈদ্রিসের জীবন প্রদীপ নিভিয়া যায়। বাছেরের প্রচণ্ড আক্রমণে যতিন ও বিনোদ নৌকা চালকদ্বয় নিহত হয়। পরে তাহাদের লাশ নদীমধ্যে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। দুইটি লাশই শহরে আনা হয় কিন্তু উহার কিছু মাংস কাঁকড়ায় খাইয়া ফেলে। ঐ স্থানে ২৫/২৬ খানা কার্তুজের খাপও পাওয়া যায়। বাছেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হয়, কিন্তু সে ধরা পড়ে না। ইতিমধ্যেই সে হিন্দুস্তানে পাড়ি জমাইয়াছে।

আমি সুন্দরবনের ঐ অঞ্চল ভ্রমণকালে সত্যপীরের খালের মধ্যে যাইয়া যেখানে উভয়পক্ষ গুলি বিনিময় করিয়াছিল সেই স্থান পরিদর্শন করি। খোলপেটুয়া নদীর প্রান্তে সত্যপীরের খাল। খালের দুই পার্শ্বেই সুন্দরবন। গ্রামের লোকেরা জঙ্গলাভ্যন্তরে গুলিগোলার ভীষণকায় আওয়াজ শুনিয়াছিল।

ইংরাজী ১৯৬২ সালের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাছের ৫০০ কার্তুজ সহ ডাকাতি করার জন্য সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে লুকাইয়া আছে। বুড়ি গোয়ালনীর নিকট তাহার দল একটি ডাকাতি করিয়াছে। এই দল বনবিভাগের সরকারী নৌকায় অকস্মাৎ গুলি ছুঁড়িয়া একটি বন্দুক ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। একজন বোটম্যান গুলির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। এইভাবে মধ্যে মধ্যে এই জলদস্যুদল সুন্দরবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিত।

বাছের বনাঞ্চলের অধিবাসীদের আতঙ্ক। ভয়ে বাড়ীতে টাকা পয়সা, স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রাখা বিপজ্জনক। রাত্রে শুইয়া লোকে বাছেরের গল্প করে। বাছেরের নাম এমন প্রচার হইয়াছে যে, অন্য জলদস্যুরা ডাকাতি করিলেও বাছেরের নাম হয়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মানুষ বাছেরের ভয়ে লোকালয়ে আসিয়া আত্মরক্ষা করে। মায়েরা পর্যন্ত বাছের ডাকুর নামে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ছেলেদের ঘুম পাড়ায়। লোকালয় ও সুন্দরবনে তাই বাছের ভীতি এককালে বিদ্যমান ছিল।

বাল্যবেলায় বাছেরের বাপ মারা যায়। শ্রীউলা গ্রামের মুচী দস্যুদলের সহিত মিশিয়া তাহাদের সাহায্যে এবং ওস্তাদ আছিরদ্দিন সানার নেতৃত্বে বাছের দস্যুবৃত্তি শিক্ষা করে। বাছেরের পিতার নাম নেপাল ঢালী। ভ্রাতা আছের, আক্কাস, ওমর আলী, নূর আলী ও রুহুল কুদ্দুস। ইহাদেরও নাকি সে দস্যুবৃত্তি শিক্ষা দিয়াছে। ডাকাতির সময় বাছেরের দল গোলাগুলি, বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, রামদা, ভেলা, ঢাল, সড়কী, বল্লম, লাঠি, ঠেন্দ্বা, টর্চ ও হেসাক লাইট সঙ্গে রাখিত। ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া প্রথমে ভীতি প্রদর্শন করা হইত। প্রায় প্রতি ডাকাতিতে তাহারা নরহত্যা করিত।

বিভাগোত্তর কালে সীমান্ত পাড়ি দিবার প্রাককালে বাছেরের বিরুদ্ধে পাঁচ-ছয়টি গুরুতর মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল। ধূর্ত ডাকু সর্দার গ্রেফতার ও বিচার এড়াইবার জন্য দেশ ত্যাগ করে। পশ্চিমবঙ্গে সে ৬ জন শিক্ষিত হিন্দু যুবককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে। ইহাদের কয়েকজন এবং তাহাদের কতিপয় সঙ্গী জলদস্যু ইতিপূর্বে ধরা পড়িয়া বিচারাদালতে নীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদের কঠিন কারাজীবন যাপনের আদেশ হইয়াছে।

এই আন্তর্জাতিক ডাকু সরদার ডাকাতি করার সময় যেরূপ নির্মমভাবে নরহত্যা করিত তদ্রূপ শৃঙ্খলাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দলভুক্ত ব্যক্তিকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এ সম্পর্কে জানিতে পারা যায় যে, এই ডাকু সরদারের পুত্রের সঙ্গে তদীয় ভায়রা পুত্রের বধূর গুপ্ত প্রণয় ঘটে। বাছের উক্ত ভায়রাপোকে তাহার স্ত্রীকে বাংলাদেশে রাখিয়া আসিতে আদেশ করে। ডাকু সরদারের আদেশ অমান্য করিয়া সে তাহার স্ত্রীকে চরিত্রহীনতার অপরাধে সুন্দরবনের জঙ্গলাভ্যন্তরে আনিয়া নির্মমভাবে খুন করিয়া লাশ নদীতে ফেলিয়া দেয়। বাছেরের নিকট ফিরিয়া গিয়া আদেশ পালন করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা রিপোর্ট দেয়। পরে বাছের জানিতে পারে যে, তাহার ভাগ্নে হুকুম তামিল করে নাই, তদাক্রোশে সে নিজ হস্তে উহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

বাছেরের অন্যতম গুরু ছিল হাজরা আর দরবার ছিল সয়া। একবার এক ডাকাতির পরে লুণ্ঠিত অর্থের বন্টন লইয়া দরবারের সঙ্গে বাছেরের গোলযোগ উপস্থিত হয়। ডাকাতদের মধ্যে যেমন শৃঙ্খলা ও একতা তেমনিই আবার একে অন্যের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে না। লুণ্ঠিত দ্রব্য অনেকে এদিক ওদিকে সরাইয়া রাখে। বাটোয়ারার

সময় কাহাকেও বেশী দিলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এজন্য কোন কোন সময় দস্যুরা একে অন্যকে হত্যা করে। এমনই এক পরিস্থিতিতে বাছের গুরু দরবারকে খুন করে। সে স্বদলীয় হোসেন ও অন্য কয়েকজনকেও নিজে বিচার করিয়া হত্যা করে।

জনৈক দক্ষ পুলিশ কর্মচারীর নিকট হইতে জানিতে পারি যে, একদা সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত বেয়ালা-কয়লা দ্বীপের জন্দ্বলে বাছের গৃহ নির্মাণ করিয়া গুপ্ত ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। গভীর জন্দ্বলে ঘেরা এই দ্বীপ। মাদারবাড়ীয়া, জলঢাকা, আশাশুনি প্রভৃতি জন্দ্বলে মনুষ্য সমাগম কম, সেজন্য এই অঞ্চলে লোকজন সহ বাছের নৌকাযোগে ভ্রমণ করিত। বাছেরকে ধরিবার জন্য কয়েকজন পুলিশ বেয়ালা-কয়লা দ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী জন্দ্বলে অন্বেষণ করে। সেখানে তাহারা একখানা ভগ্ন নৌকা ও ভগ্ন কুঁড়েঘর দেখিয়া ফিরিয়া আসে। বাছের অন্যান্য ডাকুদের লইয়া এখানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করিত। শত চেষ্টার পরও বাছের ধরা পড়ে না।

বাছের সুন্দরবনখ্যাত জলদস্যুদলের সর্বাধিনায়ক। তাহার হুকুম ব্যতীত দলের অন্য কেহ এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। সকলকে তাহার আদেশ এবং দলীয় নিয়ম কানুন কঠোরভাবে পালন করতে হয়। বাছের সকলেরই ওস্তাদ। পুলিশের হিসাব মতে বাছের সুন্দরবনের কর্মচারীদের নিকট হইতে এ পর্যন্ত প্রায় ২০টি বন্দুক ছিনাইয়া লইয়াছে। সে এবং তাহার দলের লোকেরা এক শতের অধিক ডাকাতি করিয়াছে। তাহার দলের সর্বমোট রাইফেল ও বন্দুকের সংখ্যা শতাধিক হইবে বলিয়া কোন অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী এই লেখককে জানাইয়াছেন। বাছেরের দল একবার পাইকগাছা থানাধীন এক বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া নব্বই হাজার টাকাসহ উধাও হয়।

বাছেরের প্রথম জীবন সম্পর্কে এক আইনজীবী আমাকে বলেন যে, সে চোরাকারবারের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। প্রথম প্রথম জন্দ্বলের নদীতে ছোটখাট চুরি ও ডাকাতি করিত। দিনে দিনে তাহার অপরাধ প্রবণতা বাড়িতে থাকে। এককালের সাগরেদ কয়েক বৎসরের মধ্যে দলপতি বনিয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপকার্য হইতে মহাপাপের কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িল। সামান্য বিষবৃক্ষ সহসা মহীরুহে পরিণত হয়।

ক্ষুদে ডাকু কালক্রমে খ্যাতনামা ডাকাত হিসাবে পরিচিত হইল। সে হুকুম করিল কোন ছোটখাট ডাকাতি করিবে না। দশ সহস্র টাকার নীচে নগদ অর্থের মালিকের উপর কোন হামলা করা হইবে না। কোন গৃহে ডাকাতির সময় অর্ধঘন্টার বেশী অবস্থান করিবে না। এই ধরনের বহু নিয়ম-কানুন এই জলদস্যুদের সদস্যদের মানিয়া চলিতে হইত। লুণ্ঠিত অর্থের একাংশ দরিদ্র লোকের মধ্যে বাছের বিতরণ করিত এবং কেহ দুর্বলের উপর অযথা অত্যাচার করিলে সে তাহাকে শাস্তি দিত।

১৯৫৬ সালে বাছের দলবলসহ ঝপঝপে নদীতে এক নৌকা আক্রমণ করিয়া বনবিভাগের একজন গার্ডকে গুলি করিয়া গুরুতর জখম করে। জখমীকে সকলে

নৌকাযোগে নলিয়ান অফিসে আনিয়া তথা হইতে খুলনা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে। বাছের ও তার সন্দীদের নামে মোকদ্দমা রুজু হয়।

বনবিভাগের ফরেষ্টার আবদুল মজিদ। বাড়ী সিলেট জেলায়। এখন তিনি রেঞ্জার। ১৯৫৬ সালে জন্দলাভ্যন্তরে তাঁহার নৌকা হইতে দস্যুরা গভীর রাত্রে মারপিট করিয়া বন্দুক ছিনাইয়া লয়। তিনি তখন গোলপাতা কুপ অফিসের হাউস বোটে অবস্থান করিতেছিলেন। জলদস্যুরা তাঁহার সর্বস্ব অপহরণ করে। সকলেই বাছেরকে সন্দেহ করে।

ফরেষ্ট গার্ড দুলাব আলী ফকির, বাড়ী ঢাকা জেলায়। রাত্রিতে সস্ত্রীক নৌকায় ছিল। অকস্মাৎ গভীর অন্ধকারে দস্যুদল নৌকা আক্রমণ করিয়া তাহার পিঠে তিনটি গুলি করিয়া দেয়। তার স্ত্রীর চোখের পাশ দিয়া গুলি ভেদ করিয়া গুরুতর জখম হয়। ইহাতে জন্দলের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। রেঞ্জার সুজাত সাহেব তাহাদের হাসপাতালে আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

ধীরেন দাস, আকবর—দুইজন বোটম্যান জন্দলমধ্যে একবার জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৯৫৭ সালের কথা। ডাকাতের গুলি ধীরেনের বুকে এবং আকবরের হাঁটুতে লাগে। সৌভাগ্যক্রমে হাসপাতালে চিকিৎসার পর উভয়ে নিরাময় হয়। কয়েকজন জলদস্যুর খুলনা জজকোর্টে বিচার হইয়া জেল হয়। কোন মোকদ্দমায় বাছের ধরা পড়ে না।

ভাগ্যের পরিহাস! বাছেরের সুখের দিন ফুরাইয়া আসিল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাস। যে বাছের শুল্ক ও পুলিশ কর্মচারীদের চোখে ধূলি দিয়া সীমান্ত পারে চলিয়া গিয়াছে। দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধকাল পুলিশ তাহার খোঁজ পায় নাই। সম্প্রতি আশ্চর্যভাবে এই কুখ্যাত ডাকু সরদার গ্রাম্য জনসাধারণের কাছে ধরা পড়িয়াছে।

জন্দলজীবন বাছেরের নূতন নহে। সে ভারতে গিয়াও ধরা পড়িয়া আলীপুর জেল ভান্দিয়া বাহির হয়। জেলখানার লোহার সিক কাটিয়া সে বাহিরে আসিয়া বাংলাদেশে আসার আয়োজন করে। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। বাছেরের বাড়ী ও তার দলের লোকদের বাড়ীতে ভারতীয় পুলিশ জোর খানাতল্লাশী চালায়। কিন্তু বাছেরকে তাহারা গ্রেফতার করিতে পারে না। বাছের উপায়ান্তর না দেখিয়া সীমান্ত পাড়ি দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বাছেরকে গ্রেফতারের পর জনসাধারণ হৈ-চৈ করিয়া থানায় আনিয়া উপস্থিত করে। তাহাকে দেখিবার জন্য হাজার হাজার জনতা পাইকগাছা থানায় ভিড় জমায়। সুন্দরবনের ব্যাঘ্ররাজকে ধরিয়া আনিলেও এত ভিড় জমিত না। তাহাকে অতঃপর খুলনা কোর্টে চালান দেওয়া হয়।

বাছেরকে দেখিবার জন্যে কোর্ট প্রান্দণে ভয়াবহ ভিড়। লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার জনতা রোমাঞ্চকর দস্যুবৃত্তির অধিনায়ককে দেখিতে আসিয়াছে। পুলিশ ভিড়

থামাইতে পারে না। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আইনজীবী সকলেই বাছেরের নাম জানে; সেজন্য প্রত্যেকেই তাহাকে দেখিতে উদগ্রীব। ভিড় আর থামে না। পুলিশ বাধ্য হইয়া তাহাকে দ্রুত কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করে। কোর্ট হাজত হইতে জেলখানা পর্যন্ত জনসমুদ্রের ভিড়। যেন কাহারও শোভাযাত্রা চলিয়াছে। উৎসুক নেত্রে পথিকেরা সুন্দরবনের দস্যুরাজকে দেখিয়া লয়। বাছের কারাগারে প্রবেশ করিলে তাহার পায়ে কঠিন লৌহ শৃঙ্খল পরাইয়া অভ্যর্থনা করা হয়। জেলপুলিশ তাহাকে লইয়া জেলের লৌহ পিঞ্জরের সেলে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমি কয়েকদিন পরে খুলনা পুলিশকোর্টে বাছেরের সন্দে সাক্ষাৎ করি। সে সংক্ষেপে তাহার জীবনবৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণনা করে। বিচিত্র সে জীবন কাহিনী। পশ্চিমবন্দে সে বাবর আলী মোল্লা নামে পরিচিত বলিয়া জানায়। আমাদের পরবর্তী আলোচনা হইতে এ বিষয় বিস্তারিত জানা যাইবে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাছেরের গ্রেফতার সংবাদ প্রকাশিত হয়। উহা মোটামুটি এইরূপ ঃ

সুন্দরবনের রাজা, ডাকাত বাছের ঢালী গ্রেফতার : খুলনা ৭ই জানুয়ারী ১৯৬৬ সাল।—পাক-ভারত উপমহাদেশের কুখ্যাত ডাকাত বাছের ঢালীকে এই জেলার পাইকগাছা থানার একটি গ্রামে গ্রেফতার করা হইয়াছে। গত ১৯৫০ সাল হইতে পশ্চিমবন্দ ও পূর্ববন্দ পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। বাছের ঢালী এযাবৎ প্রায় শতাধিক ডাকাতি করিয়াছে এবং বহু ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে সে ঈদ্রিস নামক একজন হাবিলদারকে হত্যা করে। ঈদ্রিস তাকে গ্রেফতার করিতে গেলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। বাছের ঢালী হাবিলদারকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া পালায়ন করে। ঈদ্রিসের স্মৃতি উপলক্ষে প্রতিবৎসর খুলনায় ঈদ্রিস স্মৃতি ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার এই কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। বাছের ঢালী পশ্চিমবন্দেও ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাকে গ্রেফতারের পর অদ্য কড়া পুলিশ পাহারায় খুলনা শহরে আনয়ন করা হয়। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতকে দেখার জন্যে বিপুল জনসমাগম হয়। বাছের জানায় যে, একজন সাগরেদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই গ্রামবাসীদের হাতে সে ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় সে ভারতে অবস্থান করিতেছিল। কালিপদ সেন নামক এক ভারতীয় মাঝির নৌকায় সে বাংলায় আগমন করিয়াছিল। ইতিমধ্যেই সে ৬ জন অনুচর সংগ্রহ করিয়াছে। আর একদিনের মধ্যে সে একটি বন্দুক যোগাড় করিতে পারিত। এই সময় সে গ্রেফতার হইয়াছে। মাঝি কালিপদ সেনকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে।

—বাংলাদেশ ও ভারতের পুলিশ গত ১৫ বৎসর যাবৎ তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। তাহার বয়স বর্তমানে ৫০ বৎসর। তাহার চেহারায় কোন অসাধারণত্ব বা কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ৫ ফুট লম্বা বাছের ঢালীর ওজন প্রায় ১১০ পাউন্ড। লুঙ্গি, শার্ট ও পুরাতন ছোট উলের কোট পরিহিত খর্বকায় বাছের ঢালীকে অত্যন্ত সাধারণ লোক বলিয়া মনে হইতেছিল।

—সে আরও জানায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বারাসতে তাহার পাকা বাড়ী রহিয়াছে। সেখানে তাহার বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী ও পাঁচজন সন্তান রহিয়াছে। বাছের ঢালীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, তাহার বারাসতের বাড়ীতে ১৪টি বন্দুক, ৪টি রাইফেল ও ২টি রিভলভার রাখিয়া আসিয়াছে। তাহার সম্পর্কে অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। অনেকে মনে করে বাছের ঢালী নানাপ্রকার মন্ত্র জানে বলিয়া তাহাকে গ্রেফতার করা সম্ভব নহে।

অন্য আর একটি পত্রিকায় বাছেরের গ্রেফতার সংবাদ বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয় ঃ

এ কালের "দস্যু মোহন" : ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়, খুলনার এই "দস্যু মোহন" মাত্র পনের দিন পূর্বে নাকি সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীদের চোখে ধূলি দিয়া পূর্ব বাংলার ভূমিতে প্রবেশ করে। মাত্র চারদিন পূর্বে তাহাকে অপূর্ব কৌশলে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

—সদম্ভে এই দস্যু ঘোষণা করে ঃ মাত্র একটি রাইফেল এবং এক বাক্স গুলি থাকিলে কাহারও সম্ভব ছিল না তাহার গাত্র কেহ স্পর্শ করে। গ্রেফতারের পরেও তাহাকে সুস্থ ও সবল দেখাইতেছিল।

—এই মধ্যবয়সী দস্যুর শৈশবকাল কাটিয়াছিল পাইকগাছা থানার গোবরা গ্রামে। কবে, কোন্‌দিন, কিভাবে তাহার প্রথম দস্যুজীবন শুরু হয়, তাহা জানা যায় নাই। তবে স্বাধীনতার পূর্ব আমলেই তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তৎপরবর্তী আমলেই সে "সুন্দরবনের নায়ক" বলিয়া খ্যাতিলাভ করে।

অপর সীমান্তে বারাসতের কতিপয় অঞ্চলে তিরিশ বিঘা জমি, একটি সুন্দর অট্টালিকা এবং কয়েকটি কারখানার মালিক এই দস্যুদলপতি। তাহার প্রথম পুত্র নাকি ইতিমধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। এই "দস্যু মোহন" মাত্র পনের দিন পূর্বে বঙ্গে প্রবেশ করে এবং বেদকাশীতে এক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাকাতির উদ্দেশ্যে আত্মীয়ের গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় হাজী মোসাক সরদার এবং হাজী হানিফের "কৌশলে" তাহাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

—আরও প্রকাশ, এই দস্যু নাকি উক্ত হাজীদ্বয়ের গৃহে ডাকাতি করিয়া বন্দুকসহ গোলাবারুদ লইয়া সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে পাড়ি জমাইবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। উক্ত হাজীদ্বয় উহা জানিতে পারিয়া দস্যুর আত্মীয়ের সহিত "যোগসাজসে" নিরস্ত্র অবস্থায় তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং পুলিশের নিকট সমর্পণ করে।

—পাইকগাছা থানার গোবরা গ্রামের অধিবাসী, সুন্দরবন অঞ্চলে তথা দক্ষিণ বঙ্গের ত্রাস এবং এ যুগের এই "দস্যু মোহনের" নাম হইল বাছের ঢালী। শোনা যায়, তাহাকে ভারতীয় জেলের দুর্ভেদ্য কারা প্রাচীরও আটক করিয়া রাখিতে পারে নাই। ভারতীয় আদালত তাহাকে ১৪ বৎসর কারাদণ্ড প্রদান করিলে সে জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাহাকে গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। বাছের হিন্দু না মুসলমান তাহা কেহই জানিত না। সে এপারে আসিয়া গোবরা গ্রামে নিজের বাড়ীতে যায় নাই, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিল আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। তখন কে জানিত শ্বশুরবাড়ী আগমনে এমন বিপত্তি ঘটিতে পারে।

জেলখানা হইতে মধ্যে মধ্যে বাছেরকে কোর্টে আনা হইত। তাহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি মোকদ্দমা। অধিকাংশ ডাকাতি ও নরহত্যাজনিত গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত। বাছেরকে দেখিবার জন্য কোর্টে বিপুল জনসমাগম হইত। অনেক পরিচিত লোক যাহারা বাছেরকে যমের ন্যায় ভয় করিত তাহারাও তাহাকে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। "ও বাছের ভাই, কেমন আছ, এখন কেমন ঠেকে?" ইত্যাদি। পিঞ্জরে আবদ্ধ দস্যু নীরবে সব সহ্য করিয়া যায়।

আমি একাধিকবার বাছেরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। জেলখানায় খাবারের অসুবিধার কথা সে আমাকে বলে। ধনী বাছের এক মুঠা অন্নের জন্য আমাকে অনুরোধ জানায়। একথা আমি জেল কর্তৃপক্ষকেও জানাই।

হাতে-পায়ে লৌহ শৃংখল। বাহিরে আসিলে তাহাকে কড়া পাহারায় থাকিতে হয়। সে বলে, প্রথমে তাহাকে সাড়ে নয় সের, পরে সাড়ে পাঁচ সের এবং সাড়ে চারি সের লোহার বেড়ী পরান হইয়াছে। এখন তাহার পায়ে তিন সের ওজনের লোহার বেড়ী খুলিয়া দেওয়ার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করে কর্তৃপক্ষকে বলার জন্য।

সাক্ষী তাহাকে দেখিয়া সনাক্ত করিবে সেজন্য সে কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখে। শুধু চোখ দুইটি দেখা যায়। এই গ্রন্থের জন্য বাছেরেব ফটো তুলিতে যাই। সে আপত্তি করে। সেজন্য বিচারাধীন আসামীর ফটো গ্রহণ সম্ভব হয় না। বাছের আমাকে বলে যে, সে খালাস পাইলে আমাকে ফটো তুলিতে দিবে।

বাছের সুদক্ষ পশু ও মানুষ শিকারী। সে যেখানে নিরিখ করিবে বন্দুকের গুলি সেখানেই লাগিবে। তাহার গুলিচালনা অবধারিত। একথা সে আমাকে বলিয়াছে।

এই দুর্ধর্ষ আন্তর্জাতিক জলদস্যুর কাহিনী রূপকথার ন্যায় বিস্তারলাভ করিয়াছে। শারীরিক অবয়ব দর্শনে অনেকেই তাহাকে বাছের ঢালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অনেকেই আবার বলিয়াছে এ জাল বাছের, প্রকৃত বাছের ধরা পড়ে নাই। তাহাদের বিশ্বাস বাছের ধরা পড়িতে পারে না। সে সুন্দরবনের রাজা।

বাছের জেলে কঠোর প্রহরাধীনে শৃঙ্খলাবস্থায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী আছে। আরও কয়েকটি মামলা তাহার বিরুদ্ধে বিচারাধীন রহিয়াছে। কিন্তু ভয়ে অনেকে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে চাহে না। এমনই ভয় যে, যদি বাছের খালাস পায় বা তাহার লোকেরা জানিতে পারে তবে সে সাক্ষীর রক্ষা নাই। তদ্ব্যতীত বাছেরের মামলাগুলি দ্বাদশ বর্ষের ঊর্ধ্বকালের। সেজন্য কাগজপত্রও অনেক খোয়া গিয়াছে। সাক্ষী বা বাদীরও খোঁজ নাই। কে জানিত দীর্ঘ পনের বৎসর পর দস্যুরাজ ধরা পড়িবে। মানুষের স্মৃতি ক্ষীণ। বাছেরের

উপর অনেকের আক্রোশ ছিল, কিন্তু তাহা বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। পুলিশও তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করে না। বাছের একদিন বলিয়া ফেলিয়াছে যে, এই ছিল তাহার স্বাভাবিক পরিণতি। যেমন কর্ম তেমনই ফল! দুর্ধর্ষ বাছের এখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দিন গুজরান করিতেছে।

মদিনারাবাদ ক্যাম্পের তিনজন পুলিশ ১৯৬২ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর গোবরা গ্রামের দিকে টহল দিতে যায়। বেলা ৪ ঘটিকার সময় গ্রামের লোকে পুলিশদের জানায় যে, বাছের ও তদীয় ভ্রাতা আছের কপোতাক্ষী নদীতীরে জঙ্গলের মধ্যে পালাইয়া আছে। পুলিশ গ্রাম্য লোকজনসহ জঙ্গল ঘিরিয়া তল্লাশী চালায়। ফলে আছের জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিয়া নদীমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সাঁতরাইয়া পালাইবার চেষ্টা করে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুলিশে গ্রেফতার করে। কিন্তু বাছেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি।

একজন সিপাহী রাইফেলসহ নদীতীরে দণ্ডায়মান ছিল, বাছের তাহাকে বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া জখম করিয়া দেয়। পুলিশও তাহার দিকে গুলি নিক্ষেপ করে কিন্তু ধূর্ত বাছের পালাইতে সক্ষম হয়। পুলিশ ও গ্রাম্য লোকেরা বাছেরের পিছু ধাওয়া করে কিন্তু সে দ্রুততার সহিত কয়রা গ্রামের জঙ্গলমধ্যে অন্তর্হিত হয়। সেখানেও পুলিশের সঙ্গে তাহার গুলি বিনিময় হয়। এবার কেহই আহত হয় না। বাছের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলে সকলে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।

বাছেরের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল হয়। সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সে খালাস পায়। কিন্তু অন্যান্য মোকদ্দমার জন্য কারাগারের বাহিরে আসিতে পারে না।

এই দস্যু দলপতির সহিত সুন্দরবন বিভাগের প্রধান— (ডি. এফ. ও.) আলীম সাহেব খুলনা জেলে সাক্ষাৎ করেন। বাছের তাঁহার নিকট কিছু গোপন না করিয়া তাহার বিচিত্র জীবনালেখ্য বর্ণনা করে। বাছের আলীম সাহেবকে এইরূপ বর্ণনা দেয় ঃ

—বাল্যে আমার বাপ মারা যায়। যা জমি-জমা ছিল মামাত ভাই মানিক গাজী ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায়। মামাদের বাড়ী মজুর খাটতে হয় তাহাদের স্বার্থে। সেজন্য অন্তর মামাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে ওঠে।

—হঠাৎ ডাকাতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে ডাকাতি শিক্ষা করি। প্রথমেই মামাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার পরিসমাপ্তি করি। মামা বাড়ী ডাকাতি করে তাদের ধ্বংস করে দিই এবং ১৬,৫০০ টাকা লুটপাট করি।

—পরে আমি দলপতি বা মাষ্টার হই। বহু লোককে আমার খাবার যোগাতে হয়। চারিদিক হতে নানা প্রকার খবরাখবর ও প্রলোভন আসতে থাকে। তখন ডাকাতি করা একপ্রকার নেশা হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত এই নেশাই আমার একমাত্র পেশায় পরিণত হয়।

—আমি দেশ বিভাগের পর চোরাচালানীদের নিকট থেকে ঘুষ আদায় করতাম। একবার খুলনা শহরের জনৈক চোরাচালানীকে একমণ রসগোল্লা পাঠাতে বলি। সে

আমাকে আটত্রিশ সের রসগোল্লা প্রেরণ করে। মিনতি করে খবর পাঠায় যে, বাজারে মাল না থাকায় ২সের রসগোল্লা কম দিয়েছি, মাষ্টার যেন কিছু মনে না করেন ইত্যাদি।

—অনেক সময় আমি বাকেরগঞ্জ জেলার দুইজন নামজাদা চোরাকারবারীর নৌকা আটক করতাম। আমাকে বহু অর্থ ঘুষ দিত। খুলনার চোরাকারবারীদের নিকট থেকেও ঘুষ আদায় করতাম। বেশ কিছুদিন জন্দ্বলের নদীপথে আমার এই ব্যবসায় অব্যাহত ছিল। আমি দেশত্যাগ করার পর এই ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়।

—একবার আমি একই সন্দ্বে ২১ খানা নৌকা চোরাচালানীর মাল ধরে ফেলি। তাতে পাট, চাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বহু ভারতীয় মালামাল ছিল। তাদের নিকট থেকে প্রচুর টাকা আদায় করে ছেড়ে দেই। এইভাবে বাটপাড়ী করে আমার যথেষ্ট আয় উপার্জন হতো। দস্যুবৃত্তি করার আবশ্যক হতো না।

ডাকু বাছের বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। যে কোন পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। তাহার মোলায়েম ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে অনেকে তাহাকে করুণার পাত্র মনে করে।

জেল পরিদর্শনে গিয়া আমি বাছেরের সন্দ্বে আলাপ করি। সে ও তার ভাই রূহুল কুদ্দুস কঠিন জেল-জীবনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। খুলনা জেলের নির্জন কক্ষে ফাঁসির আসামীর পার্শ্বে বাছের থাকে। আমি সেখানে গিয়া পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বাছেরের সন্দ্বে পরিচয় করাইয়া দিয়াছি। আমার এই গ্রন্থ পাঠের পর বাছেরকে একনজর দেখার জন্য পাঠকদের আগ্রহ বাড়িয়া যায়।

বাছেরের সহিত আমার প্রাণখোলা আলাপ হইয়াছে বহুবার। সে আবদার করিয়া অভিযোগের সুরে বলে—উকিল সাহেব, আপনি আমার ইতিহাস লেখার জন্য—সরকার আমাকে ছাড়িতেছে না। আমার ছাড়াইবার ব্যবস্থা করুন।

দশ

সুন্দরবনের বিভীষিকা

ভয়সঙ্কুল সুন্দরবনে নানাপ্রকার বিভীষিকা বিদ্যমান। জঙ্গলের সরীসৃপ, হাঙ্গর-কুমীর, ব্যাঘ্র-বন্যবরাহ প্রভৃতি জীবজন্তু আমাদের সুন্দববনকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। নির্জন বনের অভ্যন্তরে নদীনালায়ও জলদস্যুর ভীতি। সুন্দরবনের মনোরম পরিবেশে এহেন বিভীষিকা অভিনব ও রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে কত পর্যটক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং অনুসন্ধিৎসু-লোক জ্ঞান আহরণের জন্যে এখানে আগমন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। রহস্যময় সুন্দরবনে যে সমস্ত অত্যদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা শ্রুত হয় এখানে আমরা জাজ্বল্যমান ও চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা তাহারই কয়েকটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। গহীন বনের অকুস্থলে পরিভ্রমণ করিয়া বনের স্থায়ী মানুষের সাহচর্যে আসিয়া যে সমস্ত বিভীষিকাময় কাহিনী সত্য ও নিখুঁত শুধু তাহাই বর্ণনা করিব। কুসংস্কারপূর্ণ, আজগুবি ও অতিরঞ্জিত কাহিনীকে এড়াইয়া যাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ইহা ডিটেকটিভ বা কাল্পনিক কাহিনী নহে। গবেষণার দ্বারা একমাত্র·সঠিক তথ্যোদঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অসহায় মানুষ : জঙ্গলের এমনই পরিবেশ যে, মানুষ সেখানে আনন্দ করিতে গিয়াও সহায়সম্বলহীন হইয়া পড়ে। ১৯৬৭ সালের কথা। কুষ্টিয়া হইতে ১৫ জন ভ্রমণকারী লঞ্চযোগে সুন্দরবন ভ্রমণ করিতে আসে। হরিণ শিকারের নেশায় তাহাদের ২ জন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। ঘন্টার পর ঘন্টা জঙ্গলময় স্থান অতিক্রম করিয়া তাহারা পথ হারাইয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লঞ্চে ফিরিতে পারে নাই। সঙ্গীরা বীর শিকারীদের জন্য প্রায় ১০ ঘন্টা নদীতীরে অপেক্ষা করে। খোঁজ না পাইয়া সকলে নিশ্চিত মনে করিল নবকুমারের ন্যায় তাহাদের ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে।

এদিকে ঐ দুই ব্যক্তি অনভ্যস্ত কণ্টকময় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া বহুকষ্টে নদীতীরে আসিয়া লঞ্চ ও সঙ্গীদের সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়ে। নির্জন বনানী। শেষ পর্যন্ত অনোন্যপায় হইয়া তাহারা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, কাপড় দ্বারা দেহ বাঁধিয়া অতিকষ্টে রাত্রি যাপন করে। বহু পরে একখানি নৌকার সন্ধান পায় এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। ভ্রমণের সাধ মিটিয়া যায়।

খুলনা শহর হইতে একবার দশ-বার জন লোক জঙ্গল পরিদর্শনে যায়। কয়েকদিন পরিভ্রমণের পর তাহাদের দুইজন জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া যথাসময় ফিরিয়া আসে নাই।

একজন হাফেজ আর একজন মসজিদের ইমাম। তাহাদের কাছে দা ও লাঠি ছিল। জীবনে তাহারা এইরূপ ভয়াবহ বিপদে আর পড়ে নাই। এমন অসহায় অবস্থা, তদুপরি অনাহার ও অনিদ্রায় তাহাদের জীবন বিপন্ন। বনের ফলমুল কোনটা খাদ্য আর কোনটা অখাদ্য তাহাও তাহাদের জানা নাই। নদীনালায় সর্বত্র পানি, কিন্তু এমনই লবণাক্ত যে উহা গালে প্রবেশ করাইলে জিহ্বা জ্বালিয়া যায়। তাহারা পথিকদের ডাকিতে থাকে কিন্তু ডাকাত সন্দেহে কেহই ভয়ে তাহাদের কাছে ঘেঁষিতে চাহে না। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ভাল মানুষকেও ডাকাত মনে হয়।.

কপালের লিখন—তাহারা বিপদসংকুল বনের মধ্যে বৃক্ষের শাখায় গামছা জড়াইয়া তিন দিন থাকিবার পর এক নৌকার মাঝিকে পঞ্চাশ টাকা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। বৎসরের এই সময় হইতে বনভ্রমণ আরম্ভ হয়। কোন এক কলেজের ১১৩ জন ছাত্র সুন্দরবন ভ্রমণে আসিয়াছে। বাল্য চপলতা বশতঃ ছাত্রদল মহা স্ফূর্তি করিতেছে। কয়েকজন ছাত্র জঙ্গলের পার্শ্বে হলদীর চরে ব্যাডমিন্টন খেলিতেছিল। কয়েকজন বনমধ্যে জ্বালানি সংগ্রহ করিতেছিল। একদল বনভোজনের জন্য রান্নায়, অন্য একদল খাসি ছাগল জবাই করিয়া মাংস টুকরা টুকরা করিতেছিল। ছাত্রদল যখন এইভাবে আমোদ-প্রমোদে বিভোর, ঠিক সেই সময় ছাগলের রক্তের গন্ধে একটি মানুষখেঁকো বাঘ তাহাদের মধ্যে লম্ফ প্রদান করিলে ছাত্রদল ছত্রভঙ্গ হইয়া অসহায় অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে থাকে। অনেকেই ব্যাঘ্র দর্শনে বেহুশ হইয়া পড়ে। ব্যাঘ্ররাজ একজন ছাত্রকে মুখে করিয়া জঙ্গলমধ্যে উধাও হয়।

পাকিস্তান হইতে আগত বয়স্কাউটগণ কয়েক বৎসর পূর্বে লঞ্চযোগে সুন্দরবন পরিদর্শনে যায়। একটি ছাত্র জঙ্গলের নদীতে পড়িয়া যায়। অনভিজ্ঞ ছাত্রটি সাঁতার জানিত না সেজন্য নদীতে তাহার সলিল সমাধি ঘটে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েকখানি উড়োজাহাজ সুন্দরবনের জঙ্গলমধ্যে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। উড়োজাহাজের ভগ্নাংশসমূহ সরকার কর্তৃক বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত উড়োজাহাজের আরোহীরা দুর্ঘটনায় জঙ্গলমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিগত ১৯৭০ সালে একখানি বৃটিশ এরোপ্লেন (R.A.F. Plane) সুন্দরবনে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। একজন পাইলট দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করে এবং অন্য একজন জীবিত অবস্থায় দুইদিন দুইরাত্রি বৃক্ষোপরি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কালক্ষেপণ করিতে থাকে। দ্বিতীয় পাইলট প্যারাসুটের সাহায্যে বৃক্ষের উপর অবতরণ করিয়াছিল। পরে তাহাকে উদ্ধার করিয়া খুলনা শহরে আনয়ন করা হয়।

শুধু জঙ্গল নহে, সুন্দরবনের নদীগুলিও বিভীষিকাময়। শিবসা নদীর শেষ প্রান্তে সাতটি বড় নদী একত্রে মিশিয়াছে। ঐ স্থানকে লোকে 'সাতমুখ আগুনজ্বাল' বলিয়া থাকে। এখানে বহু পূর্বে ঢেউয়ের তাণ্ডবে নৌকা ডুবিয়া কত অসহায় মানুষের অকালে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। জনৈক বিজ্ঞ ও মানবসেবী সেখানে

ভীতির সংকেতসূচক একটি নিশানা রাখিয়া দিয়াছিলেন। উহা বাতাসে নড়িয়া জঙ্গলাগত পথিকদের হুশিয়ার করিয়া দিত। এই ধরনের ভয়ংকর পথ আরও কয়েকটি আছে। এইসব স্থানে অকস্মাৎ কেহ আসিলে অসহায় হইয়া পড়ে।

একদা এক হরিণ-শিকারী বন্দুকসহ জঙ্গলমধ্যে হরিণের দিকে গুলি ছুঁড়িতে গেলে অকস্মাৎ ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার দুই স্কন্ধে দুই হাতা দিয়া উঁচু হইয়া হরিণ দেখিতেছিল। ব্যাঘ্র ও শিকারী উভয়ের লক্ষ্য হরিণ শিকার। শিকারী প্রথমে ঐ ব্যাঘ্রকে বৃক্ষের অংশ বিশেষ মনে করিয়াছিল। ব্যাঘ্রের নেশা হরিণ শিকারের। মানুষ শিকার সহজ হইলেও উহা হইতে সে বিরত ছিল। শিকারীর স্কন্ধ ও মস্তকে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল এবং ঐ স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হইয়াছিল।

সুন্দরবনে পশু-বাঘ অপেক্ষা মনুষ্য-বাঘের ভীতি কম নহে। এই মনুষ্য-বাঘই সুন্দরবনের জলদস্যু। যখন তখন দিবাভাগে ও রাত্রে সুন্দরবনের সর্বত্র এই জলদস্যু ভীতি আছে। নৌকায় নৌকায় জলদস্যুরা ঘুরিয়া মধ্যে মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। তাহারা জঙ্গলস্থ ভাসমান মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ, অর্থ, চাউল, ডাউল, মসলা, দা, কুড়ালি প্রভৃতি সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। এমন লোক বিরল যাহার নৌকায় একবার না একবার জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। জলদস্যুদের বিভীষিকা সম্পর্কে পূর্বাধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

মৌমাছির কবলে জার্মান টেলিভিশন দল : ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে আগত জার্মান টেলিভিশন দল সুন্দরবনে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য আগমন করে। তাহারা ব্যাঘ্র শিকারী পচাব্দীকে সঙ্গে লইয়া ব্যাঘ্র শিকারের জন্য সাতক্ষীরা ফরেষ্ট রেঞ্জের অন্তগর্ত আঠারবেকীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখানে মানুষখেঁকো বাঘ কয়েকজন বাওয়ালীকে ভক্ষণ করিয়াছে। ভয়ে কেহ জঙ্গলে প্রবেশ করে না। শিকারীদল বাঘের সন্ধান পাইয়াছে। ইতিমধ্যে টেলিভিশন দলের সদস্যগণ দুইখানা মৌচাক দেখিতে পায। সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মৌচাক দর্শনে তাহাদের ফটো তোলার আগ্রহ হয়। এমন সময় মৌচাক হইতে অসংখ্য পোকা ক্ষেপিয়া গিয়া তাহাদের দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে। পোকার কামড়ে জর্জরিত হইয়া সকলেই পার্শ্ববর্তী খালের পানিতে ডুব দিতে থাকে। বাওয়ালীরা সঙ্গে ছিল। জার্মান টেলিভিশন দলসহ বাওয়ালীরা ও ব্যাঘ্র শিকারী পচাব্দী পানিতে ডুব দিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

মৌমাছির হুল বিদ্ধ হওয়ায় সকলেই যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে। ব্যাঘ্রভীতির কথাও মনে নাই। বাওয়ালীদের গামছা দ্বারা তাহারা মস্তক ঢাকিয়া পানির মধ্যে দিয়া দূরে সরিয়া যায়। বাওয়ালীদের সাহায্যের জন্য জার্মান সাহেবরা তাহাদের বখ্‌শিশ দেয়। রাইফেল, বন্দুক, ক্যামেরা সেখানে পড়িয়া থাকিল। রাত্রে গিয়া সেগুলি উদ্ধার করা হয়।

বাঘে-মহিষে যুদ্ধ : সুন্দরবনে পূর্বে মহিষ ছিল। বুনো মহিষকে বয়ার বলা হইত। বহুদিন পূর্বে পচাব্দী দুবলা দ্বীপের জঙ্গলে ১৪টি মহিষ দেখিতে পায়। বলেশ্বর নদীর পূর্বপার হইতে এই মহিষগুলি আসিয়াছিল। পচাব্দী আমাদের কাছে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছে।

—আমরা জেলের ট্যাকে মাছ ধরিতে যাই। সমুদ্রতীরে কাশবনের মধ্যে দুটো মহিষ প্রথমে দেখি। এর মধ্যে ব্যাঘ্র ভীমবেগে মহিষ দু'টোকে আক্রমণ করে। মহিষও শিঙ দ্বারা ব্যাঘ্রকে গুতো দিতে থাকে। ব্যাঘ্রের শক্তি অত্যধিক। মহিষের একমাত্র সুবিধা শিং দু'টি। পশুরা যুদ্ধ করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মহিষ দুটি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। একটি মহিষ দৌড়িয়া সমুদ্রতীরে আসে।

—ব্যাঘ্র অন্য মহিষটিকেও তাড়া করে পিছু ধাওয়া করে। ব্যাঘ্র বারংবার মহিষের পিছনে কামড় দিয়া রক্তাক্ত জখম করিয়া দেয়। অনোন্যপায় হইয়া মহিষ সমুদ্রের পানিতে আত্মরক্ষা করে। অন্য মহিষটি ভিন্ন দিকে পলায়ন করে। আমরা সমুদ্রের মধ্য হইতে এই দৃশ্য দেখিতে থাকি। আঘাতপ্রাপ্ত মহিষটি ডাঙ্গায় তোলার পর মারা যায়। পরে ১৩টি মহিষ একসঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে একত্রে দেখা গিয়াছিল। ১৯২৫ সালের পরে সুন্দরবনে বুনো মহিষ দেখা যায় নাই।

মহিষে-মানুষে যুদ্ধ : ১৩৪৯ সালের কোন একদিনে একদলে ৩২ জন শিকারী ছাপড়াখালির জঙ্গলে প্রবেশ করে। এই জঙ্গলে হরিণের আড্ডা ছিল। হরিণ তাড়া করিলে শিকারীদের সামনে দুইটি বুনো মহিষ দেখা যায়। শিকারীরা শতাধিক হরিণ তাড়া করিয়া পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে লইয়া আসে। অনেকগুলি হরিণ নদীতে পড়িয়া যায় এবং অন্যগুলি আর এক জঙ্গলে দৌড়াইয়া উধাও হয়। ইতিমধ্যে মহিষ দুইটি শিকারীদের আক্রমণ করে। ছাপড়াখালির জঙ্গলের পূর্বদিকে মহিষ দুইটি একজন শিকারীকে সজোরে আক্রমণ করিলে সে লাঠি দ্বারা একটি মহিষকে আঘাত করে। মহিষটি শিং দ্বারা শিকারীকে সজোরে আক্রমণ করিয়া জখম করিয়া দেয়। শিকারীরা সকলে মিলিয়া একযোগে বুনো মহিষের আক্রমণ প্রতিহত করে। মহিষ জঙ্গলে চলিয়া যায়। লোকটিও প্রাণে রক্ষা পায়।

উক্ত শিকারীদল পূর্ব সীমা হইতে অবশিষ্ট হরিণ ধরার জন্য পশ্চিম দিকে তাড়া করে। পুনরায় সেই মহিষ তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া যায়। শিকারীদের মধ্য হইতে একজন লাঠি দ্বারা সেই মহিষটিকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, ক্রোধান্বিত বুনো জানোয়ার তাহাকে কাদার মধ্যে পুঁতিয়া চাপিয়া ধরে। হরিণ-শিকারীর এহেন দুরবস্থা দর্শনে অন্যান্য সকলে আগাইয়া আসার পূর্বেই মহিষ তাহার গাত্রে শিঙ দ্বারা গুরুতর রক্তপাতী জখম করে। সকলে ধরাধরি করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার পর গ্রামে লইয়া আসে। বহুদিন চিকিৎসার পর সে প্রাণে বাঁচিয়া যায়।

একটি বুনো মহিষ একবার গাবুরা গ্রামের একটি লোককে আক্রমণ করে। লোকটি কাঠ কাটিতেছিল। তাড়া করিলে সে বৃক্ষে আরোহণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গেলে তাহাকে বুনোমহিষে আক্রমণ করে। ঐ দলে মোট চারিটি

মহিষ ছিল। ইতিমধ্যে বিপদ সংকেত "কু" শুনিয়া সঙ্গীরা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। বুনোমহিষের আক্রমণে লোকটির একখানি হাত ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সে প্রাণে রক্ষা পায়।

অতিকায় অজগর : সুন্দরবনের অতিকায় অজগর সাপের নাম শুনিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। ইহা জঙ্গলের বিভীষিকা বিশেষ। অজগর অপেক্ষা "জাত" সাপের (কেউটা) বিষ ভয়ংকর। পদ্ম গোখরা সাংঘাতিক বিষাক্ত। দাঁড়াস সর্পে মানুষ দেখামাত্র দৌড় দেয়। কিন্তু একবার কামড় দিলে মানুষ সন্ধে সন্ধে মরিয়া যায়। শঙ্খচুর ভীষণকায় বিষাক্ত সাপ। দুধরাজ সর্পের গাত্রের বর্ণ দুধের ন্যায় সাদা। কানন বোড়া সাপের বুকের বর্ণ হলুদ এবং গাত্র ডোরাযুক্ত। বিঘেতে বোড়া মানুষ দেখিলে লম্ফ দিয়া দংশন করে। টিকে বোড়া সাপের গাত্র নীল বর্ণ। ইহার বর্ণ টিয়া পাখীর ন্যায়। ইহা সরু সাপ, দুই তিন হাত মাত্র লম্বা। গুলবাহার নামক অন্য একপ্রকার সর্প খুব লম্বা ও মোটা হয়। চন্দ্রবোড়া সাপের গাত্রে চক্র থাকে।

হরিণবোড়া সাপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎকায়। এই সাপ যখন জঙ্গলের মধ্যদিয়া চলাফেরা করে তখন পক্ষীকুল কিচিরমিচির শব্দ করিয়া সকলকে হুশিয়ার করিয়া দেয়। হরিণকুল ভীত হইয়া পড়ে। বানরে বিপদ সংকেত দিয়া থাকে। হরিণবোড়া সাপের অন্য নাম বরাচিতে। এই সর্প এমন ভীষণকায় যে অতি সহজেই হরিণের বাচ্চা ধরিয়া আস্ত গিলিয়া খাইয়া ফেলে।

বরাচিতে সাপ যাদু করিয়া হরিণ শিকার করে। সাপে পেট ফুলাইয়া যখন নিশ্বাস ছাড়ে তখন উহা কামারের হাপরের ন্যায় দেখা যায়। তখন উহার হাঁ খুব বড় হয়। জোর নিঃশ্বাসের টানে হরিণ উহার গালের মধ্যে চলিযা আসে। নিরীহ হরিণ আত্মরক্ষার উপায় জানে না।

একবার নলিয়ান গ্রামের জনৈক ব্যক্তি পঁচিশ ফুট লম্বা বিরাটকায় বরাচিতে সাপ ধরিয়া ফেলে। ঐ সাপ বিরাট খাঁচার মধ্যে পুরিয়া বাড়ী আনিলে একটি আস্ত হরিণী উগরাইয়া পেট হইতে বাহির করিয়া দেয়। হরিণীটি বেশ বড়। অসংখ্য লোক সাপের পেট হইতে বাহির করা হরিণী দর্শনে তাজ্জব হইয়া যায়।

সুন্দরবনের অতিকায় অজগর সম্পর্কে অনেক সত্য-মিথ্যা অতিরঞ্জিত গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। একদা একদল কাঠুরিয়া কার্য সমাপনান্তে জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রামালাপ করিতেছিল। সেই স্থানে তাহারা একটি লম্বা পুরাতন বৃক্ষ পতিত অবস্থায় দেখিতে পায়। উহার এক প্রান্ত নদীর মধ্যে এবং অন্য প্রান্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। কেহ কেহ উহার উপর বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহাদের একজন হুকায় ধূমপান করিয়া কলকের আগুন বৃক্ষের উপর রাখিবামাত্র উহা নড়িয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে নদীর মধ্যে চলিয়া যায়। সকলে ইহাকে একটি বহুকালের পুরাতন সর্প বলিয়া বুঝিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া একই স্থানে পড়িয়া থাকার জন্য উহার শরীরে ময়লা জমিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য কেহই

উহাকে সাপ বলিয়া ধরিতে পারে নাই। এই গল্প শ্রবণ করিলে আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত সিন্দবাদ নাবিকের জাহাজ হইতে দ্বীপে অবতরণ এবং তিমি মৎস্যের কাহিনী মনে পড়িয়া যায়। এই ধরনের বিভীষিকা এখনও সুন্দরবনে পরিলক্ষিত হয়।

কনজারভেটর অব ফরেস্ট কিউ. জি. গাউস এবং খুলনার জনৈক শিকারী এই ধরনের একটি অতিকায় অজগর স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বড় বড় অজগরকে দীর্ঘ ভূপতিত বৃক্ষের ন্যায় মনে হয়।

৮০ বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধ শিকারী এই লেখকের নিকট বর্ণনা দিয়াছেন যে, একবার তিনি কাঠ মনে করিয়া সাপের উপর বসিয়া পড়েন। শিকারী দেখিতে পান যে, সাপ চক্ষু দিয়া বিড়বিড় করিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে। ভীত হইয়া তিনি সাপের গাত্রে সজোরে লাঠির দ্বারা আঘাত করেন। তখন সাপ হাঁ করিয়া শিকারীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে দ্রুতবেগে সরিয়া যায়।

জঙ্গলে বাঘের সহিত সর্পের সম্পর্ক মধুর নহে। শুনা যায় অতিকায় অজগর ও বিষাক্ত সর্প দর্শনে বাঘ অন্যদিকে সরিয়া যায়। বাঘ সর্পের দিকে আগাইয়া আসিলে সর্পের ফোঁস ফোঁস শব্দে সে স্থান ত্যাগ করে।

হরিণ শিকারে গিয়া সুতারখালির শিকারী পুটি গাজী একদিন হাতধাবড়া নদীতীরস্থ জঙ্গলে যায়। গুলি করিলে হরিণ দৌড় দেয়। এক ভীষণকায় বরাচিতে সাপ ঐ হরিণ ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে শিকারীও হরিণ ধরিবার জন্য ঐ পথ দিয়া দৌড়ায়। বিরাটকায় অজগর। উহার হাঁ প্রায় তিন ফুট প্রশস্ত। সুযোগ পাইয়া সাপে শিকারীর উরু কামড়াইয়া ধরে। সে ভীষণ চিৎকারে সঙ্গীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। সঙ্গীরা দৌড়াইয়া গিয়া বৃক্ষের শাখা ও লাঠি দ্বারা সর্পকে আক্রমণ করে। কেহ লেজ চাপিয়া ধরে, কেহ বৃক্ষের ডাল সাপের গালের মধ্যে পুরিয়া দেয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাপ মানুষ ছাড়িয়া বনমধ্যে চলিয়া যায়। লোকটিরও প্রাণ রক্ষা পায়। পরে দেখা গেল ঐ সাপের কোন বিষ নাই। তবে উহা আস্ত মানুষ ধরিয়া গিলিয়া খাইতে পারে।

ভীষণকায় হাঙ্গর : সুন্দরবনে ব্যাঘ্র, কুমীর ছাড়া ডাঙ্গায় অজগর এবং নদীতে হাঙ্গর ভীষণকায় জীব। নদীতে হাঙ্গরে মানুষকে এমনই ক্ষিপ্রতার সহিত আক্রমণ করে যে কোন প্রকার শব্দ না করিয়া উহার শরীর কর্তন করিয়া লইয়া যায়। এই ভীষণকায় জীবের দন্ত তীক্ষ্ণ। বনাঞ্চলে বহু লোক জীবিত আছে যাহাদের হস্ত পদ হাঙ্গরে কাটিয়াছে। কপোতাক্ষী নদীতে একটি লোককে ১৯৬৫ সালে স্নানের সময় হাত-পা কাটিয়া লইয়া যায়। আক্রান্ত লোকটিকে হাসপাতালে বহুদিন চিকিৎসা করা হয়। ভৈরব নদীতে একদিন বহুলোক একসঙ্গে সাঁতার খেলিতেছিল এমন সময় একটি হাঙ্গর নিঃশব্দে এক নওজোয়ানের একহস্তে কামড় দিলে সে অন্য হস্তদ্বারা হাঙ্গরকে প্রতিহত করিতে গেলে উভয় হস্ত হাঙ্গরের তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড়ে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রচুর রক্তপাত হয়। এখনও সে লোকটি জীবিত আছে। সে হাঙ্গরে আক্রান্ত হওয়ার কাহিনী আমাদের শুনাইয়াছে।

সুন্দরবনের নদীতীরে মাদার নামক একটি লোককে হান্দরে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। মাদার এই লেখককে আক্রমণের হুবহু বর্ণনা দিয়াছে উহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

—শাকবাড়ে নদীর মাথায় সুন্দরবনের পার্শ্বে আমি নৌকার কাছি দ্বারা তীরভূমি দিয়ে নৌকা পরিচালিত করছিলাম। আমি তখন যুবক, গায়ে ভীষণ শক্তি। হাঁটু পানিতে অবতরণ করিলে মনে হইল গাছের গুড়িব আঘাত। কিন্তু দেখা গেল পা হান্দরের গালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কামড় দেওয়ার সন্দে সন্দে সজোরে পা বাহির করে দুই হস্ত দ্বারা কামট (হান্দর) চেপে ধরি। কামটের গালের মধ্যে গামছা দ্বারা হাত ঢুকাইয়া পা পৃথক করার সময় হাতের একটি আন্দুল কেটে যায়। কামট চেপে ধরলে ঐ শক্তিধর জলজন্তু ঝাড়া মেরে আমাকে ১০ হাত দূরে ফেলে দেয়। প্রায় বার ফুট দীর্ঘ কামট, মানুষের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ঐ জলজন্তু আবার আক্রমণ করে। প্রথমে হাঁটুর নীচে ধরে পরে বাম পায়ের নিম্নাংশ কর্তন করে উধাও হয়। সেই অবস্থায় ডান্দায় উঠিতে গেলে উক্ত হিংস্র জানোয়ার আবার আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু পুনরায় আমাকে আক্রমণ করতে পারে নাই। আমার এক পা তদবধি খোঁড়া হয়ে গেছে এবং হাতের কয়েকটি আন্দুল ও পা খোয়া গেছে।

মাদারকে আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ তোমরা জন্দলে যাও, ভয় করে না? বিপদ সেখানে লাগিয়াই আছে। মাদার উত্তর করিলঃ "সাহেব, ভয় করলে কি বাদায় যাওয়া যায়? একবার বাদায় প্রবেশ করলে সেখানে আর ভয় থাকে না। ধর্ম যদি থাকে তবে আছে বাদায়। মানুষ বিশ্বাস করে যারা ভাললোক তাদের কোন ক্ষতি হয় না।"

কুমীরে-বাঘে যুদ্ধ : কুমীর জন্দলের এক অদ্ভুত ও ভয়াবহ জন্তু। নদীর মধ্যে অথবা কর্দমাক্ত স্থানে ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরিয়া ইহা মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং ওত পাতিয়া শিকার ধরে। উহার গতি ক্ষিপ্র এবং দূর হইতে নদীতীরে যেখানে মানুষ স্নান করে সেখানে আসিয়া হঠাৎ মানুষ ধরিয়া লইয়া যায় এবং নিঃশঙ্কচিত্তে উদরস্থ করে। কোন কোন সময় কুমীরের পেটের মধ্যে নারীদের ব্যবহৃত মূল্যবান অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। কুমীরে গবাদি পশুও ধরিয়া লইয়া যায়। সুন্দরবনের কুমীর বাঘের ন্যায় নরখাদকে পরিণত হয়। অনেক সময় কুমীর সুন্দরবনে কেওড়া বৃক্ষতলে রৌদ্র পোহায়। হরিণ মনে করে কাঠ পড়িয়া আছে। হরিণে কেওড়া ফল ভক্ষণের সময় কুমীরে শিকার করার কথা শ্রুত হয়।

একবার মানবরক্ত পান করিলে কুমীরের হিংস্র স্বভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষখেঁকো কুমীর দূর হইতে শিকারের প্রতি লক্ষ্য করে। বড় বড় নৌকার মাঝিরা চৌকির উপরে উচ্চস্থান হইতে হাল চালনা করিয়া নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। শিকারী কুমীর দূর হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া অতীব সন্তর্পণে হালের নিকট গিয়া ভীষণ জোরে ধাক্কা দেয়। অকস্মাৎ ধাক্কায় মাঝি নদীতে পড়িয়া গেলে কুমীর তাহাকে উদরস্থ করে।

কোন কোন সময় কুমীর শক্তিশালী লেজের সাহায্যে নৌকার উপর হইতে মানুষ শিকার করে। একদা সুন্দরবনের কোন এক নদীতে নৌকার উপর একজন বাওয়ালী মলত্যাগ করিতেছিল। কুমীর দূর হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া লেজদ্বারা ঐ বাওয়ালীকে নদীমধ্যে ফেলিয়া ভক্ষণ করে।

বনবিভাগের একজন কর্মচারী একটি কুমীরকে নৌকার উপর হইতে জনৈক লোককে লেজের আঘাতে ফেলিয়া শিকার করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি ক্ষুদ্র নৌকার এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। সেই অবস্থায় কুমীর লেজের আঘাতে তাহাকে নদীমধ্যে ফেলিয়া দেয়। অবশ্য এইরূপ ঘটনা বিরল।

একটি জঙ্গলচারী লোক বাঘ দেখিয়া বৃক্ষে আরোহন করিয়া আত্মরক্ষা করে। বাঘও নদীতীরে সেই বৃক্ষতলে মানবরক্তের নেশায় বসিয়া থাকে। অনাহার ও ক্লান্তিতে লোকটির দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। সে কৌশল করিয়া গায়ের জামা-কাপড় বৃক্ষের ফলপাতা সহ একটি পুঁটুলি করিয়া সম্মুখস্ত নদীতে ফেলিয়া দিল। লোভী বাঘ মনে করিল লোকটি জলে ডুব দিয়াছে। সে নদীতে ঐ পুঁটুলি ধরিতে লম্ফ দেওয়া মাত্র একটি কুমীর আসিয়া বাঘের পা কামড়াইয়া ধরিল। জল-রাজ ও স্থল-রাজের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। বাঘ পানির মধ্যে শক্তিহীন সেজন্য কুমীরের কাছে তাহার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিল। লোকটি এহেন মহাসুযোগে পলাইয়া আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাইল।

খুলনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গলের প্রান্তসীমায় হরিনগর গ্রাম। এই গ্রামের লোকেরা বাড়ীতে বসিয়া ব্যাঘ্রের ডাক ও হরিণের চীৎকার শ্রবণ করে। পার্শ্বেই নদী ও কয়েকটি খাল। হরিনগরের একখালে মৎস্য ধরিবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা বাঁধ নির্মাণ করিয়া উহার উপরে সুউচ্চ একটি টোঙ বা কুঁড়েঘর বাঁধে। রাত্রিতে টোঙের উপর তিনজন লোক বাঁধ ও মৎস্য ধরিবার যন্ত্রপাতি পাহারা দিত। দক্ষিণদিকে সুন্দরবনের একটি মানুষখেঁকো ব্যাঘ্র ঐ-ব্যক্তিদের আক্রমণ করিবার জন্য অতীব সংগোপনে ওত পাতিয়া থাকে।

ব্যাঘ্রটি সম্ভবতঃ পূর্ব হইতেই সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু সুউচ্চ টোঙের উপর কিভাবেই বা সে মানুষ শিকার করিবে। অবশেষে ব্যাঘ্রটি নররক্তের নেশায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। এদিকে টোঙের নীচে খালের মধ্যে একটি মানুষখেঁকো প্রকাণ্ড কুমীর মনুষ্য ভক্ষণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। ব্যাঘ্র ও কুমীর উভয়েরই উদ্দেশ্য মনুষ্যশিকার। টোঙের লোকেরা ব্যাঘ্র ও কুমীরের এহেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারে নাই। তাহারা নিশ্চিন্তে শুইয়া নিশিযাপন করিতেছিল। এমন সময় ব্যাঘ্রটি সম্ভবকে অসম্ভব করিবার আশায় হিংস্র লালসার বশবর্তী হইয়া টোঙের মানুষ লক্ষ্য করিয়া ভীমবেগে লম্ফ প্রদান করিল। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্রটি বিফল মনোরথ হইয়া বাঁধের পার্শ্বে ধপাস করিয়া পানির মধ্যে পড়িয়া গেল। এহেন সুযোগে মানুষখেঁকো কুমীর তৎক্ষণাৎ ভীষণ জোরে ব্যাঘ্রের পা কামড়াইয়া ধরিল। বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যাঘ্রটি কুমীরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইল। উহার পা কিছুতেই কুমীরের মুখ হইতে ছাড়াইতে পারিল না।

দুইটি ভীষণ জন্তুর এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের শব্দে চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া পড়িল। তাহারা কুঠার দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিল। অতিলোভের জন্য ব্যাঘ্রটি এইভাবে প্রাণ হারাইল। কুমীরটি ইত্যবসরে পলাইয়া গেল। গল্পটি আমার এক বিজ্ঞ চিকিৎসক বন্ধুর সূত্রে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। জলে কুমীর-ডাঙ্গায় বাঘ কথার তাৎপর্য এখানে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ব্যাঘ্রে ব্যাঘ্রে ঝগড়া-বিবাদ : সুন্দরবনে কদাচিত বাঘে বাঘে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বাঘের মধ্যেও হিংসা বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। বাঘিনীর সহিত মিলনের জন্য একাধিক বাঘের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দলের প্রধান ব্যাঘ্রটি মাদী বাঘকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। অন্য কোন বাঘ পিছু ধাওয়া করিলে উহাকে ভীষণ জোরে তাড়া করে।

বাঘ এক সঙ্গে দুই তিনটির বেশী দেখা যায় না। সুন্দরবনের লোকরা বলে বাঘের নিজস্ব এলাকা আছে, এক বাঘ আর এক বাঘের কাছে যায় না। একথাও শুনা যায় যে এক ব্যাঘ্র অন্য ব্যাঘ্রের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিলে যুদ্ধ বাধিয়া যায়।

বাঘের প্রধান শত্রু মানুষ। এহেন ভীষণকায় ও ধূর্ত হিংস্র জানোয়ার মানুষের কাছে মারা পড়ে। বন্দুক ও শিকারী দেখিলে বাঘ দ্রুত পলায়ন করে। আবার বাঘে যখন মানুষ কামড়াইয়া ধরে তখন পাঁচ ছয় জনের কমে কাড়িয়া আনা যায় না। লাশ ধরিতে দুইজন এবং বাঘ ঠেকাতে তিন-চারি জন লাগে। বাঘ আক্রান্ত হইলে স্বজাতির কেহ আসিয়া উহাকে রক্ষা করেনা। ইহাই মানুষ ও পশুর পার্থক্য।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে বর্ষায় সুন্দরবন ডুবিয়া গেলে বাঘের বিপদ হয়। সমস্ত জন্তুই কাহিল হইয়া পড়ে। ঝড় বর্ষায় উহারা খুবই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মশা ও বেড়ে পোকায় কামড়াইয়া বাঘের জীবনান্ত করিয়া দেয়। ভীষণকায় সর্প বাঘকে পরোয়া করে না। বাঘে ও সাপে শুধু ফোঁসফোঁসানী করে। কেহ কাহাকে আক্রমণ করে না।

ব্যাঘ্র ও বন্যবরাহের সংঘাত : বন্যবরাহ (শূকর) সুন্দরবনের হিংস্র জানোয়ার। বনের লোকেরা ইহাকে দাঁতাল বলে যেহেতু ইহার দাঁত প্রায় অর্ধ ফুট লম্বা ও তীক্ষ্ণ। বন্যবরাহ সাধারণতঃ মানুষ আক্রমণ করেনা। কিন্তু একবার ক্ষেপিয়া গেলে মানুষের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া দেয়।

স্ত্রী শূকরের দাঁত হয় না। সেজন্য শুধু দাঁতওয়ালা শূকরকেই দাঁতাল বলা হয়। বনের মানুষে বিচার না করিয়াই সমস্ত শূকরকে দাঁতাল বলে।

ব্যাঘ্র সাধারণতঃ স্ত্রীশূকর শিকার করিয়া খায়। দাঁতাল শূকরকে ব্যাঘ্র ভয়ে আক্রমণ করে না বলিয়া শুনা যায়। একবাব এক ব্যাঘ্রের সহিত দাঁতালের সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। শূকরের শক্তি ব্যাঘ্রের চেয়ে অনেক কম। একজন দক্ষ ও প্রবীণ শিকারী এই লেখককে জানায় যে, সে কুরুলের জঙ্গলে একটি ব্যাঘ্রকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। আরও দেখিতে পায় যে, একটি শূকরের দাঁত ব্যাঘ্রের গাত্রে লাগিয়া আছে। হিংস্র জানোয়ার মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করার পর উভয়েই মরিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা বহু বিভীষিকার একটি ব্যতিক্রম।

বাঘে-মানুষে সংঘর্ষ : সুন্দরবনে বাঘে-মানুষে সংঘাত নিত্যনৈমিত্তিক না হইলেও বিরল নহে। বনের সাধারণ অধিবাসী কিভাবে ব্যাঘ্র আক্রমণ প্রতিহত করিয়া উহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনে বা ব্যাঘ্রের পেটে জীবন বিসর্জন দেয়, উহারই অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এখানে কয়েকটি বর্ণনা করিব।

কয়েক বৎসর পূর্বে কয়রা হাউলির চকে চারজন লোক একখানি ডিন্ঘি নৌকায় জঙ্গলের মধ্যস্থ শিবসা নদীতে মৎস্য ধরিতে যায়। ভুতুমমারির চরে তাহারা সকলে নৌকা নঙ্গর করিয়া নিশাযাপন করে। ফজরের নামাজ বাদ জ্বালানি যোগাড় করার জন্য একজন জঙ্গলে প্রবেশ করে। এমন সময় নৌকায় ভীষণ চিৎকার শুনা গেল, "ওরে আমাকে বাঘে ধরেছে।" লোকটির চাচা বলিল, চলো বাঘের সঙ্গে লড়িতে হইবে এবং ভাইপোকে বাঘের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিতে হইবে।

তিন জনে জঙ্গলে যাইয়া দেখে ব্যাঘ্র সেই লোকটিকে দশ-বার হাত দূরে রাখিয়া তথা হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাঘ্র ঐ লোকটির গলা ও মাথায় থাবা দিয়া ইতিমধ্যে মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা লাঠি দ্বারা বাঘ আক্রমণ করিলে বাঘও পাল্টা আক্রমণ করিল। একজন সুন্দরী বৃক্ষে আঘাত করিলে বিকট শব্দ হইল। বাঘে বন্দুকের আওয়াজ মনে করিয়া আর অগ্রসর হইল না। সকলে মরা লাশ ধরাধরি করিয়া গ্রামে আনিয়া দাফন করিল। মাথা ও গলায় বাঘের থাবার জন্য দাগ হইয়া গিয়াছিল।

দ্বাদশ বৎসর পূর্বের কথা। বেদকাশী গ্রামের ৬ জন লোক বিনা আদেশপত্রে জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যায়। সঙ্গে দুইখানি নৌকা। গাছ কাটার পর সকলে একত্র হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। পার্শ্বে ছিল ঝাউবন। তথা হইতে লম্ফ দিয়া বাঘে একজনকে ধরিয়া মুখে করিয়া জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। বাঘ এমনই দ্রুততার সহিত চলিয়া গেল যে, সঙ্গীরা কোন প্রকার সুযোগ পায় নাই।

একবার একখানি নৌকায় কমলাপুর গ্রামের ৪ জন কাঠুরিয়া আড়পাঙ্গাসিয়ার জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যায়। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একটি বৃক্ষ ছেদন করিতেছিল। একজনকে ব্যাঘ্রে পিছন দিক দিয়া আক্রমণ করিয়া ঘাড়ে কামড় দিয়া প্রায় ত্রিশ হাত দূরে লইয়া যায়। তারপর সকলে মিলিয়া লাঠি ও কুড়াল দ্বারা বাঘকে মারিয়া তাড়াইয়া লোকটিকে উদ্ধার করে। ব্যাঘ্র মানুষের জোর আক্রমণে একেবারে ঘাবড়াইয়া যায়। লোকটির ভাগ্য ভাল তাই জীবনে বাঁচিয়া গেল। পিঠে ব্যাঘ্র কামড়ের দাগ স্থায়ী হইয়া আছে।

ইংরেজী ১৯৬৩ সাল। দক্ষিণ বেদকাশীর ৭ জন লোক সুন্দরবনে একখানি নৌকায় মধু সংগ্রহ করিতে যায়। একজনের সঙ্গে বেতের ধামা (আড়ি) দড়ি দ্বারা পিছনে বাঁধা ছিল। আংরাক্‌না নদীর পার্শ্বের জঙ্গল। অকস্মাৎ একটি ব্যাঘ্র লোকটির ঘাড় ও ধামা জড়াইয়া কামড় দেয়। ইহাতে শরীরের কিছু মাংস উঠিয়া যায়। লোকটির হাতে একখানি দা ছিল। ব্যাঘ্র লোকটিকে ভূমিতে ফেলিয়া দেওয়া মাত্র সে হাতের দা দ্বারা হিংস্র জন্তুকে সজোরে কোপাইতে থাকে। ইতিমধ্যে অন্যান্য সঙ্গীরা ভীমবেগে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া লোকটিকে উদ্ধার করে। লোকটির পিঠে ব্যাঘ্র আক্রমণে গর্ত হইয়া যায়।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের কথা। মোরেলগঞ্জ থানার গুলিশাখালি গ্রামের জনৈক ব্যক্তি জঙ্গলে হরিণ শিকার করিতে যায়। তাম্বুলবুনিয়া বাদার পশ্চিমে আড়োবয়ার জঙ্গলে। নিকটেই একটি বনবিভাগের অফিস। জঙ্গলে প্রবেশ করা মাত্র একটি ব্যাঘ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন সময় সে ব্যাঘ্রের দিকে গুলি ছুড়িয়া মারে। শিকারী পরদিন মরা বাঘ আনিতে যায়। হেন্তালের ঝোপের মধ্যে বাঘ শুইয়া আছে। তখন সে বাঘ মৃত মনে করিয়া উহার পিছনের দুই পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে। সামনের দুই পা বাঁধিতে উদ্যত হইলে বাঘ লাফ দিতে চেষ্টা করে। হিংস্র জানোয়ার সর্বশক্তি দিয়া সামনের পদদ্বয় দ্বারা শিকারীর শরীরে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দুই পা খুলিয়া যায়।

এমতাবস্থায় শিকারী বাঘের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখিয়া বাম হাতের কনুই বাঘের গালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বন্দুকের ব্যারেল বাঘের গালে পুরিয়া দেয়। এহেন বিভীষিকার মধ্যে দুঃসাহসী শিকারী কোনপ্রকারে জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। বন্দুকের গুলি খাইয়া বাঘ হাঁ ছাড়িয়া মরিয়া যায়।

অর্ধমৃত ব্যাঘ্রের আক্রমণে শিকারীর হাতের মাংস বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। স্কন্ধ ও পিঠের মাংস বাঘের কামড়ে উঠিয়া যায়। হিংস্র জন্তুর বিভীষিকা তাহার মনোবল ভাঙ্গিতে পারে নাই। শিকারীর নাম সেরজন তালুকদার। শিকারী ও মরা বাঘ ধরাধরি করিয়া সঙ্গীরা নৌকায় লইয়া আসে। সর্বত্র এহেন দুর্জয় সাহসের খ্যাতি বিস্তারলাভ করে। জীবনে আরও অনেকগুলি বাঘ সে শিকার করিয়াছে। বাঘ শিকারে অফুরন্ত আনন্দ, সে কাহিনী যতদিন জীবিত ছিল হাসিমুখে সকলকে শুনাইত। বিভীষিকার মধ্যেও মানুষ আনন্দ পায়।

জঙ্গল সীমান্তে ট্যাংরাখালি গ্রামের ছোট খাল। রাত্রিতে খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া দুইজনে ঘুমাইয়া আছে। এপারে মানুষ ওপারে বাঘ। ভাটির সময় খাল শুকাইয়া গিয়াছে। কোন দিকে যাওয়ার উপায় নাই। কাঁথা গাত্রে দিয়া লোক দুইটি শায়িত। নৌকায় ধৃত দুইটি বাঘের বাচ্চা। ইহাদের এমনই দুঃসাহস যে বাঘের বাচ্চা ধরিয়া সুন্দরবনের খালে শুইয়া থাকে।

একজন দেখিল নৌকার দিকে বাঘ আসিতেছে। নড়াচড়া করিলে আরও বিপদ। লোকটি ভয়ে কাঁপিতেছে। ভীষণ ভয়ে গা পাথর হইয়া গিয়াছে। বাঘ নৌকায় আসিয়া একটি বাচ্চা লইয়া গেল। এহেন অবস্থায় ঐ দুই ব্যক্তির অবস্থা ভয়ে মরণাপন্ন। বাঘ আবার আসিয়া আর একটি বাচ্চা লইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে বাঘ আর নৌকায় আসে নাই।

এক ব্যক্তি জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গেলে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়। বাড়ীতে খবর পাইয়া তাহার মা কাঁদিতে লাগিল। অন্য ভাই মাকে বলিল, তোমার ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব। এমন বাঘ নাই যা হজম হবে না।

ব্যাঘ্রাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে লোক পথ দেখাইয়া চলিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে মানুষের হাড়গোড়, মস্তকের খুলি পড়িয়া আছে। অদূরে দেখা গেল বাঘের স্কন্ধের উপর মানুষের লাশ। সঙ্গে সঙ্গে লাশ মাটিতে ফেলিয়া দিয়া শব্দ করে। নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া বাঘের দিকে গুলি করা হইলে বাঘ পড়িয়া মরিয়া গেল। মরা বাঘ ও ভাইয়ের লাশসহ তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বালুইঝাকির জঙ্গলে পার্শ্বেমারী গ্রাম হইতে ৭ জন লোক একখানি নৌকায় মধু সংগ্রহে যায়। তাহাদের লক্ষ্য মৌচাকের দিকে। অকস্মাৎ জঙ্গলের মধ্য হইতে ব্যাঘ্র আসিয়া উহাদের মধ্যে নাদুশ নুদুশ জোয়ান ব্যক্তির পিঠে আঁচড় দেয়। 'কুই' দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বাঘ পড়েছে' বলিয়া ভীষণ চিৎকার দিলে সকলে আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। মানুষের দলবদ্ধ আক্রমণে বাঘ পলাইয়া যায়। সে ব্যক্তির পিঠে ব্যাঘ্রদন্তের ক্ষতচিহ্ন আছে।

একবার পূর্বোক্ত গ্রামের তিন ব্যক্তি রাত্রি চারি ঘটিকার সময় হংসরাজ নদীতে মাছ ধরিতে যায়। খালের মধ্যে পাটাজাল পাতিয়া রাখে। ভাটার সময় খালের পানি সরিয়া যায়। অতি প্রত্যূষে তাহারা মৎস্য ধরার সরঞ্জামসহ খালের মাথায় উপস্থিত হয়। খালের দুই পারেই গহীন জঙ্গল। ব্যাঘ্র তীর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া একজনের ঘাড়ের উপর পতিত হয়। ব্যাঘ্রও পানিতে পড়িয়া যায়। লোকটি ব্যাঘ্রের পেটের তলে পড়িয়া চিৎকার দিতে থাকে। অন্য দুইজন সমস্ত শক্তি দ্বারা ব্যাঘ্রের গাত্রে লাঠি দ্বারা বারংবার আঘাত করিলে বাঘ 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি গ্রহণ করে। এইরূপ কল্পনাতীত বিভীষিকার মধ্যেও লোকটি বাঁচিয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া তাহার চিকিৎসা করা হয়।

পার্শ্বেমারী গ্রামে অধিকাংশ মানুষ দুঃসাহসী। এই গ্রামের অন্য এক ব্যক্তি দুবলার চটীর উত্তর দিকে ভেদাখালির খালের মধ্যে নৌকায় দাঁড়াইয়া একটি গাছ কাটিতেছিল। বাঘ তীর হইতে উহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং পিঠে আঁচড় দেয়। বাঘ ও মানুষ উভয়ই পানিতে পড়িয়া যায়। বাঘ পানির মধ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারে না। বুদ্ধিমত্তার সহিত আক্রান্ত ব্যক্তি ডুব দিয়া দূরে সরিয়া যায়। তাহার ছয়জন সঙ্গী দলবদ্ধভাবে লাঠির আঘাতে হিংস্র জন্তুকে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হয়।

শরণখোলা থানার বগিগ্রাম। একটি খাল পারেই সুন্দরবন। এই গ্রামের তিনজন লোক নল কাটিতে যায়। চাচা-ভাইপো এবং অন্য এক ব্যক্তি। সুপতির নিকটে গভীর জঙ্গল। সেখানে কেউ যাইতে সাহসী হয় না। নলখাগড়া ও গোলগাছের মধ্যে বাঘ থাকে। নদীর মধ্যে বড় নৌকা রাখিয়া ক্ষুদ্র নৌকায় (কোলডিঙ্গি) খালের মধ্যে দিয়া ভিতরে যাইতে হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র এই লেখকের নিকট হুবহু যাহা বর্ণনা করিয়াছে এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছিঃ

—নলখাগড়া কাটার সময় আমার চাচা বাঘ দেখতে পায়। লাফ দিলে চাচাকে ধরবে। চাচা আমাকে সেদিকে এগিয়ে দেয় এবং নিজে সরে অন্যদিকে আসে। অন্য ব্যক্তি মধ্যস্থলে থাকে। চাচা এদিক ওদিক চায়, তাতে আমি সন্দেহ করি। এমন সময় বাঘ লাফ দেয়। ওর হাত পা মিশে গেছে শরীরের সঙ্গে। পা দেখা যায় না।

—সেখানে একটি কালেলতার শক্ত গাছ ছিল। তাতে বাধা পেয়ে বাঘ পড়ে গেছে। বাঘ পড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে দাঁড়ায়। ওর মুখ দিয়ে লালা বেরুচ্ছে, রাগে গজ গজ করছে। এমন সময় আমরা তিন জন একত্রে দাঁড়িয়ে চীৎকার দিচ্ছি। হৈ-হুল্লোড়ে বাঘ চলে গেল।

—আমাদের পক্ষে কোন দিকে পালাইবার সুযোগ নাই। কাদার মধ্যে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। বাঘ কিছু দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করছে। বুঝা গেল ফের আক্রমণ করবে। এর মধ্যে বড় একটি হরিণ আমাদের সামনে ভয়ে কাঁপছে। চাচা বললেন, একে কোপ দি। আমরা দু'জনে বললাম—এই আশ্রিতকে মারলে আমরা তোমাকে মারবো। চাচা আর কথা বলে না।

—বাঘ আর যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। আমাদের সৌভাগ্য—তখন খাকি পোষাক পরিহিত কয়েকজন গার্ড আসলো। গার্ডরা বললো, কেউ যেন দাঁড়ায় না।

—আমরা কিছুদূর গিয়েছি। চাচা জঙ্গলের মধ্যে পায়খানায় বসেছে। অমনি সেই বাঘ তাকে আক্রমণ করে নিয়ে যায়। ইহাই জঙ্গলের বিভীষিকা।

তালবাটীর জঙ্গল, একটি বৃহৎকায় দ্বীপ, গহীন অরণ্যে আবৃত। এক নৌকার সাতজন লোকের মধ্যে ছয়জন নামাজ পড়িতেছিল। একজন ভাত রান্না করিতেছিল নৌকার মাথায় বসিয়া। এমন সতর্কতার সহিত বাঘ তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া গেল যে, অন্য কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। পরদিন জঙ্গলের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তির অর্ধভুক্ত লাশ উদ্ধার হইল। এমনই ঘটে সুন্দরবনের শ্রমিকদের ভাগ্যে।

মরা বাঘের বিভীষিকা : কৈখালির মছিম চৌকিদার নামকরা শিকারী। একদিন জঙ্গলে প্রবেশ করা মাত্র বৃহৎকায় এক ব্যাঘ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কালবিলম্ব না করিয়া সে ব্যাঘ্রের দিকে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করে। গুলির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র ভীষণ জোরে লম্ফ দিয়া কর্দমাক্ত চরে পড়িয়া গেলে উহার মাথা কাদার মধ্যে বসিয়া যায়। ব্যাঘ্র মাথা তুলিয়া জঙ্গলের মধ্যে চলিতে থাকে। শিকারীও বন্দুকসহ ব্যাঘ্রের পিছু পিছু ধাওয়া করে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে নামিয়া আসে। শিকারী তখনকার মত ঘরে ফিরিয়া আসে।

পরদিন প্রায় ৫০ জন স্থানীয় অধিবাসী ও বনকরের কর্মচারী সহ শিকারী ঐ ব্যাঘ্র আনিতে যায়। সঙ্গে পাঁচটি বন্দুক এবং বহু লাঠি-সোটা। দেখা গেল ঝোপের মধ্যে ব্যাঘ্র পড়িয়া আছে। উহার পেট ফুলিয়া গিয়াছে। তবুও অনেকে ভয়ে মনে করিল যদি ব্যাঘ্র জীবিত থাকে। সেজন্য মরা ব্যাঘ্রের উপর কয়েক রাউণ্ড গুলি করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করা হইল।

সকলে ধরাধরি করিয়া মরা ব্যাঘ্র নৌকায় উঠাইল। সমস্ত লোক নৌকায় উঠিলে মাঝিরা মরা ব্যাঘ্রসহ নৌকা ছাড়িয়া দিল। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল অযথা গুলি করা হইয়াছে। আবার কেহ বলিল ঠিকই হইয়াছে।

ইতিমধ্যে বাতাস ঢুকিয়া বাঘের পেট ফাঁপিয়া গিয়াছে। মরা বাঘের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। নৌকা চলিতে চলিতে এক অভাবনীয় হাস্যাস্পদ কান্ড-কারখানা ঘটিয়া গেল। নৌকামধ্যে খাকি ইউনিফর্ম পরিহিত বনবিভাগের একজন গার্ডও ছিল। একবার নদীতে ঢেউয়ের তাণ্ডবে নৌকা দুলিয়া গেল। ইহার জন্য মরা বাঘের পেট হইতে বাতাস বাহির হইয়া সশব্দে ঐ গার্ডের গাত্রে স্পর্শ করা মাত্র সে ভীষণ চিৎকার দিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে বাবারে বাঘে ধরলো"। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভীষণকায় নদীতে ঝাঁপ দিল। খাকি পোষাক পরিহিত গার্ডের এহেন শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নৌকার মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

নদীতেও হাঙ্গর-কুমীরের আশু আক্রমণ ভীতি। সকলে ধরাধরি করিয়া হাঙ্গর-কুমীরের কবল হইতে তাহাকে নৌকায় উঠাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। নৌকায় বাঘ আর পানিতে হাঙ্গর-কুমীর। যাহা হউক, বিপদ কাটিয়া গেল। বনাঞ্চলের লোকে এখনও এই গল্প করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।

ফাঁসি দ্বারা ব্যাঘ্র শিকার : সুন্দরবনের ব্যাঘ্র মধ্যে মধ্যে নদী পার হইয়া পথ ভুলিয়া জঙ্গল ভ্রমে দৈবাৎ গ্রামে ঢুকিয়া পড়ে। বেদকাশী গ্রামের অন্য তীরে গভীর জঙ্গল। একদিন রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্র নদী পাব হইয়া বেদকাশী সাঁকোর দক্ষিণে এক বৃক্ষতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঐ পথ দিয়া চাষীরা ভোরবেলা লাঙ্গল চাষ করিতে যাইতেছিল। জনৈক চাষী ব্যাঘ্র দেখিয়া উহাকে ধরিবার উপায় স্থির কারিয়া ফেলে। বিপদে মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ চাষী লাঙ্গলের দড়িগুলি একসঙ্গে জুড়িয়া দুই পেঁচ করিয়া একটি বাঁশ লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করে। ঐ বৃক্ষের নীচেই বাঘ শায়িত ছিল। সুচতুর চাষী বাঁশের সাহায্যে ব্যাঘ্রের গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেয়।

দড়ি গলায় দেখিয়া ব্যাঘ্র লম্ফ দিতে থাকে। ব্যাঘ্র যত লাফায় ফাঁসি তত ব্যাঘ্রের গলায় আটকাইয়া ধরে। ব্যাঘ্রও ক্রমাগত দুর্বল হইয়া পড়ে।

এদিকে এই খবর সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। অসংখ্য লোক ব্যাঘ্র ধরার স্থানে আসিয়া জমায়েত হয়। লোকে বৃক্ষে আরোহণকারীকে জিজ্ঞাসা করে "কি হয়েছে?" সে প্রায় বেহুশ, ভয়ে কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। সে একেবারেই আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অবাক হইয়া বৃক্ষের ডালে বসিয়া থাকে।

ব্যাঘ্রের অবস্থাও কাহিল। কেহই লাঠি দ্বারা ব্যাঘ্রের গাত্রে আঘাত দিতে সাহস পায় না। অবশেষে বন্দুকের গুলি দ্বারা উহাকে শেষ করা হয়। লোহার খাঁচা থাকিলে হয়ত জীবন্ত ব্যাঘ্র শিকার সম্ভব হইত।

বিভীষিকা সৃষ্টিকারী মানুষ : পেটের জ্বালায় বনের মানুষ দায়ে পড়িয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করে। গুইসাপ ধরা বিপজ্জনক। একবার এক হতভাগার জীবন দিতে হইয়াছিল গুইসাপ ধরিতে গিয়া। এক দলভুক্ত মানুষ, জঙ্গলের একাংশ ঘিরিয়া গুইসাপ তাড়া করিয়াছে। জঙ্গল প্রান্তে আসিয়া দেখা গেল কয়েকটি গুইসাপ ধরা পড়িয়াছে। সকলে একত্রিত

হইয়া দেখিল তাহাদের একজন নাই। ঐ ব্যক্তির খোঁজ করা হইতে লাগিল। যে লাইনে তাহার যাইবার কথা ছিল সেই লাইন বরাবর অগ্রসর হইয়া দেখা গেল লোকটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের ফাঁপার মধ্যে মাথা ও দেহ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। এই প্রকার ফাঁপা বা গর্তকে সুন্দরবনের লোকে 'ঢোড়' বলে। এমতাবস্থায় লোকটির শুধু পা দুইখানার শেষ ভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এহেন বিপদের মধ্যেও মানুষ উপায় স্থির করিয়া ফেলে। ইতিমধ্যে তাড়া পেয়ে শিকারীদের ভয়ে গুইসাপ ঐ বৃক্ষের ফাঁপায় প্রবেশ করে। শিকারের নেশায় লোকে ঐ বৃহৎকায় ফাঁপার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বারা গুইসাপ ধরিতে চেষ্টা করে। ঐ অবস্থায় লোকে গুইসাপের লেজ ধরিযা বৃক্ষের গর্তের মধ্যে অপেক্ষা করিতে থাকে, কিন্তু উহার বাহিরে আসার উপায় নাই। উপর দিক দিয়া পদ দ্বয় টানিয়াও তাহাকে বাহির করা একেবারে অসম্ভব। উহাতে তাহার দেহের চামড়া ছিঁড়িয়া রক্তাক্ত হইবে। এমতাবস্থায় সকলে মিলিয়া কুঠার দ্বারা বৃক্ষছেদন করিয়া ঐ লোককে বাহির করার চেষ্টা করে। বৃক্ষছেদন করিয়া অনেক সময় লোক বাহির করা যায়, আবার কদাচিত মানুষের বুকে বা মস্তকে কুঠারাঘাত লাগিয়া জীবনলীলা সান্ঘ হয়। চাঁদনীমুখো গ্রামের এক হতভাগার জীবন এইভাবে শেষ হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা আমার নিকট সেই মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে।

সুন্দরবনে শিকারীদের বিপদের অন্ত নাই। শিকারী গুইসাপ ধরার সময় নেশার ঝোঁকে যখন বৃক্ষের ঢোড়ের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেয় তখন কোন কোন সময় গর্তের মধ্যে লুক্কায়িত বিষাক্ত সর্পের কামড়ে মানুষ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সুন্দরবনের দরিদ্র লোকেরা রুজিরুটির সন্ধানে এইভাবে কোন কোন সময় জীবনপাত করিয়া থাকে।

একদা সুন্দরবন প্রদেশের এক দরিদ্র গুইসাপ শিকারী বিনা আদেশপত্রে গুইসাপ ধরিতে গিয়া বৃক্ষের ঢোড়ের মধ্যে স্বীয় হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেয়। অকস্মাৎ একটি বিষাক্ত সর্প তাহার বাম হস্তের মধ্যান্দুলী কামড়াইয়া দেয়। লোকটি বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া চিৎকার দিতে থাকে। সে সন্ধীদের উক্ত আন্দুল কাটিযা দিতে বলে। কিন্তু কেহই তাহাতে রাজী হয় না। তৎক্ষণাৎ উক্ত লোকটি নিজে আন্দুলটি বৃক্ষের উপর রাখিয়া দা দিয়া কাটিয়া জীবন রক্ষা করে। আমরা এই দুঃসাহসী শিকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার জন্দ্বলস্থ গ্রামে যাই। এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল : পেটের জ্বালায় বিনা আদেশপত্রে জন্দ্বলে প্রবেশ করি। আন্দুলের বিষাক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিয়া জীবন রক্ষা করি। অনোন্যপায় হইয়া উপস্থিত বুদ্ধিমত এই কাজ করি। আমি বনের মধ্যে মারা গেলে সন্ধীদের কৈফিয়ত দিতে হইত। সুন্দরবনে এক শ্রেণীর লোক এইভাবে জীবন বিপন্ন করিয়া খাদ্যবস্ত্র সংস্থানের জন্য বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৈচিত্র্যময় ইহাদের জীবন কাহিনী। ইহারা অসীম সাহসী ও দুর্জয়।

কি করিয়া বনের মানুষ ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াও বহুকাল জীবিত থাকে উহার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ শরণখোলা থানার রাজাপুর গ্রামের ওয়াজেদ আলী হাওলাদার। বর্তমান (১৯৬৭ সাল) বয়স ৮০ বৎসর। ভোলানদীর পূর্বপারে গ্রাম এবং

পশ্চিম পারে ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারের আবাসস্থল। পূর্বোক্ত ব্যক্তি আদেশ পত্রসহ বুড়বুড়িয়ার জঙ্গলে গরান কাঠ কাটিতে যায়। ৫০ বৎসর পূর্বের কথা। দুধমুখী নদী হইতে একটি খাল পশ্চিম দিকে গিয়াছে। খালের দক্ষিণ পারে ৮ জন সঙ্গীসহ ওয়াজেদ আলী কাঠ কাটিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করে। তাহার নিজস্ব বিবৃতি এইরূপ ঃ

—আমি ৮ জন লোককে কাজে নিযুক্ত করিয়া পশ্চিমমুখী জঙ্গলে অন্য গাছের সন্ধানে যাত্রা করি। খালের আগাড়ী পার হইয়া উত্তরদিকে যাই। আমি একটু চলার পর দিক হারাইয়া ফেলি। সুন্দরবনে এইরূপ দিকভ্রমের সম্ভাবনা অধিক। আমার হাতে একখানি সুন্দরী বৃক্ষের শাখা, লাঠি হিসাবে ব্যবহার করিতেছি। এমন সময় একটি প্রকাণ্ড বাঘ হাঁ হাঁ করিতে করিতে আমাকে আক্রমণ করিল। বাঘের হাঁ প্রায় ১০'' ইঞ্চি হইবে। মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছিল।

—আমার এহেন ভীষণ অবস্থার মধ্যে চিৎকার দিতে থাকি। বাঘ লাফাইয়া পড়িলে উহার দুই হাত আমার উরু স্পর্শ করিল। ঐ সময় আমি দক্ষিণহস্তের সুন্দরীর কচা দ্বারা বাঘকে সজোরে আঘাত করি। বাঘ আমার দক্ষিণ হস্তের বগলের দিক কামড়াইয়া ধরে। দুই হস্তের দ্বারা আমি বাঘকে ধাক্কা মারি এবং পবিত্র কোরানের আয়াত পড়িতে থাকি। তখন বাঘের হাতা মাথায় লাগিয়া আমার কপালে ক্ষত হইয়া যায়। সে চিহ্ন এখনও আছে। আবার আমি সজোরে এই হিংস্র জন্তুকে লাথি মারি। সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়িয়া যাই।

—বাঘ আমাকে ছাড়িয়া দেয়। আমার চিৎকারে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া আসিতে থাকে। লোকজন আসার পূর্বেই বাঘ চলিয়া যায়। আমার হস্তের বগলের নীচে ও পশ্চাতে ব্যাঘ্র দন্ত কামড়ের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। সঙ্গীরা কাপড় জড়াইয়া আমাকে নৌকায় লইয়া আসে। আমার ভীষণ জ্বর হয় এবং দুইদিন বেহুশ অবস্থায় থাকি। তিনমাস চিকিৎসার পর আরাম পাই। প্রায় দুইমাস পর্যন্ত চিকিৎসক ভাত খাইতে দেন নাই।

—অন্য একদিনের ঘটনা—

মরা ভোলা নদী হইতে ধাবড়া খালের তীরে ধাবড়ার জঙ্গল। ছোট খালের মধ্য দিয়া ডিঙ্গি নৌকায় চলিতে থাকি। দুই ডিঙ্গিতে সাতজন মানুষ। জঙ্গলের পাশ ঘেঁশিয়া নৌকা চলিতেছে। মনে করিলাম একটি প্রকাণ্ড হরিণ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম প্রকাণ্ড এক বাঘ। লগি দ্বারা বাঘের মাথায় আঘাত হানিবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করিতে করিতে জঙ্গলের অন্যদিকে চলিয়া যায়।

বাঘ আমাদের আক্রমণ করে নাই। বাঘের 'আড়ি' আছে। লেজ গুটাইতে গুটাইতে শিকারের জন্য 'আড়ি' করে। আড়ি বা প্রস্তুতি না গ্রহণ করিলে অকস্মাৎ বাঘে শিকার করিতে পারে না। 'আড়ি' করিতে না পারিয়া বাঘ চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে বাঘের হাঁ হাঁ চিৎকারে নৌকার দুইজন লোক ভীষণ ভয়ে লাফাইয়া খালের মধ্যে পড়িয়া যায়। অন্য দুইজন ভয়ে বেহুশ হইয়া পড়ে।

ওয়াজেদ মিয়া ও অন্যান্য বহু দুর্জয় ব্যক্তি আমাদের ব্যাঘ্রাক্রমণের আরও কাহিনী শুনাইয়াছে। কিন্তু সব কাহিনী সন্নিবেশিত করা এখানে সম্ভব নহে। অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে, গ্রামের একটি লোক—নাম আবদুল হাকিম, বয়স ২৫ বৎসর। একদিন সে আন্ধারমানিক জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যায়। একখানি নৌকায় ছয়জন লোক। সন্ধ্যার পর রান্না খাওয়া শেষ করিয়া নৌকায় শুইয়া থাকে। অকস্মাৎ একটি বাঘ লম্ফ দিয়া নৌকাপরি আরোহণ করে। বাঘের সম্মুখস্থ লোকটি নৌকার খোলের মধ্যে পড়িয়া যায়।

—এই সময় আবদুল হাকিম চিৎকার দিয়া বলে, এই বাঘ গেল। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে ধরিয়া তীরে লইয়া যায়। তীরে জঙ্গলের পার্শ্বে বাঘ লোকটিকে বসাইয়া রাখিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। তখন আবদুল হাকিম চিৎকার দিয়া বলে, মামু, আমি জীবিত আছি, আমাকে নৌকায় উঠাও। এই কথা বলামাত্র বাঘ উহাকে ধরিয়া জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়। অন্যান্য লোকের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

একবার সুন্দরবনের সন্নিকটের কয়েকজন লোক মৎস্য শিকার ও ভ্রমণের জন্য দুইখানি নৌকায় জঙ্গলে প্রবেশ করে। দিনের বেলা নৌকা দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া সকলে গল্প করিতে থাকে। এমন সময় কয়েকজনের চা পানের ইচ্ছা প্রবল হয়। কিন্তু নৌকায় জ্বালানি কাঠ নাই, কি দিয়া পানি গরম করিবে। জঙ্গলের সর্বত্র শুকনা জ্বালানি কাঠ সর্ব সময়ে পাওয়া যায়, তজ্জন্য লোকে উহা সঞ্চয় করিয়া রাখে না। একজন নদী তীরের জঙ্গলে ঢুকিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া নৌকায় আরোহণের পূর্বে তাহাকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া ফেলে। ব্যাঘ্রের কামড়ে তাহার শরীর হইতে রক্ত ঝরিতেছে, সে চিৎকার দিয়া সঙ্গীদের বলিল, "তোমরা যেয়ো না—আমি ফিরিয়া আসিব।" কিছুদূর গিয়া বাঘ শিকার ছাড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। ঐ ব্যক্তির হাতে একখানি কাঠ ছিল, সে কৌশলে ঐ কাঠ ব্যাঘ্রের গালের মধ্যে পুরিয়া দেয়। ব্যাঘ্র সক্রোধে অগ্রসর হইলে ঐ কাঠ উহার পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। ব্যাঘ্র উহাকে ধরিতে অক্ষম হয়।

ব্যাঘ্রাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের গাত্র পতিত রক্তের চিহ্ন ধরিয়া দ্রুতগতিতে নৌকায় পৌঁছিয়া সঙ্গীদের বিভীষিকার আদ্যপ্রান্ত কাহিনী বর্ণনা করে। সে বলে যে. ব্যাঘ্র তাহাকে একটু দূরে রাখিয়া হাঁপাচ্ছিল। একবাব নড়াচড়া করিলে বাঘ উহার গালে জোরে আঘাত করিয়া ফেলিয়া দেয়। ইত্যবসরে সে বাঘের গালের মধ্যে কাঠ পুরিয়া দিতে সক্ষম হয়। কৌশলে মানুষের সঙ্গে বাঘ টিকিতে পারে না যদিও উহার গাত্রে অসামান্য শক্তি। বনের লোকে বলে একটি বাঘের গাত্রে আঠার জন মানুষের শক্তি ও বলবীর্য আছে। ব্যাঘ্রাক্রান্ত লোকটি কয়েক ঘন্টা পরে বহু রক্তক্ষয়ের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার কৌশল ও দুর্জয় সাহসের তুলনা নাই।

১৩০৪ সালের মাঘ মাসের কথা। ঢাকী নদীর তীরে ভিটাডাঙ্গা গ্রাম। পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের গদাধর বাওয়ালী এই গ্রামের বাসিন্দা। মন্ত্রশক্তির প্রতি তাহার অবিচল আস্থা ছিল। সেজন্য তাহার ব্যাঘ্রভীতি ছিল না। সে সময় গুনারীর বিল আবাদ হয় নাই। ভিটাডাঙ্গা গ্রামই ছিল শেষ লোকালয়। একটি মানুষখেঁকো বাঘ ভীষণ গর্জন দিয়া অকস্মাৎ

গ্রামের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়ে। গদাধর বিশাল বপু লইয়া গ্রামের লোকজন সহ লাঠি সোটা লইয়া বাঘের দিকে ধাওয়া করিল। সে বীরদর্পে লাঠি হস্তে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিবা মাত্র বাঘ ভীষণ হুংকার ছাড়িয়া একলাফে বাওয়ালীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহার বাম কাঁধে কামড়াইয়া জঙ্গলেব দিকে যাইতে থাকে। সকলে ভীষণ চিৎকার দিয়া বাঘ তাড়া করিল। গদাধর এ হেন ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও জ্ঞানহারা হয় নাই। বাঘের তলে পড়িয়া উহার পেটে সজোরে লাথি মারিতে থাকে এবং ব্যাঘ্রের অনুগামী লোকদের সাহস দিতে থাকে। সকলের ভীষণ হৈ-হুল্লোড়ে, বাঘ ভীত হইয়া খাল পার হইবার উপক্রম করিল। লোকজন বাওয়ালীকে উদ্ধার করিতে গেলে বাঘ হাঁ হাঁ করিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসে। ইত্যবসরে বাওয়ালী উঠিবার চেষ্টা করিলে বাঘ তাহার মুখে প্রচণ্ড থাবা মারে এবং বাম হস্ত কামড়াইয়া ধরিয়া ঝাঁকুনি দেয়।

বহু লোকজন আসিয়া পড়ায় বাঘ বাওয়ালীকে ফেলিয়া জঙ্গলমধ্যে উধাও হয়। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসে। মাসাধিককাল চিকিৎসার পর বাওয়ালী এক প্রকার সুস্থ হয়, কিন্তু তাহার একখানি হাত অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

বাওয়ালীর ডান গাল বাঘের প্রচণ্ড থাবার ফলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং দুইটি ছিদ্র হয়। পরবর্তীকালে জল খাইতে গেলে একটি প্রকাণ্ড বাটির প্রয়োজন হইত। কারণ অধিকাংশ জলই পানের সময় ডান গালের ছিদ্রদ্বয়ের মধ্য দিয়া পড়িয়া যাইত। আজিও ঐ পাত্রটি রক্ষিত আছে।

একদিন বাওয়ালী উঠানে বসিয়া আছে। এমন সময় একটি গো-বৎস তাহার পিঠের উপর আসিয়া পড়ায় তড়িত বেগে পিঁড়ি দ্বারা উহাকে আঘাত করিলে বাছুরটি মারা যায়। সকলের সমবেত তিরস্কারের উত্তরে বাওয়ালি উত্তর দিল, " —আমি ভাবলাম, আবার বুঝি বাঘে ধরেছে।" এই ঘটনার তিন দিন পর বৃদ্ধ বাওয়ালীর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

এগার

সুন্দরবনের মানুষ

এদেশের লোকে বলে, "এই মানুষ বনে গেলে বনমানুষ হয়।" এই শ্রুতিমধুর প্রবাদবাক্যের তাৎপর্য এখন উপলব্ধি করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যখন সুন্দরবনের নদীনালা ও জঙ্গলের অবস্থান করে তখন তাহারা বন্যজীবনে অভ্যস্থ হইয়া পড়ে। বনের গাছপালা, নদীনালা, বিহঙ্গম, ভূচর, খেচর ও জলচরাদি তাহাদের নিত্য সহচর হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাঘ্রের ভীতি ও সরীসৃপাদির উপদ্রবকে তাহারা পরোয়া করে না।

বনের মানুষের সঙ্গে লোকালয়ের কোন সম্পর্ক থাকে না। মানুষের সঙ্গলাভ মধ্যে মধ্যে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। শহর ও গ্রামীণ জীবনের সুখ-সুবিধা হইতে তাহারা একেবারেই বঞ্চিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রমিক-মজদুর, শিকারী-বাওয়ালী, মৎস্যজীবী-মৌয়াল, বাগদী-বুনো প্রভৃতি মানুষের রক্ত-মাংস ও অস্থি-মজ্জা বনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। বনই তাহাদের ঘর, বনের আয়-উপার্জনের দ্বারাই তাহাদের সংসার নির্বাহ হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাহারা জঙ্গলে বসবাস করে। মধ্যে মধ্যে শহর-গঞ্জে আসিয়া সুন্দরবনের পণ্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া আবার বনের পানে ধাবিত হয়। বাড়িঘর, হাটবাজার ও জঙ্গলই তাহাদের আবাসভূমি। এই বনমানুষদের বনেই সুন্দর দেখায় যেমন শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। একে একে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিষয় আমরা আলোচনা করিব:

বাওয়ালী: প্রাচীনকাল হইতে সুন্দরবনে কাঠুরিয়া, মৌয়াল প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা সুন্দরবনের হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওঝা, গুনীন বা বাউলেদের সঙ্গে রাখার প্রচলন ছিল। বাউলে শব্দের প্রকৃত অর্থ ওঝা। ঝাড়, ফুক, মন্ত্রতন্ত্র পাঠ তাহাদের কাজ। এই 'বাউলে' শব্দ হইতে বাওয়ালী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কাঠ সংগ্রহকারী কাঠুরিয়া ও গোলপাতা সংগ্রহকারীকে ক্রমান্বয়ে বাওয়ালী নামে অভিহিত করা হয়। বাউলে শব্দের অপভ্রংশই বাওয়ালী।

যে সমস্ত দরিদ্রলোক নৌকাযোগে সুন্দরবনে গিয়া বৃক্ষ ও গোলপাতা ছেদনে লিপ্ত থাকে তাহাদিগকেই বাওয়ালী বলা হইয়াছে। সুন্দরবনে কাঠুরিয়াদিগকেই প্রধানতঃ বাওয়ালী বলা হইয়াছে। যশোর, খুলনা. ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জের লোকেরা বাওয়ালীর কাজ করে। বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জেলায় বাওয়ালীর সংখ্যা অত্যধিক।

বাওয়ালীগণ সুন্দরবনের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অঙ্গ। তাহারা জঙ্গলস্থ অন্যান্য কর্মরত মানুষের চেয়ে সংখ্যায় অধিক। বাকেরগঞ্জ জেলার রূপকাটি, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, পাথরঘাটা প্রভৃতি থানার গ্রামসমূহ হইতে অসংখ্য বাওয়ালী কাঠ ও গোলপাতা কাটার জন্য সুন্দরবনে দিবারাত্রি অবস্থান করে। কাঠের ব্যবসায়ই তথাকার অসংখ্য মানুষের

উপজীবিকা। শরূপকাটি থানার বর্ষাকাটি, সোহাগদল, বলদিয়া, সূতিয়াকাটি, বলিহারী, জগন্নাথকাটি প্রভৃতি গ্রামের অসংখ্য অধিবাসী বাওয়ালীর কার্যে বিশেষ দক্ষ। খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের অসংখ্য লোক প্রায় বারমাস বাওয়ালীর কার্যে লিপ্ত থাকে। যশোর খুলনার বহু পরিবার পুরুষানুক্রমে বাওয়ালীর ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

বনবিভাগের পক্ষ হইতে প্রতি বৎসর জঙ্গলের নির্দিষ্ট এলাকায় চিহ্নিত বৃক্ষসমূহ নিলাম করা হয়। এক একটি কূপ অফিসের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত 'ঘেরে' কাজ চলে। মহাজনেরা বনবিভাগের চিহ্নিত ঘের প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করে। কাঠুরিয়াগণ মহাজনদের অর্থানুকুল্যে ব্যবসায় পরিচালনা করে। কুড়াল, করাত, দা প্রভৃতি অস্ত্র বৃক্ষছেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। "ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর" তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহারা এই কার্যে লিপ্ত থাকে। বৃক্ষে কুঠারাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য তাহাদিগকে হুঁশিয়ার থাকিতে হয়।

বাওয়ালীদিগকে বনবিভাগের আইন-কানুন কঠোরভাবে মান্য করিতে হয়। তাহারা চিহ্নিত ঘেরের মধ্যে নির্ধারিত বৃক্ষ ব্যতীত অন্য বৃক্ষ ছেদন করিতে পারে না।

স্ব স্ব গ্রাম-বাড়ী হইতে বাওয়ালীরা ছোট-বড় নানা প্রকার নৌকায় দিনের পর দিন দূর নদীপথ অতিক্রম করিয়া সুন্দরবনে পৌঁছিয়া থাকে। বড় বড় নৌকায় ৮/১০ জন এবং ছোট নৌকাগুলিতে ৩/৪ জন করিয়া দাড়ি মাঝি থাকে। কাঠুরিয়াগণ কুঠার দ্বারা বৃহৎকায় বৃক্ষসমূহ ধরাশায়ী করিয়া সাইজ মাফিক কর্তন করতঃ লোকালয়ে আনিয়া বিক্রয় করে। সময় সময় মাসাধিককাল পর্যন্ত তাহারা সুন্দরবনে অবস্থান করে। সুন্দরবন হইতে লোকালয় এবং তথা হইতে সুন্দরবন যাতায়াত এবং কঠোর পরিশ্রম করাই তাহাদের দৈনন্দিন কার্য।

বাওয়ালীদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজন গ্রাম্য বাড়ীতে অবস্থান করে। যুবক, বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী সর্বশ্রেণীর লোক বাওয়ালীর কার্য করে। কেহ নৌকা পাহারা দেয়, কেহ রান্না করে আবার কেহ নৌকা চালায় এবং পথনির্দেশ করে। দিনের বেলা বৃক্ষছেদনের সময় একজনকে নৌকার হেফাজতে রাখিয়া সকলেই জঙ্গলাভ্যন্তরে গিয়া কার্যে লিপ্ত হয়। বাওয়ালী সমাজ এই সমস্ত কার্যে এমনভাবে অভ্যস্ত যে, তাহাদের কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। বনের আইন-কানুন সম্পর্কে তাহারা বনবিভাগের কর্মচারীদের ন্যায়ই ওয়াকেবহাল।

বাওয়ালীরা সুন্দরবনের বৃহৎকায় নদীমধ্যে এবং নদী ও খালের সঙ্গমস্থলে নৌকা নঙ্গর করে এবং সায়াহ্নে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নির্ধারিত স্থানে একত্রে নিশাযাপন করে। সুন্দরবনের এবম্প্রকার স্থানে আমরা একই সঙ্গে শতাধিক নৌকা দেখিয়াছি। হিংস্র জন্তু ও জলদস্যুদের ভয়ে তাহারা একই স্থানে দলবদ্ধভাবে নিশাযাপন করিতে বাধ্য হয়।

গভীর জঙ্গলে আত্মীয় বান্ধব বর্জিত বাওয়ালী সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। নির্জন বনানীর ভয়সঙ্কুল জলস্থলীকে তাহারা মধ্যে মধ্যে কোলাহলময় করিয়া রাখে। সুন্দরবনের অসংখ্য করুণ কাহিনীর সহিত এই সমস্ত বাওয়ালীর দুঃখময় ইতিহাস বিজড়িত। নিরীহ বাওয়ালীরা মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রের মুখে জীবন বিসর্জন দেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রহে বিরত হয় না। আঘাতে তাহারা হয় শক্ত এবং বিপদে অসমসাহসী দৃঢ়চিত্ত।

বাওয়ালী সমাজের চিরসঙ্গী বনের গাছপালা. ঝাড়জঙ্গল ও লতাপাতা। ভীষণকায় অজগর, হিংস্র ব্যাঘ্র, হাঙ্গর, কুমীর, বন্যবরাহ প্রভৃতি স্থল ও জলজন্তুর সহিত বসবাস করিয়া তাহারা বন্য জীবনযাপন প্রণালী গ্রহণ করে। বিপদ-আপদ তাহাদের চিরসহচর। তবে রোগ ব্যাধি বিরল। রোগাক্রান্ত হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় না। তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মেহনত করে। ধন্য তাহাদের বন্য জীবন।

সুন্দরবনের নাড়ি-নক্ষত্র বাওয়ালীদের নখাগ্রে। কোথায় ভগ্ন অট্টালিকা, কোন স্থান হরিণের চারণক্ষেত্র, কোথায় ব্যাঘ্রের অবস্থিতি, কোথায় নরখাদক নররক্তের নেশায় পাগল, কোথায় বানরের সমাবেশ সমস্ত তাহাদের জানা থাকে।

জঙ্গল যাত্রাকালে বাওয়ালীরা পানীয় জল, চাউল, মরিচ, মসলা প্রভৃতি তৈজসপত্র সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করে। বনের সর্বত্র নোনাপানি, এক ফোঁটাও পানের যোগ্য নহে। সেজন্য দূর-দূরান্ত হইতে তাহাদিগকে পানি সংগ্রহ করিয়া সঞ্চিত রাখিতে হয়। সুন্দরবনের নদী ও খালে তাহারা মৎস্য ধরিয়া থাকে। হরিণের আস্তাবলে থাকিয়াও উহার মাংস ভক্ষণ তাহাদের ভাগ্যে জোটে না। তাহারা বনের ফলপাতা যোগাড় করিয়া আহার্য প্রস্তুত করে। বনে অবস্থান করিতে করিতে তাহাদের সরল গ্রাম্য জীবনকে কঠিন বন্য জীবনে পরিণত করে।

বাওয়ালীদের সহায়তায় অসংখ্য করাতকল, হার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরী, নিউজপ্রিন্ট মিল ও ম্যাচফ্যাক্টরীসমূহে হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। বাওয়ালীদের বন্যজীবনেও মধ্যে মধ্যে আমোদ প্রমোদ পরিলক্ষিত হয়। তাহারা সন্ধ্যা সমাগমে লণ্ঠন, চেরাগ ও হারিকেন প্রজ্জ্বলিত করিয়া কত সত্য মিথ্যা ও আজগুবি গল্পের আসর জমাইয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। নৌকায় নৌকায় জারী, ধূয়া, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী ও সারীগানের হিড়িক পড়িয়া যায়। পাঁচালি ও কবিগান গীত হয়। সামান্য শিক্ষিত লোকে পুঁথি পাঠ করিয়া শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করে। প্রেমমিশ্রিত পুঁথিগুলিই তাহাদের বিশেষ প্রিয়। পুঁথিগুলির মধ্যে গাজী, কালু ও চম্পাবতী, সোনাবান, জয়গুন-বিবি, বনবিবির জহুরা নামা এবং কাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গল ও রায়মঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঁচালি ও বেহুলার ভাষাণও গীত হয়। অনেকে তাস খেলিয়া চিত্তবিনোদন করে।

বাওয়ালী সমাজের মধ্যে হুঁকায় ধূমপানের প্রচলন অত্যধিক। একজন ধূমপান শেষ করিয়া হুঁকার ছিদ্রমুখ হস্ত বা চোয়ালের সাহায্যে মুছিয়া ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত অন্যকে

খাইতে দেয়। নারিকেলের খোলের হুঁকায় কড়াৎ কড়াৎ শব্দের সঙ্গে গল্পের আসরও বেশ জমে। রূপকথারও ধুম পড়িয়া যায়। বাঘের গল্প, বনদেবতা, বনবিবির কাহিনী, গাজী কালুর কথা, কারবালার কাহিনীও আলোচিত হয়। কোন বাওয়ালীকে বাঘে আক্রমণ করিলে সেই অঞ্চলে হাহাকার পড়িয়া যায়। সেখানে মনুষ্য প্রবেশ বহুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। বৈচিত্র্যময় এই বাওয়ালীদের জীবনালেখ্য।

শুধু সুন্দরবনের কাঠ নহে, গোলপাতা সংগ্রহের জন্যও অসংখ্য নৌকা সুন্দববনে প্রবেশ করে। হেমন্ত ও শীতকালে নৌকায় নৌকায় মাঝিরা গোলপাতা কাটিতে সুন্দরবনে অবস্থান করে। তাহারা বন হইতে বনান্তরে, দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তবে ঘুরিয়া গোলপাতা সংগ্রহ করিয়া লোকালয়ে আনিয়া বিক্রয় করে। গোলপাতা ও কাঠ সংগ্রহকাবী বাওয়ালীরা সুন্দরবনের নদীপার্শ্বে টোঙ বাঁধিয়া রাত্রিতে শয়ন করে। এই ধরনের ঘব খুব উঁচু করিয়া বাঁধা হয় এবং কাঠের মই দিয়া ঘরে উঠিবার ব্যবস্থা থাকে। বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ঘরের আশেপাশে তাহারা রান্না করিয়া খায়। বড় বড় মৃন্ময় পাত্রে পানীয় জল সঞ্চিত থাকে।

বর্ষাকাটির বাওয়ালীরা সুন্দরবনের প্রাচীনতম বাওয়ালীদের বংশধব; তাহারা বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া নানাপ্রকার খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছে। প্রয়োজনই মানুষকে নব নব আবিষ্কারে সাহায্য করে। বর্ষাকাটির লোকেরা গোলগাছের শাখায় খেজুর বৃক্ষের ন্যায় মৃন্ময়পাত্র ঝুলাইয়া সুমিষ্ট রস আহরণের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। বাওয়ালীরা খেজুর ও তাল বৃক্ষের ন্যায় গোলগাছ হইতে রস বাহির করিয়া পান করে এবং উহা দ্বারা গুড় প্রস্তুত করিয়া খায়। বর্ষাকাটির বাওয়ালীদের রসিক বলা যাইতে পারে। কেননা তাহারা সুন্দরবনের নীরস গোলগাছ হইতে রস আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাওয়ালীরা অস্ত্রের দ্বারা গোলপাতা কাটিয়া নৌকায় সুসজ্জিত করিয়া গোছাইয়া রাখে। তাহারা সামান্য পরিমাণ স্থান ঘিরিয়া নৌকামধ্যে শয়ন করে। গোলপাতা সংগ্রহকারীকেও ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে সর্তক থাকিতে হয়। গোলপাতার ঝোপের মধ্যে কোন কোন সময় ব্যাঘ্ররাজ লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগমত মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়। কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রহ সুকঠিন কার্য।

বাওয়ালীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এক গ্রাম্য কবি "বাওয়ালীদের আক্ষেপ" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। উহাতে সমাজে বাওয়ালীদের অবদান এবং সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছেঃ

আমরা কি ভাই, স্বাধীন দেশের
স্বাধীন মানুষ নইরে।
মোদের দুঃখ কেউ দেখে না
কার কাছে জানাইরে—

বনজন্গল কুড়ায়ে এনে
(সবার) ঘর বাড়ী সাজাইরে
এমন সোনার বনভূমি
কোথাও আর নাইরে।

পূর্ব বাংলার কলকারখানা
আমরা বানাই বালাখানা
মোদের পরে জুলুম চলে
কেউতো ফিরে দেখেনা।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রকুমীর
সব সময় করছে ফিকির
সুযোগ পেলে প্রাণটি যাবে
মানে না রাজা, উজির।

এদের চেয়ে বড় বাঘ
বনকরের ঐ দারোগা সাব
দিনে রাতে শিকার করে
বাওয়ালী হাজার হাজার।

নজর ছাড়া কয়না কথা
সেলাম দিলে নাড়ে না মাথা
মানবতা ভুলে গেছে—
মোদের বলে ধর ছাতা।

নালিশ করলে হয় না বিচার
পাশ করে ভাই, বন্ধ সবার,
পেটের জ্বালায় কইনে কথা
সদাই ফেলি অশ্রুধার—।

একথা সত্য যে, বাওয়ালীদের উপর বনকরের কর্মচারীরা অকথ্য নির্যাতন চালায়। একে জোয়ার-ভাটার পথ, তাছাড়া সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুন্দরবনের প্রবেশ পথে বনবিভাগের অফিসে করাদি পরিশোধ করিতে অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া অকারণে হয়রান হইতে হয়। বহু কর্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ ও মানবতাবোধহীন। কে জানে কবে এই জুলুমের অবসান ঘটিবে।

মৌয়াল : সুন্দরবনের অমূল্য সম্পদ মধুসংগ্রহকারীকে মৌয়াল, মৌয়ালী বা মৌলে বলা হইয়া থাকে। ইহারা ছোট বড় নৌকাযোগে দলবদ্ধভাবে জঙ্গলে মৌচাক ভাঙ্গিতে বা মহল করিতে যায়। প্রতিটি দলে সাধারণত তেরজন করিয়া লোক থাকে। তন্মধ্যে একজনকে নৌকায় পাহারা দেওয়ার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। সে নৌকায় বসিয়া রান্না

করে এবং মধু সংগ্রহ করিয়া আনিলে তাহা সঠিক পাত্রে হেফাজত করে। দলীয় ভাষায় তাহাকে দারোগা বলা হয়। পুলিশ বা বনবিভাগের দারোগার ন্যায় তাহার ক্ষমতা বা দাপট নাই। সে জন্দ্বলের নদীনালায় নৌকাপরি দিনের পব দিন নীরবে দিন কাটাইয়া দেয়।

দলের অবশিষ্ট বারজন দুই দলে বিভক্ত হইয়া মধু ও মৌচাকের সন্ধানে বহির্গত হয়। মৌমাছিরা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া কোন্ দিকে উড়িয়া মৌচাকে উপস্থিত হয় সেদিকে তাহারা ঊর্ধমুখী হইয়া লক্ষ্য করিতে থাকে। কোন্ মৌমাছির নিকট মধু আছে এবং কোন্টির মধু নাই তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়। মধুর নেশায় মৌচাকের খোঁজে মৌয়ালরা যখন ঊর্ধমুখী হইয়া চলাফেরা করে তখন তাহাদের কোন কোন সময় ব্যাঘ্রে ধরিয়া ভক্ষণ করে। এই ভাবে জন্দ্বলের মধ্যে জীবন বিপন্ন করিয়া বনের মানুষ মধু সংগ্রহে লিপ্ত থাকে।

মৌয়ালরা খড়কুটা একত্র করিয়া 'উঁকো বা তড়পা' প্রস্তুত করত সন্দ্বে রাখে। উহাতে আগুন ধরাইরা জন্দ্বলে ধুয়া ছাড়িয়া দিলে মৌমাছি বাহির হইয়া মৌচাকের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। তখন মৌয়ালরা উহাদের পিছু ধাওয়া করিয়া মৌচাকের সন্ধান পায়।

মহাজনরা মৌয়ালদেব ব্যবসা চালিত করে। মহাজন নৌকা ও খাদ্যদ্রব্য সহ মজুরদের সুন্দরবনে প্রেরণ করে এবং জন্দ্বলযাত্রী দরিদ্র মজুরদের সংসার নির্বাহের জন্য অগ্রিম টাকা দাদন দেয়।

মৌয়ালরা জন্দ্বলে প্রবেশ করিয়া ছয়জন করিয়া দুইদলে বিভক্ত হইয়া একসন্দ্বে অগ্রসর হইতে থাকে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে 'কু' সংকেত দ্বারা অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সংকেত দেওয়া মাত্র সন্দ্বে সন্দ্বে সকলে সেখানে জমায়েত হয়। ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিলে দলবদ্ধভাবে লাঠি, দা ইত্যাদি সহ বীরত্বের সহিত আঘাত হানিয়া উহাকে তাড়াইয়া দেয় বা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে ধৃত মানুষ ছিনাইয়া আনে। আবার কোন কোন হতভাগার এই ভাবে ব্যাঘ্রের উদরে জীবন বিসর্জন দিতে হয়।

সুন্দরবনের নিকটবর্তী গ্রাম হইতে বসন্ত ও গ্রীষ্মের মরশুমে দলে দলে লোক মধু সংগ্রহের জন্য বাড়ী-ঘর ফেলিয়া জন্দ্বলপানে ধাবিত হয়। তাহারা মধু সংগ্রহ করিয়া শহর বাজারে বিক্রয় করে। বাওয়ালী, মৎস্যজীবি ও সুন্দরবনের অন্যান্য লোক অপেক্ষা মৌয়ালদিগকে সর্বপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহারা ঊর্ধমুখী হইয়া মৌচাকের নেশায় ছুটিবার সময় অসাবধান মুহূর্তে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে। মৌয়ালদের সন্দ্বে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে না এবং অগম্য ও ভয়সংকুল জন্দ্বলের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে অতিকষ্টে মধু সংগ্রহ করিতে হয়। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। তাহাদের নিকট "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।"

মৌয়ালদের মৌচাক ভান্দ্বার জন্য বড় বড় বৃক্ষে আরোহণ করিতে হয়। সুউচ্চ বৃক্ষ হইতে ভূপতিত হইয়াও অনেক সময় মানুষ মারা যায়। এই ভাবে বনের মানুষ জীবন বিপন্ন করিয়া এক জন্দ্বল হইতে অন্য জন্দ্বলে, এক বৃক্ষ শাখা হইতে অন্য বৃক্ষ শাখায়

বিচরণ করে। দুঃখ ও দৈন্য এবং ঝঞ্ঝা ও বিপদ তাহাদের চিরসঙ্গী। ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকার সৌখিন ও বিত্তশালী লোকের জন্য এবং কাঠ মধু ও মৎস্য সংগ্রহ দীন দরিদ্রের জীবিকা অর্জনের জন্য।

মৌমাছিদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মৌয়ালরা সময় সময় গাত্রে কাদা মাখিয়া আত্মরক্ষা করে। তাহারা "ছিটাদিয়া" বা পৃথক হইয়া মৌচাক খোঁজ করে। মৌমাছির ক্রোধবহ্নি প্রজ্জলিত হইলে দলবদ্ধভাবে মৌয়ালদের আক্রমণ করে। সূর্যমুখী মৌমাছির আক্রোশ ভয়াবহ। যখন হাজার হাজার মৌমাছি মৌয়ালদের আক্রমণ করে তখন তাহাদের ব্যাঘ্র ও কুমীরের ভয় থাকে না। মানুষ যন্ত্রণায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। কোন কোন সময় নদীনালায় ডুব দিয়া মৌমাছির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা হয়।

দলের বামদিকের লোকটির কাছে বেতের আড়ি বা ধামা পিছনে বাঁধা থাকে। মধু সংগৃহীত হইলে নৌকায় আনিয়া জমা করা হয়। মৌচাক ভাঙ্গার পূর্বে আগুনের ধুয়া দিলে মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে চাক হইতে উড়িয়া যায়। সুন্দরবনের লোকেরা উহাকে "বৈলেন দেওয়া" বলিয়া থাকে। মাছি সরিয়া গেলে চাক কাটিয়া মধু সংগ্রহ করা হয়। বামদিকের লোকটি দলের অন্যান্যদের পরিচালিত করে। দক্ষিণ দিকের লোকের বিপদ সম্ভাবনা অত্যধিক, কেননা তাহার দক্ষিণে আর কোনও লোক থাকে না।

মৎস্যজীবি : মৎস্যজীবিরা এদেশের সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত মানুষ। নদী-নালা, খাল-বিলে ইহাদের বসতি। সেজন্য তাহারা ধৈর্যশীল এবং অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে অভ্যস্ত। সুন্দরবনে বাওয়ালীদের পরেই মৎস্যজীবিদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। শীত সমাগমে মৎস্যজীবিদের সংখ্যা বহুল পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু-মুসলিম, জেলে-মালো, মগ-বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মানুষ সুন্দরবনের মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। জেলে সমাজ চিরদিন দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। জলের কুমীর অপেক্ষা ডাঙ্গার কুমীরের ভীতি তাহাদের অত্যধিক। এই অসহায় মেহনতি মানুষের পক্ষে বলিবার কেহ নাই। ঝড়, ঝঞ্ঝা, রৌদ্র-বাতাস, বৃষ্টি-বাদল তাহাদের চির সহচর।

সুন্দরবনে জেলে মালো ব্যতীত বাগদিরাও মাছ ধরে। বাগদিরা খুবই দরিদ্র। নমঃশূদ্রদের এক শ্রেণীর লোক মৎস্য ধরিয়া জীবিকা অর্জন করে। তাহাদিগকে জিয়ানী বলা হয়। মুসলমানদের মধ্যে নিকারী সম্প্রদায় মৎস্য ধরে না কিন্তু মৎস্য ব্যবসায় ইহাদের একরূপ একচেটিয়া।

সুন্দরবনের এক পঞ্চমাংশ নদীনালায় ভরপুর। এই সমস্ত নদী ও খালে এবং বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবিরা মৎস্য ধরিয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সামুদ্রিক ঢেউয়ের তাণ্ডবে সেখানে মৎস্য ধরা সম্ভব হয় না। কিন্তু সুন্দরবনের অভ্যন্তরে নদীনালায় সকল মরশুমে লোকে মৎস্য শিকার করে।

মৎস্যজীবিরা ছোট বড় বাছাড়ী ও অন্যান্য নৌকায় মৎস্য ধরে। সুন্দরবনের নিকটস্থ লোকেরা দলে দলে নানা উপায়ে মৎস্য ধরে। যশোর জেলার অসংখ্য ধীবর জাতীয় লোক আশ্বিন মাসে সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে যায়। তাহারা খাদ্য, শীতবস্ত্র ও ঔষধ সঙ্গে

রাখে। এই সমস্ত লোক ফাল্গুন মাসে দখিন হাওয়া প্রবল হইলে জাল গুটাইয়া সমুদ্র ত্যাগ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে।

বনাঞ্চলের এক শ্রেণীর মানুষ ধান্যরোপনের পর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জঙ্গলের নদীনালায় মৎস্য ধরিতে যায়। সৌখিন ব্যক্তিরাও কদাচিৎ মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। বনবিভাগের অফিসে মৎস্যজীবিদের ও নৌকার বনকর পরিশোধ করিয়া প্রবেশপত্র গ্রহণ করিতে হয়। মৎস্য ধরিবার পর বনকরের অফিসে ওজন করিয়া মনপ্রতি অগ্রিম কর পরিশোধ করিয়া ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় মৎস্যজীবিদের বনকরের অফিসের নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। দায়ে পড়িয়া তাহারা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার কেহ কেহ বিনা আদেশপত্রে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গিয়া মৎস্য ধরিয়া গুপ্ত পথ দিয়া পালাইয়া আসে।

সুন্দরবনে মৎস্য বিক্রয়ের কেন্দ্র আছে। পাইকারী মহাজনেরা নৌকা বা লঞ্চসহ সুন্দরবনের নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য ক্রয়ের জন্য উপস্থিত থাকে। আবার লোকালয়ে আনিয়াও মৎস্য বিক্রয় হয়। মৎস্যজীবি ও অন্যান্য সকলেরই বাসস্থান নৌকায়। প্রতি নৌকায় অতি কষ্টে রান্না, খাওয়া ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকে। জোয়ার ভাটা ও পালের সাহায্যে মৎস্যজীবিরা যাতায়াত করে। তাহারাও বাওয়ালীদের ন্যায় বহুদিন ধরিয়া বনের নদীনালায় অবস্থান করে।

মৎস্যজীবিরা বন হইতে জ্বালানী সংগ্রহ করে এবং সখ্যতা স্থাপন করিয়া বাওয়ালী ও ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে মাঝে মাঝে মৎস্যের বিনিময়ে চাউল, মরিচ, তৈল ইত্যাদি সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের ভাসমান ও ভ্রাম্যমাণ অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি খুব বেশী। আবার বিপদেরও সম্ভাবনা আছে। মৎস্য শিকার বা অনুরূপ ভান করিয়া ডাকাতেরা বে-আইনী বন্দুক সহ দরিদ্র ধীবরদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। কোন প্রকার অস্ত্রাদি না থাকায় ধীবরদের পক্ষে জলদস্যুদের প্রতিহত করা একেবারেই অসম্ভব।

মৌয়ালদের অপেক্ষা মৎস্যজীবিদের ব্যাঘ্রভীতি খুব কম। কিন্তু তাহাদেরও রাত্রিকালে গভীর জঙ্গলের সংলগ্ন নদীতীরে বৃক্ষের সহিত নৌকা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। সেজন্য কদাচিত ব্যাঘ্ররাজ মৎস্যজীবিদের নৌকায় পড়িয়া লোক ধরিয়া ভক্ষণ করে। হাঙ্গর ও কুমীরকে অতীব সাবধানতার সহিত তাহারা এড়াইয়া চলে। মৎস্যজীবিদের জালে কোন কোন সময় হাঙ্গর, কুমীর ও কচ্ছপ ইত্যাদিও ধরা পড়ে।

সুন্দরবনে চট্টগ্রামের মৎস্যজীবিদল : সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের মধ্যে চট্টগ্রামের একদল দুঃসাহসী সামুদ্রিক মৎস্যশিকারী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বঙ্গোপসাগরের তীরে দুবলার চর। ইহাকে লোকে দুবলার ট্যাকও বলিয়া থাকে। দুবলা দ্বীপের পূর্বে মানিকদিয়া নদী। এই নদী পশরের শেষ সীমান্ত হইতে উৎপত্তি হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে আগত বিভিন্ন শ্রেণীর জেলেরা এই নদীর উভয় তীরে বসবাস স্থাপন করে। বৎসরের নির্ধারিত সময়ে তাহারা এখানে মৎস্য ব্যবসায় পরিচালনা করে।

দুবলা অঞ্চলে চট্টগ্রামের কষ্টসহিষ্ণু মৎস্যজীবিদের একাধিক আড্ডা আছে। একটি উপনিবেশ সমুদ্রের সংলগ্ন বলিয়া বাহির কেল্লা নামে পরিচিত। ইহার সন্নিকটে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ দুইটি কেন্দ্রের নাম মেহের আউলের কিল্লা ও মগকিল্লা।

চট্টগ্রামের কৈবর্তসমাজ ও মগজাতীয় লোকেরা মৎস্য শিকারে দক্ষ। এই সমাজের মহাজনেরা মৎস্য শিকারের জন্য চট্টগ্রাম হইতে মজুর আনয়ন করিয়া তিন চারি মাসের জন্য এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। তাহাদের নৌকাসমূহ নানাবর্ণের পাল তুলিয়া গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া স্ব স্ব কেল্লায় আনিয়া উপস্থিত করে।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জলযান সাম্পান ও বিভিন্ন প্রকার নৌকাসহ প্রতিবৎসর কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ধীবরগণ দলে দলে সাগরকুল ধরিয়া নির্জন দুবলা দ্বীপে উপস্থিত হইয়া উহাকে জনকোলাহলময় করিয়া রাখে। ফাল্গুন মাসে দখিনা হাওয়া প্রবল হইবার পূর্বে তাহারা নৌকাযোগে আবার চট্টগ্রামে ফিরিয়া যায়।

মানিকদিয়া নদীর নিকট মোরাদিয়া খাল। এখানেও জালিয়াদের একটি প্রধান আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্র তীরবর্তী উন্মুক্ত স্থান হইতে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে অন্দরকিল্লা বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন কিল্লার মৎস্যজীবিদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র হইবে। মৎস্যজীবিরা নির্জন বনানীর পার্শ্বে সমুদ্র উপকুলে এবং নদী ও খালের তীরে সুন্দর লোকালয় স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের নামানুসারে ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছে "ফিসারম্যানস আইল্যান্ড" বা ধীবরদের দ্বীপ।

বনবিভাগেব কর পরিশোধ করিয়া এই দ্বীপাঞ্চল হইতে লক্ষাধিক মন শুটকি মৎস্য প্রতি বৎসর চট্টগ্রাম ও অন্যত্র রপ্তানী হয়। এই স্থানের অধিবাসীদের নিকট চাউল, ডাল, মশলা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধ্যে শহর ও বন্দর হইতে যাতায়াত করে।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় মিলিটারী কর্মচারী বড় বড় নৌকা বোঝাই মৎস্যসহ একদল ধীবরকে ভুলক্রমে চোরাচালানী সন্দেহে মাঝি মাল্লাসহ গ্রেফতার করিয়া খুলনা শহরে আনয়ন করে। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে ধীবরদের শাস্তি হয়, কিন্তু আপিলে জজকোর্ট হইতে সকলেই খালাস পায়।

মৎস্যজীবিদের এক আবেদনে তৎকালীন মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী শরৎচন্দ্র মজুমদার ও এই লেখক পূর্ব পাক সরকারের পক্ষ হইতে সরেজমিনে তদন্তের জন্য দুবলা দ্বীপে যাইয়া তাহাদের অবস্থা ও মৎস্য ধরাব বিভিন্ন প্রণালী পরিদর্শন করেন। আমরা জানিতে পারিলাম কয়েকদিন পূর্বে জঙ্গলে জ্বালানী সংগ্রহের সময় বিশজনের মধ্য হইতে একজনকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর মৎস্যজীবিদের দুই-এক জনকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে এবং অনুরূপ সংখ্যক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। তথাপি তাহারা এই কষ্টকর কর্ম হইতে বিরত হয় না। অদ্ভুত ইহাদের জীবনালেখ্য।

বিভিন্ন প্রণালীতে ধীবরেরা মৎস্য শুকাইবার ব্যবস্থা করে। প্রান্দ্বনে ছড়াইয়া এবং ঝুলাইয়া মৎস্য শুটকি করার ব্যবস্থা করা হয়। ঝুলান মৎস্য দূর হইতে দোচালা ঘরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। প্রতি কেল্লায় একাধিক মৎস্য শুকাইবার প্রান্দ্বন আছে। তাহারা উহার পার্শ্বে ঘর বাঁধিয়া বসবাস করে। ঐ সমস্ত স্থানে মৎস্য পচানীর তীব্র দুর্গন্ধে বহিবাগতদের পক্ষে যাতায়াত একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু উহাদের ঐ দুর্গন্ধে কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি হয় না।

মৎস্যজীবিদের শ্রেণীবিভাগ আছে। চট্টগ্রামের কৈবর্ত সমাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে মহাজন আছে, তাহারা অগ্রিম দাদন দিয়া দেশ হইতে মজুর আনয়ন করে। কেহ মাসিক বা মরশুম হিসাবে চুক্তি করিয়া মৎস্য ধরিতে আসে। কেহ মাছ বাছাই করে, কেহ শুকায় এবং অনেকে নৌকা চালায়। মহাজন বা দলের নেতাকে বহরদার বলা হয়। তাহাদের অধীনে দুই শ্রেণীর লোক থাকে। এক শ্রেণীর লোকে গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে দক্ষ এবং অন্য দল মৎস্য বাছাই (Sorting) করে। এই বাছাইকে দলভান্দ্বা বলা হয়। তাহাদের মধ্যে বহু মুসলমান আছে। জ্বালানী ইত্যাদির জন্য প্রত্যেককে প্রতি বৎসর মাথাপিছু বনবিভাগকে চারি টাকা কর দিতে হয়।

চট্টগ্রামের হিন্দু মৎস্যজীবিরা দুবলা দ্বীপে পৌছিয়া প্রতি বৎসর দুইটি পূজার ঘর প্রস্তুত করে। উহার মধ্যে একটি কারুকার্যখচিত ক্ষুদ্র ঘরে দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অন্য একটি ঘর শক্তিধর গাজীর নামে রাখিয়া দেওয়া হয়। উহাকে লোকে গাজীর ঘর বলে। এইখানে তাহারা একটি পাঠাছাগল দেবতার নামে বলি দেয় এবং অন্য একটি পাঠা বনদেবী বা বনবিবির নামে জন্দ্বলের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। উক্ত পাঠা ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে বা বনকরের লোকেবা ধরিয়া হালাল করিয়া উদরস্থ করে।

বাঘ, হাঙ্গর ও কুমীর শিকারী : সুন্দরবনের ডান্দ্বায় বাঘ এবং জলে হান্দ্বর ও কুমীর। বিভিন্ন স্থানের নানা প্রকার মানুষ হিংস্র জন্তু শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। সুন্দরবনের যেখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব খুব বেশী, বনবিভাগ হইতে সেখানে পেশাদার শিকারী নিযুক্ত হয়। এই ধরনের ব্যাঘ্র শিকারীর সংখ্যা নগণ্য।

ব্যাঘ্র শিকারের জন্য আদেশপত্র গ্রহণ করিতে হয়। বিনা আদেশপত্রে ব্যাঘ্র শিকার অপরাধজনক কাজ। বনাঞ্চলে বহু ব্যাঘ্র শিকারী এখনও জীবিত আছে। ইহারা অনেকেই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। তাহাদের পূর্বপুরুষেরাও চিরদিন বীরের ন্যায় ব্যাঘ্র শিকার করিত। জন্দ্বলে সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্বের কাজ ব্যাঘ্র শিকার। প্রকৃত ব্যাঘ্র শিকারীরা বনের আবহাওয়ায় বনমানুষ হইয়া যায়। ব্যাঘ্রের হাতে তাহারা জীবন বিসর্জন দেয়, আবার বুদ্ধি প্রতিযোগিতায় ব্যাঘ্রকে পরাজিত করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে বনের মানুষ বলশালী ও বেপরোয়া হইয়া উঠে। সাধারণ মানুষ বনের আবহাওয়ায় ভীষণ শক্তিশালী হইয়া উঠে। বন শিকারীদের জীবন-মরণের ক্রীড়াস্থল।

ব্যাঘ্র শিকার একশ্রেণীর লোকের নেশা। এই নেশা ঘাড়ে চাপিলে তাহারা গোপনেও শিকার করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র শিকারীরা পুরস্কার ও কৃতিত্বের জন্য জীবন হাতে করিয়া শিকারে লিপ্ত হয়। দরিদ্র বনের মানুষের পক্ষে কৃতিত্ব ও পুরস্কারপ্রাপ্তি গৌরবের বিষয়। পেশাদার ব্যাঘ্র ও অন্যান্য শিকারী গ্রাম্য সমাজে কৃতিত্বের পরিবর্তে হেয় বিবেচিত হয়। ব্যাঘ্র শিকারের বিভিন্ন ও অভিনব পদ্ধতি, শিকারী সমাজ ও তাহাদের কৃতিত্বের বিষয় অন্য দুইটি অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

পূর্বে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে বুনো মহিষ ও গণ্ডার শিকারী ছিল। এই দুই জন্তু বিলুপ্ত হওয়ায় সে শিকারীদলও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা ব্যাঘ্র শিকারের ন্যায় গণ্ডার ও বয়ার (বুনো মহিষ) শিকারে দক্ষ ছিল। এককালে তাহারা গভীর জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সমস্ত শিকার করিয়া আয় উপার্জন করিত। শিকারীরা মহিষ ও গণ্ডারের মাংসও ভক্ষণ করিত।

হাঙ্গর এক ভয়াবহ জলজন্তু। কুমীর অপেক্ষা ইহারা অধিকতর হিংস্র। চট্টগ্রামের মৎস্যজীবিরা এবং চাকমা ও মগ জাতীয় লোকে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী নদী ও সমুদ্রে অসংখ্য হাঙ্গর শিকার করিয়া থাকে। হাঙ্গর তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। জেলেদের জালেও হাঙ্গর ধরা পড়ে। কুমীর ও ব্যাঘ্র শিকারীর তুলনায় পেশাদার হাঙ্গর শিকারীর সংখ্যা নগণ্য। ব্যাঘ্র শিকারে যেরূপ কৃতিত্ব, কুমীর ও হাঙ্গর শিকারে তদ্রূপ হয় না।

কুমীর শিকার খুব কঠিন নহে। নৈশ অন্ধকারে শিকারীর আলো দেখিলেই কুমীর দাঁড়াইয়া যায়, একটুও নড়িতে পারে না। শিকারীরা চবক নামক একপ্রকার লৌহনির্মিত অস্ত্রের দ্বারা কুমীর শিকার করে। উহার অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ। শিকারীরা অর্থোপার্জনের জন্য কুমীর শিকার করিতে সুন্দরবনের নদীতে নৌকাপরি দিনের পর দিন নির্জন বনভূমির অভ্যন্তরে অবস্থান করে। কুমীরের মুল্যবান চর্ম বিক্রয় করিয়া শিকারীরা অর্থ উপার্জন করে। ছোট, মাঝারি প্রভৃতি নৌকায় দুই বা ততোধিক শিকারী বনবিভাগের পাশ ও শিকারের অস্ত্রাদিসহ বড় বড় নদীর মধ্যে ঘুরিয়া শিকার অন্বেষণ করে।

আলো দেখিলে ব্যাঘ্রের ন্যায় কুমীরও দাঁড়াইয়া যায়, আর নড়িতে পারে না। শিকারী চবক দ্বারা আঘাত করিলে কুমীর যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে। শিকারী অস্ত্রের সন্ধে দড়ি বাঁধিয়া নদীমধ্যে ছাড়িয়া দেয়। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছুটাছুটি করিতে করিতে কুমীর ক্লান্ত হইয়া অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অনেক সময় এক আঘাতে কুমীর মরে না। সেজন্য প্রথম চবকের পর আরও দুই তিনটি আঘাত করা হয়। পরে শিকারী দড়ি টানিয়া কুমীরকে নিকটে আনিয়া আবশ্যকমত কুঠার দ্বারা আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলে। কোন কোন শিকারী কুমীরের গাত্রে আঘাত করিয়া দড়ির সহিত কলাগাছ বাঁধিয়া ভাসাইয়া দেয়। পার্শ্বেই নৌকারোহণে শিকারী পাহারা দিতে থাকে এবং কুমীর মরিয়া গেলে ধরিয়া উঠায়।

কুমীর শিকারীদের শিকারের জন্য অনাহার, অনিদ্রা ও কালক্ষয় করিতে হয়। নদী বা খালের তীরে কর্দমাক্ত চরভূমিতে কুমীর যখন রৌদ্র পোহায় তখনও শিকারীরা শিকার করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু জাতির লোকেরা সাধারণত কুমীর শিকারে দক্ষ।

সুন্দরবনের মানুষ কুমীরকে ভয় করে না। কয়রা মাঝেরআটি গ্রামের নছে গাজী গরীব মানুষ। সে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা অর্জন করে। দেউলীর খাল শাঁকবাড়ে নদী হইতে উঠিয়া গ্রামের দিকে আসিয়াছে। একদিন ঝাকি জাল দ্বারা মৎস্য ধরার সময় গাজীকে কুমীরে আক্রমণ করিয়া পদদ্বয় একসন্ধে কামড়াইয়া ধরে। সে অনোন্যপায় হইয়া এহেন বিপদের মধ্যে দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া কুমীরের দুই চোখে দুই আঙ্গুল বসাইয়া দেয়। কুমীর তখন প্রশস্ত বড় নদীর একপার হইতে অন্য পারে লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। কুমীরের আক্রমণ হইতে সে এবম্প্রকারে রক্ষা পায়।

আর একদিনের কথা—ঐ ব্যক্তি পোলো দ্বারা নদীতে মৎস্য ধরিতে গিয়া একটি কুমীর ধরিয়া ডাঙ্গায় উঠায়। এহেন দুঃসাহসীর নিকট কুমীর দেখিয়া সকলে ঐ স্থান ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইয়া কুমীর দেখিতে থাকে। সে পোলোর মধ্যে চাপিয়া কুমীর শিকার করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসে। কুমীর শিকারের জন্য তাহার ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। এইভাবে সে আরও বহুবার কুমীর শিকার করিয়াছে। একবার পায়রাখালির খালে গরু পার করার সময় একটি কুমীর গাজীর কোমর কামড়াইয়া ধরে। সে দুর্জয় সাহসের সহিত গরুর সাহায্যে কুমীর তাড়াইতে সক্ষম হয়।

হরিণ ও বানর শিকারী : সুন্দরবনের লোকেরা হরিণ শিকারে দক্ষ। বিশ্বের এহেন মনোরম জন্তু শিকারের জন্য অনেকের মন-প্রাণ জঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া শিকারী হরিণ শিকারের নেশায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়ে। হরিণ শিকার ভয়ংকর নেশা। ইহার জন্য শিকারী দিনের পর দিন অনাহারে ও অর্ধাহারে বনভূমিতে পড়িয়া থাকে। অনেক সময় শিকারের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়। ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ, অজগর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ তুচ্ছ করিয়া মানুষ হরিণ শিকারে লিপ্ত হয়। মৃগয়া শিকার কাহিনী বিভিন্ন জাতির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সুন্দরবনে হরিণ শিকার নিষিদ্ধ হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে চালু আছে।

বন্দুকই শিকারের প্রধান অস্ত্র। পূর্বে শিকারীরা দেশী হস্তনির্মিত বন্দুক ও গাদার বন্দুক ব্যবহার করিত। এখন শিকারীরা উন্নত ধরনের বন্দুক ব্যবহার করিয়া থাকে।

হরিণ শিকারীর নিকট প্রলোভন বিশেষ। বাদাবনে হরিণ শিকার সহজ এবং দুরূহ বটে। শিকারীর আগমনবার্তা জানিতে পারিলে হরিণ তীরবেগে ছুটিতে থাকে। শিকারীর গাত্র ঘেসিয়া বায়ু প্রবাহিত হইলে হরিণ তাহা অনুভব করিতে পারে। সেইজন্য শিকারীকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। দূর হইতে শিকারীর ধূমপান হরিণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে হরিণ সাবধানতা অবলম্বন করে। সেজন্য শিকারীরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া ধূমপান করিতে পারে না। ব্যাঘ্র অপেক্ষা হরিণের ঘ্রাণ-শক্তি প্রখর। দক্ষ শিকারীর বুদ্ধি কৌশলের নিকট এহেন হুশিয়ার প্রাণীদেরও মতিভ্রম ঘটে।

হরিণ শিকারীরা শিকারের নেশায় জংলী স্বভাবের দিকে আকৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা দেশের আইন লঙঘন করিয়া জঙ্গলে হরিণ শিকার করে। গুপ্ত শিকারীর দাপটে হরিণের বংশ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।

বহুপূর্বে সুন্দরবনে 'টোপ' শিকার প্রথা চালু ছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে শিকারীকে সাগর বা নদী সৈকতে বা জঙ্গলস্থ উন্মুক্ত স্থানে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে উপবেশন করত মস্তকোপরি বৃক্ষপত্র ও ডালপালা চাপা দিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতে হয়। অসুবিধা ও কষ্টকর বিধায় টোপ শিকারের চলন আর নাই।

শিকারীরা বৃক্ষের সুউচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া ধূর্ততার সহিত বানরের ন্যায় ডাকিতে থাকে এবং ফলপাতা ছিঁড়িয়া হরিণকে খাইতে দেয়। বানর হরিণ-জাতির বন্ধু। শত্রুর অবিকল নকল শব্দকে বন্ধুর আহ্বান মনে করিয়া উহারা বৃক্ষতলে আসে। হরিণ উপরে তাকাইতে অক্ষম, সেজন্য এবম্প্রকার সুবর্ণ সুযোগে শিকারীরা সহজে হরিণ শিকার করে। ইহাকে 'গাছাল' শিকার বলা হয়। সুন্দরবনে গাছাল শিকারের প্রচলন অত্যধিক। শিকারীরা সুকৌশলে হরিণের মতিভ্রম ঘটাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে।

শিকারীরা কোন কোন সময় বানরে বানরে ঝগড়ার অবিকল নকল করিয়া হরিণ ডাকিয়া আনে। নদীপথে চলিতে চলিতে টর্চের আলোর সাহায্যে শিকার করাকে 'বাওন' শিকার বলা হয় ; খাল বা নদীতীরের পার্শ্ব দিয়া নৌকা চলিতে চলিতে শিকার সন্ধান করা হয়।

ব্যাঘ্রের ন্যায় হরিণকুল চলাপথে পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। ঐ পদচিহ্নকে পোট, পাড়া বা খোঁচ বলা হয়। শিকারী কর্দমাক্ত গুলোর মধ্য দিয়া ব্যাঘ্রভীতি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সেই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে হরিণের সন্ধান পায়। কর্দমাক্ত জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদব্রজে শিকারকে 'মাঠাল' শিকার বলা হয়। এবম্বিধ শিকারে শিকারীকে বিশেষ সাবধানতার সহিত চলিতে হয়। ইহা কষ্টসাপেক্ষ।

কোন কোন সময়ে বনের সাধারণ মানুষ বিনা আগ্নেয়াস্ত্রে হরিণ শিকার করিয়া থাকে। দলবদ্ধভাবে তাড়া করিয়াও হরিণ ধরা হয়। কালিগঞ্জ থানার শ্রীকলা গ্রামের এক ব্যক্তি বিনা অস্ত্রে হরিণ শিকার করিতে পারে। সে সংগোপনে অতীব কৌশলে যখন তখন হরিণ ধরিয়া আনিতে পারে। পূর্বে সে এইভাবে হরিণ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করিত। তাহাকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া বনবিভাগের লোকেরা গুলি করিয়া তাহার ডাহিন পা খোঁড়া করিয়া দেয়। সে এমনি দক্ষ যে, খোঁড়া পা লইয়া জঙ্গলে গিয়া হরিণ ধরিয়া আনিত। গ্রামের লোকেরা তাহাকে মগর খোঁড়া বলিয়া ডাকে। বিচিত্র তাহার জীবনালেখ্য।

কুকুরের সাহায্যেও কদাচিৎ হরিণ শিকার করা হয়। কুকুরকে জঙ্গলে আনিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। কুকুরে স্পর্শ করিলে হরিণ একপদও অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া শ্রুত হয়। এমতাবস্থায় শিকারী দৌড়াইয়া গিয়া হরিণ ধরে। আবাব কোন কোন সময় কুকুরের কামড়ে হরিণ মরিয়া যায়।

শিকারী জঙ্গলের মধ্যে কুকুর ছাড়িয়া দেয়। দূর জঙ্গলে হরিণ দেখিলে কুকুরে ইশারা করিয়া খবর পৌঁছায়। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বের কথা। ডুমরীয়া গ্রামের দুই ভ্রাতা এসেম শেখ ও মেহের শেখ কুকুরের সাহায্যে হরিণ শিকার করিত। বনবিভাগের রেঞ্জার তেজেন ঘোষ গুলি করিয়া এসেমের শিকারী কুকুরকে জঙ্গলমধ্যে মারিয়া ফেলেন। তদাক্রোশে এসেম রেঞ্জারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি ছুড়িলে তাহার ভ্রাতা মেহের শেখ ঠেকাইয়া দেয়। বন্দুকের গুলি মস্তকে লাগিয়া রেঞ্জারের হ্যাটে বিদ্ধ হয়। নরহত্যা করিতে উদ্যোগী হওয়ার অপরাধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা বলে এসেমের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বর্তমানকালে গুপ্ত বা চোরা শিকারীর দল সুন্দরবনের যত্রতত্র হরিণ শিকার করিয়া বেড়ায়। ইহারা মধ্যে মধ্যে এতদূর বেপরোয়া হইয়া পড়ে যে, বনবিভাগের কর্মচারীরা ভয়ে তাহাদিগকে কিছুই বলিতে পারে না। অনেক সময় দুর্বৃত্তেরা বেপাশী বন্দুক দ্বারা হরিণ শিকার করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং গ্রামাঞ্চলে হরিণের মাংস বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করে।

সুন্দরবন অঞ্চলে একশ্রেণীর লোক বানর শিকার করিয়া অর্থোপার্জন করে। বিদেশে বানর রপ্তানীকারী ব্যবসায়ীরা অর্থদ্বারা এইসব লোককে বানর শিকারের জন্য নিয়োজিত করে। ইহারা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। বৎসরে কয়েক মাস কৃষিকার্য করিয়া অবসর সময়ে সংসার নির্বাহের জন্য জঙ্গলের বৃক্ষ হইতে বানর ধরিয়া মহাজনকে সরবরাহ করে। শিকারীরা বনমধ্যে বড় বড় জাল ফেলিয়া বানর তাড়া করে। বানরে তাড়া পাইয়া দলে দলে দৌড়াইয়া যাইবার সময় জালে আটকাইয়া যায়। এইরূপ বিভিন্ন কৌশলে বনের অধিবাসীরা বানরের ন্যায় ধূর্ত জীবকেও ধরিতে সক্ষম হয়।

ক্রোধান্বিত বানর সুযোগ মত শিকারীর হস্ত কামড়াইয়া ক্রোধ প্রশমিত করে। এবম্প্রকার অসুবিধার মধ্যে শিকারীদের কার্য করিতে হয়। জঙ্গলের পথঘাটবিহীন স্থান, ঝোপঝাড় ঘেরা কর্দমাক্ত ভূমি অতিক্রম করিয়া বানর খুঁজিতে হয়। ব্যাঘ্র ও সর্পভীতি এবং বিপদ আপদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শিকারীকে স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য অগম্য স্থানে পরিশ্রম সহকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। নিদারুণ কষ্টকর তাহাদের বন্যজীবন। অপূর্ব ইহাদের সাহস, হেকমত ও ধৈর্য্য। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ হইতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইহাই তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

সর্প ও নারকেল শিকারী : ব্যাঘ্র শিকারের ন্যায় কঠিন না হইলেও সর্প শিকার বিপজ্জনক। সাপুড়িয়া সমাজ সর্প শিকারে দক্ষ তাহা সকলের জানা আছে। তাহারা সুন্দরবন হইতে সর্প ধরিয়া অন্যত্র বিক্রয় করে। যত বড় বিষধর সর্প হউক না কেন সাপুড়েরা উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া বশে আনয়ন করে। সাপের বশীকরণ মন্ত্র ও গাছ গাছড়ার সাহায্যে তাহারা বিষধর সর্পকেও স্বীয় আয়ত্বাধীন করে। লোকে আদেশপত্র লইয়া সুন্দরবন হইতে বড় বড় সর্প ধরিয়া গ্রামাঞ্চলে ও শহরে লইয়া আসে।

সাপুড়িয়া ব্যতীত বনাঞ্চলের এক শ্রেণীর মানুষ সর্প শিকারে দক্ষ। তাহারা কৌশলে সর্বপ্রকার সর্প শিকার করিয়া থাকে। বৃহৎকায় অজগর শিকার করিয়া কাঠের বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া বাঁশের সাহায্যে স্কন্ধে করিয়া নৌকা হইতে তীরে নীত হয়। এই ধরনের সর্প শিকার করিলে পুরস্কার দেওয়া হয়। শিকারীরা সর্পের মূল্যবান চামড়া বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করে। বিগত ১৯৬১ সালে সুন্দরবনের সন্নিকটে এক গ্রামে ২৫' ফুট একটি বোড়া সর্প ধরা পড়িয়াছিল। ১৯৬৬ সালে সুন্দরবনে একটি সাড়ে চারি মণ ওজনের প্রকাণ্ড বোড়া সাপ ধরা পড়ে।

বড় বড় সর্পের গমনাগমনের পথ আছে। জঙ্গল মধ্যে চলিতে চলিতে শিকারী তাহা বুঝিতে পারে। শিকারী দড়ি দিয়া ফাঁসি প্রস্তুত করত গমন পথে রাখিয়া দিলে সাপ ধরা পড়ে। মাথা উঁচু করিয়া চলিবার সময় সাপের গলদেশে ফাঁসি লাগিয়া যায়। অনেকের নিকট এই ধরণের সর্প শিকার সহজ কাজ। বনানীর মধ্যে সাপ আছে কিনা শিকারীরা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করে। অনেক সময় সর্পকে ভূপতিত বৃক্ষের ন্যায় মনে হয়। এইরূপ সর্পকে শিকারীরা সুন্দরী বৃক্ষের দুমুখো ডালের অগ্রভাগ ধারাল করিয়া উহার গলদেশে বসাইয়া দেয়। উহাতে সর্প মাটির সহিত মিশিয়া আটকাইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দিয়া সর্প ধরিয়া ফেলা হয়।

একদা সুন্দরবন অঞ্চলে একজন সর্প শিকারী একটি বিষাক্ত সর্প ধরিয়া উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেয় এবং সর্পটিকে লইয়া কিছুদিন খেলা করিতে থাকে। অকস্মাৎ একদিন খবর আসিল যে, সর্পাঘাতে লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিষদাঁত ফেলিয়া দিলেও নাকি পুনরায় অমাবস্যা বা পূর্ণিমার কোন এক তিথিতে নূতন বিষদাঁত গজায়। এদেশে জোর প্রবাদ আছে যে, সাপুড়িয়াকে সর্পের হাতেই প্রাণ দিতে হয়।

সুন্দরবনের মানুষ সর্প, ব্যাঘ্র, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া আছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন ঃ

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি!"

অন্য একটি প্রবাদ আছে, "বাঘের দেখা, (আর) সাপের লেখা।' সুন্দরবনের এহেন বিভীষিকাময় হিংস্র সরীসৃপও মানুষের কাছে ধরা পড়ে। এখানেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণিত হয়।

খুলনায় রুস্তম নামক একজন সর্প যাদুকর বিষধর সর্প কাঁচা এবং জীবন্ত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বহু লোক রুস্তমকে সর্প ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছে। এইরূপ অদ্ভুত সর্প যাদুকর দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় নাই। বিষধর সর্পের আবাসস্থল হইতে সে অতি সহজে উহা ধরিয়া আনিতে পারে। সর্পের সঙ্গে খেলা করাই রুস্তমের দৈনন্দিন কার্য। সর্প ধরা ও সর্প ভক্ষণের নেশায় সে উন্মত্তপ্রায়। লোকে রুস্তমের সর্প ভক্ষণ দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যায়। সংবাদপত্রে সর্প যাদুকর রুস্তমের সর্প ভক্ষণের চাঞ্চল্যকর ও বিচিত্র কাহিনী বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। অভিনব জীবনালেখ্য এই ব্যক্তির।

একজন সুন্দরবনের সাধারণ সর্প শিকারীকে ব্যাঘ্রে উদরস্থ করার কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পিতা ও পুত্র শরণখোলা ফরেষ্ট অফিস হইতে আদেশপত্র লইয়া টাইগার পয়েন্টে উলুখড় সংগ্রহ করিতে যায়। বাড়ী ফিরিবার পথে একটি বৃহৎকায় মৃন্ময়পাত্রে বার ফুট লম্বা একটি বোড়া (পাইথন) সর্প ধরিয়া আনে। বৃদ্ধ কৃষক বেআইনীভাবে সর্প শিকার করিয়াছে, সেজন্য তাহাকে গ্রেফতারের ভয় দিলে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে, আমি এই সর্প ধরার বিষয় কিছুই জানি না। অন্য একটি লোকে ধরিয়া এই মৃন্ময়পাত্রে আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছে মাত্র। দোহাই বাবাজী, আমি যদি মিথ্যা কথা বলি তবে আমাকে যেন বাঘে ভক্ষণ করে। লোকটি দায়ে পড়িয়া মিথ্যা বলিয়াছিল।

উক্ত সর্পটি একটি বৃহৎ কাঠের খাঁচার মধ্যে পুরিয়া লাহোর চিড়িয়াখানায় প্রেরণ করা হয়। পিতা ও পুত্র খড় সংগ্রহের জন্য পুনরায় জঙ্গলে যায়। কয়েকদিন পরে দেখা গেল পুত্রটি একাকী নৌকায় ফিরিয়া আসিতেছে এবং পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার পিতাকে জঙ্গল মধ্যে খড় কাটিবার সময় বাঘে ধরিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। মিথ্যা বলার এই পরিণতি।

তারকেল বা গুইসাপ সুন্দরবনের একটি বিশিষ্ট অর্থকরী সম্পদ। একশ্রেণীর দুঃসাহসী মানুষ ফাঁসি দ্বারা বা স্বহস্তে গুইসাপ শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। সম্প্রতিকালে গুইসাপ শিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। গুইসাপকে বনের লোকেরা তারকেল বলে। এই জন্তু শিকারে কোন আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বহু দরিদ্র লোক গোপনে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া গুইসাপ ধরে।

দলবদ্ধভাবে মধ্যে মধ্যে বনাঞ্চলের মানুষ গুইসাপ শিকার করে। কোন কোন সময় শিকারী দলে পঞ্চাশ বা ততোধিক লোক থাকে। বিগত ১৯৫১-৫২ সালে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইলে বহুলোক বানর, গুইসাপ ও হরিণ ধরিয়া জীবিকা অর্জন করিত। বহুলোকের হুল্লোড়ে বনভূমি প্রকম্পিত হইত। ইহাতে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য জানোয়ার ভীত হইয়া দ্রুতবেগে অন্য জঙ্গলে আশ্রয় লইত। শিকারীদের আক্রমণে গুইসাপ ও হরিণকুল নদীমধ্যে পড়িয়া যাইত। লোকে হাঙ্গর কুমীরের ভয় না করিয়া হরিণ ধরিয়া বাড়ী আনিয়া গো-শাবকের ন্যায় গোয়ালে বাঁধিয়া পরে বিক্রয় করিত। একই সঙ্গে লোকে গুইসাপ ও হরিণ শিকার করিয়া সংসার চালাইত।

বুনোদের কথা : বুনো শব্দের অর্থ বনের মানুষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা বনের আদিম বাসিন্দা নহে। সুন্দরবনে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাঁওতালদের ন্যায় বুনোদের বসতি আছে। সুন্দরবনের বুনোরা কঠোর পরিশ্রমী। শিক্ষার আলোক আজিও এই সমাজে প্রবেশ করে নাই। ইহারা সমাজের নীচের তলার মেহনতী মানুষ।

বুনোদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা আছে। তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য আছে। তাহারা কৃষিকাজ করে, নৌকা চালায় এবং মৃত্তিকা খনন করে। বুনো কৃষক

ধান্যরোপন করে, কিন্তু জমি চাষ করে না। পুরুষের ন্যায় বুনো নারীরা কঠোর পরিশ্রমী। শাশুড়ী, ননদ, নববধূ সকলেই এক সন্ধে জমিতে কার্য করে। তাহারা মৎস্য ধরে, বড় বড় বোঝা বহন করে এবং জন্দ্বল হইতে কাঠ সংগ্রহ করে। পুকুর খনন, বাঁধবন্দী ও রাস্তা নির্মাণের কার্যে বিশেষ দক্ষ। ধান্যরোপন, কাটা ও বহন করা ইহাদের স্বাভাবিক কাজ।

বুনো নাবীরা নৌকা চালাইতে পারে। বুনোরা নিজেদের মধ্যে স্বজাতিয় ভাষায় কথাবার্তা বলে। ঝগড়া করার সময় তাহাদের কথা বুঝা মুশ্কিল। উহাদের ভাষাকে বুনো ভাষা বলা যাইতে পারে যেমন সাঁওতালদের ভাষা সাঁওতালী। বাহিরের লোকের সন্ধে উহারা বাংলা মিশ্রিত বুনোভাষায় কথা বলে। তাহারা বাংলা বুঝিতে পারে কিন্তু শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারে না। বুনোদের প্রকৃতি অনেকটা সাঁওতালদের ন্যায়। তাহারা ধনসম্পদবর্জিত মানুষ।

বর্তমানে বুনোরা বাংলা ভাষা শিখিতেছে! তাদের মূল ভাষার নাম মুণ্ডাভাষা। স্থানীয় প্রধানকে মুণ্ডারী সরদার বলা হয়। কেহ মুণ্ডা শ্রেণীর আবার কেহ কুর্নী বা মাহাতো শ্রেণীভুক্ত।

বুনোদের নেতা ও উপনেতা আছে। তাহারা কোর্ট-কাছারী, শহর গঞ্জের সহিত এক প্রকার সর্ম্পকহীন। কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে বুনো সরদার বা নেতা উহা মীমাংসা করিয়া দেয়। নেতার আদেশ মানিতে তাহারা অভ্যস্ত। সম্পদহীন মানুষের ঝঞ্ঝাটও কম।

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে জমিদারেরা সম্পত্তির বন্দোবস্ত লইয়া কৃষিকার্য ও জন্দ্বল আবাদের জন্য রাঁচী অঞ্চল হইতে বুনোদের আনিয়া নিযুক্ত করিত। কৈখালি অঞ্চলে বুনোদের বাসভূমি আছে। বেতকাশী অঞ্চলেও বুনোদের বসবাস আছে। জমিদারেরা বুনোদের পশুর ন্যায় অন্য দেশ হইতে আনয়ন করিয়া বনের বিভিন্ন কাজে লাগাইত। বহুকাল বসবাসের পর বুনোরা সুন্দরবনের আবহাওয়ার সন্ধে মিশিয়া বনমানুষের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

বুনোদের ধর্ম কি, সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দুনীতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বনে বুনোরা সর্প, ব্যাঘ্র ও কুমীরের পাশাপাশি বসবাস করে। প্রকৃত বুনোরা দক্ষ কৃষক, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, দু'মুঠা অন্ন ঠিকমত তাহাদের ভাগ্যে জোটে না।

কৈখালি অঞ্চলের বুনোদের কৃষ্টি অন্যান্য অঞ্চলের কৃষ্টি হইতে পৃথক ধরনের। এই সমাজে সংসার নির্বাহের দায়িত্ব নারীদের উপর। বিবাহের সময় অদ্ভুত এক প্রথা ইহাদের মধ্যে চালু আছে। হিন্দুর বিবাহে সাত পাক ঘুরিতে হয়। কিন্তু ইহাদের তদরূপ কোন নিয়ম নাই।

বিবাহের শুভলগ্নে উত্তম পোষাক পরাইয়া বরকে গৃহের চালার উপর উঠাইয়া দেওয়া হয়। এদিকে কনেকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার সখিদের সঙ্গে নীচে মৃত্তিকাপরি বসাইয়া রাখা হয়। বুনো সরদার ও আত্মীয়স্বজন বিবাহ মজলিশে উপস্থিত থাকে। বিবাহ সম্পন্ন হইবার প্রাক্কালে বর গৃহের চালার উপর হইতে বলে, "আমি পড়ে মরবো।" উহাদের নিজস্ব ভাষায় এই কথা বলা হয়। কনের তখন মুখ ফুটিয়া যায়। সে বলে, "তুমি মরোনা, আমি তোমাকে কামাই করে খাওয়াব, তোমাকে কোদালি করে খাওয়াব।" ঘরের চালা হইতে বর অবতরণ করিলে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

বুনোরা নানা প্রকার অখাদ্য ও কুখাদ্য খায়। সাঁওতালরা খায় তাড়ি আর বুনোরা খায় কাজিয়া। কাজিয়া বা পচা ভাতের পানি পান করিয়া তাহারা নেশায় বিভোর হইয়া থাকে। মাছ ভাত ছাড়া তাহারা ইঁদুর, কচ্ছপ ও কাঁকড়া ধরিয়া রান্না করিয়া ভক্ষণ করে। ইঁদুর বুনোদের প্রিয় খাদ্য। তাহারা যত্নের সহিত শূকরের মাংস ভক্ষণ করে এবং সুন্দরবন হইতে বন্যবরাহ শিকার করিয়া অন্যত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। ইঁদুরকে বুনো ভাষায় মুসা বা গুড় বলা হয়।

বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি এই বুনোসমাজের। বিবাহ ও পার্বণাদি উপলক্ষে তাহারা নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া পড়ে। বুনোরা মাদল বা দুঘাং নামক এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নৃত্য গীতের আসর জমায। তাহারা বিশিষ্ট ধরনের স্ফূর্তি ও রং তামাসা করিয়া বিভিন্ন প্রকার সামাজিক উৎসব পালন করে।

বনের চাষী : সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী গ্রামের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী গরীব। একমাত্র আমন ধানের ফসল ফলে এই অঞ্চলে। কৃষকেরা বৎসরে মাত্র তিন মাস কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে। এখানকার কৃষকেরা অলস। অনেকেই লাঙ্গল চাষ করিয়া ধান্য রোপন করে, কিন্তু অন্য জেলার লোক আসিয়া পাকা ধান কাটিয়া দেয়।

কৃষকেরা ধান্যের পাতা সৃষ্টি করে এবং জোয়ার ভাটার সময় পানির মধ্যে লাঙ্গল চাষ করে। এই ধরনের চাষ খুব কঠিন। মহাজন ও জোতদারেরা এখানকার সর্বেসর্বা। সুন্দরবনের সম্পদশালী ভাগ্যবান মানুষ তাহারাই। এক বা একাধিক গ্রামের সমস্ত জমির মালিক মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি। হাজার হাজার বিঘা জমি তাহারা নির্বিবাদে ভোগ দখল করে। চাষীরা এক প্রকার ভূমিহীন।

গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা শিক্ষিত এবং সভ্য। ধান্যের আবাদ ছাড়া তাহারা সুন্দরবন ও শহরে ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। তাহাদের জমিদারী, তালুকদারী, জোতদারী বা গাতীদারী এখন আর নাই সেজন্যে তাহাদের অর্থনৈতিক পতন ঘটিবার সম্ভাবনা কম। কৃষকদের পরিশ্রমে তাহারা ধনী হইবার সুযোগ পায়।

পূর্বে মহাজনী ও সুদের ব্যবসায় কৃষকদের মধ্যে অবাধভাবে চালু থাকায় সুন্দরবনের কৃষক সমাজ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিজীবিরা বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ অপেক্ষা ধনী। তাহারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর। তাহাদের অত্যাচার কাহিনী প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া আছে। লোকে

বলে, যে, কৃষিজীবিদের নাম কাগজে লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে রুগ্ন গরুর গাত্রের সমস্ত পোকা পড়িয়া যায়।

বনাঞ্চলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমির মালিকানা থাকায় কৃষককুলকে মাসিক বা বার্ষিক বেতন বা বর্গা প্রথায় জমি চাষ করিতে হয়। এই সমাজ বৎসরে তিন মাসের অধিক খোরাকি ধান্য সংগ্রহ করিতে পারেনা। সেজন্য তাহাদিগকে সময় অসময় রুজির সন্ধানে বনের পানে ছুটিতে হয়। অভাবের তাড়নায় দরিদ্র চাষী ঘরবাড়ী পর্যন্ত বন্ধক রাখিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে।

কৃষকের ঘরে ঘরে যখন নিদারুণ অভাব দেখা দেয় তখন তাহারা ঐ সমস্ত ধনী গৃহস্থের নিকট হইতে তারা দুই তিনগুণ মুনাফার চুক্তিতে ধান্য কর্জ করে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে সাধারণতঃ অভাব দেখা দেয়। ইহাকে 'বাড়ী ধান' বা 'ধান্য বাড়ী' প্রথা বলা হয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হইলেও এখনও নানা প্রকারে দরিদ্রের রক্ত শোষিত হইতেছে। 'ধান্য বাড়ী' প্রথা গরীব চাষীদের শেষ করিয়া দিয়াছে।

কৃষককুল যখন জমিতে কাজ পায় না তখন জঙ্গলে গিয়া কাঠ, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহ কার্যে লিপ্ত হয়। অনেকে মৎস্য ধরিয়া বা মজুরী করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। অনেক সময় জঙ্গলই তাহাদের একমাত্র সম্বল হইয়া পড়ে।

কৃষকেরা বাঁধবন্দী এলাকার মধ্যে মৎস্যের চাষও করে। বেড়ীর মধ্যে মাঘী পূর্ণিমার সময় জোয়ারের সন্ধে বহু প্রকার মাছ ডিম বাচ্চাসহ বিলে প্রবেশ করে। ভাটার সময় বেড়ীর আটক পানি ছাড়িয়া দিলে সেই পানিতে এক প্রকার ফেনা জন্মে। কিছুদূর গিয়া সেই ফেনা আবার বিলে ফিরিয়া আসে। দুই জোগায় সময়মত চারিদিন এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অসংখ্য মৎস্য জন্মে। এমনও দেখা গিয়াছে যে মাছ ও পানি সমান সমান হইয়া বিল ভরিয়া যায়। ধান্য নষ্ট করিয়া অর্থের লোভে মহাজনেরা অনেক সময় মৎস্যের চাষ করে। ইহাতে মহাজনেরা ফাঁপিয়া উঠে বটে, কিন্তু দবিদ্র কৃষককুল নিঃস্ব হইয়া যায়। এই জন্য কৃষককুলকে বাধ্য হইয়া সুন্দরবনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

মোলঙ্গী, কাগচী, ঢালী ও সানা : মোলন্দী, কাগচী প্রভৃতি বংশীয় লোকের সহিত সুন্দরবনের যোগসূত্র ঘনিষ্টভাবে গ্রথিত। এককালে সুন্দরবনে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হইত এবং বহু লোক বারমাস সুন্দরবনে অবস্থান করিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। তাহারা লবণ প্রস্তুতের জন্য পাকা চুল্লি নির্মাণ করিত। সুন্দরবনের যত্রতত্র অসংখ্য লবণ তৈয়ারীর ভাড় বা মৃন্ময়পাত্র পাওয়া যায়। ঐ পাত্রকে মোলন্দা বলা হইত এবং এই মোলন্দার দ্বারা যাহারা ব্যবসায় করিত তাহাদেরই উপাধি হইয়াছিল মোলন্দী। লবণ শিল্পে মোলন্দীরা বিশেষ লাভবান হইত। এ বিষয় অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মোলন্দীরা সুন্দরবনের প্রাচীনকালীন বাসিন্দা। তাহারা নদী অঞ্চলে সাময়িক ঘরবাড়ী তুলিয়া বসবাস করিত। গ্রামাঞ্চল হইতে দাদন দিয়া শ্রমিকদিগকে সুন্দরবনে লইয়া কাজে লাগাইত। এখনও বহু মোলন্দী উপাধিধারী লোক বনাঞ্চলের অধিবাসী।

মোলঙ্গীদের ব্যবসায় না থাকিলেও সুন্দরবনের বহু লোক এখনও লবণ তৈয়ার করে। ঐ লবণ নিজেরা খায় এবং বিক্রয় করে। তবে পূর্বের ন্যায় রপ্তানীযোগ্য লবণ প্রস্তুত সম্ভব হয় না। নদীতীরে গর্ত খুঁড়িয়া নোনা পানি ভরিয়া দেওয়া হয়। সেই পানি একটা নালা বহিয়া অন্য আর এক নির্ধারিত স্থানে অপসারিত করা হয়। পানির মধ্যে খড়কুটা নিক্ষেপ করা হয়। উহা ব্লটিং কাগজের ন্যায় কার্য করে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় উত্তম লবণ পাওয়া যায়। বনের লোকেরা লবণ পরিষ্কার করার উপায় জানে। লবণে দানা হয় না। কিন্তু উহা বেশ সাদা হয়। এই ভাবে মিহি লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। গাবুরা অঞ্চলে মৃন্ময়পাত্রে পর পর সাজাইয়া রাখিয়া অভিনব প্রক্রিয়ায় লবণ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি।

সে যুগে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে কাগজ প্রস্তুত হইত। কি প্রকারে উহা প্রস্তুত হইত জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ গেউয়া কাঠ দ্বারা পূর্বে ও কাগজ প্রস্তুত হইত। যাহারা কাগজ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জন করিত তাহাদিগকে কাগচী বা কাগজী বলা হইত। কাগজীরা এখন ধান্যক্ষেত আবাদ এবং অন্যান্য কার্য করে।

সুন্দরবনের পার্শ্বে ঢালী উপাধিধারী বহু হিন্দু-মসুলিম বসতি বিদ্যমান। যাহারা ঢাল সড়কী দ্বারা যুদ্ধ করিতে পারদর্শী ছিল তাহাদিগকে ঢালী আখ্যা দেওয়া হইত। ঢালীরা সুন্দরবনের নদীনালায় মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের সন্দে যুদ্ধ করিয়া দেশ রক্ষা করিত। সে যুগে ঢালীরা নৌকায় ঢাল, সড়কী, তলোয়ার লইয়া শত্রুর মোকাবিলা করিত। এখনও গ্রামাঞ্চলে ঢাল সড়কী খেলাকে ঢালী খেলা বলা হয়। প্রতাপাদিত্য প্রসন্দে ঢালী সৈন্যদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ঢালীদের এখন আর সে দুর্জয় প্রতাপ নাই। বনাঞ্চলের শ্যামল শষ্যক্ষেত, নদ-নদী, সুন্দরবনের বৃক্ষলতা বেষ্টিত স্থানের আর্দ্র আবহাওয়ায় তাহারা নিরীহ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। আবহাওয়ার প্রভাব মানব চরিত্রে বিকশিত হয়।

ঢালীদের ন্যায় গাজীরাও যোদ্ধা ছিল। মোঘলদের হস্তে প্রতাপাদিত্যের পতনকালে বহু সৈন্যসামন্ত এবং পদস্থ ব্যক্তি সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে। এজন্য একটি গ্রামের নাম হইয়াছিল গুমনতলী বা গোপনতলী। এই সময় সুন্দরবনের জন্দল কাটিয়া শিবসা নদীর অদূরে আমিরপুর প্রভৃতি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই অঞ্চলে যখন ব্যাঘ্রের উপদ্রব শুরু হয় তখন উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া বহু লোক বাগালী, আমাদী, জায়গীর মহল ও মস্‌জিদকুড় প্রভৃতি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া বসবাস আরম্ভ করে। এখনও বনাঞ্চলে জন্দল আবাদকারী মানুষের বংশধরেরা বসবাস করিতেছে। সুন্দরবনের নদী-নালা, গাছপালা, জীবজন্তু ও আবহাওয়ার সহিত তাহারা অন্দান্দিভাবে জড়িত।

গাজীরা যুদ্ধ বিজয়ের পর এই উপাধি প্রাপ্ত হইত। যাহারা নৌবাহিনীতে কাজ করিত তাহাদিগের অনেকের উপাধি হইয়াছিল বাছাড়ী। বাছাড় বা বাছাড়ী একই অর্থবোধক।

বনাঞ্চলের বাঁধ বা বেড়ীর তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রামের প্রধানদের মধ্য হইতে একজন মাতব্বর নিযুক্ত করা হইত। বাঁধ যাহাতে ঠিক থাকে সেজন্য তাঁহাকে হুশিয়ার থাকিতে

হইত। এই মাতব্বর বা কর্তা ব্যক্তিকে 'সানা' বলা হইত। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যোগ্যতার মাপকাঠিতে 'সানা' নিযুক্ত হইত। এখনও অসংখ্য হিন্দু-মুসলিম সানা উপাধীধারী লোক আছে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র : পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে এদেশের আদিম বাসিন্দা বলিয়া মনে করি। তাহারা এককালে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা ছিল। বঙ্গোপসাগরের তীরে চর পড়িয়া জঙ্গল সৃষ্টি হয়। সেই জঙ্গল আবাদ করিয়া তাহারাই সর্বপ্রথম সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করে। সুন্দরবনের সংলগ্ন বাকেরগঞ্জ ও খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অধিক ছিল। বর্তমানে সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পৌণ্ড্রগণ আর্যজাতির লোক বলিয়া দাবী করে। আর্য শব্দের অর্থ কৃষক এবং এই পৌণ্ড্রসমাজ কৃষিকার্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী। এই সমাজের লোকেরা সুন্দরভাবে জমি চাষাবাদ করিয়া ধান্যের ফসল উৎপন্ন করে। কৃষিকার্য ও জঙ্গলের সম্পদ আহরণই ইহাদের প্রথম ও প্রধান পেশা। ইহারা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। পৌণ্ড্রদের ভ্রাতৃক্ষত্রিয় বলা হয়। তাহারা 'পোদ' নামেও পরিচিত। ব্রাহ্মণ্য সমাজের নির্যাতনের ফলে এই জাতির লোকেরা নিম্নস্তরে নামিয়া আসে এবং অনুন্নত বা তপশিলী শ্রেণীভুক্ত হয়।

পৌণ্ড্রদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা আছে। ইহারা ঝগড়া মারামারির ধার ধারে না। প্রায় সকলেরই স্বভাব নিরীহ ও ভদ্র। তাহারা মোড়ল মাতব্বরের আজ্ঞাধীন। সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাহারা হিন্দু। সুন্দরবনের আবাদকারী হিসাবে পৌণ্ড্রদের দান অপরিসীম। এই সমাজের বিস্তারিত ইতিহাস গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

পৌণ্ড্রগণ নিরীহ। পক্ষান্তরে নমঃশূদ্র জাতির লোকেরা উগ্র প্রকৃতির। নমঃশূদ্রগণও ব্রাহ্মণ্য সমাজের অত্যাচারে পৌণ্ড্রদের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম ছাড়িয়া উত্তরবঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুন্দরবনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এককালে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র সমাজ সুন্দরবনের প্রাণস্বরূপ ছিল। উভয় জাতির লোকে বিল অঞ্চলে বসবাস পছন্দ করিত। উভয় জাতিব মধ্যে ঢালী, সানা, সর্দার, বাছাড, সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি উপাধিধারী লোক আছে। মণ্ডল, রায়, মল্লিক ইহাদের সাধারণ উপাধি। নমঃশূদ্র সমাজের মধ্যে ক্ষাত্রজ শক্তি প্রবল। নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

বনের অন্যান্য মানুষ : বনাঞ্চলের মানুষই কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। রৌদ্র-বাতাস, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তাহারা মানুষ হয়। একশ্রেণীর মানুষ আবার শান্তশিষ্ট। তাহাদের জঙ্গলভীতি অত্যধিক। ভীষণকায় দরিয়া ও ব্যাঘ্র-কুমীরের কথা বলিয়া শিশুদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়। রায়মঙ্গল পাক-ভারত সীমান্তের ভীষণকায় নদী। প্রলয় ঝটিকার সময় বহু নৌকা ঢেউয়ের তাণ্ডবে ডুবিয়া যায়। জোয়ারের সময় নদীতে বান ডাকে। তখন ঢেউ খুব উঁচু হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে থাকে। উহা স্বচক্ষে না দেখিলে উহার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা সুকঠিন। সেইজন্য বনাঞ্চলের অধিবাসীরা ছেলেদের ভয় দেখাইয়া বলে :

বাবা তুমি বাড়ী থেকে দুধভাত খাও—
পোঁদের ঝালভাঙ্গার দরকার হ'লে রায়মঙ্গল যাও।

সুন্দরবনের জঙ্গলে একদল লোক শঙ্খ, জোংড়া, ঝিনুক ও কস্তুরী সংগ্রহ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। মধু আহরণকারীর চক্ষু উপরদিকে পক্ষান্তরে শঙ্খ সংগ্রহকারীর চোখ থাকে নীচের দিকে। জোয়ারের সময় শঙ্খ ইত্যাদি খাল নালায় জমা হয়। ভাটার সময় মানুষ কর্দমাক্ত স্থানে ঘুরিয়া উহা সংগ্রহ করে। খালের মধ্যে মানুষ এবং পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ব্যাঘ্র।

একবার এক ব্যক্তি খালের মধ্যে শঙ্খ কুড়াইতেছিল। ব্যাঘ্র সহজ শিকার মনে করিয়া তীর হইতে লম্ফ দিয়া ঐ ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। কর্দমাক্ত স্থানে পড়িয়া উহার পদচতুষ্টয় আটকাইয়া যায়। ব্যাঘ্র আর উঠিতে পারে না। তখন লোকটি "কুই" দিয়া বিপদ সংকেত দিলে সঙ্গীরা আসিয়া বীরদাপটে কর্দম নিপতিত ব্যাঘ্র তাড়াইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে।

শঙ্খের ন্যায় জোংড়া, ঝিনুক ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া কিছু কিছু লোক অর্থ উপার্জন করে। এই সমস্ত জিনিষেরও প্রাণ আছে। নৌকায় আনিয়া উহা স্তুপাকারে পচানি দেওয়া হয়। পরে শুকাইয়া গেলে চুন প্রস্তুতের জন্য বিক্রয় করা হয়। সমুদ্র তীরে মানুষ সমুদ্রের ফেনায় গঠিত শক্ত পদার্থও সংগ্রহ করে।

বাদাবনের মানুষ নির্ভয়ে জঙ্গলে চলাফেরা করে। কৈখালির সন্নিকটে কালিঞ্চি বাদা সীমান্ত পারেই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা। কালিঞ্চি গ্রামের আশে পাশেই জঙ্গল। একটি মাত্র বেড়া, জঙ্গল ও লোকালয়ের সীমা নির্দেশ করিতেছে। এই গ্রামের লোকে গ্রাম্য বৃক্ষে আরোহণ করিয়া হরিণ শিকার করে। ধান্য পাকিলে হরিণ ও শূকরে ধান খাইয়া যায়।

একবার কার্যোপলক্ষে আমার এক বন্ধু ঐ গ্রামে গমন করেন। একটি লোক তাঁহাকে একখানি ডিঙ্গি নৌকায় একটি ক্ষুদ্র খালের মধ্য দিয়া জঙ্গলে লইয়া যায়। খালের দুই তীরেই গাছ-পালা বেষ্টিত জঙ্গল। বন্ধুটি জঙ্গল দর্শনে ভীত হইয়া লোকটিকে বলিলেন ঃ "দোহাই তোমার, আমাকে জঙ্গলে নিও না, বাঘ আছে, আমাদের কাছে বন্দুক নাই, ইত্যাদি। লোকটি হাস্যভরে আরও কিছুদূর গিয়া বলিল, "হাতে বৈঠা আছে, এদিয়ে বাঘকে সাবাড় করে দেব। আর বাঘও আছে আমরাও আছি। গ্রামের ওমুক ব্যক্তিকে বাঘে নিয়াছে, ওমুক সময় ওমুক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ওসব আমরা জানি, বাঘের ভয় করলে এদেশে বাস করা চলে না। জীবনে কত বাঘ ঠেকালাম। এখনও আমাদের গ্রামের ওমুকের কাঁধে বাঘের কামড়ের দাগ আছে।" বনের মানুষের সাহস ও মনোবল স্বভাবগত। এখানকার মেয়েরা পর্যন্ত বন হইতে জ্বালানি সংগ্রহ করে। এখানকার লোকে বলিয়া থাকে ঃ

মোরা কুমীরের পিঠে চড়ি নদী হই পার,
লাঠি দিয়ে করি মোরা ব্যাঘ্র শিকার।

রামপাল থানার মধ্যে বৈদ্যমারী ও আগলদিয়া গ্রাম। ভোলা নদীর উত্তর-পশ্চিম পারে একদল লোকের বসতবাটী ছিল। নদী ভাঙ্গনে ঐসব লোক সুন্দরবনের এক চরে

৫০ বৎসর পরে উঠিয়া গিয়া বসবাস আরম্ভ করে। ইহাদের ঘরবাড়ী জন্দ্বলের সন্দ্বে একেবারেই মেশা। কোন নদী, খাল বা রাস্তা, লোকালয় ও জন্দ্বলের সীমা নির্দেশ করে না। ব্যাঘ্রে গ্রামে ঢুকিয়া মধ্যে মধ্যে গরু-ছাগল ধরিয়া লইয়া যায়। তবে কোনদিন কোনও গ্রাম হইতে মানুষ ধরিয়া লইয়া যাওয়ার কথা শ্রুত হয় নাই।

দুবলা দ্বীপের জেলেরা সুন্দরবনে থাকে। সামান্য খাল বা একটু ফাঁকা জায়গা জন্দ্বলের সহিত তাহাদের বাসস্থানের সীমা নির্দেশ করে। এখানেও ঘরে ঢুকিয়া বাঘে মানুষ ধরে না।

ব্যাঘ্রে কয়েক মাইল গ্রমের মধ্যে নৈশ অন্ধকারে ঢুকিয়া যায়। দুধলি গ্রামের তারার বাঁশতলায় একটি শিমুল বৃক্ষে ব্যাঘ্রের আঁচড় আছে। একবার পরমানন্দকাটিতে রাত্রে ব্যাঘ্র আসিয়া করাতিদের কাঠের উপর উঠিয়া ফাঁকে বসানো কাঠ মুখ দিয়া তুলিয়া ফেলিলে বাঘের পা ও লেজ ঐ ফাঁকে আটকাইয়া যায়। পরে লোক আসিয়া ঐ ব্যাঘ্র মারিয়া ফেলে। তদবধি ঐ বাড়ীর নাম হইয়াছে 'বাঘমারা-পোতা'।

দেড়শত বৎসর পূর্বের কথা। মৌতলা গ্রামের পার্শ্বে বিল শেওড়া গ্রামে জন্দ্বল হইতে বাঘ আসিয়া মানুষের গন্ধে ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। ঘরের মধ্যে একটি নবজাত শিশু ছিল। বাড়ীওয়ালা কুঠারের আঘাতে বাঘের বাঘত্ব শেষ করিয়া দেয়। এইভাবে মানুষ দায়ে পড়িয়া দুঃসাহসী হয়। অনেক সময় শিংওয়ালা গরুতে তাড়া করিলে বাঘ পালাইয়া যায়। বাঘ মনে করে গরু উহার চেয়ে শক্তিশালী।

শরণখোলা থানার বগিগ্রামে একবার বাঘে গরু আক্রমণ করে। লোকেরা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং এক ব্যক্তি নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করে। বাঘে ঘরের বেড়ায় থাবা মারিলে সকলে দা, লাঠি সহ উহাকে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে। দুইজন যুবক বাঘের পিছু ধাওয়া করিলে বাঘ হাঁ হাঁ করিয়া পাল্টা আক্রমণ করিলে তাহারা ফিরিয়া আসে।

একবার নদী পার হইয়া একদল শূকর সুন্দরবন হইতে আসিয়া ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তাড়া দিলে একটি ভিন্ন সমস্ত শূকর জন্দ্বলে চলিয়া যায়। একটি লোক হস্তস্থিত ছাতা দ্বারা শূকরের গাত্রে ধাক্কা মারিলে শূকরটির পাল্টা আক্রমণে লোকটির নাড়িভুড়ি বাহির হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

বনের কিছুসংখ্যক লোক উলুখড়, নলখাগড়া, কাশবন, হোগলা, মালিয়া সংগ্রহ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। হোগলা, ও মালিয়া দ্বারা পাটি ও মাদুর প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত লোক হস্তশিল্পী এবং মাদুর ও পাটি বয়নের সূক্ষ্ম কার্যে দক্ষ।

অসুখ-বিসুখে বনের লোকেরা জন্দ্বলের গাছগাছড়া ব্যবহার করে। হরিণ হাড়ো গাছের পাতার জাব করিয়া প্রলেপ দিলে কাটা ঘা নিরাময় হয়। কেওড়ার ফল সিদ্ধ করিয়া সরবত করিয়া খাইলে পেটের ব্যথা নিরাময় হয়। সুন্দরবনের লোকেরা বলে ঃ

যে খেয়েছে কেওড়ার ঝোল
সে ছেড়েছে মায়ের কোল।

কেওড়া ফলের অম্বল বনমানুষের সুখাদ্য। সিদ্ধ করিয়া চিনি বা লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয়। লোকে জলপাইয়ের মত কাঁচাও খায়। জ্বর আরাম হইলে গোসল করাইয়া রোগীকে কেওড়ার ঝোল খাইতে দেওয়া হয়।

সুন্দরবনের রোগ ব্যাধিরও প্রতিকার আছে। কন্টিকেরী গাছের দ্বারা সুতিকা রোগের পাচন তৈয়ার হয়। শ্বেত বাড়েলা ছোট গাছ। ইহার শিকড়ে অনেক উপকার হয়। শ্বেত আকন্দ, শ্বেত মাখাল, শ্বেত কবরী ও শ্বেত বসন্ত গাছে ঔষধ প্রস্তুত হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, শ্বেত বাড়েলা, শ্বেত কবরী, শ্বেত মাখাল ও শ্বেত আকন্দ গাছসমূহের শিকড় মাদুলী করিয়া রাখিলে সর্পে কামড়ায় না। ঐ লোকে মৎস্যের ন্যায় সর্প শিকার করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। আরও কথিত আছে যে, সর্পাঘাতের রোগীর কাছে এইরূপ মাদুলী ধরিলে বিষ নামিয়া যায়। এসব ঔষধির গাছ গাছড়া লইয়া গবেষণা করিলে সুফল পাওয়ার আশা আছে।

বনের স্থায়ী নিম্নপদস্থ কর্মচারী : সমগ্র সুন্দরবনের পাহারাদার হিসাবে বহু লোক নিয়োজিত থাকে। কোথায় চোরাশিকারী হরিণ শিকার করিতেছে, কোথায় বিনা পাশে কেহ কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রহ করিতেছে ইত্যাদি তাহারা দেখিয়া বেড়ায়। বন তাহাদের চাকুরী জীবনের চিরসন্ধী। তাহারা এক স্থানে নৌকা রাখিয়া নির্ভয়ে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে তাহারা সকলকে হুশিয়ার করিয়া দেয়। সুন্দরবনের গার্ডগণ সাহসী ও কর্মদক্ষ। ইহাদের উপর আছে দারোগা, ডেপুটি রেঞ্জার ও রেঞ্জার। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদেরই জন্দ্বলের সন্দ্বে সর্ম্পক নিবিড়। গার্ডদের সন্দ্বে পিওনরাও বন রক্ষণের কার্যে নিযুক্ত থাকে।

গার্ডদের পুলিশের ন্যায় খাকি পোশাক পরিহিত অবস্থায় কর্তব্য করিতে হয়। তাহাদের জন্দ্বলস্থ বিরক্তিকর শুলো ও কর্দমাক্ত স্থানের উপর দিয়া চলিতে হয়। জুতা পরিধান করিয়া বনে চলা অসম্ভব। কোথাও ব্যাঘ্রের আক্রমণ আশঙ্কা দেখা দিলে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। লোকে বলে খাকি পোশাক দেখিলে বাঘে আক্রমণ করে না।

বগি ফরেষ্ট অফিসে এক পিওন খাকি পোশাক পরিয়া প্রত্যহ শরণখোলা হইতে খাবার আনিয়া দিত। সে প্রায় প্রত্যহ জন্দ্বলের একই স্থানে দুইটি বাঘের বাচ্চা দেখিতে পাইত। একদিন দেখিতে পাইল বাঘিনী বাচ্চাদের দুধ পান করাইতেছে। একদিন সে অন্য প্রকার পোশাক পরিয়া সেই পথ দিয়া যায়। সেই দিন বাঘের বাচ্চা তাহাকে কামড় দিয়া আঘাত করে। চিকিৎসার পর সে আরাম পায়।

নৌকার মাঝিরা চিরদিন কঠোর পরিশ্রমে জোয়ার ভাটার সাহায্যে নৌকা চালায়। দাঁড় ও বৈঠা এবং হাইল চালনায় তাহারা অভ্যস্ত হয়। নদীনালার মধ্যে তাহাদিগকে চিরদিন অবস্থান করিতে হয়। সর্বাপেক্ষা হতভাগা জীব এই নৌকার মাঝিরা। তাহাদিগকে বোটম্যান বা বি. এম. বলা হয়। জমিজমাহীন লোকেরা নৌকার চালকের চাকুরী গ্রহণ

করে। ইহাদের বেতন সামান্য। বোটম্যানদের জঙ্গলে চলিতে হয় না। ঝড়, বৃষ্টি-বাদল ইহাদের চিরসঙ্গী। ঢেউয়ের তান্ডবের মধ্যে অতীব সতর্কতার সহিত তাহাদিগকে নৌকা চালনা করিতে হয়। জলদস্যুরা এই সমস্ত নিরীহ বোটম্যানদের উপর প্রাথমিক আক্রমণ চালায়। তাহারা জঙ্গল হইতে জ্বালানি সংগ্রহ করে এবং পিটেল বাবুদের রান্না করিয়া খাওয়ায়।

পাহারাদার, পিওন ও বোটম্যান ছাড়া লঞ্চের চালকরাও স্বল্প বেতনভোগী। তাহাদিগকেও অধিকাংশ সময় জঙ্গলস্থ নদীতে অবস্থান করিতে হয়। অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মচারীর অবস্থাও সন্তোষজনক নহে।

পীর-বোজর্গ ও দেবদেবী : সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষ কুসংস্কারান্ধ এবং আজগুবি ও মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে। পীর বদর ও গাজী সুন্দরবনের আরাধ্য পীর। লোকে বিপদে আপদে তাহাদের দোহাই দেয় এবং সর্বপ্রকার সাহায্য কামনা করিয়া থাকে। নৌকার নঙ্গর খুলিলে গাজী ও পীর বদরের নাম স্মরণ করে। লোকে বলে ইহাদের নাম করিলে জঙ্গলে মানুষ বিপদমুক্ত থাকে। ভয়সংকুল নদীপথে লোকে বলে "আমরা আছি পোলাপান, গাজী আছে নিঘাবান, পাঁচপীর বদর বদর।" আল্লা নবীর নামও স্মরণ করে।

বনের লোকে গাজী কালুর পীরত্বে বিশ্বাস করে। গাজীর নামে সিন্নি মানত করে। হিন্দু-মুসলিম সকল জাতির লোক গাজীকে ভক্তি করে। মুসলমানেরা আল্লার দোহাই দেয়। হিন্দুরা মা মনসা, গঙ্গাদেবী, জাহ্নবী প্রভৃতি দেবদেবীকে স্মরণ করিয়া থাকে।

বনের সর্বোপরি দেবতা মা বনবিবি জোহরা। তাঁহার নামে পুঁথি আছে। বনবিবিই প্রকৃত বনদেবতা। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গাজী কালু অধ্যায়ে আমরা বনবিবি ও গাজী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। হিন্দুদের আর এক দেবতা দক্ষিণ রায়। রায়মঙ্গল কাব্যে তাঁহার প্রশস্তি আছে।

বনবিবির রোমাঞ্চকর কাহিনী লোকে বিশ্বাস করে। মা বনবিবির নামে তাহারা জঙ্গলে মোরগ মুরগী ছাড়িয়া দেয়। লোকে বলে দুর্বল মানুষকে রক্ষার জন্য বনবিবি আছেন। বনবিবির মানসপুত্র ধোনাই মোনাই ও দুঃখের কাহিনী গানের সুরে গীত হয়। এ সর্ম্পকে বহু লোকগাথা আছে।

হিন্দুরা গাজী, বনদেবী, মা মনসা ও গঙ্গাদেবীর নামে জঙ্গলে পাঁঠা বলি দিয়া থাকে। গভীর জঙ্গলে ধুমধামের সহিত বহুদিন পূর্বে একদল লোক পাঁঠাবলি দিয়া উৎসব করিয়াছিল। জেলেরা বনবিবি ও গাজীর নামে ঘর নির্মাণ করিয়া রাখে সেকথা অন্যত্র বলিয়াছি। তাহারা বিশ্বাস করে বনবিবির দোয়া এবং শক্তিধর বীর গাজীর প্রতাপের কাছে বাঘ আসিবে না।

সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকির : বনের লোকে বলে জঙ্গলে সংসারত্যাগী মানুষ সাধনা করে। সাধনা করিতে করিতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিজেদের বিলীন করিয়া দেয় বা শুদ্ধি লাভ করে। অবশ্য সুন্দরবন ভ্রমণে আমরা এই ধরনের কোন সাধুর সাক্ষাৎ পাই নাই।

যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুন্দরবনের বিখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারী পচাব্দী গাজীর এক বর্ণনায় জানা যায়ঃ

—বিশ বছর আগের কথা। রায়মন্দ্বল নদীর পার্শ্বে দাইর গাঙ। ভীষণ জন্দ্বলাকীর্ণ স্থান। সেই জন্দ্বলে দিনের বেলায় এক সাধুর সন্দ্বে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সাধু স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। ঈশারা করে আমাদের ডাকছে। সাধুকে আমরা নৌকায় তুলি। সে বাক্‌শক্তিরহিত। চেষ্টার পরও কথা বলানো গেল না। তাকে গ্রামে এনে রাখি। তার চুল ও নখর লম্বা। কয়েকদিন পরে সাধুর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। গ্রামের লোকেরা হতবাক হয়ে যায়।

—আর একবার সুপতির জন্দ্বলে দিবা চার ঘটিকার সময় দেখলাম এক সন্ন্যাসী। তার পরনে ধুতি এবং গলায় মালা, উহা কাঠ বা বৃক্ষের ফল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। সন্ন্যাসীর গাত্রের বর্ণ শ্যাম, কোন জামা নেই। হাতে দেড় হাত লম্বা একখানি রোলার বা লাঠি। সাধু খাল পার হয়ে এসেছে এবং আমাদের কাছে এসে আবোল তাবোল প্রশ্ন করতে থাকে। সে বলে চান্দেশ্বরে তার ঘর আছে, সেখানে যাবে, ইত্যাদি। গহীন জন্দ্বলে এই সাধুকে দেখে আমরা ভয় পেলাম। বললাম এই পথে যাও। এই কথা বলেই আমরা ভয়ে সরে পড়ি। আর কোনদিন কোথাও এরূপ দেখি নাই।

পাইকগাছা গ্রামের প্রবীণ শিকারী গাজী বাহাদুর আলী। তিনি বানরের ডাক অবিকল নকল করিয়া একঝাঁক হরিণ একত্রিত করিতে পারিতেন। ৫০ বৎসর পূর্বে তিনি জনৈক জমিদারের সহিত মাঝি মাল্লাসহ পান্‌সি সাজাইয়া জন্দ্বল যাত্রা করেন। তিন ভাটার পথ চালাইয়া সমুদ্রতটে দুবলার চটিতে নৌকা নন্দ্বর করা হয়। এই অশীতিপর বৃদ্ধ লেখকের নিকট যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিতেছি ঃ

—সকাল বেলা একটি হরিণ মেরে রান্না করে খেয়ে সবাই নৌকায় ঘুমাই। আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। জন্দ্বলের ফাঁকের মধ্যে একটি পেয়ারা গাছের তলায় যেয়ে দেখি অনেকগুলি পাকা পেয়ারা পড়ে আছে। উহা খাইতে সুস্বাদু।

—পেয়ারা খেয়ে গাছের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ি। বন্দুক বুকের ওপর রেখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি। ইতিমধ্যে একদল হরিণ এসে দুবলা ঘাস খেতে থাকে। চড়চড় শব্দ শুনে জেগে দেখি সামনে প্রকান্ড সিন্দ্বেল। গুলি করার সন্দ্বে সন্দ্বে পড়ে গেল। হরিণ পড়ার সন্দ্বে সন্দ্বে এক শুভ্রবেশধারী বৃদ্ধ সাধু ফকিরকে দেখি। সাধুর হাতে তালের আটির হুকো। সেই সাধু আমাকে গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "তুই কেন আমার পোষা হরিণ মারলি"? আমি শিকারী তাই মারছি, উত্তর দিলাম। সাধু আবার বললেন, তুই এত জোর করিস! আমার হরিণ মারিলি? তোকে বাঘ দিয়ে খাওয়াব। উক্ত সাধুর চোখ দিয়ে যেন লাল রক্ত বাহির হচ্ছিল। সাধু বললেন ঃ তোর বাবুর বন্দুকের পাশে দুবলার চর লেখা নাই। আমি তাঁকে গুলি করার ভয় দি। সাধু বললেন, তোর বন্দুকের গুলি কি গায়ে লাগবে। মনে করেছ বন্দুক দিয়ে বুঝি সব মারা যায়।

—এইসব কথা শুনে আমার ভয় হলো। আমি করজোড়ে অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইলাম। সাধু তখন সন্তুষ্ট হয়ে বললেন ; এখন হরিণ কি করিবি? আরও বললেন— মরা হরিণ দিয়ে আমিই বা কি করবো। তুই নিয়ে যা।

—তোর আর হরিণের দরকার আছে কি? সাধু জিজ্ঞেস করলেন। আর একটি পাশের জঙ্গলের মধ্যে আছে, মারতি পারলি যা!

—অতঃপর সাধু বললেন, যাও ওপারে ঠাকুরানীর চরে। সেখানে একটি খোড়া হরিণ আছে। সেটি নিয়ে যাও। নদীতে নৌকায় বসে মারবা। তখন সেখানে গিয়ে দেখি সেই চিহ্নিত হরিণ এবং উহাকে গুলি করে মারি।

—বিদায়কালে সাধুর নিকট করজোড়ে নিবেদন করলাম। জঙ্গলে বিপদ ও ভীতি। এখানে যাতে ভবিষ্যতে কোন বিপদ না হয় এবং নির্ভাবনায় জঙ্গলে উঠতে পারি এমন কিছু শিখিয়ে দিন।

—সাধু ফকির জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কাছে কাগজ পেন্সিল আছে? থাকে ত লিখে নে। কোরানের একটি মহান সুরার কথা বলে দিলেন। তদবধি ঐ সুরা পবিত্র মনে পাঠ করে জঙ্গলে ঢুকি। কোন দিন আর বিপদে পড়িনি।

দেও-দানো-ভূত ও তন্ত্রমন্ত্র : বনের অধিকাংশ স্থান জনশূন্যতার শোচনীয় নিদর্শন । সুন্দরবনে লোকে জীনপরী, ভুতপ্রেত, দেও-দৈত্য ইত্যাদির কল্পনা করিয়া থাকে। নানা রূপ অশরীরী প্রাণীরও কল্পনা করা হয়। সমস্তই কুসংস্কারান্ধ মনের উদ্ভট ও মনোজ্ঞ কল্পনা। ব্যাঘ্রের আক্রমণ ভয়ে লোকে ফকির ও ওঝা সন্দে রাখে, তন্ত্রমন্ত্র জপ করে। ওঝা বা গুনীন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যখন বাঘ চালান দিতে পারে না তখন ছুতানাতা কৈফিয়ত দিয়া প্রবোধ দেয়। কোরানের আয়েত পড়িয়াও বাঘ তাড়াইয়া দেওয়া হয়। জঙ্গল যাত্রীরা পীর ফকিরের নিকট হইতে রুমাল পড়িয়া কাছে রাখে।

কুসংস্কারান্ধ লোকেই জঙ্গলে কাজ করে। সুন্দরবন একটি মন্ত্রতন্ত্রময় রাজ্য। কথায় কথায় মন্ত্রের বাড়াবাড়ি। বিশেষ ভঙ্গির সহিত উহা উচ্চারিত হয়। মন্ত্রবলে তাহারা স্থান বন্ধ করে এবং তাহাদের বিশ্বাস সেখানে কোন হিংস্র জন্তু প্রবেশ করিবে না। খিলন মন্ত্রবলে এমনভাবে বাঘের দাঁতে দাঁতে খিল লাগাইয়া দেওয়া হয় যে, সে আর হাঁ করিতে পারে না। অজ্ঞ লোকেরা উহা সরল অন্তকরণে বিশ্বাস করে।

বাওয়ালীরা দানো-ভূতের ভয় করে। বাঘ অপেক্ষা কল্পিত দানোর ভয় কম নহে। হিংস্র মানুষখেঁকো বাঘকে দানো আশ্রয় করিয়াছে এইরূপ কেহ কেহ বিশ্বাস করে। তাহাদের মতে তন্ত্রমন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন কৌশলেই এই সমস্ত দানো পাওয়া বাঘের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় নাই।

"পোড়ো" বা "পাঠো" ভূত সংঘাতিক ভয়াবহ। সুন্দরবনের অজ্ঞলোকে বিশ্বাস করে যে, যে সমস্ত মানুষ ব্যাঘ্র বা কুমীরের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাহারা "পোড়ো" বা "পাঠো" ভূত বলিয়া চিহ্নিত হয়। তাহারা নাকি খুব দুর্ধর্ষ দানো বা ভূতরূপে পরিণত

হয়। দুর্বলচেতা বাওয়ালীরা এই ধরনের ভূতের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণে অবাক হইয়া যায় এবং ভীত হইয়া পড়ে। তাহারা মন্ত্রবলে ভীষণকায় পোড়ো ও পাঠো ভূত হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে।

অন্ধ বিশ্বাসের জন্য গ্রাম্য ধূর্ত গুণীনদের প্রভাব সুন্দরবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় ইহাতে সুফলও ফলে। মন্ত্রতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই মুর্খ ও অজ্ঞলোকে সুন্দরবনে কঠোর পরিশ্রম করিতে সাহস করে। নানা প্রকার মন্ত্র সুন্দরবনে প্রচলিত আছে ঃ

মা তোর সন্তান গেল বনে
থাকে যেন মনে,
বাঘ ভাল্লুক বাঁধে সব
রাখবি বাদার কোণে।
দোহাই মা বনবিবি!

অন্য আর একটি মন্ত্র এইরূপ ঃ

আকাশে তারা বন্ধন
পাতালে বারী বন্ধন
সাতষট্টি কোটি দেবতা বন্ধন
নদীতে কুমীর বন্ধন
ডান্দ্বায় বাঘ বন্ধন
আমার এই বন্ধ যদি নড়ে—
বনবিবির মস্তক ছিঁড়ে জমিনেতে পড়ে।

পূর্বে অধিকাংশ মন্ত্রে হিন্দু কৃষ্টির ছাপ ছিল। মুসলমানেরা উহা ইসলামী ভাবধারায় রচনা করিয়াছে। কথিত আছে যে, নিম্নের মন্ত্রটি পড়িয়া বাঘ চালান দিলে সেখানকার বাঘে ৪১ দিনের মধ্যে কিছুই খাইতে পারে না। লোকে বলে ৪১ দিন অতিক্রম হইলে বাঘ যাহাকেই সম্মুখে পাইবে উহাকে ভক্ষণ করিবে। মন্ত্রটি এইরূপ ঃ

হাম লোহু অ ফেছা লোহু
শানা শুনা শাহারা
হাত্তা এজা বালাগা,
আশাদ্দাহু বালাগা
আরবাইনা ছানাতা।

অনুরূপ আর একটি মন্ত্র ঃ

নাদে আলীয়ান
মাজহারেল আজায়েবে তাজেদোহু
আওয়ানাল্লাকা ফিন্নাওয়ায়েবে
কুল্লো হামমেও গামমেও
শায়েন জালী বে-আজমাতেকা
ইয়া আল্লাহু বে-নবুয়াতেকা
ইয়া আলী ইয়া আলী
লা ফাত্তা ইল্লা আলী
লা শায়েফা ইল্লা জুলফিককার।"

হিন্দুরা সর্প ধ্বংসকারী গরুড় দেবতাকে স্মরণ করে। মনসা দেবী ও আস্তিক মুনির বন্দনা করে। একটি সংস্কৃত মন্ত্র ঃ

আস্তিকস্য মুনির মাতা
ভগ্নি বাসুকিস্ততা
জরতকারু মুনি পত্নী
মনসা দেবী নমস্ততে।

হিন্দুরা এইরূপ মন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সুন্দরবনে বিপদ এড়াইবার জন্য উহা উচ্চারণ করিয়া থাকে। হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ মন্ত্র ঃ

শংকট পথে বেকট দাড়
কে আছিস ভাই পথ ছাড়
হাত আমার গরুড়
পা আমার গরুড়
গরুড় আমার সহোদর ভাই।
ধর্মের আজ্ঞে ব্রহ্মার কাছে যাই।
আস্তিক আস্তিক মুনির মাতা
জাহ্নবী মা মনসা দেবীর পদে নমস্কার।

অথবা ঃ আগে যায় দুর্গা
পিছে যায় দূত
আমি চলেছি চণ্ডির পুত

জলে কুমীর ডাঙ্গায় চলে সাপ
আমরা পঞ্চ ভাই, পথ ছেড়ে দাও,
ধর্মের নিকট যাই। ইত্যাদি।

বনের মানুষ খিলন মন্ত্রে বিশ্বাসী। ইহার দুইটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। ব্যাঘ্রের মুখ বন্ধ করার জন্য এইরূপ মন্ত্র পড়া হয়ঃ

দেবী গো মা সংগ্রাসের ঝি
উবরা রক্তে পয়দা হইছে বাঘের বাচ্চাটি
আইখ লড়ে আইখ খিলাই
লেজ লড়ে লেজ খিলাই
বত্রিশ দন্তওয়ালা জিহ্বার নাই অন্ত
—লা-এলাহা ইল
বাঘ বাঘিনীর মুখে তুলে দিলাম
বাইশ মণ লোহার খিল।"

অথবাঃ রক্তে টগবগ রক্তে কুড়িয়া
তোর মা তোরে থুইছে ধামা দিয়া মুড়িয়া।
আমাবশ্যা প্রতিপদে জন্মিয়াছে খুঁ
একই চাপ্পড়ে খিলাইলাম
টায় টাগরা আলাজী।

বনের মানুষ বিপদে পড়িলে বিশেষ ভক্তির সহিত অন্য আর একটি মন্ত্র শিখিয়া রাখে। হিন্দুদের মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে।

আকাশে বাঁধলাম আকাশ কুন্ডলী
পাতালে বাঁধলাম নাগ,
ডাইনে বাঁধলাম খান্দান ছুরি,
বামে বাঁধলাম ভূত,
এই পথে চললাম মা,
আমি জয়কালীর পুত।

জঙ্গলে মুসলমানেরা বিপদ মুক্তির জন্য এই দোয়া পড়িয়া থাকে

আয়তাল কুরছি কোরান
আল্লা মে নেঘাবান।

আগুপিছে আল্লা আবেশ্বর,
আমারে বেড়ে লাগ লোহার কেওড়
ধড় নিলে রসুল
ছের নিলে হযরত
কম্বল নিলে আলী
কেহ নাইক খালি
শাহ মুর্তজা আলী
আছিরুল্লা আলী
দোহাই খোদা!

বনের ভাষা ও লোক সাহিত্য : বনের লোকে সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় কথা বলে। উহার মধ্যে দক্ষিণ বাকেরগঞ্জ ও দক্ষিণ খুলনার আঞ্চলিক ভাষাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবন অঞ্চল বলিতে যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জ বুঝায়। সুন্দরবন পরগণার এলাকা জঙ্গলের সংলগ্ন। ইহার পূর্বে সেলিমাবাদ পরগণা। স্থানীয় অধিবাসীরাও আঞ্চলিক ও বনের ভাষার সংমিশ্রণে কথা বলে। বনের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য আছে। নিম্নে কয়েকটি জংলী শব্দ ও উহার অর্থ দেওয়া গেল।

বাদা—সুন্দরবন
গাঙ—নদী
বাগদা—এক প্রকার চিংড়ি
গুণীন—ওঝা
গোণ—অনুকূল নদী প্রবাহ
দোয়ানে—খাল
ঝরা—ঝরণা
মাদিয়া (মাদে)—দ্বীপ
বাঁক—নদীর সোজাপথ
সায় সায়—সোজাসুজি
কড়—মনুষ্য পায়ের দাগ
ঢোড়—বৃক্ষের ফাঁপা স্থান
নীল কমল—হিন্দুদের দেবতা
বাছাড়ী—লম্বা নৌকা
কাগচী—কাগজ প্রস্তুতকারী
নেমক খালাড়ী—লবণের কারখানা

সুমুদ্দুর—সাগর
ভারানী—বড় খাল
কাঠিকাটা—আদি অধিবাসী
বাওয়ালী—কাঠুরিয়া
শুলো—উর্দ্ধমুখি শিকড়
শিষে—ছোট খাল
ভেড়ী (বেড়ীবাঁধ)—বাঁধ
বা'য়ে—বাহিয়া
টান—স্রোত
ভাত সরাও—ভাত খাও
পোট, খোঁচ—হরিণের পায়ের দাগ
বনবিবি—বনের কাল্পনিক দেবতা
পীর বদর—মুসলমানের পীর
নাও (লাও)—নৌকা
মোলঙ্গী—লবণ প্রস্তুতকারী
আফালী—মৎস্যের লম্ফ প্রদান

ধুমাকল—ষ্টিমার	জাত সাপ—কেউটে
বড় মিঞা—ব্যাঘ্র	বড় শিয়াল—ব্যাঘ্র
পোড়ো—ভয়াবহ ভূত	পাঠো (পড়ো)—ভয়াবহ ভূত
বয়ার—বুনো মহিষ	গাড়া—গণ্ডার
মুড়ো—গাছের গুড়ি	ঘোগা—কাকড়ার ভেড়ীতে যে ছিদ্র করে
আগাড়ী—খালের শেষ প্রান্ত	
তারকেল—গুই সাপ	দাঁতাল—বুনো শুকোর।

স্থানীয় ভাষা সুন্দরবনে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের একাংশের গ্রাম ও নদী-নালার নাম স্মরণ রাখার জন্য নিম্নোক্ত কবিতাটি এখনও গীত হয়। ছেলে-মেয়ে আবাল বৃদ্ধ সকলেই যেন ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। ছেলেরা ইহা সানন্দে গান করিয়া বেড়ায়। নৌকাপথে সুন্দরবনের পথনির্দেশের জন্য চেঁচুয়া গ্রামের ভোলাই খাঁ বহুদিন পূর্বে উহা রচনা করিয়াছিলেন ঃ

চেঁচোর গ্রামে বাস করি খাস নবীশের মাটি
পূর্ব অংশে তু'লে দিলাম নিমাইখালীর ভাটী।
হা'ড়ে বা'সে ছোট নদী ত্রিমোহনা ভারী
সেখানেতে বা'য়ে দিলাম মনোসুখের তরী।
বাঁকের মাথায় কেদোর গাঙ জানে সর্বজনা
বাঁয়ে থাকিল দেলুটির গাঙ ডানি সোলাদানা।
মাদুর পাল্টা, হাড়র গাঙ স্রোতে বড় টান
পুবের দিকে চেয়ে দেখি তিল ডান্দার [illegible]।
তিল ডান্দার পশ্চিমে ভাই আছে গড়খালি
সেইখানেতে চেয়ে দেখি কুচিয়া আর চাঁদখালি।
কুচিয়া আর চাঁদখালি গিয়া মনে হ'ল আশা
দক্ষিণ পারে চেয়ে দেখি আলমচাঁদের বাসা।
ঘোষখালি আর ঢাকির মুখ আছরে সায় সায়
সাতুল্যার তুফান দেখে পরাণ কেঁপে যায়।
গাঙরখি, বুড় হড্ডা, নলেন রইল বাঁয়
সুতারখালির মুখে কত লাও মারা যায়,
আড়বাউনে লক্ষ্মীপ্রসাদ, ছাচ-নাংলার মুখে
কত না'য়ে চাপান থাকে অতি পরম সুখে

আড়ো শিবসা মুখে টান ক'রেরে কল্ কল্
পুবের পারে চেয়ে দেখ, কুকড়াকাটীর খাল।
মার্গির চর, বুজবুনে নজরেতে দেখি
নোন্দর ক'রলাম গিয়ারে ভাই হাত ধাবড়ার মুখী
কেউ বলে মরা ভদ্র কেউ বলে হাত ধাবড়া
রূপসার তুফান দেখেরে ভাই কাঁপে পাছার চামড়া।
আদাচাকি দিয়া কত ধূমাকল যায়,
আড়পাউড়ী দিয়া তারা আড়ো শিবসায় ধায়।
সেই যে কল মহাবল বুঝে কার সাধ্যি
ডা'ন হাতে তু'লে দিলাম চা'লো বগীর মধ্যি
বা'য় থাকলো টগিবগি দক্ষিণ মুখো হ'লাম
তিন বাঁক বা'য়ে গিয়ে নলবুনের খাল পালাম
বনেতে মা বনবিবি করেছে কি খেলা
(দেখলে) রোগশোগ দূরে যায় আর সংসারের জ্বালা
বনের মধ্যে বনবিবির কতইরে খেলা
দুই পার দিয়ে চেয়ে দেখি শুধু গোলের মেলা
মা যদি করেন দয়া তবেত আর আসিব
চা'লোবগীর কয়খান বাঁক সেইবায় গ'ণে যাব।

লোকালয় হইতে সুন্দরবনের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত শিবসা নদী ধরিয়া গ্রাম্য কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে বনাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সুন্দর রূপ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবিতায় আলম চাঁদের কথা আছে। তাহার প্রকৃত নাম আলম শাহ্ ফকির। তাহার বাড়ীখানি বহু পূর্বে নদী মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের মধ্যবর্তী রূপসা নামক স্থানে শিবসা নদীর ভয়াবহতার কথা বলা হইয়াছে।

সুন্দরবনের লোক-সাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা বর্তমান প্রসন্ধে সম্ভব নহে। তবে নদনদী প্রসন্ধে নদীর গান বর্ণনা করিয়াছি। বিভিন্ন স্থানে গ্রাম্য কবিদের রচিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া তন্ত্রমন্ত্র ও দেও-দানো সম্পর্কে বনের লোক-সাহিত্যর একটি দিক বর্ণনা করিয়াছি। বনাঞ্চলের লোক-সাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ। আঞ্চলিক ভাষার আলোচনা এ প্রসন্ধে সম্ভব নহে।

বাংলা দেশের প্রাকৃতিক কুঞ্জ নিকেতন ও সৌন্দর্য্যের রাণী এই সুন্দরবন। মানুষ তথাকার বিস্ময়কর পরিবেশ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যায়। এ সম্পর্কে তাহারা গান রচনা করে, সাহিত্য সৃষ্টি করে। কবিতা ও ছড়া রচিত হয়। ইহার ধারাবাহিক গবেষণা হইলে জাতির এই লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার হইতে পারে।

বার

আদিম যুগের ইতিকথা

যে ভূখণ্ড লইয়া ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ এবং পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহারই অধিকাংশ স্থান পুরাকালে বঙ্গ নামে অভিহিত হইত। বঙ্গ দেশের অবস্থান অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান আছে। আদিম হিন্দু ও বৌদ্ধ-জৈন যুগের ইতিহাস নাই বলিলে চলে। আমাদের নিকট যে ইতিহাসের টুকিটাকি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল। হিন্দুদের অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ চারিভাগে বিভক্ত ঃ—ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব। উক্ত ধর্মগ্রন্থে এই বৈদিক যুগের কিছু কিছু ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়, তাহারই নির্যাস লইয়া এদেশের প্রাচীনকালীন ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। শুধু ভারত উপমহাদেশের এ হেন অবস্থা নহে, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশের আদি ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

ইতিহাস লেখায় সেকালের লোক অভ্যস্ত ছিল না এবং মানুষ এখনকার মত সুসভ্য ছিল না। আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা সুন্দরবন অঞ্চল, অর্থাৎ অতি প্রাচীনকালে যে সব স্থান জুড়িয়া সুন্দরবন ছিল সেই বাকেরগঞ্জ, যশোর ও খুলনা জেলার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিয়া পাঠকগণের নিকট উহা পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিব। ইহা দক্ষিণ বঙ্গ এবং বহুলাংশে সমগ্র বাংলাদেশেরই ইতিহাস।

বঙ্গদেশ সর্বপ্রথম অনার্য জাতির বসবাস ছিল। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই আমরা বলিয়াছি যে কোন এক অজ্ঞাত অতীতকালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সর্বত্র অতল সমুদ্র ছিল এবং গঙ্গা নদীর দ্বারা হিমালয় হইতে জল আনীত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া চর ও দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। গঙ্গার শাখা পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যভাগই এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এবং এই ব-দ্বীপের পরবর্তী রাজনৈতিক নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ী। উহার পূর্বে এই স্থান প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এদেশে অষ্ট্রিকদের আগমন হয়। লাঙ্গল, চাষ, ধান, নারিকেল-সুপারি অষ্ট্রিক শব্দ। অধুনা ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, ভেড্রি বা ভেড্রী-প্রতিম মানুষই এদেশের আদিম বাসিন্দা, মোঙ্গল-দ্রাবিড় নহে। বাঙ জাতীয় লোকেরা ছিল পূর্ব-বঙ্গের প্রধান বাসিন্দা। ক্রমান্বয়ে মিশ্রজাতির সৃষ্টি হয়।

ব-দ্বীপ গঠনের পর সম্ভবতঃ আদিম যুগের লোকেরা ও অনার্যগণ বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া এতদঞ্চল আবাদ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই অনার্যগণ এতদঞ্চলে মনুষ্য বসতি গড়িয়া তুলিয়াছে। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে এই ধরনের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল ইতিহাস তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে

পারে নাই। তাহাদের ধর্ম সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। স্থানীয় অধিবাসীরা আর্যদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের ধর্ম অনুকরণ করিতে থাকে। মুসলমানদের সময় আর্যধর্মের নাম হিন্দুধর্ম হয়।

গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গম স্থলে প্রাচীনকালে বহু দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্বীপের মধ্যে নিম্নভাগ হইতে অনেক নদীরও উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে ভাগীরথীর পূর্বে ও পদ্মার দক্ষিণ দিকে চর ও দ্বীপের সৃষ্টি হইতে থাকে। হিমালয়ের গাত্র ধৌত করিয়া তুষার নিঃসৃত জলরাশি পর্বতরেণু বহন করিয়া সাগর পানে ছুটিতে থাকে এবং মৃত্তিকা ও বালির সমন্বয়ে এক প্রকার পলিমাটি নদীতীরবর্তী প্রদেশ উঁচু করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ দ্বীপ গঠনের পর ভূমি ক্রমশঃ কোথাও জঙ্গলাকীর্ণ হইত এবং কোথাও লোক বসতি গড়িয়া উঠিত। এইভাবে পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী স্থানে ত্রিকোণাকৃতি ভূমিখণ্ড আসমুদ্রবিস্তারিত হইয়া পড়ে। ইহাকেই প্রাচীনকালীন বক্ দ্বীপ এবং আমরা উহাকে ব-দ্বীপ বলিয়া থাকি। এই বক্ দ্বীপই বৌদ্ধ আমলে বগ্‌দি নামে পরিচিত ছিল এবং সেন রাজগণের সময় এই প্রদেশের নাম হয় বাগ্‌দি বা বাগ্‌ড়ি। বাগ্‌দির প্রাচীনকালীন অসভ্য বাসিন্দাদেরই বাগ্‌দি নামে আখ্যাত করা হইত। এতদঞ্চলে এখনও বাগ্‌দি জাতির বসবাস আছে। কানিংহাম বলেন যে, এতদঞ্চলের অর্থাৎ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নাম ছিল ব্যাঘ্রতটি। এখানকার জঙ্গলময় স্থানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল অত্যধিক। সেজন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপকে ব্যাঘ্রতটি বলা হইত। সেন রাজাদের আমলে এই ব্যাঘ্রতটি শব্দ হইতে বাগ্‌ড়ী বা বাগ্‌দি নামের উৎপত্তি হয়।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আকৃতি পূর্বে এত বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল না। ইহার অধিকাংশ স্থানই কাননাবৃত ছিল। "পাণিনির মহাভাষ্য পতঞ্জলী প্রাচীন আর্যাবর্তের সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া উহার পূর্বভাগে কালক বনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালক বনই বোধ হয় সুন্দরবন।" বাংলার পুরাবৃত্তের লেখক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। একথা সত্য যে গঙ্গা নদীর মোহনার পার্শ্বে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান সমূহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই জঙ্গলের নাম কালকবন হইতে পারে। বঙ্গের প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভূভাগ গঙ্গার শাখা- নদীসমূহের মোহনায় পূর্ণ এবং সেজন্যই দক্ষিণাংশ কাননাবৃত। এই সমস্ত নদীর মোহনা যত দূর সাগরে প্রবেশ করিয়াছে জঙ্গলও তত দূর সরিয়া গিয়াছে। বনের উত্তর ভাগেও ক্রমান্বয়ে জনবসতি গড়িয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়াছে এবং এখনও সময় সময় এইরূপ অপসারণ হইয়া থাকে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সর্বত্রই অসংখ্য দ্বীপ ছিল এবং ঐ সমস্ত দ্বীপ ক্রমান্বয়ে সীমারেখা পরিবর্তন করিয়া একে অন্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য সুন্দরবন ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এককালে কতিপয় দ্বীপের সমষ্টি ছিল। সাতক্ষীরা ও খুলনা সদরে বুড়ন বা বৃদ্ধদ্বীপ ছিল। চন্দ্রদ্বীপ দক্ষিণ বাকেরগঞ্জ

জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। যশোরের মহেশপুর প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া সূর্য দ্বীপ এবং সেন রাজত্বের আমলে ধীবর বংশীয় সূর্য নামক এক ধীবর ইহার শাসনকর্তা ছিলেন। সেইজন্য এই দ্বীপের নাম হইয়াছিল সূর্যদ্বীপ। আমাদের দেশের ধীবরেরা সূর্য রাজার স্বগোত্র বলিয়া রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে।

সূর্যদ্বীপের উত্তরে নবদ্বীপ, জয়দ্বীপ ও নবদ্বীপের মধ্যস্থলে সম্ভবতঃ যশোর জেলার উত্তরাংশ ছিল। আদিসূর চন্দ্রদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। বাক্‌লার অধিপতি দনুজমর্দনদেব এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে মধুদ্বীপ এবং উহার পশ্চিমে রন্ধদ্বীপ। সম্ভবতঃ বাগেরহাটের মধুদিয়া ও রাংদিয়া পরগনায় এই দুইটি দ্বীপের অবস্থান ছিল। বৃদ্ধদ্বীপের দক্ষিণে বহির্দ্বীপ বা বর্তমান বাহিরদিয়া। এখনও সুন্দরবনের মধ্যে এই ধরনের অসংখ্য দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমানে সুন্দরবনের উত্তরে যশোর খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জেলার সর্বত্র এই ধরনের অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি ছিল, উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয়।

বৈদিক যুগের গ্রন্থসমূহে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায় যে, বঙ্গ, মগধ ও চের বলিয়া তিনটি দেশ ছিল এবং এই তিন দেশের অধিবাসীগণ দুর্বল ও অসভ্য ছিল। তাহারা অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ঐত্রেয় আরণ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এতদঞ্চলের লোকেরা খাদ্য দ্রব্যের কোন বাছ বিচার করিত না এবং যাহা পাইত তাহাই খাইত। তাহারা অনেক সন্তান-সন্ততি জন্ম দিত। গোপাল হালদার বলেন যে বঙ্গদেশ তখন নানা জাতি-উপজাতির বাসভূমি ছিল। রাঢ়, সুহ্ম; বলেন যে বঙ্গদেশ তখন নানা জাতি উপজাতির বাসভূমি ছিল। রাঢ়, সুহ্ম; পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শব্দগুলি বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে বুঝাইত। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী এবং বঙ্গ বলিতে বিশেষভাবে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানকে বুঝাইত। আবার সমতট, হরিকেল প্রভৃতি সেই পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ দিকের এক একটি ভাগের নাম। ইহার মধ্যে গৌড় ও বঙ্গ শব্দ দুইটি সুপ্রাচীন এবং পাণিনিতেও উহার উল্লেখ আছে। "বঙ্গ-মগধের" উল্লেখ আছে ঐত্ররেয় আরণ্যকেও। কিন্তু সমস্ত বাংলা দেশের সাধারণ নাম 'বাঙলা' মুসলমান তুর্ক বিজেতারই দান।" ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ—"গৌড় রাষ্ট্রের অধীন অধুনা উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ এবং বঙ্গের অধীন অধুনা দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ ছিল।" দক্ষিণ রাঢ়, উত্তর রাঢ়, বাংলা, তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্রবর্ধন সবই প্রাচীন নাম। গৌড়পুর, পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্ধন তাম্রলিপ্ত, সোমপুর, বসুবিহার, বর্ধমান, পুষ্কর্ণ প্রভৃতি এদেশের প্রাচীন শহর। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, বা ইন্দ্রদ্বীপ যশোর বা মুরলীও প্রাচীন স্থান। আমাদের আলোচ্য সুন্দর বনাঞ্চল বা বাকেরগঞ্জ, যশোর-খুলনা প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়।

রঘু বংশে লিখিত আছে যে এ দেশের লোকেরা নৌকায় বাস করিত এবং ধান্যের চাষাবাদ করিত। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে তখন এদেশের

লোকেরা অসভ্য ছিল। ধর্মজ্ঞান বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না। এই সময় বঙ্গদেশের পার্শ্বেই অঙ্গ দেশের নাম শ্রুত হয়। খুব সম্ভব মহাভারতের যুগে আর্যগণ পশ্চিম উত্তর এশিয়া হইতে এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিত, সেই সমস্ত স্থান কালে তীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়, কিন্তু আর্যগণ অনার্যদেব সংস্পর্শে আসিয়া এদেশের আবহাওয়া ও সমাজের প্রভাবে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই ভাবে বঙ্গে আর্য ধর্মের প্রভাব অচিরেই লোপ পাইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য জয় করত এদেশে বসবাস করিয়া অনার্যদের উপর কর্তৃত্ব করিত। উভয় জাতির সঙ্গে আবার অনেক সময় যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে দেশে অসংখ্য লোক ক্ষয় হইত। এই ভাবে রাজ্য মধ্যে সময় সময় অশান্তি বিরাজ করিত। রাজ্য শাসনের পদ্ধতিও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। "জোর যার মুল্লুক তার"—এই নীতি তৎকালে অতিমাত্রায় প্রবল ছিল।

ব্রাহ্মণেরা তখন এদেশে আসিত না। ধর্মীয় গোড়ামির জন্য সম্ভবতঃ তাহারা এদেশীয় লোকদের সংস্পর্শে আসা সমীচীন মনে করে নাই অথবা এদেশে আসিলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে বিঘ্ন জন্মিতে পারে সেইজন্য তাহারা ক্ষত্রিয়দের ন্যায় এদেশে আসে নাই। গঙ্গা নদীর প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণেও বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের যুগে মিথিলা, পৌন্ড্রবর্ধন, অঙ্গ, মগধ, কোশল প্রভৃতি দেশের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যায়। আরও জানা যায় যে বঙ্গের অধিবাসীদের তখন নৌ-শক্তি ছিল এবং তাহারা যুদ্ধবিদ্যাও অর্জন করিয়াছিল।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বঙ্গের অধিবাসীদিগকে দাস্য বলা হইয়াছে। মহাভারতে সমুদ্র তীরবর্তী বঙ্গের অধিবাসীদের ম্লেচ্ছ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উত্তর ভারতীয়েরা বঙ্গকে 'পান্ডব বর্জিত' দেশ বলিত। ভগবৎ পুরাণে রাঢ় বা সুম্মবাসীদিগকে পাপী বলা হইয়াছে। এদেশের অধিবাসীরা কিরাত, হুণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুকাক্কাস, আভির, যবন এবং খাসাস নামে অভিহিত হইত। ভাগীরথী ও নিম্ন গঙ্গা পবিত্র স্থান ছিল। গঙ্গারিডিদের ৪০০০ যুদ্ধ হস্তী দেশ রক্ষার জন্য মোতায়েন থাকিত। ডিওডোরাস বলিয়াছেন যে গঙ্গারিডি ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজারা দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য (খৃঃ পূর্ব ৩২৫—৩২৭) ২০০০০০ অশ্ব, ৮০০০০ পদাতিক, ৮০০০ সজ্জিত যুদ্ধরথ এবং ৬০০০ হস্তী সহ অপেক্ষা করিতে থাকে।

হিন্দু জাতির মহাগ্রন্থ রামায়ণে সগর দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। সেখানে কপিলেশ্বর সাধুর আশ্রম ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। সেই সাধুর নামে এখানে একটি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা হয়। গঙ্গার এক শাখার নাম ভাগীরথী। উহা যে স্থানে সাগরের সহিত মিশিয়াছে সেই স্থানের নাম সগর দ্বীপ। এই সগর দ্বীপ চিরদিন ধরিয়া হিন্দু জাতির একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসাবে খ্যাত। মহাভারতীয় যুগে বঙ্গে আর্যদের বসতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সময় বঙ্গদেশে কোন একচ্ছত্র অধিপতি ছিল না এবং রাজ্য নানা

খন্ডে বিভক্ত ছিল। সম্ভবতঃ এদেশ তখন পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ়, দক্ষিণ বঙ্গ এবং বরেন্দ্র প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল। সমুদ্রসেন পূর্ব বঙ্গে, পশ্চিমদিকে চন্দ্র সেন এবং রাঢ়ে তাম্রলিপ্ত রাজা শাসক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার তমলুক বা তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত রাজার রাজধানী ছিল।

সাধু কপিলেশ্বরের নাম প্রাচীনকাল অবধি শ্রুত হইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন তিনি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং বঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করেন। এই প্রাচীন স্থান সাধুর নামানুসারে তদীয় পীঠস্থান কপিলমুনি নামে খ্যাত। কপিলমুনি খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র। কপিলমুনিতে একটি বৌদ্ধ আশ্রম ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কপোতাক্ষী নদী তীরে এই প্রাচীন স্থান এখনও উহার পূর্ব গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দক্ষিণ খুলনার আমাদী বেতকাশী এবং বাগেরহাটের উত্তরে পানিঘাটও প্রাচীন স্থান। প্রাচীনকালে জঙ্গল মধ্যে এই সমস্ত জনপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল। পানিঘাট গ্রামে মৃত্তিকার নিম্নে বা জঙ্গলের মধ্যে একটি অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এই দেব মূর্তি অতীব প্রাচীন এবং আদিম যুগ হইতেই বিদ্যমান আছে। এই মূর্তি সম্পর্কে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে, কিন্তু উহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিগত ইং ১৯৬১ সালের মে মাসের ভয়াবহ ঝড়ে চিতলমারী গ্রামের সন্নিকটে খড়মখালিতে একটি অতিকায় বট বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। উহার নিম্নে মাটির তলদেশ হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে। কোন্ কালে ঐ হিন্দু দেব মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল উহার সঠিক তথ্য নির্ণয় করা অসম্ভব।

পানিঘাট সম্পর্কে আবদুল করিম বিশ্ববাণী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে পানিঘাট হইতে পশরের পার্শ্ববর্তী কুড়ানতলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ এককালে জলমগ্ন ছিল। পানিঘাট হইতে কুড়ানতলা পর্যন্ত পারাপারের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ঐ জলমগ্ন স্থান অতিক্রম করিতে খেয়া নৌকায় একদিন সময় লাগিত। জনাব আবদুল করিম বলিয়াছেন যে বর্তমান পুরোহিতদের পূর্ব পুরুষ রাজীব লোচন চক্রবর্তী সেন রাজগণের রাজত্ব কালে পানিঘাটের এই মূর্তি নদী গর্ভ হইতে উদ্ধার করেন। ইহা কষ্টি পাথরের উপর খোদিত মূর্তি। পানিঘাটে কে কবে এই দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন সঠিকভাবে বলা দুষ্কর। খড়মখালির প্রতিমূর্তি প্রস্তর নির্মিত চতুর্ভূজ বিষ্ণু মূর্তি। উহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম খোদিত আছে।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি গয়ার নিকট নিরঞ্জনা নদীতীরে সিদ্ধিলাভ করেন। এইজন্য উক্ত স্থানের সন্নিকটে বিহারের অন্তর্গত পাটলিপুত্র, নালন্দা প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম সর্ব প্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই স্থান হইতে বঙ্গদেশ খুবই নিকটবর্তী। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে দেখা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধদেব এ দেশে

আসিয়া স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণ বঙ্গে সুন্দরবন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের বাণী বঙ্গদেশ হইয়া ব্রহ্ম ও সিংহলে গিয়াছিল। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে এই সময় বৌদ্ধদের বসতি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। দীঘি খননের সময় পীর খানজাহান আলী মৃত্তিকার নিম্নে যে বুদ্ধ মূর্তি পাইয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করাইয়া দেয় যে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃত ছিল। ভরতভয়না ও আগ্রার স্তূপ এবং বারবাজারে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ এদেশে আর্য সভ্যতার পত্তন হয়। উহার পূর্ব হইতে এতদঞ্চলে অনার্যগণ ও আদিম অধিবাসীরা সমুদ্র তীরে ও সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাস করিত। রাহুল সাঙ্কৃত্যায়ন রচিত "ভোলগা থেকে গন্ধা" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে আর্য জাতির আগমনের পূর্বে শুধু অনার্য জাতির বসবাস ছিল না। তাঁহার লেখনী হইতে আরও জানা যায় যে, প্রাক্ আর্যগণ এদেশে আর্য জাতির বহু পূর্বে সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রাক্ আর্য সভ্যতার বিষয় আমাদের নূতন ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাক্ আর্যগণ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করিবার ক্ষমতা রাখিত। সভ্যজাতিগুলির মধ্যে দামিল, নিষাদ ও কিরাত জাতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিরাত জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। তাহারা পর্বত গাত্রে বাস করিত এবং ওষধি প্রভৃতি দ্রব্যের পরিবর্তে কাপড়, মাদুর ও চামড়া দেশে আমদানী করিত। নিষাদেরা গ্রামে বসবাস করিত এবং তাহাদের শাসন কর্তাকে "স্থপতি" বলিত। এই সব জাতির লোকেরা লৌহ, তাম্র, পিতল ও কাঁসার ব্যবহার জানিত। তাহারা কৃষিকার্য করিয়া ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করিত।

প্রাক্ আর্যদের মধ্যে দামিলগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সুসভ্য ছিল। তাহারা এদেশে সর্ব প্রথম নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষের চাষ আবাদের প্রবর্তন করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সবুজ বাগিচা প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা শহর পত্তন করিয়া সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। নিষাদ জাতীয় লোককে "নাগ" এবং পরে কোল ও ভিল বলা হইত। কিরাতেরা সম্ভবতঃ মোঙ্গলীয় বা ভোটচীনা গোষ্ঠীয় উপজাতি। চাকমা, গারো, কোচ, মেস প্রভৃতি লোকেরা এই জাতীয়। রাহুল সাঙ্কৃত্যায়ন বলিয়াছেন ঃ "এই দামিল জাতি চাষবাস ও শিল্প কার্যে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারা ক্রমশঃ গ্রামের পর গ্রাম স্থাপন করতে লাগল, এক গ্রামের লোকেরা আসতে লাগল অন্য গ্রামে এবং তারা একে অপরের সঙ্গে শিল্প ও কৃষি বিনিময় করে নিজেদের জীবনযাত্রা আরও সহজ করে নিল।" ধীরে ধীরে কিরাত ও নিষাদ জাতির লোকেরা দামিলদের পদানত হয় এবং সকলে একত্রিত হইয়া এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়াছিল।

দামিল ও নিষাদ জাতির অবনতির সময়ে অন্য আর এক জাতি এই দুই জাতির শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারা আর্য জাতি নামে সুপরিচিত। ইহাদের শরীরের

রং গৌরবর্ণ এবং ইহাদের সোনালী কেশ বিশেষ গর্বের বস্তু ছিল। ক্রমে ক্রমে আর্যগণ প্রত্যেক ক্রিয়া কর্মে এবং ব্যবহারিক জীবনেও তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। গ্রাম, নদী, বৃক্ষলতা এবং ফুলের পুরাতন নামগুলি পরিবর্তন করিয়া তাহাদের ভাষায় নূতন নামকরণ করিতে আরম্ভ করিল।

আর্যদের সর্বাপেক্ষা বড় দান তাহাদের আনিত অশ্ব। একমাত্র এই সুন্দর জন্তুর উপর নির্ভর করিয়া মুষ্টিমেয় আর্যগণ নিষাদ, দামিল ও দুঃসাহসী কিরাত জাতিকে পদানত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সময় ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা দেশব্যাপী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পরও দামিলগণ বৈশ্য ও গৃহপতি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ভাষা ও কৃষ্টি অনুকরণ করিয়া তাহারা আর্যদের সন্ধে প্রতিযোগিতা চালাইত।

প্রাচীনকালে দেশ মধ্যে বিশেষ কোন শাসন ব্যবস্থা ছিল না। মন্ডলিকার প্রধানগণ স্ব-স্ব এলাকায় জবরদখলমূলক ভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। রাজ্যশাসন ও সামাজিক শৃঙ্খলা না থাকার ফলে হর্ষবর্ধনের রাজত্বের পর দেশব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

পন্ড্র নামক এক অনার্য জাতির নাম শুনা যায়। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র বলিয়াছেন "আর্যাধিকারের পূর্বে পুন্ড্র প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ সমুদ্র কুলবর্তী বন্ধের অধিবাসী ছিল। এখনও সমুদ্রতীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে পদ্মা পর্যন্ত এদেশে বহুসংখ্যক পুঁড়া বা পোদ জাতীয় লোকের বাস আছে। পুঁড়া বা পোদ পুন্ড্র শব্দের অপভাষা। মহাভারতের যুগে এই দেশ অনার্য ভূমি বলিয়া বিবেচিত হইত। মহাভারতে আছে যে ভীম পুন্ড্র ভূমি ও বন্ধদেশ জয় করেন। পুন্ড্রগণ অনার্য ছিল। তাহাদের বাসস্থান বাঙলা দেশ ভ্রমণ করাও আর্যগণ অপ্রিয় মনে করিত। ইহা ব্যতীত চন্দাল বা চণ্ডালগণ বরেন্দ্র হইতে আসিয়া উপবন্ধের নানা স্থানে বসতি করিয়াছে। তাহারা এখন নমঃশূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়।"

মিঃ ফকাস পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদিগকে আদিম (Aboriginals) জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণ ও মধ্য বন্ধে এবং বিশেষ করিয়া এই দুইটি প্রাচীন জাতির আবাসস্থল সম্পর্কে "সুন্দরবনের পুরাকালীন জনপদ" অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। এতদঞ্চলে দেখা যায়—এই দুই জাতি বিল অঞ্চলে বহুলাংশে বাস করে। তাহারা জন্দল কাটিয়া নিম্নে ভূভাগকে উন্নত করিয়া অসংখ্য জন বসতি গড়িয়া তুলিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান ও ব্রাহ্মণ কায়স্থের বহু পূর্ব হইতে এই দুইটি প্রধান জাতি এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। এদেশকে ধনধান্যে ও বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ করিয়া তাহারা সুন্দর মনুষ্যবাসভূমিতে পরিণত করিয়াছে। এই জাতি দ্বয়ের দান অপরিসীম।

মহারাজ অশোকের শিলা লিপিতে রাষ্ট্রকুট জাতির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রকুট নাম হইতে রাঢ় নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীক দূত মৌর্য রাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় এদেশে

আগমন করেন। তিনি স্বকীয় বিবরণীতে গন্ধারিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ গন্ধারাঢ়ী বা গন্ধারাষ্ট্র শব্দের বিকৃত নাম। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে গন্ধারাঢ়ীয়দিগের হস্তী সৈন্যের ভয়ে এই রাজ্য অন্য রাজ্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার এদেশের প্রতাপের কথা শুনিয়া গন্ধা তীর হইতে অন্যত্র প্রস্থান করেন। তিনি বলিয়াছেন যে গন্ধা সন্ধমের পার্শ্বে এক দ্বীপে মোলন্দী জাতীয় লোক বাস করিত। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, বুড়ন, বাক্‌লা ও সন্দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপটি গঠিত হইয়াছিল। লবনাক্ত সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী প্রদেশে প্রাচীনকালে লবণ প্রস্তুত হইত। লবণ প্রস্তুতের জন্য এক প্রকার মৃন্ময় পাত্র ব্যবহৃত হইত, তাহাকে মোলন্দা বলা হইত এবং লবণ প্রস্তুতকারীকে লোকে মলন্দী বলিত। এখনও এতদ প্রদেশে মলন্দী উপাধিধারী লোকের বসবাস আছে। যাহারা কাগজ প্রস্তুত করিত তাহাদিগকে কাগজী বলা হইত। এসম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আলোচনা করিয়াছি।

বুদ্ধদেবের আমলে বিজয় সিংহ গন্ধা তীর হইতে তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া সিংহল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই রাজ্যের নাম হইয়াছে সিংহল। "মহাবংশ" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। বন্ধদেশ হইতেই সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চলের সমুদ্র তীর হইতে সিংহলে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যগণ এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। প্রথমে ক্ষত্রিয়দের আগমন, পরে বৈশ্য এবং সর্বশেষে আসে ব্রাহ্মণগণ। ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ বিদ্যা, বৈশ্যদের ভেষজবিদ্যা ও ব্যবসায় বাণিজ্য এবং ব্রাহ্মণদের ধর্মচর্চার কাজ ছিল। এই সময় এদেশে জৈন ধর্মেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বে এদেশে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। জৈনদের গ্রন্থে নেমীনাথ কর্তৃক অন্ধ, বন্ধ প্রভৃতি দেশে ধর্ম প্রচারের উল্লেখ আছে। জৈন গুরু মহাবীর বর্ধমানের নামানুসারে রাঢ় অঞ্চলে বর্ধমান জেলার নামকরণ হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পুরাণে বন্ধ দেশের সহিত জৈনদের সম্পর্কের উল্লেখ আছে। জৈন ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের সংঘর্ষের কথাও শ্রুত হয়। মহাবীর জিন যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় তাহা এদেশের মাটিতে শিকড় প্রবেশ করাইতে পারে নাই। তবে ভারতের রাজপুতনা অঞ্চলে অসংখ্য জৈনের বসবাস আছে।

বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মও পূর্ব ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মগধ (বিহার) ও চাম্পায় ধর্মীয় জীবন অতিবাহিত করেন। জৈন মতাবলম্বীরা গুপ্তযুগের পূর্বে নির্গন্থ নামে অভিহিত হইত। নির্গন্থ সমাজ পৌণ্ড্র বর্ধনে বিস্তার লাভ করে। কথিত আছে যে, মহারাজ অশোক নির্গন্থ ধর্মের পদতলে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হন এবং পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরীতে তাহাদের ধ্বংস সাধন করেন। এই গল্প কতদূর সত্য সে সম্পর্কে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তর ও দক্ষিণ বন্ধে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। বিখ্যাত

জৈন গুরু পার্শ্বনাথের নামানুসারে পরেশনাথ পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে। পাহাড়পুরে পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত জৈন বিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে জানা যায় যে নির্গন্থগণ উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে সপ্তম শতকে প্রাধান্য লাভ করে। পৌণ্ড্রবর্ধন ও সমতটে অসংখ্য দিগম্বর নির্গন্থদের দেখা যাইত। পরে ইহাদের জৈন বলা হইত। পাল ও সেন রাজত্বকালে তাহারা অবধৃত সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যায়। অষ্টম শতকে বঙ্গদেশ হইতে জৈন ধর্মের শেষ চিহ্ন প্রায় মুছিয়া যায়।

বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতাপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এক প্রকার নির্জীব হইয়া পড়ে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধদেব কর্ণসুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়াছিলেন এবং সমতটের রাজধানীর উপকণ্ঠে সপ্ত দিবস পর্যন্ত স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। পরে এইস্থানে মহারাজ অশোকের সময় একটি স্তুপ নির্মিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক উহা স্বচক্ষে দর্শন করেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে মানুষের জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। সমতটের লোকেরা খুব কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। এখনও সে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরা কষ্ট সহিষ্ণু ও সাহসী ছিল এবং দ্রুততার সহিত কার্য সম্পাদন করিত। কর্ণসুবর্ণের লোক সৎ ও ভদ্র ছিল। এদেশের অধিবাসীরা অতিমাত্রায় বিদ্যানুরাগী ছিল। জ্ঞানার্জনের জন্য ছাত্রেরা তখন কাশ্মীরে যাইত। হিউয়েন সাঙ আরও বলেন যে গৌড়ের লোকেরা ঝগড়া বিবাদ করিত। ইতসিঙ বলিয়াছেন যে তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ বিহারের অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিল। ব্রাহ্মণ হত্যা, মদ্যপান, চুরি, পাশব অত্যাচার অতীব জঘন্য পাপ রূপে গণ্য হইত এবং ঐ সমস্ত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। সততা, ন্যায়নীতি, পবিত্রতা, দানশীলতা এবং দয়াই ছিল মানব ধর্ম। জনসাধারণ ক্ষুদ্রকায় ধুতি পরিধান করিত। নারীদের এখনকার ন্যায় অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখা যাইত। তানচেংটেন ও অন্যান্য পরিব্রাজকদের বিবরণী হইতে জানা যায় যে সপ্তম শতকে পূর্ব বঙ্গ বৌদ্ধ ধর্মে ভরিয়া যায়। এই সময় সোমপুর (পাহাড়পুর) শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। দেবকোট ফুল্লহারি, সান্নগর, জগডালা, বিক্রমপুর প্রভৃতি বিহারের নাম শ্রুত হয়। রাজা ধর্মপালের অধীনে হরিভদ্র নামক পণ্ডিত তাঁহার বিখ্যাত টিকা অভিসামলঙ্কর রচনা করেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে জানা যায় যে এই ধর্ম প্রচারের পূর্ব সীমা ছিল রাজমহলের সন্নিকটে কাজনগলা বা পৌণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন যে সম্ভবতঃ আশোকের পূর্বে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়। নাগার্জুনী কোন্ডা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। সিংহলী ভিক্ষুরা যে সমস্ত প্রধান প্রধান দেশে ধর্ম প্রচার করেন উহার তালিকায় বঙ্গের নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। পঞ্চম

শতকে ফা-হিয়েন তমলুকে ২২টি সংঘারাম ও অসংখ্য ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজ কর্তৃক মহাযান সংঘারামের জন্য জমি দান করিতে দেখা যায়। এই সময় রুদ্র দত্ত ও আচার্য শান্তিদেব নামক দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম শ্রুত হয়। ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে সুদূর পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সময় নির্বাণ লাভ করেন। অজাতশত্রুর পর শুদ্র রাজ মহানন্দের রাজত্বকালে আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন। মহানন্দের এক পুত্রের নাম চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুরা নাম্নী জনৈক দাসীর গর্ভজাত বলিয়া মৌর্য নামে খ্যাত। চন্দ্রগুপ্ত জৈন মতের সমর্থক ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বৃষল আখ্যায় লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের সুযোগ্য পুত্র অশোক। মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া উহার সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল তাহা বহুলাংশে অশোকেরই কৃতিত্ব। সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত বুদ্ধ মূর্তি ও স্তূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই মহারাজ অশোকের সময় স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে উপমহাদেশে আগমন করেন। তিনি বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন এবং ঐ ধর্মের তীর্থ স্থানগুলি পরিদর্শন মানসে এদেশ ভ্রমণ করেন। ঐতিহাসিকগণের নিকট এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূল্যবান উপাদান। বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থস্থান দর্শন এবং শাস্ত্র গ্রন্থাদি সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। হিউয়েন সাঙ গোবি মরুভূমি, সমরখন্দ, তাসখন্দ, কোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি বিখ্যাত শহর অতিক্রম করিয়া পাকভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক ও নানা মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় জানা যায় যে ভারতবর্ষের নাম ছিল হিন্দু রাজ্য বা চন্দ্রের দেশ। চীনা ভাষায় চাঁদকে বলে ইনটু। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র নালন্দায় দশহাজার ছাত্র ও শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত সমতট, কামরূপ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় সিন্ধুনদের এক দুর্ঘটনায় তাঁহার বহু মূল্যবান পুস্তক নষ্ট হইয়া যায়। তিনি নিজেও কোন প্রকারে জীবন রক্ষা পান। তাঁহার সম্পর্কে একটি মজার গল্প শুনা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে এদেশে অসুখ-বিসুখ হইলে লোকে সাত দিন উপবাস করে এবং ঐ সময়ের মধ্যে অসুখ আরাম হইয়া যায়। ঔষধ খাওয়ার রীতি বিশেষ প্রচলিত ছিল না। অসুখ নিরাময় না হইলে ঔষধ ব্যবহার করা হইত।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার সমূহ। প্রাথমিক অবস্থায় বিহারগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাকালীন আবাসস্থল ছিল। প্রত্যেক বিহারে বহু কক্ষ পাশাপাশি থাকিত। প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের একটি চিত্তাকর্ষক নিদর্শন বগুড়া মহাস্তান গড়ের আবিষ্কৃত গোকুলের মন্দির। ইহার উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরটি ধাপে ধাপে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। শীর্ষদেশে একটি সুন্দর চূড়া ছিল। মহাস্তান গড়ের উত্তরাংশে করতোয়া নদী তীরে গোবিন্দ

ভিটায় অনুরূপ পদ্ধতিতে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত স্তূপ ও মন্দির ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে নির্মিত হয়।

কানিংহাম গান্দের বদ্বীপ, বাগ্‌ড়ী এবং সমতটকে অভিন্ন রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে বন্দ্বদেশ—বন্দ্ব, রাঢ়, বাগড়ী ও বরেন্দ্র এই চারভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার পূর্বে সমতট নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সমতট প্রদেশ কামরূপ ও নেপালের পাশাপাশি অবস্থিত, ইহা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের ভৌগোলিক বৃত্তান্তে সমতটের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাঙ এই প্রদেশকে নীচ, আর্দ্র সমুদ্র তীরবর্তী দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীরা ক্ষুদ্রকায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কৃষ্ণবর্ণের ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক সমতটকে চক্রাকৃতি এবং উহার বেষ্টন ৩০০০ লী বা ৫০০ মাইল বর্ণনা করিয়াছেন। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লী বা সাড়ে তিন মাইল। কানিংহাম সমতটের রাজধানী মূরলী বা বর্তমান যশোর বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন। কামরূপ ও তমলুক হইতে দূরত্ব মাপিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সমতটের রাজধানী বারবাজার স্থির করিয়াছেন। গান্দেয় ব-দ্বীপ যে সমতট তাহা বহুকাল যাবৎ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আরও বলা হইয়াছে যে এখানে ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল।

সতীশবাবু তদীয় যশোর খুলনার ইতিহাসে গান্দেয় ব-দ্বীপকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমতট বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি হিউয়েন সাঙ বর্ণিত ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘারামেরও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে সমতট ও তন্মধ্যস্থ সংঘারামের স্থান নির্দেশের সমস্ত গবেষণাও অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

যুগের পরিবর্তনে এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে পূর্ব বর্ণিত সমতটের স্থান পরিবর্তিত হইয়াছে। বাগড়ী বা গান্দেয় ব-দ্বীপ এবং সমতট পৃথক রাজ্য। মিঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী কুমিল্লায় আবিষ্কৃত নর্তেশ্বর মূর্তির খোদিত লিপি এবং বাঘাউড়া গ্রামের বিষ্ণু মূর্তির খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। নর্তেশ্বর মূর্তি লহরচন্দ্র নামক জনৈক রাজার রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিঃ ভট্টশালীর মতে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল লইয়া সমতট রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ফার্গাসন সমতটের রাজধানী সোনারগাঁও বা সুবর্ণগ্রাম, ওয়াটার্স সাহেব ফরিদপুরের দক্ষিণে এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কুমিল্লা বর্ণনা করিয়াছেন। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে এই রাজ্যের উত্তর পূর্বে শি—লি—চা—টা লো বা শ্রীহট্ট দেশ অবস্থিত ছিল। সমতটের বাউন্ডারী নিম্নরূপ নির্ধারিত হইয়াছেঃ

উত্তর-পূর্বে=গারো, খাসিয়া পর্বত ও ত্রিপুরা রাজ্য

পশ্চিমে=ব্রহ্মপুত্র নদী

দক্ষিণে=বঙ্গোপসাগর

কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে কারমান্তা বা বাদ্‌কামটা নামক স্থানকে সমতটের রাজধানী বলা হইয়াছে। রাজা মহিপালের বাঘাউড়া বিষ্ণুমূর্তি ও দামোদর দেবের তাম্রলিপি (১২৩৪খৃঃ) হইতে এ বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। স্যার যদুনাথ বলেন যে ত্রিপুরা ব্যতীত মধ্য বাংলার একাংশ সমতটের অন্তর্গত ছিল। লোকনাথে প্রাপ্ত মূর্তির খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে কুমিল্লা জেলার চাম্পিতলা সমতটের অন্তর্গত এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনী চক্রবর্তী বলেন যে সমতট রাজ্যের মধ্যে রায়পুর ব্রজযোগিনী, মঠবাড়ী, জম্বুসর, সুবর্ণগ্রাম, বেজীনীসার বাজাসন, যোগডিহা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। এই সমস্ত স্থানের একটিও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মধ্যে নাই। বৃহৎ সংহিতা অনুসারে ইহা বঙ্গ দেশ হইতে পৃথক। আশুরাফপুর প্লেট হইতে জানা যায় যে রাজভট্ট এই দেশের অন্যতম রাজা ছিলেন।

সমতট সম্পর্কে শেষ এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলিয়াছে বাঘাউড়া গ্রামের নারায়ণ মূর্তি হইতে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার বাঘাউড়া গ্রামে নারায়ণ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। উহা মহীপালের রাজ্যের তৃতীয়াঙ্কে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব মতাবলম্বী জনৈক বণিক প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে সমতট বলা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডক্টর আব্দুল করিম সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের অতিরিক্ত সংশোধনীতে সমতটের অবস্থান সম্পর্কে আরও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতিকালে কুমিল্লা জেলার নারায়ণপুর গ্রামে আবিষ্কৃত একটি গণেশ মূর্তির উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ঐ মূর্তি মহারাজাধিরাজ মহীপালের রাজত্বকালে সমতটের অধীন বিলাকান্ডক গ্রামের বুদ্ধমিত্র নামক জনৈক ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ডঃ ডি, সি সরকার ১৯৪৩ সালের ২৫ শে এপ্রিল তারিখে উহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করেন। তিনি বাঘাউড়ার নারায়ণ মূর্তির বিলাকিন্ডক গ্রামের সহিত উহাকে একই গ্রাম বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সমতট সম্পর্কে বাঘাউড়া পূর্ণ সমর্থক পাওয়া যায়। উপরোক্ত অনুসন্ধানের ফলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যে প্রাচীন সমতট রাজ্য নহে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ বা বাগ্‌ড়ীতে ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘারামের কথা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে তাহা হইলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের কি নাম ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা অন্যত্র দিয়াছি। এতদঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ এবং সেন রাজগণের সময় উহার নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ী। বল্লালসেনের সময় রাজধানী রামপালে স্থানান্তরিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের পরবর্তী নামও হইয়াছিল বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ)।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও প্রাচীন সমতট রাজ্য (পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গ) পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙ সিন্ধু তমলুক এবং তথা হইতে সমতট ও কামরূপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে তিনি গাঙ্গেয় বদ্বীপও ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং এখানে

কিছুদিন অবস্থান তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সম্ভব ছিল। এখানে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ সংঘারামও ছিল।

সে যুগে সমতট ও এতদঞ্চলের ও আবহাওয়া একই রূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন বাংলার একটি অংশের নাম ছিল ব্যাঘ্রতটি (Vyaghratati) । এখানকার জঙ্গলময় স্থানে রয়াল বেঙ্গল বাঘের উপদ্রব ছিল বলিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপকে ব্যাঘ্রতটী (Tiger coast) বলা হইত সেকথা অন্যত্র বলিয়াছি।

ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগ, ব্রহ্মপুত্র নদীর নিম্ন ভাগ এবং মেঘনার নিকটবর্তী স্থান এক কালে বঙ্গ নামে কথিত হইত। এই অঞ্চলকে টলেমী গঙ্গারেজিয়া এবং পণ্ডিত কালীদাস বঙ্গভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমতট ইহার পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায় তদীয় "বাংলার ইতিহাস" গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ "ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধ হয় সর্বপ্রথমে বঙ্গের নাম দেখা যায়। বৃহৎ সংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক ষোড়শ সপ্তদশ শতকে রচিত দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক গ্রন্থে উপবঙ্গ বলিতে যশোর ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি কাননময় বা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।" বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় যশোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে উপবঙ্গ বলা হইয়াছে। জৈনগ্রন্থ ও বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। ভৌগোলিক ইবনে খোর্দাদবে, সোলায়মান ও আলমাসুদীর বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বাংলাদেশ

দিগ্বিজয় প্রকাশে আছে "উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশঃ কানন সংযুক্তা।" আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল (শ্রীহট্ট) এই তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হিউয়েন সাঙের সময় সিলেট জেলার পর্বত সংলগ্ন স্থানে সমুদ্র উপকুল ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পুরাকালে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল, সমুদ্র নহে। সামস সিরাজ আফিফ রচিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে নিম্ন আর্দ্র অঞ্চলকে ভাটিদেশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যেখানে নদী নালায় নিয়মিত ভাটা হয় সেই স্থানকে ভাটি বলা হইয়াছে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ ভাগই ভাটি অঞ্চল। বাকেরগঞ্জ ও খুলনা যশোরাঞ্চলকে ভাটি দেশ বলা হইত। আবুল ফজল তদীয় আইনী আকবরী গ্রন্থে সুবা বাংলার পূর্বদিককে ভাটি বলিতেন। বাংলাবাদ নামক স্থান রামসিদ্ধির দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। বাকেরগঞ্জ জেলার গৌরনদীর সন্নিকটে প্রাচীন বাংলাবাদ নামক স্থান অবস্থিত ছিল।

বাংলাদেশের অতি প্রাচীন নাম বাং বা' বান্ধ (Band)। এই বান্ধে পুরাকালের শাসকেরা স্থানে স্থানে ঢিপি বা জাঙাল নির্মাণ করিতেন। এই ঢিপি (Mounds) ১০ হাত উচ্চ এবং ২০ হাত প্রশস্ত হইত। সম্ভবতঃ বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় দুর্গ প্রাচীর প্রস্তুত করা হইত। আল বা আলি শব্দের অর্থ বাঁধ। এই সমস্ত বাঁধের পার্শ্বস্থ খাল নালায় মনুষ্য যাতায়াতের জন্য সাঁকো নির্মিত হইত। বান্ধ+আল=বাঙাল এবং এই বান্ধাল শব্দ হইতে বান্ধলা এবং

উহা হইতে 'বন্দ্ব' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবুল ফজল ও অন্যান্য সমস্ত ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন। ইংরেজ লেখকগণ এদেশকে বেন্দ্বল বলিয়াছেন। অধুনা বন্দ্বদেশ, বাঙলা, বান্দ্বালী, বান্দ্বাল, বাংলাদেশ, বন্দ্বভূমি প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হয়। মাণিক রাজার গানে ভাটি ও বান্দ্বাল উভয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "ভাটি হইতে আইলা বান্দ্বাল লম্বা লম্বা দাড়ী।" পরিব্রাজক মার্কোপোলো এ দেশেকে সর্বপ্রথম বাংলা বলিয়াছেন।

পশ্চিমবন্দ্বের কোন অংশই কস্মিনকালেও প্রাচীন বন্দ্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উহার প্রায় সমস্ত স্থানই রাঢ়ের এবং কিয়দংশ বাগড়ী ও বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ছিল। প্রায় সমগ্র পূর্বদিককে প্রকৃত বন্দ্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি এবং যশোধরের জয়মন্দ্বলে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব দিকের স্থানকে বন্দ্ব বলা হইত। এই মতে হরিকেল এবং সিলেটই পূর্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিক্রমপুর বন্দ্বের নামও শ্রুত হয়। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া, বাকেরগঞ্জের ইদিলপুর প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর বন্দ্বের অধীন ছিল।

কবিকঙ্কন বান্দ্বাল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের প্রকৃত নাম বান্দ্বাল, বান্দ্বালী নহে। এই প্রসন্দ্বে কলকাতায় প্রচলিত বান্দ্বাল ও ঘটি শব্দদ্বয় প্রণিধানযোগ্য। বান্দ্বালকে হাইকোর্ট দেখাবার তাৎপর্যও অনুরূপ। বান্দ্বাল শব্দ শুদ্ধ হইলেও উহা অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রচীনকালীন বহু লেখক বান্দ্বাল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কবিকঙ্কন বিরচিত কাব্যে দেখিতে পাইঃ

"কান্দেরে বান্দ্বাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।
আর বান্দ্বাল বলে বড়লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ, না দেখিলু মাগু পো।"

শ্রীশচন্দ্রের তাম্র শাসনে বন্দ্বাল কথার উল্লেখ আছে।

আদিম যুগের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। যতটুকু পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধানের ফল এবং অনুমান মাত্র। জৈন যুগের ইতিহাস অনুরূপ। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস কালের কুয়াশা ভেদ করিয়া এখনও কোনোরূপে বাঁচিয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের পূর্বে বন্দ্বদেশের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তের

দনুজ মর্দন ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যখন রাজ্যমধ্যে গোলযোগ চলিতেছিল, সেই সময় দনুজ মর্দন দেব নামক অন্য এক হিন্দু রাজা বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে চন্দ্রদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। দনুজ মর্দন দেবের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী একস্থানে হলকর্ষণের সময় অনুরূপ দুইটি মুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত মুদ্রার একটি মহেন্দ্র দেব নামীয় এবং অপরটি দনুজ মর্দন দেবের। উভয় মুদ্রা গোলাকৃতি। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রী শ্রী মন্মহেন্দ্র" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ, পাণ্ডুনগর শকাব্দ (   ) ৩৬৬।"

রাজা দনুজ মর্দন দেবের মুদার ওজন প্রায় ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি পৌণে চার ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রী শ্রী দনুজ মর্দন দেব" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়, "শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ, পাণ্ডুনগর শকাব্দ (   ) ৩৩৯।" সুন্দরবন অঞ্চলে খোলপেটুয়া নদীতীরে একটি কবর খননকালে ১৯১১ খৃস্টাব্দে দনুজ মর্দনের একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত মুদ্রা গোলাকৃতি। ওজন ১৬০ গ্রেণ। প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলা অক্ষরে "শ্রী দনুজ মর্দন দেব," দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ. শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দ্র দ্ব (   ) প।" ১৩৩৯ শকাব্দ অথবা ১৪১৭ খৃস্টাব্দ হইবে। পূর্বোক্ত দুইটি মুদ্রায় ১ সহস্রাংকটি কাটিয়া গিয়াছে। অতএব মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় ৩৩৬ শকাব্দ স্থলে ১৩৩৬ শকাব্দ এবং দনুজ মর্দনের অপর মুদ্রায় ৩৩৯ স্থলে ১৩৩৯ শকাব্দ বা ১৪১৪ খৃস্টাব্দ হইবে। উপরোক্ত তিনটি মুদ্রা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মহেন্দ্র দেবের পর দনুজ মর্দন দেব পাণ্ডুয়ার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে দনুজ মর্দন দেব প্রাচীন আর্য ধর্মের বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের পূর্ব নাম আর্য ধর্ম। হিন্দু ধর্ম বলিয়া কোন শব্দ চতুর্বেদের কোথাও নাই। বেদে ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়—অথাৎ বৈদিক যুগের হিন্দুগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। বিভিন্নপ্রকার দেব-দেবীর নাম ও উহার পূজা-অর্চনা মহাগ্রন্থ বেদের কুত্রাপি লিখিত নাই। 'হিন্দু' শব্দ আরব ও পারস্যবাসীদের দান। তাঁহারা সিন্ধুনদীতীরে অবস্থিত অধিবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। 'স' স্থলে তাহারা 'হ' উচ্চারণ করিত এবং সেইজন্য 'সিন্ধু' শব্দ 'হিন্দু'তে পরিণত হইয়াছে।

যাহা হউক যদুর রাজত্বের শেষদিকে সম্ভবতঃ দনুজ মর্দন দেব তাঁহাকে পাণ্ডুয়া নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আর্যাবর্তে মুসলমান রাজগণ কর্তৃক বিজিত কোন জনপদে বা দেশে কোন হিন্দু রাজা নিজ নামে পাক-ভারতীয় অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন করিতে সাহসী হন নাই। দনুজ মর্দন ও মহেন্দ্রের নাম স্বাধীন হিন্দুরাজা হিসারে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দনুজ মর্দনের মুদ্রায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাজ্যারোহণের অল্পদিন পরেই পাণ্ডুনগর ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে নূতন রাজ্য স্থাপন করত মুদ্রা প্রচার করেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় তখন রাজ্যারোহণ ব্যাপারে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও নরহত্যা চলিত। সম্ভবতঃ এইরূপ সংকট এড়াইবার জন্য তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেন। মিঃ ষ্টেপেলটন দনুজমর্দন দেবের বহু রজত মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাগুলিতে উপরোক্ত কথা লিখিত আছে।

মহেন্দ্র ও দনুজ মর্দন উভয়েই 'দেব' উপাধিধারী কায়স্থ এবং 'শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ' উপাধি ভূষিত শাক্ত হিন্দু। এ দনুজ মর্দন কে? এবং কোথা হইতে চন্দ্রদ্বীপে আসিলেন? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, " বল্লাল সেনের কায়স্থ জাতীয় উপপত্নীর পুত্র কালু রায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করেন। দনুজ মর্দন রায় তাঁহাব বংশধর। " এখানে দনুজদমন ও দনুজ মর্দনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু এই মতের পোষকতায় কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ডক্টর এনামুল হক বলেন, "রাজা গণেশ ১৪১৪ খৃস্টাব্দে দনুজ মর্দন উপাধি ধারণ করিয়া গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ডক্টর এনামুল হকের পূর্বে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী গণেশকেই দনুজ মর্দন বলিয়াছেন। সুখময়বাবু বলিয়াছেন; চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা কিংবদন্তী ও অলৌকিক উপাদানে পূর্ণ। মুদ্রায় উল্লেখিত দনুজ মর্দনই রাজা গণেশ। গণেশ–দনুজমর্দন ব্যতীত অন্য একজন দনুজমর্দন ছিলেন। দ্বিতীয়বার রাজ্য প্রাপ্তির পর গণেশ দনুজমর্দন উপাধি গ্রহণ করেন। ফার্সি ইতিহাসে অবশ্য গণেশকে দনুজমর্দন বলা হয় নাই। খাশ পাণ্ডুয়াতে দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তিনি পাণ্ডুয়া ও সোনার গাঁ ও চট্টগ্রাম হইতে একই সময় মুদ্রা বাহির করেন...।"

চন্দ্রদ্বীপের প্রতিষ্ঠাতাকে বিভারীজ ও রোহিনী কুমার রামনাথ দনুজমর্দন, খোশাল চন্দ্ররায় দনুজমর্দন দে (পুত্রের নাম রামনাথ দে) এবং জেমস ওয়াইজ দনুজমর্দন দে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুখময়বাবু গণেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের কোন ইতিহাস গ্রন্থকার গনেশকে দনুজমর্দন বলেন নাই। সুখময়বাবুর মতে জোরালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সন্দেহ থাকিয়া যায়।

অন্য সূত্র হইতে জানা যায় যে, লক্ষণ সেনের পৌত্র দনুজমাধব বহুদিন যাবত পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দনুজমাধবকে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা দনুজ, ধিনুজ রায়, দনোজা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আবুল ফজল তাঁহাকে 'নৌজা' এবং জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁহাকে দনুজ রায়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দনুজমর্দন এবং দনুকদমন বা দনুজমাধব একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। এই মতানুসারে বিক্রমপুরের দনুজমাধব এবং চন্দ্র দ্বীপের দনুজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি। বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর দনুজমাধব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। ১২৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার রাজত্বকালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন বঙ্গের বিদ্রোহী শাসনকর্তা মুঘীসুদ্দীন তোগরোলকে দমন করিতে সসৈন্যে বঙ্গে আগমন করেন। দনুজমাধব এই অভিযানে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনকে সাহায্য করেন এবং উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গে মুসলিম রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দনুজমাধব চন্দ্র দ্বীপে আসিয়া স্বীয় গুরু চন্দ্রশেখরের নির্দেশ অনুসারে নবোত্থিত দ্বীপে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং গুরুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ উহার নামকরণ করেন চন্দ্র দ্বীপ। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট ও ইলিয়ট এই মতের পরিপোষক। তাঁহাদের মতে চন্দ্র দ্বীপের রাজবংশীয়গণ এই দনুজমাধবের বংশধর। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে, আকবরের রাজত্বের ২৯ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃস্টাব্দে চন্দ্র দ্বীপে (বাক্‌লায়) যে জলপ্লাবন হয় তখন এই বংশের পরমানন্দ রায় অল্পবয়স্ক যুবক। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এই মতের বিরোধী। তাঁহার সুচিন্তিত মতানুসারে দনুজমর্দন দেব ১৪১৭ খৃস্টাব্দে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে আলোচিত মুদ্রাত্রয় ইহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে দনুজমাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আরো ১৩৭ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া চন্দ্র দ্বীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ স্থলে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে, বিক্রমপুরের দনুজমাধব এবং চন্দ্র দ্বীপের দনুজমর্দন একই ব্যক্তি নহেন। এখন এই দনুজমর্দন দেবের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইবে। দেব বংশের ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে ঐ বংশের লোকেরা রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এইজন্য রাজবংশের সহিত তাঁহাদের বংশীয় ইতিহাসেরও সম্পর্ক ছিল। এই বংশের লোকেরা বহুকাল পূর্বে হরি দ্বার হইতে আসিয়া কর্ণসুবর্ণে বসবাস করেন। তাঁহারা ক্ষাত্রজ কায়স্থ, দ্বিজ ও ক্ষত্রিয় কুলসম্ভব। পরে তাঁহারা সপ্তগোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়েন। "তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য দেবগণ কুল নায়ক ছিলেন। তাঁহারা কন্টক দ্বীপে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই শাণ্ডিল্য দেব কুলে শূরদেব জন্মগ্রহণ করেন; তৎপুত্র দনুজারি। পাঠান রাজত্বকালে তিনি দেব রাজগণের সামন্তস্বরূপ বহুদিন ধরিয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি বন্দ্য বংশীয় মকরন্দের পুত্র দাশরথিকে কন্টক দ্বীপে স্থাপন করেন ও তাঁহার পাঁচ পুত্রকে পাঁচ খানি গ্রাম দান করেন

এবং চণ্ডীপরায়ণ বন্দ্য বংশের শিষ্য হওয়ায় দেব বংশীয়েরা "শ্রী শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ" উপাধি গ্রহণ করেন। দনুজারির পুত্র হরিদেব কন্টক দ্বীপ হইতে পাণ্ডুনগরে গমন করেন। হরিদেবের পুত্রের নাম নারায়ণ এবং নারায়ণের দুই পুত্রের নামে পুরন্দর ও পুরুজিৎ। তন্মধ্যে পুরন্দর সন্ন্যাসী হন। পুরুজিতের আদিত্য নামে মহাতপা পুত্র জন্মে। আদিত্যের দুই পুত্র—শ্রীশ্রী চণ্ডীপরায়ণ দেবেন্দ্র ও ক্ষীতিন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। তাঁহার সম্পর্কে একটি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায় ঃ—

"যবনাঞ্চ দূরীকৃত্য কংসকুলনং নিহত্যা।
পাণ্ডুয়ায়ং দেবরাজ্য মনে নৈব প্রতিষ্ঠিতম্।।"

অর্থাৎ তিনি (মহেন্দ্রদেব) যবন বা মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করেন এবং কংসকুল (রাজা গণেশ বা কংস নারায়ণের বংশধর) ধ্বংস করিয়া পাণ্ডুয়ায় দেব বংশীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যবন শব্দের তাৎপর্য ও উৎপত্তির বিষয় উপলব্ধি করিতে এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশ উল্লেখ করিতেছি ঃ—

"কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হোল হারা।"
হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক হুনদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।"

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজা গণেশ বা কংস নারায়ণের মৃত্যুর পর যদু স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্র দেব বিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডু নগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কন করেন।" রাজা মহেন্দ্র দেব কিছুদিন রাজত্ব করার পর দুষ্ট ঘাতক কর্তৃক নিহত হইলে তৎপুত্র দনুজমর্দন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এই সময় গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ দোর্দন্ড প্রতাপে গৌড় শাসন করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের অবসানে এ দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা মুসলমানদিগকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন জাতির অবস্থা যখন চরম সংকটে উপনীত হয় তখনই বিজেতার দল আমন্ত্রিত হইয়া বা সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে উক্ত দেশ আক্রমণ করে। প্রথম দিকে নব শাসকেরা প্রজাগণ কর্তৃক বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়। ক্রমশঃ বিজিত দেশের অধিবাসীদের মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং বিজেতা শাসক শ্রেণীর উপর বিদ্বেষভাবে প্রকটিত হয়। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা গণেশের পূর্বে কোন হিন্দু জমিদার বা প্রধান স্বাধীন সুলতানদের বিরোধিতা করিতে সাহসী হয় নাই।

রাজা গণেশ মুসলমানদের বিশেষ সমীহ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেন। তৎপুত্র যদু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করেন কিন্তু মহেন্দ্র দেবের সিংহাসন কন্টকাকীর্ণ ছিল, তাহার অকালমৃত্যুই উহার অকাট্য প্রমাণ। দনুজমর্দন দেব পাণ্ডু নগরে

স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন। কি অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে পাণ্ডুয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সে যুগে মধ্যে মধ্যে হিন্দু সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজদণ্ড হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মুসলমানদের বিক্রম তাঁহাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা ধুলিসাৎ করিয়া দিত। গণেশ কিছুকাল হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু তৎপুত্র জালালউদ্দীন (যদু) পিতৃনীতির বিপরীত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্র দেব সুখে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র দনুজমর্দন সম্ভবতঃ ভয়সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে রাজ্যারোহণ করিয়া পাণ্ডুয়া হইতে বড় এক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া তুষ্ট থাকেন। ইহাই দনুজমর্দন দেব কর্তৃক চন্দ্র দ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত।

প্রবাদ আছে যে, বন্দ্যবংশীয় চন্দ্রাচার্য দনুজমর্দনের গুরু ছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলের এক দ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন এবং তথায় একটি রাজ্য স্থাপন করেন। গুরুভক্তির নির্দশন হিসাবে এই রাজ্যের নামকরণ হয় চন্দ্র দ্বীপ। দনুজমর্দন চন্দ্র দ্বীপ হইতেও স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। তিনি স্বাধীন রাজাই ছিলেন, অন্যথা স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিতেন না। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, চন্দ্র দ্বীপ নাম বহু পূর্ব হইতেই ছিল। চন্দ্রাচার্যের সন্দে কোন সম্পর্ক ছিল না।

ঐতিহাসিক রাখালবাবু বলিয়াছেন যে, গণেশ বা যদু যাহা করিতে পারেন নাই অথবা করিতে ভরসা করেন নাই দনুজমর্দন দেব তাহা সহজেই সম্পাদন করিয়াছিলেন। রিয়াজুস সালাতীন, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা বা তবাকাত-ই-আকবরীতে বা হিন্দুর পুরাণে তাঁহার নাম নাই। কায়স্থকুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, তিনি কায়স্থ ছিলেন। চন্দ্র দ্বীপের রাজবংশ সম্বন্ধে আদিলপুর বা ইদিলপুরের ঘটকগণের কারিকা ও কতিপয় রজতমুদ্রা ব্যতীত দনুজমর্দনের অস্তিত্বের অন্য কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তদীয় পুস্তকে (বাংলার ইতিহাস আদিপুর্ব) বলিয়াছেন ঃ "এইমাত্র আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে তৈলক্য চন্দ্রদেবের প্রসন্দে চন্দ্র দ্বীপের উল্লেখ দেখিয়াছি।" ১০১৫ খৃস্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতেও চন্দ্র দ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতেও বোধ হয় চন্দ্র দ্বীপের উল্লেখ আছে (ত্রয়োদশ শতক)। এই চন্দ্র দ্বীপের ঘাঘরকাটি পট্টক নিশ্চয় ঘাঘর নদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি নামক কোন গ্রাম (বরিশাল জেলার ঝালকাটি প্রভৃতি কাটি প্রদত্ত নাম লক্ষ্যণীয়)। এই ঘাঘর নদীর তীরেই ফুল্লশ্রী গ্রামে মনসার পাঁচালির কবি বিজয়গুপ্তের বাসভূমি (পঞ্চদশ শতক)।

"পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘন্টেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।"

যাহা হউক মধ্যযুগে চন্দ্র দ্বীপ বঙ্গের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে বাক্‌লা পরগণা ও

চন্দ্রদ্বীপকে একই স্থান বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। উপরোক্ত মতে চন্দ্রদ্বীপ নাম এবং ঐ স্থান বহুপূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রাচার্যের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ নাম হয় নাই।

চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে দনুজমর্দনদেব রাজধানী স্থাপন করেন। কচুয়ার কমলা সাগর দীঘি সেকালে দেশের প্রসিদ্ধ জলাশয় ছিল। দনুজমর্দনের রাজ্য বাকেরগঞ্জ জিলার দক্ষিণাংশ ও নোয়াখালির পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রমাবল্লভও এই বংশের আরও কতিপয় নৃপতি রাজত্ব করেন। এই বংশের সপ্তম অধস্তন পুরুষ রাজা কন্দর্প নারায়ণ রায়। তিনি কচুয়া হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঞার অন্যতম ভূঞা। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা। রামচন্দ্র মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করেন। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তাঁহাদের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

চৌদ্দ

খানজাহানের পূর্ব পরিচয়, যশোর আগমন ও সুন্দরবন সংস্কার

খানজাহানের জীবনালেখ্য বৈচিত্র্যময়। তাঁহার সম্পর্কে অসংখ্য প্রবাদ ও কিংবদন্তী শ্রুত হয়। নানা মুনির নানা মতের জন্য এই মহাত্মার পূর্ব পরিচয় আমাদের নিকট কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া আছে। প্রচলিত একটি প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, খানজাহান পারস্য দেশীয় মুসলমান। তিনি দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তোঘলকের সময় ভারতে আগমন করেন। কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব হইতে সম্রাটের অভিভাবকরূপে কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ বিন তোঘলকের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রবাদে আরও জানা যায় যে, তিনি এগার জন আউলিয়া ও ষাট হাজার সৈন্যসহ দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

অনুরূপ আর এক প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, তিনি ইমন দেশীয় সওদাগর। ব্যবসায়ের জন্য আত্মীয় পরিজনসহ দিল্লীতে আগমন করেন। পরে তিনি দিল্লীর রাজসরকারে চাকুরী প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে মোহম্মদ বিন তোঘলকের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে তিনি কতিপয় বিদ্রোহ দমন করেন এবং জৌনপুরে আসিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। জৌনপুরেই তাঁহার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। রাজদরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, জুলুম, ধ্বংসাত্মক কার্য, শাসকশ্রেণীর দাম্ভিকতা, নরহত্যা এবং যুদ্ধবিগ্রহ দর্শনে তাঁহার মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কথিত আছে তিনি পবিত্র শবে কদরের রাত্রে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। অসংখ্য লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন হইতে তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে মানব সেবা ও তাহাদের আত্মিক ও জাগতিক মঙ্গল সাধন, পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার, রাজ দরবার হইতে দূরে অবস্থান এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ। এ হেন মানসিক পরিবর্তনের ফলে তিনি কতিপয় শিষ্যসহ জৌনপুর ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।

উপরোক্ত দুইটি প্রবাদ অনুসারে খানজাহান মোহম্মদ বিন তোঘলকের মন্ত্রী ছিলেন। কেহ কেহ এই মতের পোষকতা করেন। এ হেন প্রবল জনশ্রুতির ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তাহাই আমাদের বিচার্য। মোহম্মদ বিন তোঘলকের পূর্ব নাম উলুঘ খান। বঙ্গদেশ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ দমন করিয়া গিয়াসউদ্দিন তোঘলক যখন দিল্লী ফিরিয়া আসিতেছিলেন সেই সময় উলুঘ খান পিতার রাজকীয় অভ্যর্থনার জন্য তোঘলকাবাদে একটি শাহী মঞ্চ নির্মাণ করেন। তোঘলক শাহের সঙ্গে খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার

সদ্ভাব ছিল না। এই মহাত্মা তাঁহার দিল্লী প্রত্যাগমনকালে বলিয়াছিলেন "হনুজ দিল্লী দূরস্ত" অর্থাৎ দিল্লী বহুদূরে। যাহা হউক অভ্যর্থনা মঞ্চ নির্মাণ করিতে উলুঘ খান মালিকজাদা ওরফে আহাম্মদ বিন আয়াজের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইনি রাজকীয় হর্ম্যরাজির ইন্‌সপেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে উলুঘ খানের নির্দেশে এই মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। যথাসময় অভ্যর্থনা শেষ হইবার পূর্বে তোঘলক শাহ মঞ্চোপরি চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেকথা ইতিহাস পাঠকগণ জানেন।

পিতার মৃত্যুর পর উলুঘ খান মহাসমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আহাম্মদ বিন আয়াজকে 'খাজা জাহান' উপাধিতে ভূষিত করিয়া মন্ত্রীকে অধিষ্ঠিত করেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন তোঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়ের মধ্যে খাজা জাহান ব্যতীত খানজাহান নামীয় অন্য কেহ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন না। এই খাজা জাহান ঐ বৎসর ২৫শে আগষ্ট তারিখে ফিরোজ তোঘলকের রাজত্বের প্রারম্ভে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খলিফাতাবাদের মাজার লিপিতে উলুঘ খানে আজম খানজাহান লিখিত আছে। উলুঘ তুর্কীশব্দ। উহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ তুর্কীস্তানের অধিবাসী ছিলেন। খান-এ-আজম ছিল তাঁহার উপাধি। তাঁহার আবির্ভাবকালে বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। তিনি নাসিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহের সমসাময়িক এবং তাঁহার নিকট হইতে উপাধি গ্রহণ করেন। 'আলী' শব্দ তাঁহার নামের শেষে পরবর্তীকালে যুক্ত হইয়াছে।

বাগেরহাটে মহাত্মা খানজাহান আলীর কবর গাত্রে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ দেওয়া আছে ৮৬৩ হিজরী বা ১৪৫৯ সাল। মিঃ জেমস ওয়েষ্টল্যান্ড ১৪৫৮ সাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবরের দেওয়া মৃত্যু তারিখ বিশ্বাস্য এবং গ্রহণযোগ্য। খানজাহান বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার আয়ুষ্কাল ১০০ বৎসরের কিছু অধিক হইলেও তিনি মোহাম্মদ বিন তোঘলকের সমসাময়িক হইতে পারেন না। অতএব মন্ত্রী খাজা জাহান এবং আমাদের খানজাহান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। পূর্বোক্ত প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। খানজাহান মোহাম্মদ বিন তোঘলকের বহু পরে এদেশে আগমন করেন।

খানজাহান সম্পর্কে এ পর্যন্ত কেহ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন কিনা জানি না। যাঁহারা কিছু লিখিয়াছেন তাঁহাদের লেখনীর বিষয়ও আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। জনাব মোতাহারুল হক ও ডাঃ আবুল কাসেম দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা ১৩২৬ সালে সওগাত পত্রিকায় খানজাহান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি সতীশ বাবুর যশোর-খুলনার ইতিহাসে খানজাহান সম্পর্কে বহু অলীক কাহিনীর অবতারণা করায় তাহার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে সতীশ বাবু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বশিরুদ্দিন একখানি পুঁথি লিখিয়াছেন। আর একখানি পুঁথিতে খানজাহানের নাম কেশর খাঁ এবং তাঁহার মাতার নাম আম্বিয়া বিবি বলা হইয়াছে। আরও অনেকে পুঁথির ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ

করিয়াছেন। পুঁথিগুলি অসম্ভব ও অযৌক্তিক গল্পে পূর্ণ। সেজন্য উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

খানাজাহানের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী আই, সি, এস, এক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, "তিনি দিল্লীর সুলতান বা বঙ্গের রাজার নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া যশোর অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। কথিত আছে জনৈক সন্ন্যাসী সম্রাট আকবরকে একটি মূল্যবান উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। গভীর নিশীথে সন্ন্যাসী যখন আগমন করেন, সেই সময় বাদশাহ আকবর নিদ্রিত ছিলেন এবং খাঞ্জা আলী তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ঘুমন্ত বাদশাহকে বিরক্ত না করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু যাইবার প্রাক্কালে তিনি খাঞ্জা আলীকে সেই মূল্যবান উপহার দিয়া যান। সম্রাট আকবর খাঞ্জা আলীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ উপহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। সম্রাট তাঁহাকে বসবাসের জন্য প্রচুর অর্থ ও ভূমিদান করিতে স্বীকৃত হন। অতঃপর খাঞ্জা আলী আকবরের শাহী দরবার ত্যাগ করিয়া অসংখ্য অনুচরসহ সুন্দরবন অঞ্চলে আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া ভূমি আবাদ করেন।" সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। অতএব এই সময়ে খানজাহান আলীর কার্যকাল একটি অসম্ভব ঘটনা, কারণ তিনি ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ওমালী সাহেবের বর্ণনার কোনই মূল্য দেওয়া যায় না।

সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা একাডেমী পত্রিকায় 'ফাতেহাবাদের আউলিয়া কাহিনী' নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বের একটি উর্দু পাণ্ডুলিপির বঙ্গানুবাদ। প্রাচীনত্বের দরুণ পান্ডুলিপিটি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উহার প্রণেতা সৈয়দ ইনায়েত হোসায়েন রিজভী। এই পুস্তিকায় লিখিত আছে যে, হজরত সৈয়দ শাহ্ আলী বাগদাদী পিতার মৃত্যুর পর ইরাক হইতে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি "৯২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান। তাঁহার মাজার সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে মাজারটি মোহাম্মদপুর ঝিলের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আবার অনেকের মতে ঢাকা শহরের উত্তরদিকে মীরপুরে।"

এই উর্দু পুস্তিকায় খানজাহান আলীর নাম লিখিত হইয়াছে। "হজরত শাহ্ পীর খানজাহান আলী (রহঃ)। আরও বর্ণিত আছে, পীর শাহ্ খানজাহান আলী ওরফে খাজা আলী কামেল দরবেশ ছিলেন। দিল্লীর দিক থেকে জাঁকজমকের সঙ্গে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফাতেহাবাদ পরগণায় হজরত শাহ্ আলী বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন। এখানে কিছুকাল থাকার পর শাহ্ আলী বাগদাদীকে নিজের বর্ম দান করে সুন্দরবনের দিকে চলে যান এবং হাবেলী কড়াপুরে বসবাসের বন্দোবস্ত করেন শুনা যায়। পীর সাহেব চট্টগ্রাম গিয়ে হজরত বায়জীদ বোস্তামীর রুহ মোবারকের খেদমতে পাথরের জন্য প্রার্থনা

করেন। খোদার দয়ায় তাঁর দোয়া কবুল হয়। সেখান থেকে এক মুঠি পাথর এনে হাবেলী কড়াপুরে খুব বড় এবং উঁচু ষাট গম্বুজের একটি মসজিদ তৈয়ার করেন। এর আশে পাশে ছোট দুইটি মসজিদ ও তালাব খনন করেন। সেই তালাবে একটি কুমীর আছে, এর আচরণ প্রায় মানুষের ন্যায়।" পাণ্ডুলিপিটি মাত্র ৭০ বৎসরের পুরাতন। এখনও (১৯৬০) বাগেরহাট অঞ্চলে প্রায় শত বৎসর বয়সের বিশ্বাসযোগ্য কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি জীবিত আছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা খানজাহান সম্পর্কে অনেক বিষয় জানিয়াছি। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে মৌলিক গবেষণা নাই বলিয়া মনে করি—দূর অঞ্চল হইতে শুনিয়া লেখা হইয়া থাকিবে। নাম এবং পরিচয় মোটামুটি ঠিক আছে। কড়াপুর স্থলে কাড়াপাড়া বা কস্‌বা হইবে। হযরত রায়জীদ বোস্তামীর প্রসন্দ ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। তিনি খানজাহানের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বের লোক। পরে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিব।

খানজাহান দিল্লী হইতে সরাসরি ফাতেহাবাদ পরগণায় মহাত্মা শাহ্ আলী বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন, এরূপ কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা সর্বাদি-সম্মত যে বারবাজারেই তাঁহার প্রথম আস্তানা এবং তথা হইতে যদি তিনি ফতেহাবাদ যাইতেন তবে নিশ্চয় পথিপ্রান্তে জলাশয়, রাস্তা বা মসজিদের চিহ্ন থাকিত। বারবাজার হইতে ফতেহাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘপথে খানজাহানের কোন কীর্তি চিহ্ন নাই। তদ্ব্যতীত পীর আউলিয়াদের জীবনী লিখিতে গেয়া ভক্তগণ প্রায়ই অতিরঞ্জিত করিয়া ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ পীর বা মোর্শেদকে সর্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান দিয়া থাকেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, "শাহ্ আলী বাগদাদী ৯২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান।" খানজাহান আলীর মৃত্যু তারিখ সর্বসম্মতভাবে ৮৬৩ হিজরী অর্থাৎ ৬০ বৎসর পূর্বে। পাণ্ডুলিপির লেখকও ভুলত্রুটির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব ফতেহাবাদে খানজাহানের আগমন এবং শাহ্ আলী বাগদাদীকে বর্মদান কথাটির কোন সামঞ্জস্য নাই। উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে উক্ত বর্মদান ও সাক্ষাৎকারের কাহিনী সঠিক নহে।

সতীশবাবু তদীয় যশোর-খুলনার ইতিহাসে খানজাহানের পরিচয় সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই খাজা জাহান খোজা বা নপুংসক ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি স্বীয় পালিত পুত্র ইব্রাহিমের উপর জৌনপুরের শাসনভার দিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পুণ্য কার্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য পূর্বাঞ্চলে আসেন। ইব্রাহিমের শাসন আরম্ভের পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সেটি অনুমান মাত্র বলিয়া বোধ হয়।...... যশোর-খুলনার "খাঞ্জালী পীর" বা খাঁ জাহান আলী এবং জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহানকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি।"

মিঃ ওমালী বলেন যে, খানজাহানের সময় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৪২-১৪৫৯) বঙ্গের সুলতান ছিলেন। তিনিও প্রফেসার ব্লকম্যানের অভিমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন

যে, "ঢাকায় একটি মসজিদের দ্বারদেশে একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উক্ত মসজিদ যিনি নির্মাণ করিয়াছেন তিনি একজন খান। মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল খাজা জাহান।" উক্ত মসজিদের নির্মাণ তারিখ ১৪৫৯ অব্দের ১৩ই জুন। ব্লকম্যান অনুমান করিয়াছেন যে, এই খাজা জাহান এবং বাগেরহাটের খানজাহান অভিন্ন ব্যক্তি। ইহার পর আর কিছুই জানা যায় না। সতীশবাবুও ব্লকম্যানের এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, এই মাহমুদ শাহ্ বঙ্গেশ্বর নাসিরুদ্দিন মাহমুদ নহেন। তিনি দিল্লীশ্বর মাহমুদ শাহ্ (১৩৯৫-১৪১৪) এবং তিনি তাঁহার সময় খাজা জাহান উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, খানজাহান বঙ্গে ৫৯ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং ৪০ বৎসরের সময় জৌনপুর ত্যাগ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "জৌনপুরের সুবিখ্যাত খাজা জাহান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তেমন বিনারক্তপাতে দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত না, ইহা নিশ্চিত। যাহা হউক আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজাজাহান ও যশোর-খুলনার খানজাহান আলী এক ব্যক্তি।"

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খানজাহান দিল্লীর সম্রাটের আদেশে মহানগরী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই মত সমর্থন করেন। বাবু গৌর-দাস বসাক বলিয়াছেনঃ "খানজাহান দিল্লীর রাজদরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে তহশীলদার বা রাজস্ব বিভাগের শাসক করিয়া বাগেরহাটে প্রেরণ করা হয়। পক্ষান্তরে মিঃ ব্লকম্যান বলেন যে, দিল্লীর সম্রাট খানজাহানকে দূরদেশ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি অদ্ভুত কর্মী পুরুষ ছিলেন এবং বহু অসাধ্য কার্যে সিদ্ধিলাভ করেন।

খানজাহান যে বিপুল ধনভাণ্ডারসহ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি ফিরোজশাহের মন্ত্রী খানজাহানের বংশধর হওয়াই সম্ভব। কথিত আছে তাঁহার সহিত ষাট হাজার সৈন্য ছিল। এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। তবে বারবাজার হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত পথিমধ্যে প্রকাণ্ড জলাশয়সমূহ ও রাজপথ খনন করিতে বিপুল ধনরাশির প্রয়োজন হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় তিনি এত বিপুল অর্থ ও স্বর্ণরৌপ্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন যে জনহিতার্থে মুক্ত হস্তে দান করিয়া যাইতেন। সেই সময় দিল্লীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল। তৈমুরের আক্রমণের পূর্বে বা প্রাক্কালে রাজধানী দিল্লী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের লীলাভূমি ছিল। ফিরোজ শাহের দীর্ঘ শাসনের পর সিংহাসন লইয়া ভীষণ গোলযোগ চলিয়াছিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে পর পর এই বংশের পাঁচ ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নির্জীব মাহমুদ তোঘলকের সময় রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা বিস্তার করিতেছিল। ইত্যবসরে যদি কেহ বিপুল ধনরাশিসহ মহানগরী দিল্লী ত্যাগ করেন কে তাঁহার খোঁজ রাখিবে? খোঁজ রাখিবার আবশ্যকতাই বা কোথায়? গোপনে বা প্রকাশ্যে এই ধরনের প্রস্থান সম্ভবপর ছিল।

খানজাহান এমন এক মুহূর্তে কতিপয় বিশ্বস্ত আত্মীয় ও সন্ধীসহ দিল্লী ত্যাগ করিয়া আসেন। দিল্লী হইতে পদব্রজে আসিতে আসিতে তিনি পথিমধ্যে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করেন। সমস্ত সন্ধী ও সৈন্যদের তিনি দিল্লী হইতে আনয়ন করেন নাই এবং উহা সম্ভবও ছিল না। দিনের পর দিন সুদূর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বারবাজারে আসিয়া আস্তানা করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তখনকারদিনে বন্দদেশ হইতে খানজাহানের পৌছা সংবাদ দিল্লীতে পৌছিতে বহুদিন লাগিত। এতদ্ব্যতীত গৌড়ের সুলতান তখন স্বাধীন ছিলেন। বন্দদেশ তখন দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই। কাজেই স্বাধীন গৌড় সুলতানের আদেশ লইয়া খানজাহান বাগেরহাট অঞ্চলে সুন্দরবন আবাদ করার জন্য এবং ইসলাম প্রচারার্থে আগমন করেন।

খানজাহান রাজদরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও সংসার ধর্মে বিতৃষ্ণ হইয়া নির্জন স্থানে থাকিয়া ধর্ম প্রচারে এবং মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন।

খুলনা বাংলাদেশ কাউন্সিলে খানজাহানের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে আমার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাতে অংশগ্রহণ করেন। বহু বাক্‌বিতন্ডার পরও এই জটিল অধ্যায়ের কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয় আরও গবেষণা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

তাঁহার পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। তিনি নিজেও স্বীয় পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তিনি নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধর্মপ্রাণ ও বিজ্ঞ সন্তান। অন্তরে অহমিকা উপস্থিত বা কার্যসিদ্ধির অন্তরায় হয় মনে করিয়া সম্ভবত তিনি নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সমাধি গাত্রের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি একজন প্রবাসী এবং ধর্মের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আল্লার দাস এবং হযরত মোহাম্মদের বংশধরের ভক্ত। তাঁহার নাম উলুখ খান জাহান, খান-এ-আজম। তিনি এগারো জন আউলিয়াসহ যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন তদনুসারে সেই স্থানের নাম হইয়াছিল বারবাজার, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বারবাজার যশোর শহর হইতে এগারো মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাচীন স্থান। এই স্থান হইতে খানজাহান তাঁহার বিরাট কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়েন।

তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল খুলনা, যশোর' বাকেরগঞ্জ—ফরিদপুর নহে। শেষ পক্ষে দুইটি জেলায় তিনি কখনও পদক্ষেপ করেন নাই। তিনি ছিলেন মুকুটহীন রাজা। কখনও সুলতান বা বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। বাদশাহ উপাধি তখনও এদেশে প্রবর্তিত হয় নাই।

ডক্টর কাদির তাঁহার আলোচনায় আরও কয়েকটি ভুল সংশোধন করিয়াছেন যাহা আমরা এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। তবে তিনি বলিয়াছেন "জৌনপুরের খাজায়ে জাহান এবং বাগেরহাটের খানজাহান চিরকুমার ছিলেন। তদুপরি দুইজনই ছিলেন খোজা। খানজাহান নাকি ৬০,০০০ সৈন্যসহ নবদ্বীপের বড়বাজারে পদার্পন করেন। এই

তথ্য সম্বল করিয়া স্টেপ্লেটন সাহেব তাঁহাকে জৌনপুরের খাজায়ে জাহান বলিয়া অনুমান করেন। যশোর খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র এই মতবাদ মানিয়া লন। আমিও তাহা অনেকটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। ইহা লইয়া ডক্টর আবদুল করিম সাহেবের সহিত পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় এক প্রচন্ড বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়। আকরাম খাঁ সাহেব ও স্টেপেল্টন সাহেবের মতের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই মহাপুরুষটি কোথা হইতে যে এত বিপুল লোকজন সহ দক্ষিণ বঙ্গে আগমন করেন অদ্যাপি তাঁহার কোন মীমাংসা হয় নাই।"

ডক্টর কাদির আরও বলিয়াছেন ঃ "জেলা জজ সৈয়দ জালালউদ্দীন হোসেন সাহেবের নিকট শুনিয়াছি কোন ভদ্রলোক বাকীপুরের খোদা বখ্‌শ লাইব্রেরীতে খানজাহান সম্পর্কে দুইখানা ফার্সি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আসিয়াছেন"। এই ভদ্রলোক যশোরের কবি জাফ্‌রী। আমরা এ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তবুও স্পষ্টভাবে আরও কিছু বলার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। খানজাহান চিরকুমারও ছিলেন না, নপুংসকও ছিলেন না। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক বা একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তবে তাহার কোন সন্তানাদি না থাকায় এইরূপ ভুল ধারণা করা হইয়াছে। জৌনপুরের খাজায়ে জাহান খোজা ছিলেন, সেইজন্য বাগেরহাটের খানজাহানকে খোজা বলা মারাত্মক ভুল হইবে। স্টেপেল্টন সাহেব ও সতীশ বাবুর মত অনেকটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ডক্টর কাদিরই ভুল করিবেন।

মোটকথা খানজাহান সম্পর্কে অবশ্য আরও তথ্য জানা প্রয়োজন। তাঁহার পূর্ব পরিচয় এখনও অস্পষ্ট। কালের কুয়াশা ভেদ করিয়া হয়তো একদিন সে মূল্যবান তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

বারবাজার আগমন ও যশোর অঞ্চলের কীর্তিরাজি ঃ খানজাহান অন্যত্র না গিয়া বারবাজার অবস্থান করিলেন কেন? এই স্থানে তখন একটি শহর ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বারবাজার হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে—এই দুই জাতির শাসনকেন্দ্র ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে খৃস্ট্রীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত গ্রীক ইতিহাস (Periplus of the Erythrean Sea) পেরিপ্লাসে বর্ণিত গন্ধারিড়ি রাজ্যের রাজধানী বারবাজারেই অবস্থিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ভার্জিল তাঁহার জার্জিকাস নামক কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি জন্মভূমি মন্টুয়া নগরীতে ফিরিয়া একটি মর্মর মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার শীর্ষদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তে গন্ধারিড়িদিগের বীরত্বের কথা খোদিত করিবেন। ইহা হইতে এদেশীয় লোকের শৌর্য-বীর্যের কথা প্রতীয়মান হয়।

বারবাজার অঞ্চলে এখনও বহু দীঘি (লোকে বলে ছয় বুড়ি ছয়টা অর্থাৎ একশত চব্বিশটি) বিদ্যমান থাকিয়া উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেকটি পুকুরে পাকা ঘাট ছিল। অনেকগুলি পুকুর এখনও প্রায় পূর্বাবস্থায় আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান আমলে প্রায় দশ বর্গমাইল জুড়িয়া এই শহর বিস্তৃত ছিল। শহরের উত্তরদিকে

খোসালপুর ও পিরোজপুর গ্রাম দ্বয়, পূর্বে বাদুড়গাছা ও পিরোজপুর, দক্ষিণে ভৈরব নদী এবং পশ্চিমে সাতগাছি গ্রাম। এখনও স্থানে স্থানে মরাখাল ও নদীর চিহ্ন আছে।

কথিত আছে যে সুবিদপুর গ্রামে সমসনদীর মধ্যে চাঁদ সওদাগরের দুইখানি বাণিজ্যপোত নিমিজ্জিত হয়। এখনও জাহাজের ন্যায় মৃত্তিকার আকৃতি দেখিয়া লোকে চাঁদ সওদাগরের স্মৃতি চিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। গাজী কালুর ঐতিহাসিক বিরাট নগর এখানকার বেলাট দৌলতপুর মৌজা। এই শহরের সর্বত্র স্তুপ দেখা যায়। এখনও প্রায় ২০/২১টি স্তুপ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে জোড় বাংলা স্তুপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সর্বত্র ইষ্টক, মৃত্তিকা খুড়িলে প্রচুর ইট পাওয়া যায়। অনেক সময় মৃত্তিকার নিম্নে বিভিন্ন প্রকার মৃন্ময় পাত্র, থালাবাসন, লোহার অলঙ্কার এবং মুসলমান আমলের মুদ্রা পাওয়া যায়। সাধু সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের একটি বড় লোহার চিম্‌টা কয়েক বৎসর পূর্বে পাওয়া গিয়াছিল। অনেক স্থানে ইটের জন্য হলকর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বারবাজার হইতে সাত মাইল পশ্চিমে ধোপাদী গ্রামে বলু দেওয়ানের দরগা আছে। বেলাট দৌলতপুরে নামাজগায় পূর্বে ঈদের নামাজ হইত।

শ্রীরাম রাজার গড়বেষ্টিত রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট দীঘি তাঁহার কীর্তি অদ্যপী রক্ষা করিতেছে। এই প্রাচীন শহরের যেখানে সেখানে প্রস্তর পড়িয়া আছে। অনেকগুলি প্রস্তর ও প্রস্তরখন্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি উহা বাগেরহাটের খানজাহান আলীর পাথরের ন্যায়। প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্বে হলকর্ষণের সময় একটি কামানের নল পাওয়া গিয়াছিল। জলাশয়ের মধ্যে রাণীমাতার দীঘি, সওদাগরের দীঘি, (সম্ভবতঃ চাঁদ সওদাগর নামীয় দীঘি), শ্রীরাম রাজার দীঘি, ভাইবোনের দীঘি, খোন্দকারের দীঘি, গোড়ার পুকুর, চাল ধোয়ানীর পুকুর, পাঁচ পীরের দীঘি, বেড় দীঘি, গলাকাটার দীঘি, বিশ্বাসের দীঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেড়দীঘির মধ্যে একসময় বাড়ী ছিল। পীর পুকুরের পার্শ্বে পূর্বে মেলা বসিত। খোন্দকাবের দীঘির পার্শ্বে ছিলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। এই দীঘির পার্শ্বে দরগা ও মাজার আছে। বারবাজারের সর্বত্র এবং বিশেষ করিয়া পথিপার্শ্বে মানুষের অগণিত অস্থি দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকার নিম্নে প্রায় সর্বত্র মানুষের অখন্ড কঙ্কাল ও হাড় পাওয়া যায়। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এক সময় এই শহরের অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শহরটি মানুষ অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বারবাজারে খনন কার্য চালাইলে পাহাড়পুর বা মহাস্থানের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইতে পারে।

বারবাজার অতীব প্রাচীন স্থান তাহা পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহার একাংশের নাম ছাপাই নগর ছিল। খানজাহান বারবাজার আসিয়া অনেকগুলি দীঘি ও মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। বারবাজারের জরাজীর্ণ ঐতিহাসিক মসজিদটি এখনও খানজাহানের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। খানজাহান নামীয় কোন দীঘি না থাকিলেও উহার কয়েকটি যে তিনি খনন করাইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বারবাজারের

মসজিদটি এক গুম্বজ বিশিষ্ট এবং উহা বাগেরহাটের পশ্চিমে রণবিজয়পুরে ফকির বাড়ীতে অবস্থিত খানজাহানের অন্যতম মসজিদের আকৃতিবিশিষ্ট। মসজিদটির উপর একটি প্রকান্ড ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে বারিপাত নিবারণ সম্ভব নহে। মসজিদের দেওয়ালগাত্রের প্রশস্ততা ৪ $\frac{১'}{২}$ ফুট। পূর্বে এই মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ১৩৩৪ সালে ফুরফুরার মরহুম পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব এখানে আসিয়া এই মসজিদে নামাজ পড়া শুরু করিয়া দেন। মসজিদের ভিত্তি ও নামাজের স্থান বসিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এই মসজিদের গুম্বজ দেখিয়া উহাকে মন্দির বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাগেরহাটে খানজাহানের স্থাপত্য শিল্প যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা কোন মন্দির নহে, খানজাহানের কীর্তি। সতীশবাবুও ইহাকে খানজাহানের মসজিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

খানজাহান বারবাজারে অবস্থান করিবার পর এই স্থান মুসলমানে ভরিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের নাম যথাক্রমে রহমতপুর, মুরাদগড়, দৌলতপুর সাদিকপুর, হাসিলবাগ, এনায়েতপুর। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এক কালে এই অঞ্চল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ছিল। বারবাজারে আসিয়া খানজাহান অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিযাছিলেন।

মুরলী হইতে বেদকাশী ঃ বারবাজারে কিছুকাল অবস্থানের পর খানজাহান সদলবলে ভৈরব তীর বহিয়া মুরলী উপস্থিত হন। মুরলী অতীব প্রাচীন স্থান সে বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। মুরলী এবং বারবাজারে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। খানজাহান এই স্থানের নাম করেন মুরলী কসবা। কসবা ফার্সী শব্দ, উহার অর্থ শহর। মুরলী বর্তমান যশোর শহরের সংলগ্ন উপশহর। মুরলীতে মধ্যযুগে সৈন্যবাহিনীর জন্য মৃত্তিকা গর্ভে কেল্লা ছিল। সে নিদর্শন এখন নাই। এখনও লোকে সেখানকার বসতবাটিকে কেল্লাবাটী বলিয়া থাকে। প্রাচীন আমলের শিব মন্দির ও কালীবাড়ী আছে। হাজী মহসীন প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া এখানেই অবস্থিত।

যশোরে খানজাহান দীর্ঘদিন অবস্থান করেন নাই। তাঁহার দুইজন প্রধান শিষ্য ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে থাকিয়া যান। তাঁহাদের নাম বাহ্‌রাম শাহ বা বোরহানুদ্দীন এবং গরীব শাহ্। তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে তাঁহারা মুরলীতে অনুচরবর্গের খাদ্য প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথাসময় মুরলীতে পৌঁছিয়া তাঁহারা খাদ্য প্রস্তুতের চেষ্টা করেন। কিন্তু সময়মত খাদ্য প্রস্তুত না হওয়ায় খানজাহান এখানে অবস্থান না করিয়া চলিয়া যান। তিনি গরীব শাহ্ ও বাহরাম শাহ্‌কে ঐখানেই রাখিয়া যান। প্রেসিডেন্সী বিভাগের প্রাচীন মনুমেন্টের তালিকায় গল্পটি লিখিত আছে। কিন্তু উহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক খানজাহান ভৈরব তীরে প্রাচীন মুরলীতে একটি ইসলাম প্রচার কেন্দ্র সংস্থাপন করেন। ক্রমে ঐ স্থান শহরে পরিণত হয়। উহাই মুরলী কসবা। পুরাতন কসবাও ঐ সময়কার শহর। গরীব শাহ ও বোরাহান শাহ লোকদিগকে ইসলামের আদর্শ বুঝাইয়া দিতেন। লোকে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা

করিত। এই দুই মহাত্মার মাজার যশোর শহরে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের পুণ্য স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

যশোর শহরে অবস্থিত পুলিশ অফিসের পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা পশ্চিমদিকে প্রায় এক মাইল গিয়াছে উহারই পার্শ্বে করবালা নামক স্থানে বোরহানউদ্দীনের সমাধি। পূর্বে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জনৈক খাদেম জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া একটি নূতন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জঙ্গলের মধ্য হইতে পাকা কবরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবরের পূর্ব পার্শ্বের প্রকাণ্ড দীঘি বোরহান শাহ কর্তৃক খানিত হইয়াছিল। দীঘির পশ্চিম তীরে একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর পড়িয়া আছে। কলেজের কয়েকজন ছাত্র আমাদিগকে বলিল যে উহা পীর সাহেবের পাথর, কেহই উহা অপসারণ করিতে পারে না। যেখানেই প্রাচীন কীর্তি সেইখানেই এই ধরণের আজগুবি গল্প শুনা যায়। বর্তমানে এই কবরের পার্শ্ববর্তী স্থান সাধারণের গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে।

যশোর শহরের পুরাতন কসবা অঞ্চলে ফৌজদারী কোর্টের উত্তরে ভৈরব তীরে গরীব শাহের মাজারের উপর এক গুম্বজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মসজিদের ন্যায় একটি স্মৃতি সৌধ আছে। সমাধিগাত্র মূল্যবান রন্ধীন বস্ত্র দ্বারা সর্বদা আবৃত থাকে। লোকে গরীব শাহের নামে সিন্নি মানত করে। যশোরের লোকেরা বিশ্বাস করে যে গরীব শাহের মাটিতে অত্যাচার সহ্য হইবে না। স্রোতস্বিনী ভৈরব এককালে তীরভূমি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গরীব শাহের মাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তবে মাজারটি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে। যশোর জেলার শ্রীপুর থানার নোহাটা গ্রামে গরীব শাহের প্রকৃত কবর অবস্থিত বলিয়া দাবী করা হয়। নোহাটার কয়েক ঘর অধিবাসী গরীব শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। সেখানে প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুকালে গরীব শাহ বলিয়াছেন যে তাঁহার কবরের উপর যেন কোন প্রকার স্মৃতিসৌধ স্থাপিত না হয়। ইহা কতদূর সত্য তাহা জানা যায় নাই।

মুরলী কসবা হইতে খানজাহানের অনুচরবর্গ দুইদিকে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল কপোতাক্ষ নদী বহিয়া সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে বেতকাশী পর্যন্ত গিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিল। অন্যদল ভৈরবকুল দিয়া পায়গ্রাম কসবায় পৌঁছিয়াছিল, যে কথা পরে আলোচিত হইবে। এখন দক্ষিণ দিকের বাহিনীর বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। সেকালে বারবাজার হইতে মুরলী পর্যন্ত রাস্তা ছিল। উহার নাম হইয়াছিল গাজীর জাঙ্গাল। যশোর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব দুইদিকেই খানজাহান আলী বা খাঞ্জা আলীর রাস্তা বা জাঙ্গাল আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি খানজাহানের অসংখ্য শিষ্য ও অনুচর জুটিয়াছিল। তাহারা সকলেই সৈন্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই সৈন্যদল বসিয়া বসিয়া রাজকোষ শূন্য করিত না। তাহারা সর্বদা কায়িক পরিশ্রম করিয়া রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ এবং জলাশয় খনন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত। তাহাদের প্রত্যেকের এক একখানি কোদাল ছিল। খানজাহান যে অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন, ইহা তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন।

খানজাহানের যে বাহিনী যশোর হইতে সুন্দরবনের দিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার নেতা ছিলেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নাম ফতে খাঁ। পিতাপুত্র উভয়ে ধর্মপ্রাণ ও কর্মনিপুণ সৈনিক ছিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে মসজিদ নির্মাণ, জলাশয় খনন, জঙ্গল কর্তন ও ইসলাম প্রচার করিতে করিতে সুদূর সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যশোর হইতে সর্বপ্রথম তাঁহারা খানপুরে উপস্থিত হইয়া তথাকার বহু অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। খানপুর হইতে অনুচরবর্গ বিদ্যানন্দকাটীতে আস্তানা স্থাপন করে। এখানে তাহারা একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করে। সেই আমলের বহু কীর্তিমালার ধ্বংসাবশেষে এখনও এতদঞ্চলে বিদ্যমান। বিদ্যানন্দকাটীর দীঘির দৈর্ঘ্য ১৬০০ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ৭০০ হাত। প্রতি বৎসর এখানে খানজাহানের নামে মেলা বসিয়া থাকে। খানজাহান এতদঞ্চলে পীর বলিয়া খ্যাত। বিদ্যনন্দকাটী অঞ্চলে খানজাহানের নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানের নিকটবর্তী সরফ আবাদ=সরফাবাজ ও মীর্জাপুর কয়েকটি দীঘি খানজাহানের অনুচরবর্গ জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য খনন করে। লবণাক্ত পল্পলময় দেশে ইহাই তখন ছিল প্রথম ও প্রধান সমস্যা।

ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোপালপুরে খানজাহানের জনৈক শিষ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা অদ্যপি বিদ্যমান। গোপালপুর হইতে দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষের কুলে মেহেরপুর গ্রামে পীর মেহের উদ্দীন সমাধি সৌধ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গোরস্থানের পার্শ্বে পীর সাহেবের সর্প ও হাতীর গোরস্থান আছে বলিয়া কথিত হয়। উহাও ইষ্টক নির্মিত বেদীর দ্বারা চিহ্নিত। উত্তর দিকে একটি পাকা ইন্দিরা আছে।

খানপুর ও বিদ্যানন্দকাটি হইতে খানজাহানের অনুচরবর্গ রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এখনও সেই প্রাচীন রাস্তার স্থান লোকে দেখাইয়া থাকে। এই রাস্তা যশোর হইতে আরম্ভ হইয়া খানপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি হইয়া মাগুরাঘোনা, ডাঙ্গানলতা, ভায়ড়া, তালা, কপিলমুনি ও সরল হইয়া শিবসা নদী অতিক্রম করিয়াছে। শিবসা নদী পার হইয়া এই রাস্তা আমাদী ও মসজিদকুড়ে মিশিয়াছে। কথিত আছে যে এই রাস্তা তৎকালে সুন্দরবনের অন্তর্গত বেদকাশী নামক স্থানে শেষ হইয়াছিল। কপোতাক্ষ নদীর পার্শ্ব দিয়া এই রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। পথের দুইদিকে বহু কীর্তি চিহ্ন আজিও বিদ্যমান।

খানজাহানের শিষ্যবর্গ বা সমসাময়িক ধর্মপ্রচারকেরা তালা থানার আটারই গ্রামে তিন গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উহাতে আরবী লিপি খোদিত আছে। আজিও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। ঐ গ্রামে হাজী দীঘি নামে একটি প্রাচীন জলাশয় বিদ্যমান। একটি প্রাচীন বৃহৎকায় ভিটি এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিটিও আছে। এগুলি প্রাচীনকালীন বসতবাটীর চিহ্ন, মৃত্তিকা খুঁড়িলে ইট পাওয়া যায়। এখানে পাকা রাস্তার চিহ্নও মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

খানজাহান শিষ্যবর্গ তালা থানার ডান্দ্বা নলতা গ্রামে কয়েকটি বসতবাটী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে তিনটি ইটের প্রকাণ্ড ভিটা আজিও বিদ্যমান। ঐ থানার ভায়ড়া গ্রামে বিরাটকায় দীঘি আছে। সাধারণ লোকে বলে জিন পরীতে এই দীঘি খনন করিয়াছে। জলকষ্ট নিবারণের জন্য বারইহাটি গ্রামে অনেকগুলি জলাশয় খনিত হয়। লোকে বলে এখানে সাত গণ্ডা অর্থাৎ ২৮টি পুকুর ছিল। পাইকগাছা থানার সোলায়মানপুরে বোরহানুদ্দীন নামীয় একটি দীঘি ও মসজিদ ছিল। দীঘির মধ্যে কয়েকখানা প্রস্তর আছে। দরগা মহলে পীর মিয়াউদ্দীন সাহেবের মাজার। ইনি খানজাহানের শিষ্য কিনা জানি না। কাশিমনগরে অনেকগুলি ভিটা আছে। উহাকে লোকে 'দমদমার, ভিটা বলে। খানজাহানের শিষ্যগণ সরলগ্রামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করে। সম্প্রতি উক্ত জলাশয়ের সংস্কার হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে সরল খাঁ এই দীঘি খননের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। লোকের বিশ্বাস ইহার জল সেবন করিলে রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। লস্করবেড় নামক গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনিত হইয়াছিল। এইভাবে জলাশয় খনন, রাস্তা, মসজিদ ও বসতবাটী নির্মাণ করিতে করিতে খানজাহানের অনুচরবর্গ আমাদি গ্রামে উপস্থিত হন।

আমাদি প্রাচীন স্থান। এখানে বোরহান খাঁ ও ফতে খাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল। ধর্মপ্রচারের সন্দ্বে সন্দ্বে পিতাপুত্রে শাসনকার্যও পরিচালনা করিতেন। তখনকার দিনে সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে কোন সুশৃঙ্খলিত সরকার না থাকলেও খানজাহানের শিষ্যবর্গ খলিফাতাবাদ হইতে গুরুর আদেশ লইয়া বিচারকার্য ও জমি পত্তন করিতেন। কপোতাক্ষীতীরে আজিও লোকে বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁর সমাধিস্থল দেখাইয়া থাকে। বুড়ো খাঁর সমাধি নদী স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনও টিকিয়া আছে। এই সমাধির উপর এখনও দুইশত বৎসরের একটি চাঁপাফুলের গাছ শোভা পাইতেছে। সমাধিস্থলের সন্নিকটে তাঁহাদের গড়বেষ্টিত বাড়ী ও আস্তানা ছিল। ঘর ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ নাই বলিলেই চলে। আমাদিতে জমিদার খনিত একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। মিঃ জেমস ওয়েষ্টল্যান্ড বলিয়াছেন যে এইস্থানে বুড়ো খাঁ একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়াছিলেন। উহা নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পরবর্তীকালে উহা 'হাতিবান্ধার দীঘি' নামে পরিচিত হয়। এখানে প্রাচীনকাল হইতে চতুর্ভুজা চামুণ্ডা মূর্তি পরিমালা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। হিন্দুজাতির নিকট ইহা এক অভিনব তীর্থক্ষেত্রবিশেষ।

আমাদি গ্রামে বুড়ো খাঁর কর্মকেন্দ্রে প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটি করিয়া একটি নবগুম্বজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। পরে এই স্থান লোক অভাবে জনশূন্য হইয়া জন্দ্বলে পরিণত হয়। বহুকাল পরে পুনরায় এখানে লোকে জন্দ্বল কাটিয়া বসতি স্থাপন করে। পরে একটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকার স্তূপ খুঁড়িয়া লোকে এই মসজিদ আবিষ্কার করে। তখন হইতে এই গ্রামের নাম হয় মসজিদকুড়। এই মসজিদ সুন্দরবন অঞ্চলের একটি প্রধান এবং প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। মসজিদের ভিতরকার মাপ ৪০'×৪০' ফুট এবং দেওয়ালের ভিত্তি ৭

ফুট প্রশস্ত। মসজিদের চতুষ্কোণে কয়েকটি মিনার আছে। ইহার পশ্চিমদিকে প্রাচীর গাত্রে তিনটি মিহরাব আছে। অধুনা মসজিদের পশ্চিমদিকে অনেকগুলি ডালিম গাছ উহার শোভা বর্ধন করিতেছে। মসজিদকুড় গ্রামের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিলে প্রাচীনকালীন ইষ্টক পাওয়া যায়। এক সময় মৃত্তিকার নিম্নে কয়েকঝুড়ি কড়ি পাওয়া গিয়াছিল। বুড়ো খাঁর সময়ে খনিত চাল ধোয়া ও ডাল ধোয়া নামীয় দীঘি দ্বয় মজিয়া গিয়াছে। বুড়ো খাঁর প্রকৃত নাম ছিল বোরহান খাঁ। সম্ভবতঃ বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় লোকে পূর্বোক্ত নাম দিয়া থাকিবে। লোকমুখে বোরহান নাম একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত এই মসজিদদের উপর সরকারের নজর পড়িয়াছে। বুড়ো খাঁ একজন ধর্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর বিদেশে প্রবাসী হইয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিত। স্বীয় গুরুকে দর্শন মানসে তিনি মধ্যে মধ্যে বাগেরহাটে যাইতেন। খানজাহানের দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বাগেরহাটে আজিও বুড়ো খাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। কথিত আছে যে, ঈশ্বরপুরেও বুড়ো খাঁর আস্তানা ছিল।

বুড়ো খাঁর জনৈক প্রধান সহকর্মীর নাম ছিল খালেস খাঁ। তিনি এদেশে খালাস খাঁ নামে সুপরিচিত। তিনি বেতকাশীতে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব অত্যাধিক। সর্বত্র লবণাক্ত জল। দূরদূরান্ত হইতে অসংখ্য লোক এই বেতকাশীর দীঘির জল লইয়া সেবন করিয়া থাকে। আজিও বহু হাটবাজারে গ্রীষ্মকালে এই জল বিক্রয় করিয়া বহু দরিদ্র লোক জীবন ধারণ করে। খননকারীর নামানুসারে এই দীঘির নাম হইয়াছিল খালাস খাঁর দীঘি। সতীশবাবু এই দীঘির নাম কালীখালাস খাঁ দীঘি বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ফলক খাঁ খালেস খাঁ নামের সহিত "কালী" নামের কোন সম্পর্ক নাই।

পনের

গাজী-কালু-চম্পাবতী, মুকুটরায়, বনবিবি ও দক্ষিণরায় কাহিনী

গাজীকালুর নাম এদেশে সর্বজন বিদিত। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্র গাজীর প্রভাব বিস্তারিত ছিল। এককালে গাজী তাঁহার দুর্জয় শক্তিদ্বারা এমন অভাবনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, সমগ্র দেশ গাজীময় হইয়া গিয়াছিল। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পল্লীতে পল্লীতে গাজীর গীতের আসর বসিত। সেখানে অবাধভাবে গাজীর গান ও নাচ হইত। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরা এই গাজীর গান শুনিয়া দিবাবসানে চিত্ত বিনোদন করিত। বর্তমানেও গাজীর গান হয়। কিন্তু উহার তীব্রতা একেবারেই হ্রাস পাইয়াছে।

মনসার ভাসান যেমন হিন্দুদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, মুসলমানদের নিকট গাজীর গীত তেমন খ্যাতিলাভ করিয়াছে। জারীগান, উত্তরবঙ্গের রূপবান গান এবং বরিশালের জরিনা গানের ন্যায় গাজীর গানও এককালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। গাজীর গীত শ্রবণ করিতে করিতে দেশের লোকে এক সময় এত উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহ একই কথা বারবার বলিলে উহাকে "গাজীর আলাপ" বলিয়া উপহাস করিত এবং ঐরূপ অতিরিক্ত লেখা দেখিলে তাহা না পড়িয়া 'গাজীর পট' বলিয়া উপেক্ষা করিত। গাজীর জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের ফলে এদেশের বহুস্থানে গাজীর হাট, গাজীপুর, গাজীর জাঙ্গাল, গাজীডাঙ্গা, গাজীর ঘাট, গাজীর দেউল, গাজীর খাল, গাজীর ঘুটো প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে।

কলিকাতার পরপারে শিবপুরে এবং ২৪ পরগণার কয়েকস্থানে গাজীর দরগা আছে। বগুড়া জেলার শেরপুরে প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজী কালুর নামে মেলা বসিয়া থাকে। সুন্দরবনে মৎসজীবি হিন্দুরা গাজীর নামে পাঁঠা বলি দেয়। ঝড় তুফানের মধ্যে বিপদ-সঙ্কুল নদীপথে যখন দাঁড়ি মাঝিরা নৌকা চালাইয়া আপন মনে পাল তুলিয়া চলিতে থাকে তখন তাহাদের গানের সুরের মধ্য দিয়াও শক্তিধর গাজী শাহের গুণ কীর্তন শ্রুত হয়।

"আমরা আছি পোলাপান,
গাজী আছে নিঘাবান
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচপীর, বদর বদর।।"

পাঁচপীর ও পীর বদর বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র সুপরিচিত। এই বিখ্যাত পাঁচপীরের মধ্যে সেকন্দর শাহ্, গাজী ও কালুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য দুইজনের সঠিক

পরিচয় জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে সামসুদ্দীন ইলিয়াস ও গিয়াসউদ্দীন পাঁচপীরের অন্য দুইজন। কিন্তু তাহা অনুমান মাত্র। পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে যে গাজীর গীতের প্রচলন আছে তাহার মধ্যে পাঁচপীরের কথা আছে। কথিত আছে যে, এই পাঁচপীরের নাম গিয়াসউদ্দীন তৎপুত্র সামসুদ্দীন এবং সামসুদ্দীনের পুত্র সেকন্দর। সেকন্দরের পুত্র বরখান গাজী এবং কালু। গাজীর গীতে পাঁচপীরের সম্পর্কে আছে।

"পোড়াগাজী গায়েশদি; তার বেটা সমসদি
পুত্র তার সাই সেকন্দর
তার বেটা বরাখন গাজী; খোদাবন্দ মুলুকের কাজী
কলিযুগে তার অবসর
বাদশাই ছিড়িল বঙ্গে; কেবল ভাই কালুর সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির।'

তুর্ক আফগান আমলে এদেশে অসংখ্য পীর ও আউলিয়ার শুভাগমন হয়। তাঁহারাই এদেশে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। তাহাদের মধ্য হইতেই এই "পাঁচপীরের" নামকরণ হইয়াছে। সুবর্ণগ্রামে এই পাঁচপীরের নামে পাঁচটি দরগা আছে। সিলেটের জিন্দাবাজার মহল্লার এক গোরস্থান "পাঁচপীরের মোকাম" বলিয়া পরিচিত। এই পাঁচপীর সম্পর্কে ডক্টর আনিসুজ্জামান তদীয় মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য পুস্তকে বলিয়াছেন যে, হিন্দু দেবদেবী ও তাঁহাদের গুণাবলীর পরিচয় মুসলিম মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহারই ফলে এইসব দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপও গড়িয়া উঠে। হিন্দু বনদর্গার স্থলে বনবিবি, দক্ষিণরায়ের রূপান্তর গাজীপীর ও কালু মৎস্যেন্দ্রনাথের পরিবর্তে মসন্দলি এবং সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ সত্যপীর। মুসলমান সমাজের খোয়াজ খিজির, পীরবদর, মাণিক পীর ও পাঁচপীরের উপাসনা দেখা যায়। ডক্টর জামান বলেনঃ "এইসব পীরের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল কিনা সে সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।

পাঁচপীর কথাটি বারভূঞা বা বার আউলিয়ার ন্যায়। পাঁচপীরের যে পাঁচটি পৃথক সত্বা ছিল, তাহারও সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। বনবিবি, সত্যপীর ও মাণিকপীরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে গাজীকালু, পীরবদর ও দক্ষিণরায় ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করি।

সুন্দরবনাঞ্চলে গাজীর দুর্জয় প্রতাপ শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। মিঃ ওমালী বলেন গাজীর নামে বনের ব্যাঘ্রকুল নত হইত এবং জঙ্গলে লোকে নির্ভয়ে চলাফেরা করিত। গাজীকে তিনি জিন্দাগাজী বা জিন্দক-ই-গাজী বা বিধর্মীদের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী বীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ গেইট বলেন, গাজী কাঠুরিয়াদের পৃষ্ঠপোষক পীর এবং ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

বারবাজারে পাঁচপীরের প্রভাব আছে। খুলনা জেলার লাবসা অঞ্চলে পাঁচপীরের মোকাম বা দরগা অবস্থিত। বারবাজার হাই স্কুলের উত্তরে এবং রেল লাইনের পূর্ব দিকে

এখনও পাঁচপীরের নামে সুন্দর জলাশয় তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। পীরবদরও সুন্দরবনাঞ্চলে প্রসিদ্ধ। বারবাজারের দক্ষিণে হাসিলবাগ গ্রামে একটি হাট ছিল--উহার নামকরণ হইয়াছিল বদরের হাট। নৌকার মাঝিরা ভয়সঙ্কুল নদীপথে যে পীরবদরের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে তাঁহার নামেও এই হাটের নামকরণ হইতে পারে। চট্টগ্রাম শহরে বখ্শী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে পীরবদরের মাজার আছে। তিনি বদর শাহ্ ও শাহ্ বদর নামেও পরিচিত। কথিত আছে যে পীববদর প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে একটি প্রস্তরের উপর বসিয়া চট্টগ্রামে আসেন। তিনি একটি মাটির আশ্চর্য প্রদীপ জ্বালাইতেন। উহাকে 'চাটি' বলা হইত। যে স্থানে ঐ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত উহা বর্তমানে 'বদর পাটি' নামে পরিচিত। প্রবাদ এই 'চাটি' শব্দ হইতে চাটি গ্রাম বা চাটগাঁও নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গাজী ও পীরবদর উভয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পীর বদর সম্পর্কে গাজীর ন্যায় বহু অতিরঞ্জিত আজগুবি গল্প এদেশে প্রচলিত থাকিলেও একথাও সত্য যে তিনি চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন। ভক্তেরা তাঁহাকে চট্টগ্রামের অভিভাবক দরবেশ বলিয়া জানে। মুসলমানেরা গাহিয়া থাকে ঃ

"আমরা আছি পোলাপান
গাজী আছে নিঘাবান
আল্লা নবী, পাঁচপীর,
বদর বদর।

চট্টগ্রামে একটি মাজারের উৎকীর্ণ ফলক প্রমাণ করে যে পীর বদর শাহ্ ১৩৪০ খৃস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় যে গাজী কালুর বহু পূর্বে পীরবদর এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সিলেটের বদরপুর রেল ষ্টেশনের নিকট অন্য আর এক পীর বদরের সমাধি আছে।

গাজীর নামে বারবাজার অঞ্চলে "গাজীর জাঙ্গাল" আছে। ঐ অঞ্চলে জাঙ্গাল মৌজা উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐতিহাসিক ছাপাই নগর গ্রাম বর্তমান বাদুরগাছা মৌজার মধ্যে এবং বারবাজার রেলষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। এই ছাপাই নগরে শ্রীরাম রাজার গড় বেষ্টিত বাড়ী ছিল। উহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। গড়ের মধ্যে এখনও বারমাস জল ভর্তি থাকে। এই গড়ের সংলগ্ন দক্ষিণে প্রাচীনকালের একটা বটবৃক্ষ ছিল। কিছুদিন পূর্বে ঐ বট বৃক্ষটি আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় তথাকার জঙ্গল অপসারিত হইয়া কয়েকটি পাকা কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে বলে এখানে গাজীর এবাদতখানা বা প্রার্থনাগার ছিল। সেখানে গাজীর নামে একটি দরগা আছে। সতীশবাবু বলিয়াছেন যে সেখানে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। কিন্তু উহা অনুমান মাত্র। প্রবাদ আছে যে, গাজী তদীয় প্রিয়তমা সহধর্মিণীসহ কিছুকাল মুরলী ও বারবাজার অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন। অনুমান করা হয় যে গাজীর স্ত্রী চম্পাবতীর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম হয় চম্পাপুর বা চাপাইনগর। বারবাজারের সন্নিকটে হাসিলবাগ গ্রামের দক্ষিণে মরা

ভৈরবের তীরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে গাজীর দরগা আছে। এখানে লোকে গাজীর নামে সিন্নি দেয়। খুলনা জেলার শ্যামনগর থানার মানিকপুর ও শহিদালীপুরে গাজীর দরগা আছে। পৌষ সংক্রান্তিতে সেখানে গাজীর নামে মেলা হয়। বারুইখালিতে গাজীর দরগা আছে। এখানেও বৎসরে একবার মেলা হয়।

ঝিকিরগাছার দুই মাইল পূর্বে যশোর রাস্তার সংলগ্ন লাউজানি বা ব্রাহ্মণনগর গ্রামে গাজীর নামীয় বিখ্যাত দরগা অবস্থিত। এই দরগার সংলগ্ন চম্পাবতীর পুকুর এবং দক্ষিণে খনিয়ার রণক্ষেত্র। বেনাপোল কাষ্টম কলোনীর মধ্যেও গাজীর নামে একটি দরগা আছে। বাগেরহাটের সন্নিকটে রণবিজয়পুরে গাজীর দরগা বিদ্যমান। যশোর খুলনার নানা স্থানে গাজীর বটগাছ আছে। মুজগুন্নির পার্শ্বে বিল পাবলার একস্থানের নাম গাজীর ঘুটো। মোরেলগঞ্জ থানার সুতালরী গ্রামে কাষ্ঠ নির্মিত বিরাটাকার ব্যাঘ্র ও অশ্বমূর্তির পৃষ্ঠে গাজী ও কালুর মূর্তিদ্বয় সোয়ার অবস্থায় দেখা যাইত। এই সমস্ত দর্শনে শক্তিশালী গাজীর প্রতাপ এতদঞ্চলে বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করা দুরূহ সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পর ইতিহাসের যে টুকিটাকি হস্তগত করিয়াছি উহাই গাজী কালুর ইতিহাস প্রণয়নে আমাদের সম্বল। "গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুঁথি", "দরাফখানের গঙ্গা স্তোত্র" ও "দরাফ খান গাজী," (দফর খাঁ বা জাফর খাঁ গাজী) মৌলভী আবদুল জব্বার প্রণীত "গাজী" নামক পুস্তক, আবদুল গফুর ও হালুমিয়ার "বরখা গাজীর কেরামতি" ও "গাজীমঙ্গল" প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই। ইহা এত অতিরঞ্জিত, অযৌক্তিক এবং অসম্ভাবিত ঔপন্যাসিক সৃষ্টি ছাড়া অলীক গল্পে পূর্ণ হইয়া এমন বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহার মধ্য হইতে বর্তমানে আমাদের আলোচ্য ইতিবৃত্তের কোন সঠিক তথ্য বা উপকরণ পাওয়া দুষ্কর। এই সমস্ত পুঁথি এদেশে এত বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহা ইতিহাসকে একরূপ ধামাচাপা দিয়া মিথ্যার স্বরূপ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক এই ধরণের পুঁথি পড়িয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করে। পুঁথিতে সাহিত্য রস আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক চরিত্র বিকৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। গাজী কালুর পুঁথির এক স্থানে আছেঃ

"গাজী শাহের বাপের নাম সেকন্দর
চৌদ্দ বছর যুদ্ধ কল্ল বেতকাঁটার ভিতর।।

ডাক্তার আবুল কাসেম এ সম্পর্কে বিভাগ পূর্ব কালের এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী মোসলমানদের মধ্যে আজকাল উপন্যাস লেখকের বড় একটা অভাব নাই। কিন্তু ঐতিহাসিকের অভাবের কথা ভাবিলে দুঃখে, ক্ষোভে ম্রিয়মান হইতে হয়।" গাজীর গান ধর্মপ্রাণ গাজীর নামে অনাচারের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সৎকার্যের খতিয়ানের স্থান দখল করিয়াছে গাজীর গানের ছড়া।

গাজী কালুর ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে আমাদের গলদঘর্ম হইয়াছে, তবুও আশাতীত ভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, গাজীর গীত, উপন্যাস, পুঁথি সাহিত্য, কিংবদন্তি, জনশ্রুতি, স্থানীয় প্রবাদ প্রভৃতি পর্বত প্রমাণ তুষরাশির মধ্য হইতে গাজীর ঐতিহাসিক তথ্য দুই চারিটি তন্ডুলকণার ন্যায় বাছিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। ঐতিহাসিকের চক্ষে যাহা বাস্তব সত্য তাহাই উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যাহা অবাস্তব ও অসত্য তাহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের যুগে সুধী সমাজ অসম্ভব ও আজগুবি কথার উপর আস্থা স্থাপন করিবেন না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

এখন এই ভাগ্যবান পুরুষ সিংহ কে? তাহাই আমাদের বিচার করিতে হইবে। গাজীর পূর্ব পুরুষের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস এবং সেকন্দর শাহের ইতিহাস আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করিয়াছি। কথিত আছে যে, সেকন্দরের প্রথমা রাণীর গর্ভে গিয়াসউদ্দীন (জুলহাস) ও বরখান (গাজী) জন্মগ্রহণ করেন।' 'গাজী' নামক পুস্তক ও পুঁথিতে আছে বৈরাট নগর নিবাসী শাহ সেকন্দরের পুত্র গাজী। তাঁহার মাতার নাম অজুপা সুন্দরী। অজুপা সুন্দরীর এক পালিত পুত্রের নাম কালু। গাজী বাল্যকালে বাদশাহী গ্রহণ করিবার জন্য পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হন। উত্তরে গাজী বলিয়াছিলেন, "আমি বাদশাহী চাহি না। পক্ষান্তরে ফকির হইতে ইচ্ছা করি।" গাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিকারে গিয়া নিখোঁজ হন। কাজেই পিতা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে রাজদন্ড গ্রহণ করিতে বলেন। আদেশ অমান্য করায় তিনি রাজরোষে পতিত হন। বাদশাহ অতঃপর স্বীয় পুত্র গাজীকে হত্যা করার জন্য জল্লাদকে আদেশ করেন। আশ্চর্যের বিষয় জল্লাদের খরশান অসির আঘাতে গাজীর একটি লোম পর্যন্ত কাটিল না। হুকুম হইল তাঁহাকে হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। অতঃপর তাঁহাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হইল। তহাতেও কিছু হইল না। গাজীকে পাথরের সহিত বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল তথাপি কিছুই হইল না। পরিশেষে একটি সূঁচে বিশেষ চিহ্ন দিয়া সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া গাজীকে তাহা উঠাইবার জন্য আদেশ করা হইল। খোদার কৃপায় অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইল। সাগর শুকাইয়া গেল। খোঁয়াজ খিজির আসিয়া পাতাল পুরী হইতে চিহ্নিত সুঁচ কুড়াইয়া গাজীকে দিলেন। মহানন্দে গাজী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতঃপর গাজী ও কালু সিদ্ধার্থের ন্যায় রাজসিংহাসন ও সংসার জীবন ত্যাগ করিয়া ফকিরী বেশে পৈতৃক বাসভূমি হইতে পলায়ন করিয়া বহু জনপথ ভ্রমণ-পূর্বক অবশেষে সুন্দরবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বনের ব্যাঘ্র ও কুমীর পর্যন্ত বাধ্য হইয়া গেল। অবশেষে গাজী ছাপাই নগরে শ্রীরাম রাজার দেশে মুসলমান বাসিন্দা না থাকায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। পুঁথিতে আছেঃ

"প্রজাগণ যত তার সব হিন্দুয়ান
সে দেশের মধ্যে নাহি এক মুসলমান।"

হাসিলবাগে আসিয়া শ্রীরাম তাঁতীর উপর গাজীর অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং তিনি তাহাকে ধনী করিয়া দেন। তিনি জামাল গোদা নামক এক ব্যক্তির গোদ আরোগ্য কবিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অকস্মাৎ শ্রীরাম রাজার রাজবাড়ীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, রাণী অপহৃতা হইলেন এবং সেখানকার সমস্ত অধিবাসী ইসলাম কবুল করিল। ছাপাই নগরে একটি সুবর্ণমন্ডিত মসজিদ নির্মিত হইল। অবশেষে গাজী কালু দুই ভাই সোনারপুর ও ব্রাহ্মণনগরে রাজা মুকুটরায়ের দেশে গেলেন। পুঁথিতে আছেঃ

"ব্রাহ্মণ নগর এই শুন বিবরণ।
এদেশের প্রজাগণ সকলি ব্রাহ্মণ
অন্য জাতি দেশে রাজা নাহি দেয় ঠাই।।
যবন পাইলে খায় দক্ষিণা গোসাই"

মুকুটরায়েব সাত পুত্র ও এক কন্যা, তাহার নাম চম্পাবতী। চম্পাবতীর ন্যায় পরমা সুন্দরী সে যুগে আর ছিল না। ফকির গাজী চম্পার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইলেন। কালু ঘটক হিসাবে মুকুটরায়ের দরবারে গিয়া গাজীর সহিত চম্পার বিবাহের প্রস্তাব করায় কালু বন্দী হইলেন। ফলে সমর দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। গাজীর গীতে বর্ণিত আছেঃ

"সাতশত গাড়োল ল'য়ে
দরার ঘাট পার হয়ে
গাজী চললেন খুনিয়া নগর
খুনিয়া নগরে যেয়ে
মুকুট রাজার মেয়ে,
গাজী বিয়ে করলেন কৌশল্যা সুন্দরী"

গাজীর সৈন্য অসংখ্য ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্র সৈন্য সহ গাজী মুকুটরায়ের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। মুকুটরায়ের সেনাপতি মহাবীর দক্ষিণরায়। কুমীর লইয়া তিনি গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। দক্ষিণরায় মুগুর হস্তে আসিয়া সক্রোধে গাজীর হাতের আসা (যষ্ঠি) ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গাজীর অদ্ভুত রণ-কৌশলে পরাস্ত হইলেন। রণ-বিজয়ী গাজী দক্ষিণরায়ের দুই কর্ণ ও বারহাত লম্বা টিকি কাটিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই নিদারুণ সংবাদে মুকুটরায় স্বয়ং তিন কোটি বার লক্ষ তের হাজার সৈন্য ও লক্ষ লক্ষ "তোপ-তীর" লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মুকুটের প্রতিদিন যত সৈন্য, ঘোড়া, হাতী ক্ষয় হইত, তিনি তাঁহার "মৃতঞ্জীব কূপ" হইতে জল ছিটাইয়া তাহা বাঁচাইয়া দিতে লাগিলেন। গাজীর লশ্‌করগণ এই গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়া সেই কূপে গোমাংস ও রক্ত নিক্ষেপ করিয়া উহার সঞ্জিবনী শক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। মুকুটরায় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। গাজীর ব্যাঘ্র সৈন্য ও পরীদল প্রতিদ্বন্দ্বী মুকুটের বার লক্ষ হস্তী ও ঘোড়া এবং তিন কোটি সৈন্য মারিয়া ফেলিল। রাজা ও সভাসদগণ পৈতা

ছিঁড়িয়া কলেমা পড়িয়া ঝুঁটি কাটিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। বাঘ ও পরীগণ তখন রাজপুরীর মধ্য হইতে চম্পাবতীকে অপহরণ করিয়া লইল। গাজীর সহিত চম্পার বিবাহ হইয়া গেল। রাজা ও রাণী ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। পুঁথিতে আছে মুকুটরায় বলিতেছেন ঃ

"বড় আহ্লাদের মোর কন্যা চম্পাবতী
সাতপুত্র মধ্যে সেই আদরের অতি।
তার প্রতি দয়া তুমি সর্বদা রাখিবা
অনিষ্ট করিলে কোন মার্জনা করিবা।"

ইহার পর চম্পাকে লইয়া গাজী বিদায় হইলেন। বাঘ ও পরীগণ রাজাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল। গাজী চম্পার রূপে মুগ্ধ হইলেন। পুঁথিতে চম্পার রূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"বিধুমুখী চম্পাবতী আছে কাছে বসি
জ্বলিতেছে রূপ যিনি লক্ষকোটি শশী।
হঠাৎ চম্পার রূপ নয়নে হেরিয়া
মুর্ছিত হইয়া গাজী পড়িল ঢলিয়া।"

কিছুদিন পরে গাজী দেখিলেন এক নদীর তীরে তিন শত যোগী সাধনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি গঙ্গাকে ডাকিয়া যোগীদিগের অভিষ্ট কমলে কামিনী দর্শন করাইলেন। যোগীরা মুসলমান ধর্মের ন্যায় ধর্ম নাই দেখিয়া ঝুঁটি কাটিয়া মুসলমান হইল। পরে পাতালপুরী হইতে জুলহাসকে লইয়া গাজী-কালু ও চম্পাবতী সাগর পার হইয়া বৈরাট নগরে পৌছিলেন। মলিন রাজপুরী হর্ষ কোলাহলে মুখরিত হইল। ইহাই পুঁথির সারকথা।

এইবার আমরা উপরোক্ত নিছক কল্পিত পুঁথিব স্তুপীকৃত আবর্জনা রাশির মধ্য হইতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব। সর্বপ্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক বৈরাট বা বিরাট নগর কোথায়? গাজীর প্রকৃত পরিচয় কি? বিরাট নগরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেহ কোন অনুসন্ধান দিতে পারেন নাই। অনুসন্ধানের পর আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বারবাজারের সন্নিকটে বেলাট দৌলতপুর মৌজা অবস্থিত। বিরাট বা বৈরাট নগর এই বেলাট শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি। তুর্ক-আফগান আমলে এবং উহার পূর্বেও এখানে জনাকীর্ণ শহর ছিল। এক সময় এই স্থান মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। বিরাট নগর এখানেই হওয়া স্বাভাবিক। যেহেতু এই স্থান হইতে ব্রাহ্মণনগর বেশী দূরে অবস্থিত নয়। গাজীর স্মৃতি এতদঞ্চলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি সেকন্দর শাহের পুত্র—ইহা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। বরখান গাজী বা বড় খাঁ নামে সেকন্দর শাহের কোন পুত্র ছিল না। সেকন্দর শাহ ১৩৫৯ হইতে ১৩৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দোর্দন্ডপ্রতাপে বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। সেকন্দরের অষ্টাদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে গিয়াসউদ্দীন পিতার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। মুকুটরায় ও গাজীর

যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ সেকন্দর শাহের প্রায় একশত বৎসর পরে। গাজীর সহিত সেকন্দর শাহের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব। বনবিবির পুঁথি ও গাজীর গীতের মধ্যেও বরখান নাম দেখিতে পাওয়া যায়। রায়মঙ্গলে আছে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যে গাজীর সন্ধি হয়, তিনি বরখান গাজী বা বড় খাঁ গাজী নামে পরিচিত।

"বড় খাঁ গাজীর সাথে মহাযুদ্ধ খণিয়াতে
দোস্তানী হইল তারপর।"

শাহ্ গরীবুল্লার জঙ্গনামা পুঁথিতে বড় খাঁ নাম আছেঃ

"বাপ নাম শাহ দুন্দি আল্লার ফকির
ভাঁটির সুলতান গাজী বড় খাঁ পীর।
অধীন ফকির বলে কেতাবের বাত
বড় খাঁ গাজী যারেদিল মোলাকাত।"

পুঁথি লেখকদের হস্তে পড়িয়া সম্ভবত বরখান নাম বড় খাঁতে পরিবর্তিত হইয়াছে। চব্বিশ পরগণা জেলার কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬-৮৭ খৃস্টাব্দে তদীয় রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। সুন্দরবন অধিপতি দক্ষিণরায়ের নামের সহিত এই কাব্যের নাম বিজড়িত। দক্ষিণরায় ও গাজীর মধ্যে যে ভয়াবহ্ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, উহার অসংখ্য কাহিনী দ্বারা এই কাব্যখানি ভরপুর। কাব্যের শেষ দিকে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজীর বন্ধুত্বের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অসম্ভাবিত ঘটনা বর্ণনায় রায়মঙ্গল কাব্য গাজী-কালুর পুঁথিকেও অতিক্রম করিযাছে। এতৎ সত্বেও রায়মঙ্গল কাব্যে ইতিহাসের যৎকিঞ্চিত উপকরণ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে আমাদের আলোচ্য গাজী শাহের প্রকৃত নাম বরখান গাজী। সম্ভবত তিনি রাজনন্দন না হইয়া সেকন্দর নামীয় কোন অমাত্য বা ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র হইতে পারেন। ইহাও সম্ভব যে তাঁহার পিতা তুর্ক-আফগান আমলে কোন সামন্তরাজ বা অধীনস্থ শাসন কর্তা ছিলেন। সিলেট জেলায় শেখ সেকন্দর ওরফে শাহ সেকন্দর নামে একজন দরবেশ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শাহ্ গাজী। উভয়ের সমাধি শাহ সিকন্দর নামক গ্রামে অবস্থিত। আমাদের আলোচ্য গাজীর সহিত তাঁহাদেরও কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। ফলকথা ইতিহাস বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্যন্ত তাঁহার পূর্ব পুরুষের সঠিক পরিচয় উদ্ধার করিতে পারে নাই।

গাজীর বাল্য জীবনও পূর্ব পুরুষের পরিচয়ের ন্যায় অস্পষ্ট। কথিত আছে যে তিনি বাল্যকালে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ধারণ করিতেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র কোরাণের শিক্ষায় নিজেকে মহিমান্বিত করেন। তিনি আরবী, ফার্সি, গণিত ও ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। গাজী বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ছিলেন এবং ধর্মকার্যে আত্মনিয়োগ

করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অন্যান্য গুণরাজি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। পাণ্ডুয়ার তাপস প্রবর শাহ্ জালালউদ্দীন তাব্রিজীর সহিত গাজীর সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। এই মহাত্মা গাজীকে জীবজগৎ, অধ্যাত্ম জগৎ, পারলৌকিক জগৎ ও মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান লাভ করেন। দেশ পর্যটনের অদম্য আশা তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। একথা সত্য যে গাজী কোন আধ্যাত্মিক গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে শাহ্ জালালউদ্দীন তাব্রিজী গাজীর বাল্য শিক্ষক হইতে পারেন না। এই মহাত্মা দ্বাদশ শতাব্দীর পরেই এদেশে আগমন করিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। গাজী আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে।

প্রবাদের যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সত্য নির্ধারণের জন্য প্রবাদ সমূহকে যুক্তিতর্ক ও বিবেকের দ্বারা যাচাই করিয়া আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। গাজীর বিষয় একথা সহজে বলা চলে যে তিনি ধনীর দুলাল হইয়াও সংসার বিরাগী ছিলেন, তাঁহার গৃহত্যাগ অকস্মাৎ ঘটনা নহে। গভীর চিন্তার পর তিনি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। গাজীর গীতে বর্ণিত আছেঃ

"গাজী বলে কালু ভাই
ছাড় দ'নের বাদশাহী
চল মোরা ফকির হয়ে যাই।"

অতঃপর গাজী এক নিশীথে কালুকে সঙ্গে লইয়া সংসার ত্যাগ করেন। কালুর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল রাম-লক্ষণের ন্যায়। শিশুকাল হইতে কালুকে তিনি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাই গৃহ ত্যাগ করিয়াও একসঙ্গে দুইজনে যৌবনে যোগী সাজিলেন। দীর্ঘকাল পথে পথে দুই নবীন সাধু বহুকষ্ট সহ্য করিয়া চলিতে থাকেন। কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যায়, কত ঝড় ঝাপটা মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যায়, কত বিপদ-আপদ পাশ কাটাইয়া যায়—পথিকগণ তাহা ভ্রূক্ষেপ করেন না। সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট তাঁহারা নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন। অবশেষে তরুণ সন্ন্যাসীদ্বয় সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন। অতঃপর দুই ভ্রাতা পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

গাজী শব্দের অর্থ মোজাহেদ বা ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী বীর, অর্থাৎ বিধর্মীদের সহিত ইসলামধর্মের স্বার্থে যিনি যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন, তিনিই "গাজী" নামে সম্মানিত হন। গাজী শব্দ উপাধি, প্রকৃত নাম নহে। তুর্ক আফগান আমলে এই ধরনের বহু গাজী এদেশে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। গাজীদের অনেক আস্তানা ও দরগাহ্ এদেশে আজিও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন মুকুটরায়ের সহিত যে গাজী যুদ্ধ করেন, তাঁহার নাম গোরাই গাজী। কিন্তু পীর গোরা চাঁদ বা গোরাই গাজী সম্পর্কে পৃথক ইতিবৃত্ত আছে। তাহতে মুকুট রায়ের সহিত যুদ্ধের কথা নাই। আবদুল গফুর সিদ্দিকী

গোরাই গাজী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন ডক্টর শহিদুল্লাহ উহার ভিন্নমত পোষণ করেন। গোরাই গাজীর প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী। তিনি দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। ২৪ পরগণার গেজেটীয়ার হইতে জানা যায় যে হাতীয়াগড়ে গোরাই গাজীর সহিত রাজা মহিদানন্দের পুত্র অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যুদ্ধে বকানন্দ নিহত হন, এবং গোরাই গাজী ভীষণভাবে আহত হইয়া বালান্ডার সন্নিকটবর্তী হাড়োয়ায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন গোরাই গাজীর হাড় হইতে হাড়োয়া নামকরণ হইয়াছে। গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন (১২৩০-১২৩৭) গোরাই গাজীর সামাধির উপর এক মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দেন এবং মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচশত একর জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। বসিরহাট অঞ্চলে গোরাই গাজী সর্বজন পরিচিত পীর। প্রতি বৎসর তাঁহার নামে হাড়োয়ায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। ফকিরেরা এখনও কলিকাতার রাস্তায় এবং অন্যত্র সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালাইয়া, "পীর গোরাচাঁদ, মুশকিল আসান" বলিয়া গান করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। গোরাই গাজীর স্মৃতি রক্ষার্থে কলিকাতায় গোরাচাঁদ রোড আছে। গোরাই গাজী এবং আমাদের আলোচ্য গাজী ভিন্ন ব্যক্তি।

গোরাই গাজী ব্যতীত বারাসাতের একদল শাহ্, বাঁশড়ার মোবারক গাজী এবং আরও কয়েকজন ধর্মপ্রচারক এদেশে ধর্মপ্রচার করেন। মোবারক গাজী সুন্দরবনের একাংশে ব্যাঘ্রভীতি নিবারণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মোবারক গাজী যোদ্ধা দরবেশ। বহুস্থানে তাঁহার নামীয় দরগা আছে।

ত্রিবেনীর জাফর খাঁ গাজীর তৃতীয় পুত্রের নাম বড় খাঁ গাজী। তিনি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। ব্লকম্যান ছোট পাণ্ডুয়ায় (হুগলী) জাফর খাঁ গাজীর সমাধির পার্শ্বেই বড় খাঁ গাজীর কবর দর্শন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই বড় খাঁ গাজী হুগলীর রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন ইসমাইল গাজীই পরবর্তীকালে বড় খাঁ গাজী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডক্টর সেনের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ রিসালাতুস-শুহাদা নামক ফার্সি গ্রন্থে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থে বা অন্য কোথাও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইসমাইল গাজী গৌড় সুলতান বরবক শাহের সমসাময়িক এবং তাঁহার সময় তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকে রচিত কবিতায় সীতারাম দাস তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। বুকানন হ্যামিলটন বলেন যে তিনি হোসেন শাহের সহিত কামরূপ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বন্দেশী রায়ের চক্রান্তের ফলে ইসমাইল গাজীর শিরচ্ছেদ হয়। ইহা মুসলিম বঙ্গের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা। তাঁহার মস্তক রংপুরের কাটাদুয়ারে এবং

দেহ তদীয় কর্মক্ষেত্র হুগলীর গড়মান্দারণে সমাধিস্থ হইয়াছিল। বন্দেশী রায়ের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া সুলতান গভীর মর্মপীড়া ভোগ করেন এবং নির্দোষ মনীষীর সম্মানার্থে তিনি বেগমকে সঙ্গে লইয়া মান্দারণ ও কাটাদুয়ারে উপস্থিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে গাজীর দরগাহ জিয়ারত করেন।

ত্রিবেনীর বড়খাঁ গাজী, রংপুরের ইসমাইল গাজী এবং আলোচ্য বরখান গাজী প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক চরিত্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে জাফর খান গাজী ত্রিবেনীতে ইসলাম প্রচার করিয়া ১২৯৮ খৃঃ তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে ১৩১৩ খৃঃ তিনি সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক শিলালিপিতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে "নাসিরুল ইসলাম" বা ইসলামের সহায়ক এবং "শিহাবুল হকওয়াদ্দিন" বা সত্য ও ধর্মের উল্কাস্বরূপ। জাফর খাঁর পুত্র বড় খাঁ গাজী চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গে আসেন এবং আমাদের আলোচ্য গাজী শাহের কার্যকাল পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে। ডক্টর এনামুল হক বলিয়াছেন যে আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ সম্ভবত ত্রিবেণী বিজেতা জাফর খাঁ গাজীর পুত্র এবং গৌড়াধিপতি সুলতান সেকন্দর শাহের আমলের ব্রাহ্মণ রাজা হইলেন মুকুটরায়। তিনি আরও বলিয়াছেন বড় খাঁ গাজী সম্ভবত দক্ষিণাঞ্চলে যশোর-খুলনা ও ২৪ পরগণায় যুদ্ধাভিযান করিয়াছেন। জাফর খাঁ বা তৎপুত্র বড় খাঁ সম্ভবত ইসলাম প্রচারকল্পে ২৪ পরগণা অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন গাজী কালুর অন্যূন একশত বৎসর পূর্বে। জাফর খাঁ প্রতিষ্ঠিত মসজিদের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে উক্ত মসজিদ ১২৯৪ খৃঃ স্থাপিত হয়। তাঁহার বা তদীয় পুত্রের সময় মুকুটরায় বা আমাদের আলোচ্য গাজীর নাম পাওয়া যায় না।

দারাবউদ্দিন বা দরাফ খাঁ বা দফর খাঁ গাজী এবং ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজী অভিন্ন ব্যক্তি। দরাফ খানের গঙ্গাস্তোত্র পুস্তকে তাঁহাকে গঙ্গাভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মুসলমান হইয়া তিনি কিভাবে গঙ্গাদেবীর ভক্ত হইয়া পড়েন তাহাই এই পুস্তকের সারমর্ম। অবশ্যই এই সমস্ত কাল্পনিক কাহিনীর আমরা কোন গুরুত্ব দিতে পারি না।

আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ দয়ার প্রতীক ছিলেন। এজন্য এদেশের অতিরিক্ত দয়ালু ব্যক্তিকে "দয়ার গাজী" বলা হইয়া থাকে। ইনিই সাধারণত বরখান গাজী, বরখাঁ গাজী বা বড় গাজী এবং গাজী সাহেব বলিয়া সুপরিচিত এবং কালুর সহিত তাঁহার নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। এদেশের গ্রামাঞ্চল, নদ-নদী, সুন্দরবন এমনকি আলো-বাতাসের সহিত এই গাজী সাহেবের নাম জড়িত রহিয়াছে।

এখন আমরা গাজীর সহিত দক্ষিণ রায় ও মুকুটরায়ের যুদ্ধের বর্ণনা দিব। উহার পূর্বে সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিতেছি। অনেকে মনে করেন গাজী কালুর কাহিনী, সোনাভান, জয়গুণ বিবি, বনবিবি, বিরাগগুরু প্রভৃতি পুঁথির ন্যায় অলীক গল্প পূর্ণ কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সমুদ্রের রাশি রাশি বালুকণার মধ্যে যেমন কদাচিৎ মণিমুক্তা পাওয়া যায়, তেমন পুঁথির আবর্জনারাশির মধ্যেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক সত্য

নিহিত আছে। স্থানীয় প্রবাদ, মুকুটরায়ের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, গাজীর দরগাহ, চম্পাবতীর দরগাহ প্রভৃতি নিদর্শন হইতে বহু সত্য উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কোট চাঁদপুরের পশ্চিমদিকে বিখ্যাত জয়দিয়া বাওড়ের পার্শ্বে মুকুটরায়ের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মুকুটরায়ের যুদ্ধ ও চম্পাবতী হরণের কাহিনী এতদঞ্চলে শ্রুত হয়। কিন্তু উহা প্রবাদ মাত্র।

যশোর জেলার ঝিকরগাছার দুই মাইল পূর্বে লাউজানি গ্রাম। বর্তমান রেল লাইনের দক্ষিণ ও উত্তরে এই গ্রামের বিস্তৃতি। বক্সারের বিখ্যাত কালিবাবুর রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বে অসংখ্য প্রাচীন বৃক্ষ কালের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি রেল লাইনের উত্তর দিকে লাউজানি গেটের পূর্বে বিখ্যাত গাজীর দরগাহ অবস্থিত। ইহা বর্তমানে মল্লিকপুর মৌজার মধ্যে পড়িয়াছে। বড় রাস্তার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে এই দরগা অবস্থিত। দরগায় পূর্বে একখানি ঘব ছিল। সে ঘর এখন আর নাই। উন্মুক্ত স্থানই দরগা হিসাবে পরিচিত। বহু পূর্বে এখানে প্রতি বৎসর মেলা বসিত। বর্তমানে দরগার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পোষ্ট অফিস ও মাদ্রাসা আছে। ইহার পূর্বদিকে 'চম্পাবতী' নামীয় পুকুর। ইহার একটু পূর্বে 'বাঘমারীর পুকুর'। লোকে বলে গাজী এখানে ব্যাঘ্র বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

দরগার সংলগ্ন "আমুড়ী কুয়া" বা "মৃতঞ্জীব কুপ"—এখনও লোকে সেই স্থান দেখাইয়া থাকে। একটি বটগাছের নিম্নে এই কুয়া অবস্থিত ছিল। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা তাহাদের পূর্ব পুরুষের মুখে সে কথা শুনিয়াছেন। পরে এই কুপের সন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে যে ঐ কূপের জল ছিটাইয়া দিলে মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিত। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দার্শনিক যুক্তির মাপকাঠিতে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তবে তথাকথিত এই মৃতঞ্জীব কূপ বা "জীয়ত কুঁড়ির" স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং সাধারণ লোকে উক্ত গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। দরগার দক্ষিণ দিকে খনিয়া বা কুনিয়ার রণক্ষেত্র। সে ময়দান স্থানীয় লোকে আমাদের দেখাইয়া দেয়। এই ময়দানেই গাজীর সহিত দক্ষিণ রায়ের 'মহাযুদ্ধ' সংঘটিত হইয়াছিল। তিন চারি বর্গমাইল ব্যাপী মুকুটরায়ের রাজধানী এবং শহর বিস্তৃত ছিল। রাজধানীর নাম ছিল ব্রাহ্মণনগর। স্থানীয় লোকে এখনও ঐ নামে জানে—লাউজানী উহার বর্তমান নাম। বাবু রামশংকর সেন লিখিয়াছেন যে মুকুট রায়ের রাজধানী ছিল খড়িয়া নগরে। খনিয়া, কুনিয়া বা খড়িয়া একই স্থানের বিভিন্ন নাম। ইহা রাজধানী ব্রাহ্মণনগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এখানে শহরের কোন চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই নাই। কেহ কেহ বলেন বর্তমান মাদ্রাসার স্থানই এককালে রাজধানী ছিল। ইহার অদূরে গড় ও টিলা পরিলক্ষিত হয়।

দরগার কিছুদূর পশ্চিমে লাউজানীর ক্ষুদ্র বাজার অবস্থিত। এই বাজারের দক্ষিণে কলিকাতার রাস্তা ও রেল লাইন। মুকুটরায়ের রাজবাড়ীর সীমানার মধ্য দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণ দিকে মুকুটরায় খনিত প্রকাণ্ড দীঘি। উহা পূর্ব-পশ্চিমে

দীর্ঘ। দীঘির দক্ষিণ পাড়ে মুকুটরায়ের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষের নিদর্শন অদ্যপি বিদ্যমান। রাজবাড়ীর ভিটায় চাষীরা চাষ করিয়া ফসল ফলাইতেছে। জমি খুঁড়িলে প্রাচীন কালের ইট পাওয়া যায়। দীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে পাকা ঘাট ছিল। সে চিহ্ন এখন আর নাই। রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে অন্দর মহলের একটি পুকুর ছিল। রাজবাড়ীর ভিটায় একটি প্রকাণ্ড হরীতকী বৃক্ষ ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিশুরা এই বৃক্ষতলে জমায়েত হইয়া হরীতকী ফল সেবন করিত। চাচ্‌ড়ার রাজষ্টেট হইতে এই বৃক্ষটি ছেদন করিয়া রাজবাড়ীর সৌখিন আসবাব পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মুকুটরায়ের জমিদারী পরবর্তীকালে চাচ্‌ড়া ও নলডাঙ্গার বাজাদের মধ্যে বন্টন হইয়া যায়। নলডাঙ্গার অংশ ছিল চারি আনা এবং চাচ্‌ড়ার বার আনা। বর্তমানে প্রজাগণ ঐ সম্পত্তি খাসে ভোগদখল করিতেছে। নোয়াখালী জেলার বহু দরিদ্র কৃষক পরিবার এখন রাজবাড়ীর আসে পাশে ও পরিত্যক্ত ভিটায় বসবাস করিতেছে।

মুকুটবায় গুড় গাঁঞিভুক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব হইতেই তাঁহারা এদেশে বাস করিতেন। সেই জন্য সম্ভবত এই স্থানের নাম হইয়াছিল ব্রাহ্মণনগর। এই স্থানের উত্তরে গুংড়ী নদী প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে এই নদী মজিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হরিহর নদী এবং পশ্চিম দিকে কপোতাক্ষ নদী প্রবাহিত ছিল। ইহার মধ্যে পরিখাবেষ্টিত দুর্গে সাড়ম্বরে রাজা মুকুটরায় বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার রাজ্য সম্ভবত দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন ও পশ্চিমে হুগলি নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

মুকুটরায়ের সেনাপতির নাম ছিল দক্ষিণ রায়। তিনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং রাজার আত্মীয়। উপরোক্ত তথ্য হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে গাজীকালু, চম্পাবতী, মুকুটরায় এবং তদীয় সেনাপতি দক্ষিণ রায় সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। পরবর্তী আলোচনা হইতে এই ইতিহাস আরও স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এখন মুকুটরায় ও দক্ষিণ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

যশোর অঞ্চলে মুকুটরায়ের নাম জানেন না এমন লোক নাই। ঝিকিরগাছা অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে মটুক রাজা বলিয়া অভিহিত করে। সতীশবাবু তদীয় যশোর খুলনার ইতিহাসে কয়েকজন মুকুটরায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা একে একে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। প্রথম–জমিদার মুকুট রায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিনোদ রায়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। যশোর জেলার উত্তরে তাঁহার জমিদারী ছিল। নলডাঙ্গার রাজ বংশের প্রবল প্রতাপে সেই বংশের জমিদারী বিলুপ্ত হয়। দ্বিতীয় মুকুট রায় ঝিনাইদহ অঞ্চলে। ইনি একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তিনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ। লোকে তাঁহাকে রাজা মুকুট রায় বলিত। তাঁহার ভ্রাতার নাম গন্ধর্ব রায়। গৌড়ের সুলতান তাঁহাকে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সামন্ত এবং অশ্ব ও হস্তী ছিল। তিনি জন হিতার্থে অসংখ্য জলাশয় খনন ও রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও ঝিনাইদহ অঞ্চলে উহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ঢোল সমুদ্র নামক জলাশয় সর্বাপেক্ষা

বৃহৎ। ঝিনাইদহের পূর্ব দিকে বিজয়পুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। উহার দক্ষিণ পশ্চিমে বাড়ী বাথান নামক স্থানে তাঁহার প্রকান্ড গোশালা ছিল।

কথিত আছে যে মুকুটরায়ের ১৬ হল্‌কা হাতী, ২০ হল্‌কা ঘোড়া এবং ২২০০ কোড়াদার ছিল। তিনি অসংখ্য গাভী পুষিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বৃন্দাবনের "নন্দ মহারাজ" আখ্যা দিয়াছিল। বেড়বাড়ী নামক স্থানে তাঁহার উদ্যানবাটী অবস্থিত ছিল। রঘুপতি ঘোষ রায় তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মুকুটরায়ের গয়েশউদ্দীন নামীয় আর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তদীয় কর্মস্থলের নাম হইয়াছে গয়েশপুর। চণ্ডী সর্দার ও কেশব সর্দার নামে তাঁহার আরও দুই জন প্রধান সৈন্য ছিলেন। কথিত আছে, গৌড়েশ্বরের সৈন্যের সহিত বাড়ীবাথানে মুকুটরায়ের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হিন্দু রাজা পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন।

প্রবাদ আছে যে কোন রাজা বন্দী হইলে সঙ্গে দুইটি কপোত উড়িয়া যাইত। বন্দীকে হত্যা করা হইলে কপোত দুইটি ফিরিয়া আসিত। পারাবত প্রত্যাগমন করিয়াছে জানিতে পারিলে বন্দীর স্ত্রী পুত্র সকলে মিলিয়া আত্মহত্যা করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বংশচিহ্ন মুছিয়া ফেলিত। অনেক সময় বন্দী নিষ্কৃতি পাইলেও দৈবক্রমে পারাবত উড়িয়া আসিয়া বংশ নির্লোপ করিয়া দিত। কথিত আছে যে এইরূপ ভুলের জন্য দেবগ্রামের দেবপাল রাজা, দেউলিয়ার চন্দ্রকেতু, মোহাম্মদপুরের সীতারাম ও বাড়িবাথানের এই মুকুটরায়ের বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। সামাজিক কুসংস্কার ও কুশিক্ষাব জন্য এহেন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। কথিত আছে মুকুটরায়ের কপোত ফিরিয়া আসিবা মাত্র তাঁহার পরিবারবর্গ গুপ্তদুর্গের পার্শ্ববর্তী পরিখাতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। যেখানে তাঁহার কন্যারা মরেন তাহা 'কন্যাদহ', যেখানে তাঁহার দুই স্ত্রী নিমজ্জিত হন, তাহা সতীনে বলিয়া খ্যাত। বর্তমানে সে পরিখা ও দুর্গ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। এই মুকুটরায়ের সহিত গাজীর যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই।

তৃতীয় মুকুটরায়ের বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণ নগর তাঁহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার রাজ্য শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাঁহার অধীনে বিপুল সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি নিজে উত্তর দিকের শাসনভার স্বহস্তে পরিচালনা করিতেন। দক্ষিণ দেশে বা ভাটি মুল্লুকের শাসনভার দক্ষিণ রায়ের হস্তে সমপর্ণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে ভাটিশ্বর এবং আঠার ভাটির রাজা বলিত। এজন্য তাঁহার শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ অত্যধিক ছিল। তিনি ছিলেন বীর্যবান বীর পুরুষ এবং তীর, ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে বহু ব্যাঘ্র ও কুমীর শিকার করিতেন। এজন্য সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের নাম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস প্রণীত "রায়মঙ্গল" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ২৪ পরগণার দক্ষিণে জঙ্গল কাটাইয়া প্রভাকর নামে জনৈক রাজা একটি রাজ্য স্থাপন করেন। দক্ষিণ রায় তাঁহার পুত্র। সম্ভবত দক্ষিণ রায়ের ব্যাঘ্র শিকারের খ্যাতি শ্রবণে মুকুটরায় তাঁহাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আমরা যে কয়েকজন মুকুটরায়ের কথা আলোচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে শেষোক্ত মুকুট রায়ই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। চম্পাবতী বা সুভদ্রা তাঁহার একমাত্র কন্যা, দক্ষিণ রায় তাঁহার সেনাপতি এবং গাজীর সহিত খনিয়ার ময়দানে তাঁহারই "মহাযুদ্ধ" সংঘটিত হইয়াছিল। মুকুট রায়ের স্ত্রীর নাম লীলাবতী। তাঁহার সাত পুত্র ও এক কন্যা। সাত ভাইয়ের এক বোন চম্পাবতী সকলেরই বিশেষ আদরণীয়। কোন আদরের ভগ্নির কথা উঠিলে আমাদের দেশে এখনও লোকে "সাত ভাই চম্পার" কথা বলিয়া থাকে। গানের সুরেও সে কথা সুমধুর ঝঙ্কারে গীত হয়। "সাত ভাই চম্পা জাগরে"—এই সুরলহরীর সন্ধান অনেকে জানেন না। ইনি সেই মুকুট-কন্যা এবং গাজীর সহধর্মিণী চম্পাবতী। কবি ও গায়কের নিকট এই নাম অতীব প্রিয়। চম্পাবতীর অপরূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তাঁহার নাম রূপকথার রাজকন্যার ন্যায় রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইনি ছিলেন প্রকৃত রূপবতী রাজকন্যা।

পুঁথিতে আছে গাজী তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল প্রায় হইয়া পড়েন এবং বিবাহের প্রস্তাব সহ কালুকে মুকুটরায়ের দরবারে প্রেরণ করেন। কালু বন্দী হইলে তাঁহার মুক্তির জন্য গাজী সোনারপুর হইতে যুদ্ধ যাত্রা করেন। প্রবাদ আছে যে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহও গাজীকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিযাছিলেন। পুঁথিতে গাজীর চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও কামুক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি যে চম্পাবতীর উপর আসক্ত ছিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনা পুঁথি লেখকদের কল্পনা প্রসূত রসাল কাহিনী। এই ধরনের কাহিনী সংযোজিত না করিলে বাজারে পুঁথি চলে না এবং অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত পাঠক ও শ্রোতাদের আসর জমিতে পারে না। সতীশবাবু বলিয়াছেন, "এ বিষয় মুসলমান পুঁথিতে গাজী সাহেবের কামুকতার যে বিস্তৃত কাহিনী আছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বোধ হয়।" প্রকৃতপক্ষে গাজী ধর্মপরায়ণ ও পূত চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মযোদ্ধা দিব্যজ্ঞানী সেনানায়কের এইরূপ কুৎসিত চরিত্র কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে গাজী সম্ভবত ব্রাহ্মণ রাজা মুকুটরায়ের ইসলাম বিদ্বেষের কথা জানিতেন। দক্ষিণ রায়ও ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন। এ সম্পর্কে সতীশবাবু বলিয়াছিলেন, "মুকুটরায় অতিরিক্ত যবনবিদ্বেষী ছিলেন, তখন সম্যক্ শাসন বিস্তৃত না হইলেও দেশ যবনাধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু তবুও মুকুটরায় যবনের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, যবনের মুখ দর্শন করিতেন না; কোন কারণে যবন দর্শন করিলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন।" দক্ষিণ রায় সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ "দক্ষিণ রায়ও মুকুটরায়ের মত যবনদ্বেষী ছিলেন। এই যবনদ্বেষই তাঁহাদের কালস্বরূপ হইয়াছিল।" কালুকে সম্ভবত মুকুটরায়ের দরবারে ইসলামী দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। রাজা মুকুটরায় ইহাতে অপমানিত মনে করিয়া কালুকে বন্দী করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের

প্রতি অবমাননা এবং কালুর বন্দী হেতু গাজী সমরায়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে গাজী সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করিয়া ফকিরী বেশ ধারণপূর্বক বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার পক্ষে চম্পার রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে পাইবার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কাহিনী অলীক বলিয়া মনে করি। এই ধরণের যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধ বলা হয় না এবং এহেন বিজয়ী বীর গাজী আখ্যা পাওয়ার অযোগ্য।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে মুকুটরায়ের রাজধানী ব্রাহ্মণ নগরের সংলগ্ন খনিয়ার রণক্ষেত্রে গাজীর সহিত মুকুটরায়ের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে দক্ষিণ রায় সেনাপতিরূপে মুকুটের পক্ষে যুদ্ধ করেন। পুঁথিতে গাজীর ব্যাঘ্র সৈন্য এবং দক্ষিণ রায়ের কুমীর সৈন্যের উল্লেখ আছে। এই কথার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করি। ২৪ পরগণা জেলার হিজলী, হাতীয়াগড়, সোনারপুর এবং বর্ধমান ও হুগলী অঞ্চল হইতে গাজী ব্যাঘ্রের ন্যায় শক্তিশালী পাঠান সৈন্য যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য পুঁথিতে আজগুবি ব্যাঘ্র সৈন্যের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষিণ রায় ভাটি অঞ্চলের প্রতাপশালী যোদ্ধা, সুন্দরবনের নদনদীতেই তাঁহার আধিপত্য। তিনি নৌ-সেনার অধিনায়ক ছিলেন। সেজন্য তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের কুমীর সেনা বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে গাজীর শক্তিশালী পদাতিক সৈন্যের সহিত দক্ষিণ রয়ের নৌ-বাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

খনিয়ার ময়দানে গাজীর সেনাদলের সহিত দক্ষিণ রায়ের সৈন্যদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা। কথিত আছে গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গাজীকে এই যুদ্ধে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ের সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। কয়েকদিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। দক্ষিণ রায়ের সৈন্যগণ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা মুসলমানদের নিকট টিকিতে পারিল না। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গাজীর সৈন্যগণ সদলবলে রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে মুকুটরায় আত্মসমর্পণ করেন। পরাজয়ের গ্লানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুকুটের পরিবারবর্গের অনেকেই কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। মুকুটের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব এবং এক মাত্র কন্যা সুভদ্রা বা চম্পাবতী সৈন্যদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। কামদেব পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া 'পীর ঠাকুরবর' নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি দেশব্যাপী ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বিষয় অনেক কিংবদন্তী আছে। সেনাপতি দক্ষিণ রায় পরাজিত হইবার পর যুদ্ধ সমাপনান্তে গাজীর সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। মুকুটরায় ইহার পর দেশত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন তিনিও কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর বীর সেনানায়ক বরখান, "গাজী" উপাধিতে ভূষিত হন। ইহাই যুদ্ধের সার কথা।

যুদ্ধশেষে চম্পাবতী মুসলিম শিবিরে নীত হইলে গাজীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। গাজী শেষ পর্যন্ত ভক্তগণের অনুরোধে চম্পাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস অজ্ঞাত। কেহ কেহ বলেন গাজী চম্পাকে

বিবাহ করেন নাই, আবার পুঁথির ভাষায় বিবাহ করিয়া পরে গাজী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। চম্পাবতীর সহিত গাজীর শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সম্ভবত ফকির গাজী সংসার বিরাগী বিধায় তাঁহার সহিত রাজকন্যা চম্পার দাম্পত্য জীবন খাপ খায় নাই। গাজীর কবর সিলেট জেলায় এবং চম্পাবতীর কবর খুলনার পশ্চিম সীমান্তে। উভয়ে একত্রে বসবাস করিলে একই স্থানে সমাধিস্থ হওয়া স্বাভাবিক।

গাজী ও চম্পাবতীর সমাধি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হয় নাই। শেষ জীবনে চম্পাবতী ধর্ম সাধনায় ও আত্ম চিন্তায় কালাতিপাত করেন। তাঁহার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল সমস্তই পর সেবায় দান করিয়া এমন আদর্শভাবে জীবন যাপন করিতেন যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত, মায়ের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। সেইজন্য এই মহিলার নাম হইয়াছিল মা চম্পা বা "মাই চম্পা বিবি।" তাঁহার তিরোধানের পর তদীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহার স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করিয়া দেন। চম্পাবতী মুসলমানের পত্নী না হইলে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হইত না। জাফর খান গাজী কর্তৃক ত্রিবেনী বিজয় ঘটনা অবলম্বনে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হইয়াছে তাহাতে গাজী ও চম্পার কবরের দুইখানি হাফটোন ছবি আছে। ইহা উপন্যাস ইতিহাস নহে। সাতক্ষীরা শহরের তিন মাইল উত্তরে লাবসা গ্রামে মাই চম্পার দরগা আজিও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। বারাসাতের নিকট ঘোলা গ্রামে মাই চম্পার একটি প্রসিদ্ধ আস্তানা আছে।

মুকুটরায়ের একমাত্র কন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠ চম্পাবতী লাবসা গ্রামে চিরশায়িত। কালের কষাঘাতে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সমাধি সৌধটি মৃত্তিকার নিম্নে পড়িয়া যায়। বহু পরে মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা বাহির করা হয়। চম্পাবতীর নামের সহিত অনেক অলৌকিক কাহিনী জড়িত আছে। দরগার পার্শ্বে ও উপরে চম্পক ফুলের গাছ এবং প্রাচীন কালীন দুইটি বটবৃক্ষ, একটি নিমগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষলতা স্থানটিকে জঙ্গলাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমাধি সৌধের চারিটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই জরাজীর্ণ দরগার সংস্কার আবশ্যক। পূর্বে এখানে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতক্ষীরার গুড় পুকুররের মেলার ন্যায় হিন্দু মুসলমানের বিরাট মেলা বসিত। প্রায় ২৫ বৎসর হইল আলেমগণ ফতোয়া দিয়া ঐ মেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মেলায় অসংখ্য মুরগী ও ছাগল মানত হিসাবে আসিত। হিন্দুগণ শনি ও মঙ্গলবারে দরগায় পূজা দিত।

মাই চম্পার জীবন কাহিনী সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। ইতিহাস এ বিষয় এক প্রকার নীরব। খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ "চম্পা বাগদাদ নগরীর খলিফা বংশের অবিবাহিতা কন্যা। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি মহানগরী বাগদাদ হইতে সুদূর বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে করিতে চম্পা একদিন নৌখালি নদীর মধ্য দিয়া নৌকাযোগে যাইবার সময় লাবসা গ্রামে তাঁহার নৌকা ডুবি হয়। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা এই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পান এবং তখন হইতে নদী তীরে লাবসা গ্রামে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে

তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যগণ তদীয় সমাধির উপর এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন।" ওমালি সাহেব এই গল্প অবিশ্বাস করিয়াছেন। চম্পাবতী যে হিন্দু রাজকন্যা তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সূত্র পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

এখন আমরা গাজীর শেষ জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব। শেষ পর্যন্ত যশোর অঞ্চল হইতে গাজী ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে করিতে আসামের দিকে চলিয়া যান। তথায় গাজীর ইসলাম প্রচারের কাহিনী লোকমুখে শ্রুত হয়। কথিত আছে সিলেট জেলায় গাজীর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। সেখানেও তাঁহার নামীয় দরগা আছে। গাজী অতঃপর শেষ জীবনে সিলেটের অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমায় দেহত্যাগ করেন। এখানে বিশগাঁও (পরবর্তী নাম গাজীপুর) গ্রামে অদ্যাপি গাজীর সমাধি ও আস্তানা অক্ষতরূপে বিদ্যমান থাকিয়া ধরাপৃষ্ঠে গাজীর বহু শতাব্দী পূর্বের শৌর্যবীর্য ও ইসলাম প্রচারের কথা সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে। সৈয়দ আবদুল আগফর লিখিত ও ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তরপের ইতিহাসে আছে "সা গাজী বিলগ্রামের অর্ন্তবতী গাজীপুরে তাঁহার দরগা আছে। সৈয়দ নাসিরুদ্দীন সা গাজীর সহায়তায় ত্রিপুরার রাজাকে পরাজিত করিয়া তরফ দখল করেন।" ষ্টেপেলটন সাহেব বিশগাঁও গ্রামে আলোচ্য গাজীর সমাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এইক্ষণ আমরা দক্ষিণ রায় ও গাজীর শেষ পরিচয় বর্ণনা করিব। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে কথাকথিত বনদেবতা বনবিবির নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রতাপশালী যোদ্ধা দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের দেবতা বলিয়া পরিচিত। সুন্দরবনের সর্বত্র বনবিবি ও গাজীর আধিপত্য বিরাজমান। আজিও নৌকার মাঝিরা উভয়ের নাম স্মরণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই মানস সুন্দরী বনবিবি কে? ইতিহাস তাহা নির্ধারণ করিতে পারে নাই। জঙ্গলের লোকেরা রোমাঞ্চময়ী বনবিবিকে অতি আপন জন হিসাবে বিশ্বাস করে। বিপদে-আপদে বনবিবির সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। সুন্দরবনাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র বনবিবির কাহিনী অতিরঞ্জিত ও আজগুবি করিয়া গল্পের আসর জমানো হয়। অজ্ঞ লোকেরা বলে বনবিবির আকৃতি বিরাটকায় নারীর ন্যায়। এহেন নারী মূর্তি সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে একবৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। ব্যাঘ্র, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সবই তাহার অনুগত। সাধারণ লোকে এই কল্পিত কাহিনী সরলভাবে বিশ্বাস করে।

"বনবিবির জহুরনানা" নামক পুঁথিত বর্ণিত আছে, মক্কাবাসী বেরাহিমের স্ত্রী গুলাল বিবি, কৌশলে সুন্দরবনে নির্বাসিত হন। সেই সময় তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। বনের মধ্যে শাহ জঙ্গুলী ও বনবিবি নামে তাঁহার দুই জমজ পুত্র-কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। বনবিবির বাল্যকাল রোমঞ্চকর কাহিনীর সহিত বিজড়িত। পুঁথিতে আছে,—

"বনের হরিণ সব খোদার মেহের।।
হামেশা পালন করেন বনবিবির তরে।।

বেহেশতের হুর এসে কোলে কাঁখে নিয়া,
তুষিয়া মায়ের মত ফেরে বেড়াইয়া।"

ভাটি দেশের রাজা দক্ষিণ রায়ের কবল হইতে দুঃখী ও দুবর্লকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর আদেশে বনবিবি ও তাহার ভ্রাতা সুন্দরবনে থাকিয়া যায়। দক্ষিণ রায় প্রতাপশালী যোদ্ধা। তাঁহার সম্পর্কে বনবিবির পুঁথিতে আছে।

"এখানে দক্ষিণ রায় ভাটির ঈশ্বর
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর।"

অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটি পরগণা বনবিবির অধীনতা স্বীকার করে। দক্ষিণ রায় এই আধিপত্য সহ্য করিতে নারাজ। তিনি বনবিবির বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরুষ হইয়া নারীর সঙ্গে কি করিয়া যুদ্ধ করিবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি মাতা নারায়ণীকে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত হইয়া বনবিবির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই।

পুঁথিত আছে এই সময় বরিজহাটীতে ধোনাই মোনাই নামে দুই ভাই বাস করিত। তাহারা একদা সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করিতে যায়। তাহাদের সঙ্গে এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র দুঃখেও ছিল। সপ্তডিঙ্গা গড়খালী নদীতে পৌঁছিলে দক্ষিণ রায় নরবলি দাবী করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ধোনাই ও মোনাই দুঃখেকে রাখিয়া গেল। দুঃখে এহেন বিপদের মধ্যে মা বনবিবির কৃপা প্রার্থী হইল ঃ—

"কহ মা বনবিবি কোথা রইলে এই সময়,
জলদি করে এসে দেখ তোমার দুঃখে মারা যায়।
কারার দিয়াছো মাগো যদি না পালিবে,
ভাটি মধ্যে তোমার কলঙ্ক রয়ে যাবে।"

দুঃখের করুণ ক্রন্দনে যথা সময়ে সাড়া পড়িল। বনবিবি দুঃখের জীবন রক্ষার্থে দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দক্ষিণ রায় বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইভাবে দুঃখের জীবন রক্ষা পাইল। বনবিবির দোয়ার বরকতে দুঃখের অনাথিনী বিধবা মাতার অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচিয়া গেল। দুঃখে বহু সম্পত্তির মালিক হইল। ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে তাহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই অবধি বনবিবি বনদেবতা বা মানস সুন্দরী দেবী। পুঁথিতে আরো আছে আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাই "বনবিবির জহুরা নামা" পুঁথির সারাংশ।

সতীশবাবু গাজী, বনবিবি ও দক্ষিণ রায়কে দেবতার আসনে স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'গাজী ও দক্ষিণ রায়ের উপর প্রভু ছিল, তাহারা যতই প্রভুত্ব করেন বনদেবতার (বনবিবি) স্থান তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে।' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন "পূর্বে দেখিয়াছি গাজী সাহেব বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বনবিবি মানুষ হইয়া দেবতা হইয়া

গেলেন, তাঁহার অনুগত বীর দক্ষিণ রায় কেন দেবতা হইবেন না?" সতীশবাবু তদীয় যশোর-খুলনার ইতিহাসে দক্ষিণ রায়ের মস্তক পূজার কথা বলিয়াছেন;

"কাটা মুন্ডু বারা পূজা সেই হ'তে করে-
কোন খানে দিব্য মূর্তি বাঘের উপরে।"

সতীশবাবু বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহিনী ইতিহাস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ সমস্ত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তথ্যের মুলনীতি বিরোধী। বনবিবি কাল্পনিক চরিত্র, গাজী ও দক্ষিণ রায় বীর যোদ্ধা হইলেও তাহাদিগকে দেবতা বা অতিমানুষ আখ্যা দেওয়া নিছক ধর্মান্ধতা বা কুসংস্কার।

গাজী-কালু ও চম্পাবতীর পুঁথিতে আবর্জনা রাশির মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। কিন্তু বনবিবির পুঁথি নিছক কল্পিত কাহিনী। বটতলার পুঁথি লেখকেরা ব্যবসায়ের জন্য মক্কাবাসী হযরত ইব্রাহিমের সহধর্মিণী বিবি হাজেরার বনবাস কাহিনী অবলম্বনে এই পুঁথি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইতিহাস নাই, আছে শুধু রোমাঞ্চকর কল্পিত কাহিনী। তবে দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত তথ্য এই পুঁথিতে পাওয়া যায়। বনবিবি কল্পিত নারী হইলেও সুন্দরবনের নদীনালা ও বনজঙ্গলের রন্ধ্রেরন্ধ্রে তাঁহার নাম সুপরিচিত।

সুন্দরবনাঞ্চলে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক বিশেষ করিয়া অজ্ঞ সমাজ বনবিবি ও গাজীর নামে দোহাই দেয়। হিন্দুরা এ আরাধ্য দেবতাদের নামে পাঠা বলি দিয়া থাকে, গাজীর দরগায় সিন্নী মানত করিয়া তাহার গায়েবী সাহায্যের আশা রাখে। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সমস্ত দরগার শরিয়ত বিরোধী কার্য অবাধভাবে চলিয়া থাকে। মানুষ আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া সাধারণ মানুষ গাজী বা কল্পিত নারী বনবিবির সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। এইভাবে বিপদ-আপদে পীর দরবেশ ও গাজীদের সাহায্যের জন্য মানুষ আশা করিয়া থাকে। এবম্বিধ কুসংস্কার ও ধর্মবিরোধী কার্য সমূহ সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষকে গোমরাহীর দিকে লইয়া যাইতেছে। পীর পূজা ও গোর পূজার কবে অবসান হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

ষোল

সুন্দরবনের রাজা প্রতাপাদিত্য

রাজা প্রতাপাদিত্য বাংলার বারভুঞার অন্যতম ভুঞা। পূর্বাধ্যায়ে আমরা তাহার পরিচয় ও যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছি। এ রাজ্যের রাজধানীর উত্তর দিক ব্যতীত অন্য তিন দিকই সুন্দরবন বেষ্টিত ছিল। সুন্দরবনের জঙ্গল কাটাইয়া এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীন যশোর রাজ্যকে সে জন্য সুন্দরবন রাজ্য এবং উহার অধীশ্বর প্রতাপাদিত্যকে সুন্দরবনের রাজা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা সুন্দরবনের মধ্যেই এই রাজ্যের উৎপত্তি এবং প্রায় সমগ্র বনাঞ্চলই এই রাজ্যাধীন ছিল। সুন্দরবনই ছিল এই রাজ্যের প্রাণ।

প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য (শ্রী হরি) এবং পিতৃব্য বসন্তরায় (জানকী বল্লভ) যশোর রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তাহাদের পরিচয় অত্র প্রসঙ্গে অপরিহার্য, সে জন্য পূর্বেই প্রতাপের পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে কিছু বলিয়া রাখি।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ঃ রামচন্দ্র গুহ নামক এক উদ্যমশীল যুবক ভাগ্যান্বেষণে বাকলা হইতে সপ্তগ্রাম আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটি প্রসিদ্ধ শাসন কেন্দ্র। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। শিবানন্দ সোলেমান কররানীর অনুগ্রহে গৌড় সরকারের অধীন কানুনগো দপ্তরে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। ভবানন্দের পুত্রের নাম শ্রীহরি এবং গুণানন্দের পুত্রের নাম জানকী বল্লভ। শ্রীহরি এবং জানকী বল্লভ প্রায় সমবয়সী। উভয়ের মধ্যে আবাল্য সম্প্রীতির ভাব বিদ্যমান ছিল। রামরাম বসু লিখিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত' পুস্তকে এই বংশের বহু নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের প্রথম দিকে আছে যে, শিবানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি ও মধ্যম ভ্রাতা গুণানন্দের পুত্র জানকী বল্লভকে দাউদের পাঠশালায় বিদ্যার্জনের জন্য প্রেরণ করেন।

"এই মতে সে দুই কুমার নবাবজাদার সহিত লেখাপড়া করেন, একত্রে খেলা করেন ও বেড়ান। আস্তে আস্তে নবাবজাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই হৃদ্যতা হইল। তিনজনেই বড় প্রিতপ্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।"

সোলেমানের মৃত্যুর পর গৌড়ে অশান্তি দেখা দেয়। অকর্মণ্য বায়েজীদ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর জ্ঞাতি ভ্রাতা হাঁসু কর্তৃক নিহত হন। বিচক্ষণ সেনাপতি লোদী খাঁর সাহায্যে সোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ হাঁসুকে হত্যা করিয়া স্বাধীন সুলতান হিসাবে গৌড়ের তখ্তে সমাসীন হন। মিঞা সোলেমানের সঙ্গে আকবরের সদ্ভাব ছিল। তাঁহার সেনাপতি বিখ্যাত কালাপাহাড় হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেন।

সিংহাসন প্রাপ্তির পর যুগ যুগ সঞ্চিত অপরিমিত ধন-রত্নের অধিকারী হন দাউদ। তিনি দুঃসাহসী বীর ছিলেন। মুগলদের প্রাধান্য কিছুতেই বরদাস্ত করিতেন না।

দায়ূদ রাজ্য প্রাপ্তির পর বাল্যবন্ধু বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে উচ্চরাজকার্যে সমাসীন করেন। "জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্বাধ্যক্ষ মুখপাত্র কনিষ্ঠ জানকী বল্লভকে বসন্তরায় খেতাব দিয়া খান সামানির দেওয়ান করিলেন।" রামরাম বসু আরও বলেন যে, দাউদের অর্থ গৃধ্নুতায় ভবানন্দ মজুমদার ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহার পতনে তাঁহাদের সর্বনাশ তন্নিমিত্ত উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

"কুমারেরা দুই ভ্রাতা এবং বৃদ্ধেরা তিন সহোদর" পরামর্শ করিয়া মৃত নিঃসন্তান চাঁদ খাঁ মছন্দরীর বর্তমান "বে-ওয়ারিশ জমিদার" দক্ষিণ সমুদ্রের কাছে দক্ষিণ দেশে যশোহর নামক স্থানে যাওয়া স্থির করিলেন। যথাসত্বর দুর্গম জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া যশোহরে বাসস্থান নির্মিত হইল। শ্রীহরি, জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ গৌড়ে থাকিয়া গেলেন এবং পরিবারের অন্যান্য সকলে যশোরে চলিয়া আসিলেন।

এখানে আমরা সুন্দরবন প্রদেশে চাঁদ খাঁ মসনদ-ই-আলা (মসন্দরী) এক জায়গীরদার বা জমিদারের নাম দেখিতে পাই। চাঁদ খাঁর সঠিক পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। একমাত্র পর্তুগীজ সাহিত্যে বিশেষত ডু-জারিকের বিবরণে চ্যাণ্ডিকান, চান্দেকান বা চণ্ডিকান রাজ্যের নাম দৃষ্ট হয়। বিভারীজ চ্যাণ্ডিকান রাজ্যকে চাঁদ খাঁ মছন্দরী প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন এবং তিনিই ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে চ্যান্ডিকান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু যশোরাঞ্চল (ঈশ্বরীপুর) খান জাহানের রাজ্যাধীন ছিল কিনা জানা যায় না। তবে পর্তুগীজ সাহিত্যের চ্যান্ডিকান এবং যশোর রাজ্য একই অর্থবোধক।

বিভারীজ বলেন, "চাঁদ খাঁ নামীয় জায়গীর পাইয়া বিক্রমাদিত্য যে রাজধানী স্থাপন করেন তাহার নাম যশোহর।" সতীশবাবু বলেন, "চাঁদ খাঁ চক হইতে পাশ্চাত্যের রাজ্যটির নাম চ্যাণ্ডিকান রাখিয়াছেন।"

নিখিলবাবু যশোরকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়া সনাক্ত করেন না। তিনি বলেন যে, সাগরদ্বীপই চণ্ডিকান। তিনি এ বিষয় বহু প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। নিখিলবাবু আরও বলিয়াছেন, "এই প্রদেশের অধিকাংশই চাঁদ খাঁ মসনদ আলার জায়গীর ছিল। তিনি কোন্ বংশীয় লোক তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

আমাদের আলোচ্য সুন্দরবন অধ্যুষিত যশোর অঞ্চলে চাঁদ খাঁর চক বা জমিদারী ছিল। পুর্তুগীজেরা চাঁদ খাঁকে চ্যাণ্ডিকান বা চণ্ডিকান বলিয়াছেন।

তৎকালে খিজিরপুরের ঈসা খাঁর মসনদ-ই-আলা উপাধি ছিল। ঈসা খাঁ বা তৎপুত্র মুসা খাঁ বা এই বংশের পূর্ব পুরুষেরা কেহ যশোরে ছিলেন কিনা জানা যায় না। সে জন্য চাঁদ খাঁর সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। মেদিনীপুর অঞ্চল যশোর সংলগ্ন ছিল। ঐ অঞ্চলে হিজলীর ওসমান খাঁ বা ঈসা খাঁ লোহানীদের মসনদ-

ই-আলা উপাধি ছিল। তাহাদের বংশের কোন স্বতন্ত্র জমিদার বা জায়গীরদার চাঁদ খাঁ মসনদ-ই-আলা" (মসন্দর) উপাধিধারী হইতে পারেন।

মিশনারী ফেনসেকো বাকলার বালক রাজা রামচন্দ্রকে কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "আমরা আপনার ভাবী শ্বশুর চণ্ডিকানের রাজ্যে যাইতেছি।" এখানে যশোর রাজ্যকেই চণ্ডিকান বুঝাইতেছে। ডুজারিক ১২ জন ভুঞার মধ্যে চণ্ডিকানের উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যানরিকও চণ্ডিকান বলিয়াছেন। নিখিলবাবু বলেন, "চাঁদ খাঁর সহিত চ্যাণ্ডিকানের সামান্য উচ্চারণ সাদৃশ্য ব্যতীত অভিন্নতার আর যে কোন প্রমাণ আছে তাহাও বুঝা যায় না। বিভারীজ চ্যাণ্ডিকানের কথা কোন মানচিত্রে দেখেন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা স্যার টমাস রোর মানচিত্রেই তাহার উল্লেখ পাইয়াছি।"

স্যামুয়েল পার্শা দঙ্গার মোহনাকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন। নিখিলবাবু সম্ভবত এই মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। সতীশবাবু ধুমঘাটকে চণ্ডিকান বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যশোর, ধুমঘাট, ঈশ্বরীপুর অঞ্চলই চণ্ডিকান। চণ্ডিকান অঞ্চলের নাম, স্থানের নাম নহে বলিয়া মনে করি।

শ্রীহরি উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যাবিবাহ করিয়াছিলেন। এই রমণীর গর্ভে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। সুলতানের উপাধি প্রাপ্তির পর শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য এবং জানকী বল্লভ বসন্তরায় নামে সুপরিচিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্বনাম লোকে এক প্রকার ভুলিয়া গেল। উভয়ে গৌড় রাজদরবারে বিশেষ সম্মান লাভ করিলেন।

গৌড়ের ধনরত্ন দায়ূদের অনুপস্থিত কালে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের নিকট গচ্ছিত ছিল। দায়ূদের পতনে যশোর রাজ্য প্রতিষ্ঠার মহাসুযোগ আসিয়া গেল। ভ্রাতৃদ্বয় এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রাজধানী গৌড়ে অবস্থিত নগরবাসীরা মুগল আক্রমণ ও লুটতরাজের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল।

রামরাম বসুর ভাষায় সুলতান দায়ূদ বলিতেছেন, "আমরা যে কিছু ধনসম্পদ গৌড়ে আছে তাহা সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশোহরে চালান করহ পশ্চাৎ আনা যাবেক। এই দুই ভ্রাতা দায়ূদের নিতান্ত বিশ্বাস পাত্র বাদশাহের যতেক ধন, স্বর্ণ, রূপা, তামা, পিতল, কাঁসা, ধাতুদ্রব্য ও আর আর যা কিছু ছিল এবং প্রধান প্রধান সকল এবং তাহার আর আর সমস্ত চাকরদের যাবতীয় ধন এবং সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবতীয় সামগ্রী ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্যন্ত লুট যাওনের ভয় প্রযুক্ত সামুদায়িক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল। ইহারা সহস্রাধি বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় সামগ্রী বোঝাই করিয়া যশোহরে চালান করিলেন। গৌড় প্রায় ধনহীন শহর হইয়া রহিল।"

অতঃপর সুন্দরবনের একাংশের জঙ্গল কাটাইয়া যশোর শহরের ভিত্তি পত্তন হইল। কালের আবর্তনে কোলাহলময় শহর জঙ্গলে পূর্ণ হয়, আবার গভীর অরণ্যে লোকালয় ও শহর গড়িয়া উঠে। এখানে গড় ও গড়খাই খনিত হইল। ইতিমধ্যে গৌড়ের ধনরত্ন

বোঝাই অসংখ্য নৌকা যশোরে আসিয়া পৌঁছিল। ক্রমে ক্রমে কানন বেষ্টিত যশোরের খ্যাতি গৌড় ও অন্যত্র বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। সর্বপ্রথম জঙ্গল কাটিয়া যে স্থানে শহরের পত্তন করা হয় তথাকার নাম হয় বসন্তপুর। বাংলাদেশ সীমান্তে বসন্তপুর প্রসিদ্ধ স্থান, রাজা বসন্তরায়ের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। সম্ভবত এই সময় মুকুন্দপুরে গড় বেষ্টিত রাজধানী স্থাপিত হয়। মুকুন্দপুরে এখনও গড়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

নবপ্রতিষ্ঠিত নামকরণ যশোর। কথিত আছে যে, গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া নতুন রাজ্য সৃষ্টি হওয়ায় উহার নামকরণ হয় যশোহর। যশোহর (যশঃ হরণকারী) কথাটির এই অর্থ পরবর্তীকালে অধিকাংশ লেখকই ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে ওয়েষ্টল্যান্ড সাহেব লিখিয়াছেন; "কানাইনগর নামকস্থানে রাজা সীতারাম রায়ের নির্মিত মন্দিরে রুচির রুচিহর' এই বিশেষণ লিখিত আছে। ইহার অর্থ সৌন্দর্য হরণকারী। তদরূপ যশোরকে জশর (Jessore) এবং প্রাচীন যশোর রাজ্যকে যশোহর বলিত।"

নিখিলবাবু বলিয়াছেন; "বহু প্রাচীনকাল হইতে যশোরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক একটি সুন্দর নগরে পরিণত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিশাল রাজ্যের রাজধানী হয়। এই বিশাল রাজ্যের অধিকাংশই সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময় দুর্গম সুন্দরবন লোকের পক্ষে সুগম হইয়াছিল।"

প্রাচীন কালীন বিভিন্ন গ্রন্থে যশোর নাম দৃষ্ট হয়, যশোহর নহে। দিগ্বিজয় প্রকাশ ও তন্ত্রে যশোরেশ্বরী মন্দিরের নামোল্লেখ আছে। প্রবাদ, অরণ্য মধ্যে এই মূর্তি পাওয়া যায় এবং মন্দিরের সংস্কার হয়। উক্ত গ্রন্থে যশোর রাজ্যের নিম্নোক্ত সীমা দেওয়া হইয়াছে;

পূর্বে মধুমতী সীমা, পশ্চিমে ইছামতী
বাদা ভূমি দক্ষিণে চকুশোদ্দীপো হিচত্তরে।।

অর্থাৎ-এই রাজ্যের পূর্বে মধুমতী, পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং উত্তরে কুশদ্বীপ। অন্যমতে পশ্চিমে কুশদ্বীপ, পূর্বে ভূষণা ও বাকলার সীমা মধুমতী, উত্তরে কেশবপুর এবং দক্ষিণে সুন্দরবন ছিল। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী এক বিংশতি যোজন পরিমিত স্থান যশোর নামে খ্যাত। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মখন্ডে যশোর নামক স্থানে দশ যোজন পরিমাণ ভূমির উল্লেখ আছে। নিখিল বাবু যশোর রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন; "পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্বে মধুমতী এবং উত্তরে নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশ।" ওয়েস্টল্যান্ড বলিয়াছেন, এই রাজ্যের দক্ষিণসীমা সুন্দরবনের প্রান্তসীমা পশ্চিমে ইছামতী নদীর পূর্বভাগ, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ ব্যতীত সমগ্র যশোর জিলায় উত্তরে নদীয়া পর্যন্ত।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন রাজ্যের নাম যশোর। যশোহর নাম এককালে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও ঐ নাম প্রাচীন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বর্তমান জেলা যশোরকে অনেকে শুদ্ধ (?) করিয়া বলিয়া থাকেন যশোহর কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আরবী জসর (জে-ছিন-রে) শব্দের অর্থ সাঁকো। এককালে বর্তমান শহর যশোরাঞ্চল নদনদী বিধৌত দেশ

ছিল। লোকে বাঁশের সাঁকো বাঁধিয়া নদীখাল পার হইত। সেইজন্য স্থানের নাম হয় যশোর। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীও এই নাম (Jessore) ব্যবহার করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে সুন্দরবনের আর এক স্থানের নামও যশোর। তবে এই নামের উৎপত্তি কিভাবে হয় জানা যায় না। অধুনা যশোর শহর হইতে প্রাচীর যশোর প্রায় ৮০ মাইল দূরে। প্রতাপাদিত্যের যশোর এখন খুলনা জেলার শ্যামনগর থানার মধ্যে অবস্থিত। উভয়স্থানকে আমরা যশোর বলিব। ভারতচন্দ্র প্রমুখ যশোরই বলিয়াছেন।

যশোর রাজ্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্রগ্রাম যশোর নামে অভিহিত হয়। প্রতাপ বা বসন্তরায়ের উত্তরাধিকারীকে এখনও যশোরের রাজা বলা হয়। রাজধানী ঈশ্বরীপুরের নাম এই যশোর হইতে উদ্ভুত। যশোর শব্দ পরে রূপান্তরিত হইয়া মূর্তির নাম হয় যশোরেশ্বরী এবং এই যশোরেশ্বরী হইতে স্থানের নাম হয় যশোরেশ্বরীপুর। পরবর্তীকালে শব্দের প্রথমাংশ যশ বাদ দিয়া রাজ্যের রাজধানীর নাম হয় ঈশ্বরীপুর (যশোরেশ্বরীপুর)। বর্তমানে শেষোক্ত নামই সর্বজন বিদিত। এখনও এতদঞ্চলে যশোর বলিলে ঈশ্বরীপুরকে বুঝায়।

যাহা হউক যশোর রাজ্যের ভিত্তি পত্তনের পর বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় মুগল সম্রাট আকবরের রাজস্বসচিব তোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাদশাহের সামন্তরাজরূপে স্বীকৃত হন। ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে সম্ভবত বিক্রমাদিত্য রাজসনদ লাভ করেন। নামে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হইলেও প্রকৃতপক্ষে বসন্ত রায় ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা।

বসন্ত রায় বিক্রমাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র। পূর্বেই বলিয়াছি উভয়েই একত্রে বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছেন। একই সঙ্গে গৌড় সরকারের রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যশোরে হিজরত করিয়া আবার দুই ভাই একত্রে ভূ-সম্পত্তির মালিক বা রাজা হইয়া বসিলেন। বসন্ত রায় চরিত্রবান সাধুপুরুষ এবং বীর যোদ্ধা। তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজা ও মন্ত্রী।

দুই ভাই মিলিয়া মিশিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। বসন্ত রায় কর্তৃক একটি রাজস্ব তালিকা প্রণীত হয়। যশোর রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভবানন্দ দেহত্যাগ করেন।

বসন্ত রায় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি বাকলা ও অন্যান্য স্থান হইতে নিজে আত্মীয়-স্বজনদের যশোর আনিয়া রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় বহু বঙ্গজ কায়স্থ যশোরের অধিবাসী হইয়া যান। বঙ্গজ কায়স্থ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান হিন্দুদের লইয়া বসন্তরায় 'যশোর সমাজ' নামে এক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনাও ইহার মধ্যে থাকিতে পারে। যশোর সমাজের লোকেরা এখনও খুলনা ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করিতেছে।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের সময় কতিপয় অট্টালিকা, মন্দির ও গড় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা নিয়মিত মুগল সম্রাটকে বাৎসরিক কর প্রদানে সম্পত্তির ভোগদখল করিতেন। রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাই যশোর রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার

ইতিবৃত্ত। এই বংশের স্বনামধন্য রাজা প্রতাপাদিত্যই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রতাপাদিত্য ঃ সুন্দরবনের রাজা প্রতাপাদিত্য বারভুঞার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিভিন্ন লেখক প্রতাপ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা যথাসম্ভব দেশী-বিদেশী লেখকদের লেখনী, স্থানিক পুরাতত্ত্ব, প্রবাদ, জনশ্রুতি প্রভৃতি হইতে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি। প্রতাপ চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিসহ আলোচনা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। একে একে আমরা সে ইতিহাস আলোচনা করিতেছি।

বাল্যজীবন ঃ শিশুকালে পিতামাতা বালকের নাম রাখেন গোপীনাথ। গোপীনাথের পরবর্তী নাম প্রতাপাদিত্য। যুবরাজ অবস্থায় তিনি প্রতাপাদিত্য নামেই সুপরিচিত হন। রামরাম বসু তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "জ্যোতিষীরা বললেন সব বিষয়েই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী। হরিষেবিষাদ মনে রাজা অন্নপ্রাশনে পুত্রের নাম রাখলেন প্রতাপাদিত্য রূপবান কুমার বসন্তরায়ের খুব প্রিয়। দশবারো বৎসরের সময় সর্ববিদ্যাতেই 'বিশারদ'। লেখাপড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসী নাগরি বাংলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতে তৎপরতা।"

কেহ কেহ এই কথা বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন যে, বালক পিতৃদ্রোহী এবং বংশের কলঙ্ক সেজন্য তাহাকে এখনই শেষ করা উচিত। কিন্তু হাজার হইলেও পিতৃগত প্রাণ। এ কাজ সম্ভব নয়।

সূতিকাগৃহে প্রতাপের বয়সমাত্র ৫ দিন, সেই সময় মাতার মৃত্যু ঘটে। মাতৃহারা শিশুকে সকলেই অপত্য স্নেহে লালন পালন করিতে থাকেন। অপত্য স্নেহের প্রভাবে বাল্যেই প্রতাপ চঞ্চল ও অস্থির মতি হইয়া উঠিলেন। বসন্তরায় প্রতাপকে অতিমাত্রায় স্নেহ করিতেন এবং রায় পত্নীই শিশুব লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী এবং দশ-বার বৎসরে সর্ববিদ্যা বিশারদ প্রভৃতি বিষয় অবিশ্বাস্য এবং অতিরঞ্জিত।

প্রতাপের বিরাটকায় তনু ছিল। তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধি ছিল এবং তিনি বাল্যেই যুদ্ধ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি তরবারী, তীর চালনা ও মল্লযুদ্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী রাজবাড়ী হইতে জঙ্গলে ব্যাঘ্র, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তু শিকারে যাইতেন। এই সেই বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়, ভয়সংকুল সুন্দরবন যেখানে নরখাদক ব্যাঘ্র, ভীষণকায় অজগর, বন্য বরাহ, নদীতে হাঙ্গর ও কুমীর নির্ভয়ে চলাফেরা করে। জন্মাবধি এই সুন্দরবনের সহিত প্রতাপের নিবিড় সম্পর্ক। সুন্দরবন শুধু মৃগয়া ও ব্যাঘ্র শিকার ক্ষেত্র নহে উহা প্রতাপের রক্তমাংসের সহিত বিজড়িত এক মনোমুগ্ধকর ও রূপময় দেশ।

রহস্যেঘেরা সুন্দরবনের অভিনব শিকার কাহিনী আমরা গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বর্ণনা করিয়াছি। চাঞ্চল্যকর সে কাহিনী। তখনকার দিনে আরও ভয়াবহ ছিল এই জঙ্গল। প্রতাপ বন্ধুবান্ধবসহ গহীন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্র, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি শিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁহার সঙ্গীরও অভাব ছিল না। সূর্যকান্ত ও শংকর নামে প্রতাপের দুইজন ভক্ত অনুচর জুটিয়াছিল। প্রতাপ প্রায়ই তাঁহাদের সঙ্গে কালহরণ করিতেন। এই সময় বালক প্রতাপ নানা প্রকার উৎপাত শুরু করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার দুষ্কর্মে বিরক্ত হইয়া একবার বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বাল্যেই হত্যা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু বসন্ত রায়ের হস্তক্ষেপের ফলে বিক্রমাদিত্য নিরস্ত হইলেন। এ বিষয় কতদূর সত্য বলা যায় না।

প্রতাপের রাজ্যাভিষেক ঃ পিতাকে কৌশলে এবং শক্তির মদমত্ততা প্রদর্শনে অপসারিত করিয়া প্রতাপ যশোর রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের জন্য আনন্দ উৎসব ধুমধামের সহিত চলিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, রাজ্যাভিষেক উৎসবে প্রতাপ এক কোটি টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তিনি ধুমঘাট নামক স্থানে রাজপুরী নির্মাণ করিয়া মহাসমারোহে তথায় প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্য রোগে শোকে ও মন দুঃখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সম্ভবত ১৫৯৭ খৃঃ অন্যমতে ১৫৮২—৮৪ খৃঃ প্রতাপ রাজা হন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বসন্তরায়ই একমাত্র কণ্টক রহিয়া গেলেন। এইরূপ একজন গুণীজ্ঞানী মুরুব্বির উপস্থিতি প্রতাপের অসহ্য হইয়া পড়িল। বসন্ত রায়ের পরিশ্রমলব্ধ রাজ্য এবং তিনিও এই রাজ্যের ন্যায্য অংশীদার। সেজন্য প্রতাপ ও বসন্তরায়ের মধ্যে জমিদারীর সম্পত্তি বিভক্ত হইল। প্রতাপ সমগ্র সম্পত্তির । ।% আনা অংশ পাইলেন এবং বসন্ত রায়ের ভাগে বক্রী ।% অংশ। সম্ভবত বিক্রমাদিত্যের জীবদ্দশায় এইরূপ বন্টন কার্য সমাধা হইয়াছিল।

যশোর রাজ্যের পশ্চিমাংশ বসন্তরায়ের ভাগে পড়িয়াছিল। কালীঘাটের প্রাচীন মন্দির, বড়িসা বেহালার রায়গড়, কমলা-বিমলা পুষ্করিণী এবং শাহাজাদপুরে বসন্ত রায়ের গঙ্গাবাসের বাটি প্রভৃতি স্মৃতি চিহ্ন বসন্ত রায়ের কীর্তি। বর্তমান মৌতলার সন্নিকটে রায়পুরে বসন্ত রায়ের রাজবাটী ও মন্দির ছিল। চক্‌শ্রী অঞ্চল বসন্ত রায়ের ভাগে পড়িয়াছিল। চক্‌শ্রী বা চাকশ্রী, কেউ বলেন সুন্দরবনের এইস্থানে সুন্দর মোচাক পাওয়া যাইত সেইজন্য স্থানের নাম হইয়াছিল চাকশ্রী। অন্যমতে এই চকের সুশ্রী ধান্য ক্ষেত্রের জন্য নাম হয় চকশ্রী। চকশ্রী প্রাধান্য লইয়া প্রতাপের সহিত বসন্ত রায়ের গোলযোগের প্রধান কারণ যাহার পরিণতি বসন্ত রায়ের হত্যা। সে কথা পরে বলিতেছি।

যশোরেশ্বরী মন্দির ও অন্যান্য কীর্তিরাজী ঃ সতীশবাবু বলিয়াছেন যে, প্রতাপ মহাভাগ্যবান এবং ধার্মিক হিন্দু নরপতি। তিনি ভাগ্যগুণে রাজ্যাভিষেকের পর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া স্তুপিকৃত ইষ্টকাদির নিম্নে যশোরেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী মূর্তি আবিষ্কার করেন। ইহা

কষ্টি পাথরে নির্মিত কালী মূর্তি। তিনি আরও বলিয়াছেন ; "মূর্তি অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এমন বিভীষিকাময়ী মৃত্যু মূর্তি আর দেখি নাই।" তাঁহার মতে ইহা আদিম যুগে নির্মিত প্রস্তর মূর্তি। এই ঐতিহাসিক মূর্তি রাজধানী যশোরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যশোরেশ্বরী নামে খ্যাত। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মূর্তি যেমন ঢাকেশ্বরী এবং খুলনার পরপারে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির নাম খুলনেশ্বরী এবং ভুবনেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভুবনেশ্বরী।

এই মূর্তি নূতন করিয়া আবিষ্কারের কাহিনী সতীশবাবু রচিত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যশোর নাম এবং এই মূর্তি মন্দিরসহ বহু পূর্ব হইতে এখানে ছিল। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্ত রায়ই সম্ভবত এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন।

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় বলিয়াছেন, "তন্ত্রোক্ত পীঠস্থানের মধ্যে যশোর ও কালীঘাটের উল্লেখ দেখা যায়। গোকর্ণ বংশসম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে রাজা জঙ্গল কাটাইয়া যশোরেশ্বরী মন্দিরের নিকট ইষ্টক রচিত গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ধেনুকর্ণ রাজার অস্তিত্ব থাকিলে, তিনি যে বহু পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" দিগ্বিজয় প্রকাশে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণ সেন দেব যশোরেশ্বরীর নিকট এক শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য ও অন্যান্য রাজাদের কীর্তিরাজীর অধিকাংশের চিহ্ন মাত্র নাই। প্রতাপ খানজাহানের ন্যায় বহুল পরিমাণে প্রস্তর ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তদ্ব্যতীত তাঁহার রাজ্য নিম্নবঙ্গের লবণাক্ত প্রদেশে অবস্থিত। লবণাক্ত আবহাওয়াতেই এখানকার হর্ম্যরাজি অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। কালের কষাঘাতে ঈশ্বরীপুরের দুর্গ এবং রাজ প্রাসাদ ধুলির সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ইংরেজ আমলে যশোরেশ্বরী মন্দির জরাজীর্ণ হইয়া গেলে উহা পুনর্নির্মিত হয়। বর্তমানে উহা সুন্দররূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন নাট্যশালাকে নাট মন্দির বলা হয়। এখানে পার্বনাদি উপলক্ষে থিয়েটার যাত্রা প্রভৃতি গানের আসর বসিয়া থাকে। ইহার অদূরে প্রতাপনির্মিত চণ্ডভৈরবের ত্রিকোণ মন্দিরটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রতাপের অন্যান্য কীর্তিরাজীর কথা পরে বলিতেছি।

রাজধানী ঈশ্বরীপুরে পর্তুগীজ মিশনারীরা প্রতাপের আদেশ লইয়া গীর্জা নির্মাণ করেন। ইহাই বঙ্গ দেশের প্রথম গির্জা, সে কথা অন্যত্র বলিয়াছি। প্রতাপের সময় বা মুগলরাজত্বের সময় নির্মিত টেঙ্গামসজিদ এখনও প্রাচীন রাজধানীতে বিদ্যমান আছে। একই স্থানে মসজিদ, মন্দির এবং গীর্জার অবস্থিতি ইহাই প্রমাণ করে যে, এখানে এককালে হিন্দু, মুসলিম এবং খৃস্টান জাতিত্রয়ের মিলন কেন্দ্র ছিল।

রায়পুরের রাজবাড়ীতে বসন্ত রায় সপরিবারে বাস করিতেন সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রায়পুর প্রতাপের রাজধানী হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজধানী ঃ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রতাপের পূর্বে মুকুন্দপুরে সর্ব প্রথম রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরীপুরে রাজধানী স্থাপিত

হয়। প্রতাপ নূতন রাজধানী স্থাপন করেন ধুমঘাটে। এখানে একটি মৃন্ময় দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিখিলবাবু বলেন, প্রতাপাদিত্যের রাজধানী সগরদ্বীপে ছিল। অন্যমতে ধুমঘাটের বহু দক্ষিণে গহীন অরণ্যের মধ্যে তেরকাঠি নামক স্থানে। আবার কেহ কেহ বলেন বিক্রমাদিত্য তেরকাঠিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং প্রতাপের রাজধানী ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটেই ছিল।

আমরা প্রতাপের রাজধানীও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। জঙ্গল মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত শহর বসন্তপুর, দ্বিতীয় শহর মুকুন্দপুর। শেষোক্ত স্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানী ধুমঘাট ও ঈশ্বরীপুর পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। ধুমঘাট দুর্গ বা রাজপুরী বর্তমানে ধুমঘাট গ্রাম নহে। উহা রাজবাড়ী ও মন্দিরের সংলগ্ন স্থানের নাম। বর্তমান ধুমঘাট, তেরকাঠি ও বংশীপুর, ঈশ্বরীপুর, নূরনগর, জাহাজঘাটা, রায়পুর, মৌতলা, কাটুনিয়া, কুশলী, দুদলী, গোপালপুর, পরমানন্দকাটি, মুকুন্দপুর. বসন্তপুর জুড়িয়াস্থান সমূহ শহর ও শহরতলীর অন্তর্গত ছিল।

রাজধানীর উত্তরপার্শ্বে সুউচ্চ মৃত্তিকার ঢিপিকে বুরুজ পোতা বা বুরুজখানা বলা হয়। এখানে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হইত এবং এখান হইতে সম্ভবতঃ রক্ষিবাহিনী কামানের সাহায্যে রাজধানী পাহারায় রত থাকিত। কালের আবর্তনে সে স্থান প্রায় জনমানবহীন হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরীপুর দুর্গের পার্শ্বেই রাজবাড়ী এবং রাজবাড়ীর সংলগ্ন বারদুয়ারী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বারদুয়ারীর সম্মুখে পদ্মপুকুর। বারদুয়ারীর মধ্যে সম্ভবত প্রতাপের দরবার বসিত। পদ্মপুকুরের দক্ষিণে যশোরেশ্বরী মন্দির।

প্রতাপের রাজধানীর কয়েক মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনিত হইয়াছিল। দীঘির দামদলের উপর দিয়া মানুষ যাতায়াত করিতে পারিত। এই দীঘি প্রায় ১০০ বিঘা জমি জুড়িয়া বিস্তৃত। দুদলী গ্রামের তালপুকুর এই সময় খনিত হয়।

গোপালপুরের মন্দিরটি আজিও প্রতাপাদিত্যের কীর্তিচিহ্ন রক্ষা করিতেছে। প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে এই মন্দির সম্পর্কে স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। একপক্ষ মন্দির, অন্যপক্ষ মসজিদ বলিয়া দাবী করে। শেষপর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বিশেষজ্ঞ আসিয়া স্থির করেন যে, উহা একটি হিন্দু মন্দির। ১৯৭০ সালে মন্দিরটির শেষ অবস্থা দেখিয়াছি।

প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে নির্মিত ড্যামরাইলে নবরত্ন মন্দির বিখ্যাত। ইহার স্থাপত্য শিল্প চমৎকার। বিলের মধ্যে জনমানব শূন্য স্থানে এই মন্দির অক্ষত অবস্থায় দন্ডায়মান আছে। ধুমঘাটে মৃন্ময় দুর্গের কোন চিহ্ন নাই। এখন সেখানে ধান্য ফসল ফলে। বর্তমান ধূমঘাট গ্রামে একটি প্রাচীন দীঘি আছে। উহা সংস্কারের পর একটি পাকা ঘাট পাওয়া যায়।

প্রতাপের রাজধানীতে অবস্থিত টেঙ্গা মসজিদ সেকালের স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন। এখানে নিয়মিত ওক্তিয়া ও জুম্মার নামাজ হয়। টেঙ্গা মসজিদের প্রাঙ্গণে কয়েকটি

বৃহৎকায় পাকা কবর দৃষ্ট হয়, উহার মধ্যে একটি ১৪ হাত লম্বা। গোরস্থানকে 'বারওমরাহ' বলা হয়। মৌতলা গ্রামে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান। প্রায় ১০০ লোক একসঙ্গে এখানে নামাজ পড়িতে পারে। এই গ্রামে নামাজগড় নামে একটি প্রাচীন স্থানে এখনও ঈদের নামাজ হয়। এই স্থানের অসংখ্য ইষ্টক স্থানীয় লোকে অপসারণ করিয়াছে।

টেঙ্গা মস্‌জিদের সন্নিকটে একটি হাম্মামখানা এখনও জরাজীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। ইহাকে লোকে হাবসীখানা বা জেলখানাও বলিয়া থাকে। এই সময় রামপাল থানায় চকশ্রী গ্রামে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। ইহা রাজধানী হইতে বহুদূরে।

প্রতাপের রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অন্যান্য কীর্তির মধ্যে পরমানন্দকাটিতে গোবিন্দজীর মন্দির বিখ্যাত। অন্যান্য কীর্তিরাজির মধ্যে জয়নগরের মন্দির, পাঁচফুলের মন্দির, মোস্তফাপুরের নবরত্ন, গোপালপুরে গোবিন্দ দেবের মন্দির, তৎসম্মুখস্ত দোল মঞ্চ, জাহাজঘাটা, দুদলীর পোতাগর প্রভৃতি বিখ্যাত। জাহাজঘাটার সন্নিকটে একটি হাবসীখানা ছিল। রায়পুর গ্রামে লোহাগড়ার মাঠে লৌহের অস্ত্রাদি নির্মিত হইত। গড় মুকুন্দপুরে দুর্গ ছিল। কুশলীর মাঠে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত। মৌতলা রাজধানীর একাংশ ছিল। সেখানে হাটশালা নামক একটি স্থান ছিল। এই গ্রামে সেকালে একটি অতিথিশালা বা মুসাফিরখানা ছিল। দমদমা ও গাদিগুমা নামক স্থানে গোলাগুলি নির্মিত হইত। ঈশ্বরীপুর গ্রামে চাঁদরায়ের দীঘি আছে। উহার পার্শ্ববর্তী স্থানটিকে দীঘির বিল বলে। প্রাচীন রাজধানীর পশ্চিমে কাশিপুর গ্রামে জঙ্গলাবৃত্ত অবস্থায় একটি মসজিদ পাওয়া যায়। সেখানে বৃহৎকায় দুটি পাকা কবরও পাওয়া গিয়াছে।

দুর্গ ও গড়ঃ নিম্নবঙ্গ ও সুন্দরবনে প্রতাপের রাজ্য, সর্বত্রই নদীনালা ও খালবিল। এখানকার ন্যায় রাস্তাপথ ছিল না। নৌ-পথে মানুষ সর্বত্র ভ্রমণ করিত। তখন জলযুদ্ধ হইত। সেজন্য নৌশক্তি ও নৌ-বাহিনীর দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হইত। প্রতাপ রাজ্যের প্রধান প্রধান সীমান্তে ও কেন্দ্রস্থলে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সতীশবাবু একাদিক্রমে ১৪টি দুর্গের নাম ও স্থানের বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাদের নাম যথাক্রমে যশোর, ধূমঘাট, রায়গড়, কমলাপুর (কপোতাক্ষী), বেদকাশী শিবসা, জগদ্দল, শালিখা, মাতলা, আড়াই বাঁকি, রায়মঙ্গল, সগরদ্বীপ, মনিদুর্গ এবং চক্‌শ্রী।

এই সমস্ত স্থান এখন খুলনা ও ২৪ পরগণার মধ্যে অবস্থিত। দুর্গগুলি মৃত্তিকার দ্বারাই নির্মিত হইত। ইষ্টক নির্মিত দুর্গ ছিল, কিন্তু উহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে সতীশবাবু এত বেশী অতিরঞ্জিত করিয়া নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষে বহুক্ষেত্রে সত্যোদঘাটন করা একরূপ অসম্ভব হইয়াছে।

প্রতাপের ঢালী সৈন্য ও নৌসেনারা দুর্গে অবস্থান করিত। যশোর রাজ্যে বহু গড় ও গড়খাই ছিল। গড় বন্দী এবং আত্মরক্ষার জন্য সুউচ্চ গড় নির্মাণ নদীমাতৃক

বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য। আজিও বহু গড় বিদ্যমান থাকিয়া প্রতাপ তথা যশোর রাজ্যের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত গড় খননের জন্য এতৎপ্রদেশে প্রতাপাদিত্য অমর হইয়া আছেন। প্রতাপের নামীয় প্রতাপপুর, গড় প্রতাপ এবং প্রতাপনগর গ্রাম আছে। গড় প্রতাপ গ্রামে এখনও বিরাট গড়ের চিহ্ন আছে।

মুকুন্দপুরের গড়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কালিগঞ্জ থানার পার্শ্বেই ছিল সুউচ্চ মহৎপুরের গড়। সেনাপতি মহব্বত খাঁর নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় মহব্বতপুর বা মহৎপুর। প্রতাপের প্রধান সেনাপতি খাজা কামালের নামানুসারে গড় কামালপুর নাম আছে। সেখানে এখনও গড় আছে। দশালিয়া ও অন্যান্য কয়েক স্থানে সুউচ্চ গড় দেখা যায়। বিছট, গড় কোমলপুর ও প্রতাপনগরে ডক ছিল। রায়পুর হইতে পূর্বদিকে বহুদূর গড়ের চিহ্ন আছে। রহিমপুর, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া এই গড় বিস্তৃত ছিল।

রামরাম বসু লিখিয়াছেন ; "যশোহর পুরীর বর্ণনা। (৪৪) চারিদিকে গড়। তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক এক দিকে পাঁচ পাঁচ ক্রোশ আয়তন গড় প্রশস্তে ১০০ হাত বিংশতি হাত ভিতর গড়ের উপর মাটিয়া পোস্তা ত্রিংশতি হাত উচ্চ গোড়ায় ষাট হাত মাথায় দশ হাত। এ কেবল মাটিয়া পোস্তা। পোস্তার বহির্ভাগে গড় তাহার দুই পার্শ্ব এবং মধ্যস্থল সামুদায়িক রেকতায় গ্রন্থিত।" দক্ষিণ-খুলনা ভ্রমণ করিলে যে কেহ এই ধরনের গড় দেখিতে পাইবেন।

নৌ ও সেনাবাহিনী ঃ নৌবাহিনীর জন্য নানা প্রকার নৌকা পোতাগারে প্রস্তুত ও মেরামত হইত। তখন যন্ত্র চালিত জাহাজ ছিল না। বাদামের সাহায্যে বড় বড় নৌকা সমুদ্রে চলিত। উহাকে লোকে জাহাজ বলিত।

মৌতলার সন্নিকটে জাহাজঘাটা কুঠারবন নামক স্থানে পোতাশ্রয় ছিল। ঘুরাব, বাছাড়ী, ছিট, পাতিল, কোশা প্রভৃতি দ্রুতগামী নৌকা সৈন্যদের জন্য ব্যবহৃত হইত। এখনও এ দেশে বাছাড়ী নৌকার প্রচলন আছে।

প্রতাপাদিত্যের পোতাশ্রয়ের প্রধান ছিলেন ফ্রেডারিক ডুডলী (পর্তুগীজ)। তিনি জাহাজ নির্মাণ কার্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। জাহাজঘাটার অনতিদূরে তাঁহারই নামানুসারে একটি গ্রামের নাম হইয়াছে দুদ্‌লী। ঐ গ্রামে জাহাজ নির্মাণের ডক ছিল। খাজা আব্বাছ নামক এক ব্যক্তি ডুডলীর অধীন ডকের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। নৌসেনার অধিনায়ক ছিলেন অগাষ্টাস পেড্রো। গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন ফ্রান্সিসকো রডা।

প্রতাপের তীরন্দাজ সৈন্য ছিল। তীর চালনা সে যুগের প্রচলন ছিল। তীরন্দাজদের মধ্যে ধুলিয়ান বেগ, সুন্দর প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। ধুলিয়াপুর গ্রাম আজিও ধুলিয়ান বেগের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। প্রতাপের পদাতিক সৈন্যরা ঢালী নামে খ্যাত; ঢালী নায়কদের মধ্যে মদনমল্ল ও কালিদাসের নাম পাওয়া যায়। এখনও সুন্দরবন অঞ্চলে অসংখ্য হিন্দু-মুসলিম ঢালী উপাধিধারী লোক আছে। তাহাদের পূর্বপুরুষেরা সৈন্যবিভাগে

কাজ করিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। গ্রামাঞ্চলে এখনও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকে ঢালী খেলা বলা হয়।

ঢালী সৈন্য ব্যতীত প্রতাপের কুকি সৈন্য ছিল। রাজধানী ও রাজপরিবারের রক্ষার জন্য পৃথক বাহিনী ছিল। তাঁহার কিছু হস্তী সৈন্যও ছিল। প্রতাপাদিত্যের অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তবে নদী অঞ্চলে হস্তী অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্য অধিক না থাকাই সম্ভব। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে প্রতাপের যশ ও খ্যাতি মুখর করিয়া রাখিয়াছেন ,

'যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী;
ষোড়ষ হলকা হাতী অযুত তরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।
তাঁর খুড়া মহাশয় আছিলা বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিলা।
তাঁর বেটা কুকুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইলা।
ক্রোধ হইল পাতশায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
মানসিংহে বাংলায় পাঠাইলা।

বায়ান্ন হাজার ঢালী সৈন্যের কথা অতিরঞ্জিত। আবদুল লতিফ নামক ভ্রমণকারীর বিবরণে জানা যায় যে. "প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের শক্তিশালী রাজা। তাঁহার যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ সাতশত নৌকা এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আছে। এবং তাঁহার রাজ্যের আয় পনর লক্ষ টাকা।"

প্রতাপের আমীর ওমরাহদের মধ্যে সূর্যকান্ত ও শংকর রাজ্যে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কারণ উভয়ে প্রতাপের বাল্যবন্ধু। শংকর রাজস্ব ও রাজ্যশাসন ব্যাপার পরিদর্শন করিতেন। সূর্যকান্ত ছিলেন বীরযোদ্ধা। তিনি একসময় রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন ভবানন্দ মজুমদার। বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসু একজন কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। বংশীপুরে রূপরামের দীঘি তাঁহার কীর্তি চিহ্ন রক্ষা করিতেছে। ইনি পরে প্রতাপের বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের মধ্যে শ্রীপতি গুহ, বাজিত হাজারী এবং জগৎ সহায় দত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। দুর্গাধ্যক্ষের মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত চৌধুরী, খাজা কামাল (বিকৃত নাম কমল খোজা), মুয়াজ্জিম বেগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাজা কামাল, সূর্যকান্ত,

জামাল খাঁ, যুবরাজ উদয়াদিত্য, ধুলিয়ান বেগ এবং পর্তুগীজ রডা প্রমুখ কয়েকজন দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন।

মীর্জা নাথন প্রণীত 'বাহ্‌রীস্তান-ই-গায়েবীতে' এই সমস্ত বীরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। খাজা কামাল মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। জামাল খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্তা কতলু খাঁর পুত্র। খাজা কামাল যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, উদয়াদিত্যের পলায়নের পর জামাল খাঁ যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাল, তলোয়ার, শড়কী, বল্লম, লেজা, কামান, বন্দুক, বর্শা, তীর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। ঈশ্বরীপুরে রাজধানীর উত্তরে বড় রাস্তায় বুরুজ পোতার পার্শ্বে যমুনা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদীই ছিল প্রতাপের জাহাজ চলাচলের একমাত্র পথ এবং রাজধানীর সৌন্দর্য। সে যমুনায় এখন কোন নমুনা নাই। সেখানে চাষীরা ধান্যের আবাদ করে।

প্রতাপ হিন্দু রাজা হইয়াও পাঠান ও পর্তুগীজ সৈন্যেরা যুদ্ধে অধিকতর দক্ষ বলিয়া তাহাদেব নিযুক্ত করিতেন। শতদোষ সত্ত্বেও প্রতাপ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে লোক নিয়োগ করিতেন এবং সাম্প্রদায়িকতা হইতে নিজকে দূরে রাখিতেন বলিয়া মনে হয়।

প্রতাপের রাজ্যে নানা স্থানে অস্ত্রাগার ছিল। এখনও এ দেশের লোকেরা সেকালের ন্যায় বন্দুক ও কামান প্রস্তুত করিতে পারে। এখনও সুন্দর সুন্দর তরবারি প্রস্তুত হয়। সৌখিন লোকেরা হরিণ ও মহিষের শিং দ্বারা নির্মিত ছড়ির মধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারি ব্যবহার করিয়া থাকে।

স্বাধীনতা ঘোষণা ঃ কিছুদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিবার পর প্রতাপের সুখময় দিনগুলি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিতে থাকে। আরাকানীয় মগেরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া নৌকায় বাস করিত। এই মগ ও ফিরিঙ্গিরা একত্রে মিশিয়া দক্ষিণবঙ্গে লুটতরাজ ও নরহত্যা চালাইত। বাকলার রাজা কন্দর্পনারায়ণ ও প্রতাপাদিত্যকে মগ-ফিরিঙ্গিদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারের মুখে বাকলা রাজ্য প্রথমে পড়িত, পরে তাহারা যশোর রাজ্যেও প্রবেশ করিত। একটি পৃথক অধ্যায়ে পর্তুগীজ মিশনারী ও মগ-ফিরিঙ্গিদের সহিত প্রতাপের সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

প্রতাপের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু ঘটে। বসন্ত রায় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরোধিতা না করিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে থাকেন। অন্য কোন উপায়ও ছিল না। রক্তপাত ব্যতীত বিরোধিতা সম্ভবও ছিল না। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বসন্ত রায় তাহা এড়াইয়া চলিতেন।

প্রতাপ মুঘলদের সামন্তরাজ। সেজন্য তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ যাত্রার জন্য তাঁহার ডাক আসে। তিনি মানসিংহের সঙ্গে উড়িষ্যাভিযানে যান। উড়িষ্যা বিজয়ের পর তিনি তথা

হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ এবং উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ লইয়া আসেন। প্রথম বিগ্রহ রাজধানীর সন্নিকটে গোপালপুর এবং দ্বিতীয়টি সুন্দরবনের মধ্যে বেদকাশী নামক স্থানে এক মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোবিন্দদেব বিগ্রহ পরে রায়পুরে আনিয়া স্থাপন করা হয়। সেখানে গোবিন্দদেবের নামে মহা ধূমধামে দোলযাত্রা উৎসব হইত। পরে এই মূর্তি কাটুনিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রতাপ এতদিন মুঘলদের সামন্তরাজ ছিলেন এবং উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পর মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। রাজা বসন্ত রায় প্রতাপকে তাঁহার ভয়াবহ পরিণামের কথা বুঝাইয়া দেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র— একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস থাকিল না। প্রতাপ সর্বদা বসন্ত রায়কে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

১৫৯৯ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রবাদ আছে যে, এই স্বাধীনতা ঘোষণার সময় তিনি দীন দুঃখীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রার্থিগণ যে যাহা চাহিয়াছিল রাজকোষ হইতে তাহা পূরণ করা হয়। এই দানের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। স্বাধীনতা ঘোষণার পর এই দানের কাহিনী শ্রবণে জনৈক ভাট রচনা করেন ঃ

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকী পাতালে
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মন্ডলে।।"

ক্ষমতালিপ্সু প্রতাপ এখন যাহা খুশী তাহাই করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যলিপ্সা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্তরে চিন্তা করিতে থাকেন কি করিয়া প্রতিবেশী বাকলা রাজ্য ও শরিক বসন্তরায়ের অংশ হস্তগত করা যায়। এই সঙ্গে প্রতাপ সম্পর্কে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, তিনি শুধু নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন না, তিনি একজন কুখ্যাত মদ্যপায়ী হিসাবে সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ দিবে।

সতীশবাবু বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রতাপ যশোরে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। এ বিষয় তিনি বেশ গবেষণাও করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত তাঁহার কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা সতীশবাবুর আবিষ্কার মাত্র।

কার্ভালোর হত্যা ঃ বারভুঞাদের আমলে যে সমস্ত বিদেশী সেনানায়ক বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে সেনাপতি কার্ভালো অন্যতম। এই পর্তুগীজ বীর কেদার রায়ের সেনাপতি ছিলেন। তিনি গোয়ার ন্যায় সন্দ্বীপকে পর্তুগীজ উপনিবেশে পরিণত করেন। শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজদের সন্দ্বীপ ত্যাগ করিতে হয়। কার্ভালোও সে স্থান ত্যাগ করিয়া হুগলী চলিয়া আসেন।

এই সময় আরাকানীর সহিত পর্তুগীজদের চরম বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা এতই ক্ষমতাপন্ন হইয়া পড়ে যে, শীঘ্রই যশোর রাজ্য আক্রমণের হুমকি দেয়। প্রতাপও এদিকে

মুঘল আক্রমণ ভয়ে ভীত। মগরাজার বিষয় এবং কার্ভালোর সন্দ্বীপ হইতে চলিয়া আসার কথা এবং প্রতাপের বিশ্বাসঘাতকতা অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে।

প্রতাপ মগরাজার সহিত গোপনে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুসারে প্রতাপ পর্তুগীজ বীর কার্ভালোর মস্তক উপহার দিলে মগেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবেন। প্রতাপ কার্ভালোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অন্তরে বিশ্বাসঘাতকতার পাপারূপ চাপাছিল। তিনি তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতাপ কার্ভালোকে হত্যা করিয়া মগ আক্রমণ হইতে রক্ষা পান। সতীশবাবু প্রতাপ কর্তৃক কার্ভালোর হত্যা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদুনাথ সরকার বলেন, প্রতাপাদিত্যই এই হত্যাযজ্ঞের নায়ক। ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য স্বীয় পিতৃব্যকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে একজন বিদেশী সেনাপতিকে হত্যা করা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না।

সতের

সুন্দরবনাঞ্চলে খৃস্টান পাদরী ও মগফিরিঙ্গি

পঞ্চদশ শতকে পর্তুগীজ নাবিকেরা দক্ষিণ বঙ্গে আগমন শুরু করে। পাশ্চাত্যের তিন শ্রেণীর লোক এদেশে আগমন করিত। একদল ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। অন্যদল খৃস্টান ধর্ম প্রচার করিত। আর একদল ছিল জলদস্যু। পর্তুগীজ জলদস্যুকে হার্মাদ বলা হইত। আরমাডা হইতে হার্মাদ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারাই ফিরিঙ্গি দস্যু বলিয়া কথিত হয়। মগেরাও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিত, সেইজন্য মগ-ফিরিঙ্গির কথা একত্রে বলিব।

পক্ষান্তরে পাদরী বা মিশনারীরা খৃস্টান ধর্ম প্রচার করিত। উন্নত চরিত্রের লোকেরাই মিশনারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এদেশে আসিত। আলোচনার সুবিধার্থে একত্রে সবগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

খৃস্টান পাদরী ঃ বাকেরগঞ্জ ও খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে ভীষণকায় দরিয়া শুধু জলে জলময়। সমগ্র সুন্দরবন প্রদেশের সহিত সাগরের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সাগর পথেই দেশবিদেশ হইতে বাণিজ্য-জাহাজ আসিয়া দক্ষিণবঙ্গ তথা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যবসায় চালাইত সে কথা বিভিন্ন জাতির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার লোকেরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে বঙ্গদেশে আগমন করিত। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের পূর্বেও যাতায়াতের পথ সুগম হয় নাই। মুসলিম অধিকারের পূর্বেও এদেশে বহির্বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল এবং সাগর পথেই সে বাণিজ্য চালিত হইত। মুসলিম বিজয়ের পূর্ব হইতে আরবীয় সুফী সাধক ও ব্যবসায়ীরা সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মের আবির্ভাব হয় মধ্যপ্রাচ্যে। খৃস্টানধর্ম অতীব প্রাচীন এবং ইসলাম অভ্যুদয়ের ৫০০ বৎসর পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু যতদূর জানা যায়, মুসলমানদের পূর্বে অন্য কোন জাতি ধর্ম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে আসেন নাই। গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতি জাতি এদেশে তাহাদের কৃষ্টির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ধর্ম প্রচার করে নাই।

ইসলাম প্রচারকল্পে আরব নাবিকদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে থাকে। তাঁহারা ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি মহাসাগরীয় দ্বীপে এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার করিতেন।

বংশীদাসের পদ্মপুরাণে ফিরিঙ্গিদের উল্লেখ আছে ঃ

মগরিঙ্গি যত বন্দুকে করিতে হত
একেবারে দশবিশ ফুটে।

কামান বন্দুক ভরি ছাড়িতেছে ঘড়িঘড়ি
যার শব্দে হস্তী ঘোড়া ছোটে।।

ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, ১৫১৭ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলাদেশে আগমন করে। সম্ভবত ১৫৩৭-৩৮ খৃস্টাব্দে তাহারা সপ্তগ্রামের কাছে ব্যান্ডেল ও হুগলীতে গ্যালিন নামে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ ও দুর্গ স্থাপন করেন।

তুর্ক আফগান আমলে এ দেশে পর্তুগীজ, স্পেন ও ইটালী হইতে খৃস্টান পাদরীগণ বঙ্গোপসাগর হইয়া প্রাচ্যে খৃস্টান ধর্মের মহিমা প্রচার করিতেন। এই সমস্ত পাদরীদের মধ্যে যেসুইট মিশনারীর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৫৪০ খৃস্টাব্দে ইগ্নেসিয়াস নামক এক স্পেন দেশীয় ব্যক্তি দ্বারা 'জেসুইট' বা যীশু সম্প্রদায় নামক একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। শিক্ষা বিস্তার, মানবসেবা ধর্ম ও প্রচারই তাহাদের উদ্দেশ্য। দুঃসাহসী নাবিকদের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানের লোকেরা দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। এখনও বহু খৃস্টান মিশনারী জীবনের সুখ-সম্ভোগ ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া এদেশে কার্যে লিপ্ত আছেন। পৃথিবীতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য দেশ নাই যেখানে তাঁহাদের প্রচারকার্য চালিত হয় নাই। পাদরীদের মধ্যে ঐক্য শৃঙ্খলা ছিল। তাঁহারা প্রধান পুরোহিত বা নেতার আদেশ ভক্তির সহিত পালন করিতেন।

১৫৪২ খৃস্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের সেন্টফ্রান্সিস জেভিয়ার পাক-ভারতে আগমন করেন। আজিও কলিকাতার সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ১৫৭৬ খৃঃ ফাদার ভাজ ও ডিয়াজ নামক দুইজন পুরোহিত বঙ্গে আসেন। কিন্তু তাঁহারা মুঘল সম্রাটের আদেশে ফতেপুর সিক্রি চলিয়া যান।

ক্যাম্পোজ প্রণীত 'বঙ্গে পর্তুগীজ' গ্রন্থে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদ-নদীর আধিক্য এবং সুন্দর ফসলাদী সর্বপ্রথমে পর্তুগীজ জল দস্যুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গের ধান্য ও ধনদৌলতের খ্যাতি ছিল এবং এই দেশের আর্দ্র জলবায়ু এবং কোমলস্বভাব মানুষের নিকট হইতে রক্তচোষার দল চিরকাল সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে।

জলদস্যু ও পর্যটকদের নিকট শুনিয়া পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এ দেশের উপর পতিত হয়। তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসিতে থাকেন। সর্বপ্রথম পর্তুগীজ বণিকের নাম ডি-জোয়া এবং তাঁহার পর আসেন ডি-সিলভেরিয়া। পরে মার্টিন আলফানসো প্রভৃতি বহু পর্তুগীজ নাবিকের আগমন বার্তা শ্রুত হয়।

লিকোলাস প্রাইমেন্টার বিবরণে জানা যায় যে, তিনি ফ্রান্সিস ফার্ণান্ডেজ ও ডেমিনীক সোমা নামক দুইজন পাদরীকে ১৫৯৬ খৃস্টাব্দে বঙ্গদেশে খ্রস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। পাইমেন্টা ঐ সময় জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে গোয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার পরবৎসর ফেনসেকো ও এন্ড্রুনামক আরও দুইজন পুরোহিত ইটালী হইতে বঙ্গে প্রেরিত হন। কোচীন হইতে যাত্রা শুরু করিয়া তাঁহারা পক্ষকাল সফরের

পর বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের আমন্ত্রণে তথায় আগমন করেন। তাঁহারা সুন্দরবনকে ভয়সঙ্কুল বনস্থলী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরোহিতদ্বয় সুন্দরবনের নদীতে জলদস্যুর ভীতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত এক দলিলে জানা যায় যে, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল তারিখে বাকলার রাজা পরমানন্দ রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফার্নান্ডেজ। তিনি বঙ্গে পৌঁছিয়া পাইমেন্টোর নিকট কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করেন। ঐসকল পত্রের বুনিয়াদে পাইমেন্টো ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ক্লডের নিকট বঙ্গীয় মিশনারীদের সম্পর্কে পর্তুগীজ ভাষায় যেসব পত্র লিখিয়াছিলেন, লিসবনে উহা ১৬০২ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ডু-জারিক নামক একজন ফরাসী গ্রন্থকার ঐসকল পত্র ও অন্যান্য বিবরণীসমূহ এশিয়ায় খৃষ্টধর্মের অবস্থা সম্পর্কে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহা বৃহৎকায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ, তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়। এই মূল্যবান গ্রন্থে বাকলারাজ রামচন্দ্র, যশোররাজ প্রতাপ্রাদিত্য ও বারভুঞাদের সম্পর্কে মূল্যবান ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

ডু-জারিকের গ্রন্থ হইতে চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ ও হুগলী জেলার ব্যান্ডেলে পর্তুগীজ আগমনের বিষয় জানা যায়। এই গ্রন্থখানি পর্তুগীজ তথা বঙ্গদেশেব খৃষ্টান ধর্মের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। উহা হইতে জানা যায় যে, পাদরীদের আগমনে রাজা প্রতাপাদিত্য বিশেষ আনন্দিত হন এবং তাঁহাদের বিশেষ আদর-আপ্যায়ন করেন। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া তাঁহারা যশোরে (ঈশ্বরীপুর) গীর্জা নির্মাণ করিয়া খৃস্টধর্ম প্রচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

ডু-জারিকের বিবরণে আরও জানা যায় যে, বাকলা, শ্রীপুর ও যশোর (চন্ডিকান) তখন তিনটি প্রধান হিন্দুরাজ্য ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি কারণে পর্তুগীজ ও অন্যান্য খৃস্টানেরা সমুদ্রপথে এখানে আসিয়া বসবাস করিতেন। এখানে বসবাস করার সময় ধর্মের সঙ্গে তাঁহাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। ফাদার ফেনসেকো বাকলা পৌঁছিলে তথাকার পর্তুগীজগণ বহুদিন পরে স্বদেশ হইতে আগত পুরোহিতদের দেখিয়া পরম আনন্দলাভ করেন। জেসুইট পুরোহিত বাকলার নাবালক রাজা রামচন্দ্রের সহিত আলোচনা করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজসভায় ফেনসেকো বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

ফেনসেকো বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক হালহকিকত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। বালক রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; "আপনি কোথায় যাইবেন?" উত্তরে ফেনসেকো বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার ভাবী শ্বশুরের রাজধানীতে যাইব।" পাদরী গীর্জা নির্মাণের অনুমতি চাহিলে রামচন্দ্র আনন্দে সে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ফেনসেকো তখন বাকলা ত্যাগ করিয়া যশোরের রাজধানী ঈশ্বরীপুরে আসেন।

ফাদার সোসা ইতিমধ্যেই যশোরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। ফেনসেকো সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পরদিন তিনি যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের দরবারে উপস্থিত হন। এইখানে ইতিমধ্যে একটি পর্তুগীজ পল্লী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্তুগীজদের অনেকে প্রতাপাদিত্যের রাজসরকারে চাকুরী করিত। ব্যবসায় বাণিজ্যও ছিল। কয়েকজন পর্তুগীজ উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রেডারিক ডুডলী ও রডা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ফেনসেকো রাজা প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গীর্জা নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি পাইমেন্টাকে যশোররাজের উদারতার প্রশংসা করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। রাজার হুকুম পাইয়া পর্তুগীজগণ গীর্জা নির্মাণ আরম্ভ করিয়া দিল। পর্তুগীজ সমাজ চাঁদা করিয়া যথাসত্বর এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্য সমাধা করিল। মুসলমানদের মসজিদ, খৃস্টানদের গীর্জা এবং হিন্দুদের মন্দির নির্মাণে কোনদিনই অর্থের অভাব হয় না।

পাদরীদের আপ্রাণ চেষ্টায অতি অল্পদিনের মধ্যে গীর্জা নির্মাণের কাজ শেষ হইতে চলিল। ১৫৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে সমস্ত কার্য শেষ হইয়া গেল। এ সম্পর্কে ফেনোসেকোর পত্রে জানা যায় ; "বঙ্গদেশে জেসুইটদের সর্বপ্রথম গীর্জা এইখানে প্রস্তুত হয় এবং ইহার নামকরণ হয় 'যীশুর গীর্জা'। পর্তুগীজদের অর্থে এই গীর্জা জাকজমক সহকারে সুসজ্জিত হইল এবং পহেলা জানুয়ারীতে খুব ধুমধামের সহিত উপাসনা পর্ব শেষ হইল। "রাজা এই গীর্জা দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনিও ভক্তিভরে পাদুকা খুলিয়া গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করেন।"

ঈশ্বরীপুরে বৃক্ষলতার মধ্যে গীর্জার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। গীর্জার সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গন ও গোরস্থান ছিল। গোরস্থানের সমাধিগুলি দর্শনে উহাকে খৃষ্টান গোরস্থান বলিয়া বুঝা যায়। রাজধানী যশোরের খৃস্টান ভজনালয়ই বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা। দ্বিতীয় গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যান্ডেলে এবং তৃতীয় গীর্জা চট্টগ্রামে।

ডু-জারিকের গ্রন্তের নাম 'হিষ্টইরী ডেস ইনডেজ ওরিয়েন্টেলাস' ১৬১০ সালে প্রকাশিত হয় ফরাসী ভাষায়। বঙ্গদেশ হইতে ১৫৯৯ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর ফ্রান্সিস্ ফার্নান্ডেজ প্রথম পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত গ্রন্থে এই পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কোচীন হইতে বঙ্গদেশে আগমনের কাহিনীতে পূর্ণ। আমরা উহার একাংশের উদ্ধৃতি দিতেছি ;

—মে মাসে সোসাগ্যালিন (হুগলী) অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহাকে পথে বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ দস্যুগণ তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিয়া তীরাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে তাহারা পালাইতে বাধ্য হয়। চন্ডিকান যাইতে আমরা পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম।

"বাকলারাজ আমাদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠান। আমি আমার সঙ্গী পর্তুগীজদের লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। রাজপ্রাসাদে পৌঁছিলে রাজা আমাদের নিকট দুইবার সংবাদ প্রেরণ করেন। আমরা গিয়া দেখি রাজা তাঁহার সম্ভ্রান্ত লোক ও সেনাপতিগণসহ আসনে উপবিষ্ট আছেন। সুন্দব গালিচার উপর সকলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে

আর একটি গালিচায় রাজা আমাকে ও আমার সঙ্গীগণকে বসিবার অনুমতি প্রদান করেন। পরস্পরের অভ্যর্থনার পর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা কোথায় যাইবেন? আমি উত্তর করিলাম যে, আমরা আপনার ভাবীশ্বশুর চ্যান্ডিকানের রাজার নিকট যাইব।"

"রাজা আমাদিগকে গীর্জা নির্মাণের আদেশ দিলেন। পরে তিনি দুইজনের উপযুক্ত বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। বাকলা হইতে চণ্ডিকানের পথ এইরূপ রম্য ও মনোজ্ঞ যে, আমরা কখনও সেরূপ দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। স্বচ্ছসলিলপূর্ণ বহু সংখ্যক নদ-নদী বহিয়া আমরা গমন করি। এই সকল নদীকে সে দেশে গাঙ বলিয়া থাকে। উহাদের তীরসমূহ শ্যামল তরুরাজির দ্বারা সুশোভিত। প্রান্তরে ধান্য রপিত হইয়াছে ও গাভীরদল বিচরণ করিতেছে। খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় সুন্দর বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে এবং অনুকরণকারী বানরেরা লম্ফপ্রদান করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছে। এই সকল সুন্দর ও উর্বর স্থানে অনেক ইক্ষু জন্মিয়াছে। এই অরণ্য মধ্যদিয়া গমন করা অত্যন্ত বিপদজনক, কারণ তাহার মধ্যে অনেক গণ্ডার ও হিংস্র জন্তু বিচরণ করিয়া থাকে।

"আমরা ২০শে নভেম্বর চণ্ডিকানে উপস্থিত হই এবং রাজাকে কতকগুলি বেরীনগাঁয়ের কমলালেবু উপহার দিই। তিনি অত্যন্ত সম্মান করেন। আমরা তাঁহার আদেশ লইয়া গীর্জা নির্মাণ করি। ঐ গীর্জাকে আমরা সুসজ্জিত করিয়াছিলাম এবং উহাই বাংলাদেশের প্রথম গীর্জা।"

পর্তুগীজগন যশোর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ সুখ-শান্তিতে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। প্রতি বৎসর গীর্জার বার্ষিক অনুষ্ঠানে খুব আমোদ-প্রমোদ হইত। পাদরীদের এক পত্রে জানা যায় যে রাজা নিজে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া গীর্জা পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পর্তুগীজদের সুখের দিনগুলি ক্রমাগত নিঃশেষ হইতে লাগিল। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে প্রতাপ তাহাদিগকে বিষ নজরে দেখিতে শুরু করিলেন।

ডু-জারিকের বিবরণে জানা যায় যে, সন্দ্বীপ কেদার রায়ের রাজ্যাধীন ছিল। পরে উহা মুঘলদের অধীনে আসে। কেদার রায়ের সেনাপতি পর্তুগীজ কার্ভালো। তিনি সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া উহাকে গোয়ার ন্যায় পর্তুগীজ উপনিবেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতে সন্দ্বীপের মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া যায়। চট্টগ্রামের পর্তুগীজ সেনাপতি ম্যানুয়েল ডি-মার্টোসের সাহায্যে কার্ভালো সন্দ্বীপের মালিকানা লাভ করেন।

ক্ষমতা লিপ্সু পর্তুগীজদের সন্দ্বীপে একটি আড্ডা হওয়ায় তাহাদের প্রবৃত্তি দস্যুবৃত্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই সময় পর্তুগীজ জলদস্যুরা নৌকা যোগে সুন্দরবনে ঢুকিয়া যেখানে সেখানে লুটতরাজ ও নর হত্যা করিত। পর্তুগীজদের সঙ্গে বাকলা রাজ ও যশোর রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু সে সম্পর্ক স্থায়ী হইল না।

পর্তুগীজদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শিবসা নদীর পূর্ব তীরে গহীন অরণ্যাভ্যন্তরে মুঘল আমলে কালী বাড়ী ও শেখের ট্যাক নামক অঞ্চলে এবং সুন্দরবনের আরও কতিপয় স্থানে এই সময় মনুষ্যবসতি ও সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল সে বিষয়ে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আরাকান রাজ প্রথমে পর্তুগীজদিগকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় দেন। অতি সত্বর প্রমাণিত হইল যে, আরাকান রাজ খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছে। অতঃপর তিনি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শায়েস্তা করেন। প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে পর্তুগীজরা মগের মুল্লুক আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সন্দ্বীপে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। মগফিরিঙ্গির এই যুদ্ধে মগেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করে।

এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের জন্য খৃস্টান পাদরীদের বিরুদ্ধেও দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেয়। ফার্ণাণ্ডেজ ইতিমধ্যে আরাকানীদের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সমস্ত ঘটনার পর পর্তুগীজেরা নিদারুণ বিপদে পতিত হয়। গোপনে তাহারা দলে দলে চট্টগ্রাম, আরাকান ও সন্দ্বীপ ত্যাগ করে। তাহারা বাকলা ও যশোর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সমস্ত পাদরী ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া আসেন।

পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো ইহাতেও দমিলেন না। তিনি বীর বিক্রমে আরও কয়েকটি যুদ্ধ করিলেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও বীরত্বের পরিচয় দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সন্দ্বীপ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্যাণ্ডেলে চলিয়া যান। তথা হইতে যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের আহ্বানে কার্ভালো ধূমঘাট গমন করেন।

ডু-জারিকের এক বিবরণে জানা যায়, "মগরাজা সন্দ্বীপ অধিকার করার পর বাকলা রাজ্যের কিয়দংশ দখল করিয়া চাঁদেকান (যশোর) রাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।" ইহাতে প্রতাপাদিত্য বিশেষ চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়েন। একদিকে মুঘলদের আশু আক্রমণ ভীতি, অন্যদিকে মগের আক্রমণ। প্রতাপাদিত্য মনে করিলেন এবার আর তাঁর রক্ষা নাই। চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। শাসকসমাজ সাধারণ মানুষের ন্যায় চিন্তা করেন না। তাঁহাদের অনেক সময় "চাচা আপন জান বাঁচা" নীতি গ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্বকেও জলাঞ্জলী দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতাপ তাহাই করিলেন।

ডু-জারিকের বিবরণে স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্য এই সময় মগরাজার সহিত পর্তুগীজ স্বার্থের পরিপন্থী এক সন্ধি করিতে মনস্থির করেন। তদনুসারে গোপন সিদ্ধান্ত হইল যে, আরাকান রাজ্যের পরম শত্রু সেনাপতি কার্ভালোর মস্তক উপহার দিতে পারিলে মগরাজা যশোর রাজ্য আক্রমণ করিবেন না। স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য বিদেশী বন্ধুকে শেষ করিয়া প্রতিবেশী শত্রুর উপকারার্থে উপায় হইয়া গেল।

প্রতাপের অন্তরে বিশ্বাসঘাতকতার পাপপঙ্কিল আবৃত ছিল। কার্ভালো রাজধানীতে আগমণ করিলে তিনি তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জরীর

পোশাক ও একটি মূল্যবান অশ্ব তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। রাজার ব্যবহারে কার্ভালো কোন প্রকার বিপদ সংকেত সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

রাজদরবারের কোন গুপ্ত সংবাদ অধিকদিন চাপা থাকেনা। এ দিকে ধূমঘাটে পর্তুগীজ ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে গুজব রটিয়া গেল যে, রাজা কার্ভালোর মস্তকের বিনিময়ে আরাকান রাজার সহিত গুপ্ত সন্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কার্ভালো সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি কয়েকজন সঙ্গীসহ প্রতাপের দরবারে গিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। পূর্বে বন্দোবস্ত অনুযায়ী কার্ভালোকে রাজ সমীপে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হইল। তিনি যখন সদলবলে রাজবাড়ীর সদর তোরণ অতিক্রম করিয়া অন্যদ্বারে প্রবেশ করিলেন তখন প্রতাপ নিযুক্ত প্রহরীরা তাঁহাকে আটকাইয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গীদের বন্দী করিয়া অস্ত্র ও পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়া নিষ্ঠুরতা ও অবমাননার সহিত গায়ে লোহার বেড়ী পরানো হইল।

সম্ভবত আরাকান রাজ্যের গুপ্ত সন্ধি অনুযায়ী প্রতাপাদিত্য কার্ভালোকে হত্যাব আদেশ দেন। রাজাদেশে কার্ভালো ও তাঁহার সঙ্গীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাযজ্ঞের পর স্থানীয পর্তুগীজেরা বিপন্ন হইয়া পড়ে। সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, এই সময় স্থানীয় মুসলমানেরা পর্তুগীজদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। তিনি ইহা কোথায় পাইলেন উল্লেখ করেন নাই। ফলকথা প্রতাপাদিত্যের অকথ্য অত্যাচারে পর্তুগীজেরা ধূমঘাট অঞ্চল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন। রাজাদেশে তাহাদের নিকট হইতে অগণিত অর্থ দণ্ডস্বরূপ গৃহীত হয়।

পর্তুগীজদের বাসভবনের উপর লুটপাট চালিয়েছিলেন। সতীশবাবু কার্ভালোর পরিমাণ সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রতাপের স্কন্ধে দোষ না চাপাইয়া এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পর্তুগীজরা এদেশে ব্যবসায় করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করিত। সমগ্র বাকেরগঞ্জে তাহাদের বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছিল। সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে, পাদরী শিবপুরে এবং অধুনা বরিশাল শহরে তাঁহারা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পাদরীগণ ধর্মপ্রচার করিত বণিকরা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত এবং জলদস্যুরা লুটতরাজ ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত।

বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে খৃস্টান পাদরীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল পাদরীশিবপুর গ্রামে। এখানে খৃস্টান উপনিবেশও গড়িয়া উঠিয়াছিল। বরিশাল শহরের দক্ষিণে নদীতীরে এখনও পাদরীদের একটি সুরম্য হর্ম আছে। খুলনা তথা সুন্দরবন প্রদেশেও পর্তুগীজদের ব্যবসায় ছিল।

রাজা রাজবল্লভ গোয়া হইতে পর্তুগীজ আনিয়া শিবপুরে স্থাপন করেন এবং 'তালুক প্যাড্রিয়ান' দান করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা মগফিরিঙ্গির জন্য যে নওয়ারা ভূমি দান করিয়াছিলেন, কোম্পানী সরকার ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে তাহা খাস করেন।

মগদের সংস্পর্শে জাতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় হিন্দু জনসাধারণের বিরাট একাংশ দক্ষিণাঞ্চল ত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে গমন করে। ফলে ভোলা পটুয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাকেরগঞ্জ জেলার ইলতা, কবাই প্রভৃতি স্থানের নাম পর্তুগীজ ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং বাকেরগঞ্জ, ভোলা ও মেহন্দীগঞ্জের নীল চক্ষুর লোকেরা পর্তুগীজদের বংশধর বলিয়া অভিহিত হয়।

মগ ও ফিরিঙ্গি ঃ মগফিরিঙ্গিদের যুদ্ধবিগ্রহ ও শত্রুতার কথা বলিয়াছি। এখন তাঁহাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় দুর্ধর্ষ দস্যুদল সৃষ্টি হইয়া সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে যে তান্ডবলীলা সৃষ্টি করিয়াছিল সে কাহিনী বর্ণনা করিব। মারাঠাবর্গী অপেক্ষা ইহাদের অত্যাচার কম ছিল না।

মুঘল আমলে বঙ্গদেশে মগফিরিঙ্গিরা যে অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছিল মানবজাতির ইতিহাসে উহা কলঙ্কস্বরূপ। ইহা এক মাত্র বর্গীর হাঙ্গামার সহিত তুলিত হইতে পারে। সমুদ্রপথে আসিয়া সুন্দরবনাঞ্চলে এই সমস্ত মগফিরিঙ্গি গ্রামে গ্রামে অমানুষিক অত্যাচার চালাইতো। নারীজাতির অবমাননা, নারীহরণ, লুটতরাজ, নরহত্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার জুলুম চলিত। ইহারা মগফিরিঙ্গি জলদস্যু বলিয়া কুখ্যাত ছিল।

পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হার্মাদ বলা হইত তাহা পূর্বে বলিয়াছি। মগেরা আসিত আরাকান রাজ্য বা মগের মুল্লুক হইতে। অত্যাচার ও জুলুম হইতে 'মগের মুল্লুক' কথাটির ব্যবহার সর্বত্র দেখা যায়। গ্রন্থের প্রথম দিকে এ বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি এখন উহাদের বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিব।

পূর্ব-পাকিস্থানের দক্ষিণ পূর্ব কোণে আরাকান। এই রাজ্য বর্তমানে ব্রহ্মদেশের অধীন, চট্টগ্রামের পার্শ্বেই অবস্থিত। একটি পর্বতশ্রেণী ইহার পূর্বদিকে জুড়িয়া থাকায় উহা ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক দেখায়। ইহার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। আরাকানী মগেরা নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে বসবাস করে বলিয়া তাহারা নৌবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী। দুর্গম ও ভয়সঙ্কুল জলস্থলীতে যাতায়াতের জন্য তাহারা কষ্টসহিষ্ণু, দুঃসাহসী এবং বর্বর। এই রাজ্যাধীন সমুদ্রতটে বহু দ্বীপ আছে। পূর্বে রামাবতী নামক স্থানে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমানে উহার নাম সন্দোবয়।

বর্তমানে 'আরাকান অঞ্চল' ব্রহ্মদেশের পাঁচটি অঞ্চলের অন্যতম। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পার্বত্য অঞ্চল গহীন অরণ্যে আবৃত। আকিয়াব এই অঞ্চলের প্রধান নগর ও বন্দর। আরাকানের সহিত পূর্ব পাকিস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মহাকবি আলাওল রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজসভায় কাব্যচর্চা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

আরাকানের অধিবাসীরা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তাহারা এককালে বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র অহিংসা ভুলিয়া মানব হিংসায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। আরাকানের লোকেরা বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ আসিত। সন্দ্বীপে তাহাদের আধিপত্য ছিল। এই আরাকানের লোকদিগকেই মগ বলা হইত। এখন আরাকানে বহু মুসলমান বসবাস করে।

পর্তুগীজেরা সর্বপ্রথম গোয়া প্রভৃতি স্থান হইতে আরাকানে গিয়া সমুদ্রতীরে বসবাস করিত। উভয় দেশের লোকেরা একই প্রকার আবহাওয়ায় মানুষ সেজন্য কষ্টসহিষ্ণু ও বর্বর। উভয় জাতির লোকেরা ভিন্নদেশে দস্যুবৃত্তির জন্য দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণ ছিল মগফরিঙ্গির আভ্যন্তরীন মিলন সেতু। উভয় জাতি নৌবিদ্যায় ও দস্যুবৃত্তির জন্য এক জোটভুক্ত হইয়াছিল।

বঙ্গের বিখ্যাত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় পর্তুগীজদের আগমন হয়। স্পেনের পার্শ্ববর্তী পর্তুগাল রাজ্য ইহাদের আবাসভূমি। এই পর্তুগাল এক সময় আরবীয় মুসলমানের অধীন ছিল। বহুদিন নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্তুগীজরা সুদুর বঙ্গোপসাগরের তীরে উপস্থিত হইত। পর্তুগীজ রাজা ম্যানুয়েলের সময় সুবিখ্যাত নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা পঞ্চদশ শতকে আফ্রিকা ঘুরিয়া পাকভারতে আসিয়াছিলেন। এই সময় হইতে এদেশে ইউরোপের সহিত নৌপথে বহির্বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। পর্তুগীজরা বাণিজ্য বিস্তার ও দস্যুবৃত্তির ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য এদেশ বাছিয়া লয়।

পর্তুগীজগণ ক্রমান্বয়ে গোয়া প্রভৃতি স্থানে বসবাস আরম্ভ করে। বঙ্গদেশের সম্পদের খোঁজ খবর তাহারা রাখিত, সে জন্য এ দেশে আসার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে জাগরিত হয়। দক্ষিণবঙ্গ সমুদ্রতটবর্তী মনোরম দেশ। এই অঞ্চলের অসংখ্য নদ-নদী সমুদ্রবক্ষে পতিত হইয়াছে! সাগর তীরে কোথাও আবার ভয়সঙ্কুল জঙ্গল। নৌবিদ্যায দক্ষ মগ ফিরিঙ্গিরা জনমানবশূন্য জঙ্গলময় দেশে দস্যুবৃত্তি অভ্যাস করিতে লাগিল। তাহারা সমুদ্রকূল হইতে জঙ্গল ও নদ-নদী এবং তথা হইতে গ্রামাঞ্চলে আসিয়া উৎপাত ও লুটতরাজ শুরু করিয়া দিল।

পঞ্চদশ শতক অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত তাহারা বঙ্গদেশে আসিতে আরম্ভ করে। ১৫১৭ খৃঃ সর্বপ্রথম কোয়েলহা চট্টগ্রামে আসেন। পরবৎসর সিলভিরা নামক আর একজন পর্তুগীজ আরাকানে উপস্থিত হন। এই সময় হইতে তাহারা নৌকায় পণ্যসম্ভার বোঝাই করিয়া বঙ্গদেশে বণিকেরবেশে প্রবেশ করিত। ১৫২৮ খৃঃ মেলো নামক একজন পর্তুগীজ বন্দী অবস্থায় গৌড়ে নীত হন। মাহমুদশাহের রাজত্বকাল পর্তুগীজেরা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের আদেশ পায়। শেরশাহ্ যখন বঙ্গদেশ আক্রমন করেন তখন পর্তুগীজরা মাহমুদ শাহের অনুকূলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৫৮৮ খৃস্টাব্দে র‍্যালফফিচ্ বঙ্গে আসেন। তিনি কিছুদিন চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে অবস্থান করিয়া এক বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা অন্যত্র বলিয়াছি।

বোম্বে অঞ্চলে বহু দুর্বৃত্ত পর্তুগীজ বাস করিত। তাহারা কঠোর শাস্তির ভয়ে পলায়ন করিয়া বোম্বে অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে হিজরত করিত। দস্যুবৃত্তিই ছিল তাহাদের প্রধান ব্যবসায়। বোম্বে অঞ্চল হইতে ফিরিঙ্গি দুর্বৃত্তগন আসিত বলিয়া তাহাদিগকে বোম্বেটে বা বোম্বাটে বলা হইত। এখনও বঙ্গদেশে এ কথাটির অবাধ প্রচলন আছে। এই দলের লোকেরা সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইত।

সন্দ্বীপ তখন ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। এই উন্নত দ্বীপের নাম ছিল শোনদ্বীপ বা স্বর্ণদ্বীপ এবং উহা হইতে সন্দ্বীপ দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ বলেন সোমদ্বীপ হইতে সন্দ্বীপ হইয়াছে। পূর্বে এই দ্বীপ নোয়াখালীর মধ্যে ছিল এখন উহা চট্টগ্রামের অধীন। ডু-জারিকের বিবরণে জানা যায় যে, সন্দ্বীপ লবন ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রতি বৎসর দুই শতের অধিক জাহাজ লবণ ব্যবসায়ের জন্য এখানে আসিত। বিদেশাগত সকল জাতির দৃষ্টি এই সন্দ্বীপের উপর পতিত হইত।

পর্তুগীজেরা সন্দ্বীপের পরেই চট্টগ্রাম বন্দর বাছিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। চট্টগ্রাম শহরের একাংশের নাম এখনও 'ফিরিঙ্গি বাজার'। ঢাকায়ও অনুরূপ একটি স্থানের নাম আছে মগবাজার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন একজন পর্তুগীজ খৃস্টানের কবর গাত্রে পর্তুগীজ ভাষায় লিখনী খোদিত আছে। ইংরেজদের পূর্বে এ দেশের সম্পর্ক স্থাপিত হয় পর্তুগাল ও ফ্রান্সের সঙ্গে। সুন্দরবনে এখনও মগের ট্যাক, ফিরিঙ্গিখালি এবং ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়া নামক স্থান আছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, এককালে মগফিরিঙ্গিরা সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ এমন কি ঢাকা শহর পর্যন্ত তোলপাড় করিয়া দেশব্যাপী ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল।

বঙ্গদেশ চিরদিন লুটতরাজের উত্তমক্ষেত্র হিসাবে বহির্বিশ্বে পরিচিত। মগফিরিঙ্গির এ দেশে মারাঠা বর্গীর হামলা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। ইংরেজ আমলে প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের ঠগীদের আক্রমণ চলিত। ঠগীরা গলায় রুমাল পেঁচাইয়া মানুষ মারিয়া যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ঠগীদের কাহিনী সম্পর্কে পুস্তক আছে। একবার 'আনন্দবাজার' পত্রিকার পূজাসংখ্যায় ঠগীদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশিত হয়। ঠগীরা র‍্যামেসে ভাষায় কথা বলিত। মিঃ স্লিম্যান এই ভাষা শিখিয়া তাহাদের দলে মিশিয়া এই দস্যুদলকে সমূলে ধ্বংস করেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ঠ্যাঙ্গাড়ে' নামক একদল দস্যুজাতির কথাও বলিয়াছেন। ইহারা পথিপার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া মানুষের পায়ে ঠেঙ্গা মারিয়া খোঁড়া করিয়া যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। মগফিরিঙ্গিরা ঠগী ও ঠেঙ্গাড়েদের চেয়ে কম বর্বর ছিল না।

চট্টগ্রাম সৌন্দর্যশালী মনোরম সমুদ্র তীরবর্তী দেশ। মগ ফিরিঙ্গিরা দলে দলে এখানে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল। ১৫৯০ খৃস্টাব্দে তাহারা চট্টগ্রাম অধিকার করে। চট্টগ্রামের সন্নিকটে ডিয়াঙ্গা ও রামুতে তাহাদের আরও দুইটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

পর্তুগীজেরা এই সময়ে চট্টগ্রামে তাহাদের গীর্জা নির্মাণ করে। তখন হইতে তাহাদের দস্যুবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারা সমুদ্র তীর দিয়া নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪ পরগণা পর্যন্ত অত্যাচার চালাইত। নারীদের প্রতি তাহাদের কোন দয়ামায়া ছিল না। তাহারা রোজপূর্বক নারী হরণ করিয়া বিবাহ করিত বা দাস্যকার্যে নিয়োজিত করিত। বিবাহের পর এ দেশে তাহাদের সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পর্তুগীজদের এই সমস্ত মিশ্রিত সন্তান সন্ততিকে ভিরিঙ্গি বলা হইত। শেষ পর্যন্ত এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং

পরে সকল ইউরোপীয় খ্রিস্টানদিগকে ফিরিঙ্গি বলা হইত। ফ্রাঙ্ক শব্দ হইতে ফিরিঙ্গি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কলিকাতায় ফিরিঙ্গিদের টেসো বলা হইত।

মগেরা যাযাবরের ন্যায় স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ নৌকায় বসবাস করিত। সপরিবারে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিত। শেষ পর্যন্ত ফিরিঙ্গারা এদেশের সঙ্গে মিশিয়া গেল। তাহাদের রাজা অনেককে দুষ্কর্মের জন্য দেশে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ফলে অসংখ্য ফিরিঙ্গি মগদের সহিত মিলিয়া সখ্যতা স্থাপন করিয়া দস্যুবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিল। কথিত আছে যে এই দুই জাতির সহিত কোন কোন সময় স্থানীয় দস্যুরা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দস্যুবৃত্তির কঠিন পথ সুগম করিয়া দিত। এখনও সুন্দরবনাঞ্চলে জলদস্যুর অভাব নাই। ইহাদের কথা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে মগ ফিরিঙ্গির অত্যাচার চরমে পৌঁছিল। তাহারা লুণ্ঠন, নরহত্যা, গৃহদাহ, নারী হরণ প্রভৃতি জঘন্য কার্যদ্বারা দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। শান্তিপূর্ণ বাঙ্গালীজাতির দুর্দশার সীমা রহিল না। নদ-নদী বিধৌত ভাটিদেশ 'মগের মুল্লুকে' পরিণত হইল। বার্ণিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীতে জানা যায় যে, উহারা চৌর্য ও দস্যুবৃত্তিকে প্রধান ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করিত। দস্যুদল শহর, বাজার ও জনতার ভীড় দেখিলে দ্রুতগামী নৌকায় আসিয়া অকস্মাৎ কাপুরুষের ন্যায় নিরীহ লোকদের উপর বর্বর আক্রমণ চালাইত। বিবাহ উৎসবের সন্ধান পাইলে সেখানে গিয়া হামলা করিত এবং নারীদের ধরিয়া লইয়া যাইত। এ সমস্ত নারীদের অন্যত্র লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করিত। পুরুষদিগকে কঠিন কার্যে নিয়োগ করিত। জোরপূর্বক খৃস্টান ধর্মে দীক্ষার নজিরও বিরল নহে!

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মগ ফিরিঙ্গিদের জুলুম চরমে পৌঁছিয়াছিল। ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে তাহারা ভুষণা লুণ্ঠন করিয়া তথাকার রাজকুমারকে অপহরণ করিয়া খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। ভুষণার রাজকুমার পরে পাদরী দোম আন্তনিও নামে খ্যাতি লাভ করেন। ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে তৎপ্রণীত একখানি বাংলা গদ্যগ্রন্থ গোয়া হইতে প্রকাশিত হয়।

মগ ফিরিঙ্গির আকস্মিক হামলা প্রতিরোধের জন্য ঢাকা শহরে রক্ষী বাহিনী মোতায়েন থাকিত। চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ ও বাকলা অঞ্চলে এই যুগ্মদস্যুদলের অত্যাচার চরমে পৌঁছিয়াছিল। ১৫৭১ খৃস্টাব্দে চারিটি জাহাজের এক নৌবহর পর্তুগীজ পতাকা উড্ডীন করিয়া বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হয়। তাহারা জঘন্য শ্রেণীর মানুষ ছিল। মঠ গীর্জার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা ছিল খুনী, ফাঁসির যোগ্য। সর্বাপেক্ষা নির্মম ও শক্তিশালী ব্যক্তি দলের নেতৃত্ব করিত। বিবেক বর্জিত এই দস্যুদল ছিল বন্য ও বর্বর। ব্রাডলী বার্ট বলেন যে, সভ্যতার কোন বিধি বিধানই তাহাদের জীবনে ন্যূনতম প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই। বার্নিয়ারের মতে তাহারা ছিল জঘন্য ধরণের এবং ইহারাই ছিল খৃস্ট ধর্মের কলঙ্কস্বরূপ। তাহারা একে অন্যকেও নির্মমভাবে হত্যা করিত অথবা দেহে বিষ প্রয়োগ করিত এবং নিজেদের পাদ্রীদের মারিয়া ফেলিত।

ফিরিঙ্গি দস্যুদলপতি গঞ্জালেসের নেতৃত্বে সন্দ্বীপ অধিকার করার পর এই দলের লোকদের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শাহবাজপুর ও পাতিলভাঙ্গা তাহাদের রাজ্যভক্ত হয়। ১৬৩১ খৃস্টাব্দে কাশিম খাঁ পর্তুগীজদের হুগলী নগরী (পোর্টপেকিনো) অবরোধ করেন। এই অভিযানে এক হাজার পর্তুগীজ নিহত ও চারি সহস্র বন্দী হয়। অনেককে শৃঙ্খলাবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করা হয়।

১৬১০ খৃস্টাব্দে গঞ্জালেস লগরাজার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গের বহুস্থান লুণ্ঠন করেন। বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ উক্ত জলদস্যুদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম পর্যন্ত মুঘল রাজ্যভুক্ত করেন। তখন হইতে চট্টগ্রামের নাম হয় ইসলামাবাদ। পর্তুগীজরা চট্টগ্রামকে পোর্টোগ্রান্ড বলিত।

১৬১৮ খ্রস্টাব্দে মগ ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের দমন করিতে অক্ষম হওয়ায় বঙ্গের সুবাদার নওয়াব কাশেম খাঁ পদচ্যুত হন। পর বৎসর আরাকান রাজ গঞ্জালেসকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত সন্দ্বীপ ও হাতীয়া অধিকার করেন।

একবার তিনশত জাহাজ ভর্তি মগ সৈন্য মুঘল সেনাদের আক্রমণ করে। বঙ্গের জবরদস্ত সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সৈন্যদল মগ সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং জীবিতাবস্থায় যে দুই হাজার হতভাগ্য আরাকানীকে পাওয়া যায় তাহাদের বন্দী কবিয়া গোলামরুপে বিক্রয় করা হয়।

বঙ্গের মাটিতে মুঘলদের সহিত মগ ফিরিঙ্গির অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ রণাঙ্গনে পরিণত হইয়াছিল। ১৬২৫ খৃস্টাব্দে ফিরিঙ্গি দস্যুরা পূর্বও নিম্নবঙ্গের বহুস্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে ঢাকার দ্বারদেশে আঘাত হানে। দুর্বলচিত্ত সুবাদার খান-ই-দুরান ভীত হইয়া রাজমহলে পলায়ন করেন।

নড়াইল কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় মগ অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনীর এক বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। শায়েস্তা খাঁর সময় বরিশালের অদূরে শায়েস্তাবাদে একটি নৌঘাটি নির্মিত হইয়াছিল। যুবরাজ শাহ্ শুজা মগ ফিরিঙ্গি আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বরিশালের সন্নিকটে শুজাবাদ নামক স্থানে একটি মৃন্ময়দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার মগ ফিরিঙ্গি দস্যুদের অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে শিহাবউদ্দীন তালিসের ফার্সি বিবরণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তালিসের প্রকৃত নাম ইবনে মুহম্মদ ওয়ালী আহম্মদ। তিনি মীর জুমলার 'ওয়াকিয়া নবীশ' (ঘটনার বিবরণ লেখক) ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'ফাতেহা ইব্রিয়া' বা 'তারিখ-ই ফতেহ আসাম।" ডক্টর এ, বি, এম হাবিবুল্লাহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। এই হস্ত লিখিত গ্রন্থখানি অক্সফোর্ডের বডলেয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এ দেশীয় বন্দীদের হাতের তালুতে সরুবেত ঢুকাইয়া সকলকে একত্রে বাঁধিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে ফেলিয়া দিত। পশুপক্ষীর

ন্যায় চাউল ছড়াইয়া বন্দীদিগকে খাইতে দিত। দেশে গিয়া বন্দীদের কৃষি ও অন্যান্য কঠিন কার্যে নিয়োজিত করিত। অবশিষ্টদের লইয়া দাক্ষিণাত্যে চালান দিত এবং তথা হইতে ওলান্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের নিকট ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিত।

ম্যানরিক নামক জনৈক পাদরী ফিরিঙ্গিদের পক্ষ হইতে আরাকান রাজসমীপে যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি;

"প্রত্যেকেই জানেন এই পর্তুগীজগণ কিরূপে প্রতি বৎসর বাকলা, সেলিমাবাদ, যশোর, হিজলী ও উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইয়া মুঘলশত্রুর শক্তি নাশ করিয়া আপনার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহারা সম্পূর্ণ নগরী ও গ্রামগুলি পর্যন্ত আপনার রাজ্যে লইয়া আসিয়াছে। এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহারা এই রাজ্য হইতে এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া বসতি করাইয়াছে।" চট্টগ্রাম হইতে হিজলী এবং বাকলা, যশোর ও হুগলী পর্যন্ত তাহারা উৎপাত চালাইত। এই অত্যাচারের ফলে দক্ষিণ বঙ্গ জনশূন্য হইয়া পড়ে।

মগের অধীনস্থ দেশে শাসন ও শৃঙ্খলা ছিল না। মগের পরে আসে ফিরিঙ্গিরা। তাহারাও জলপথে স্বাধীন ছিল। এদেশের দুঃসাহসী বণিকগণ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে ;

ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে।।

বহুলোক ফিরিঙ্গিদের হাতে ধরা পড়িয়া স্বীয় ধর্মকর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চলিত। যে সব স্ত্রীলোক মগদের কিছুমাত্র ছোঁয়াচ পাইত তাহারা সমাজে গৃহীত হইত না। ফলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় হইয়া উঠিত। সতীশবাবু বলিয়াছেন; "তাহাদের স্বামী বা পিতা নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে পবিত্র জানিয়া স্নেহের কোলে টানিয়া লইলেও নির্দয় হিন্দু সমাজের রুক্ষ কটাক্ষ তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখিতে পাইত না। বংশ কাহিনীর তথ্য জানিতে গিয়া গল্প শুনিয়াছি, একটি স্ত্রীলোক নদীর ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময় দুই একজন মগ, দস্যুতার উদ্দেশ্যে না হইতে পারে, অন্য কারণে পার্শ্ববর্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি মগের ভয়ে জলে ডুব দিয়া রহিল। ভাবিল মগেরা চলিয়া গেলে উঠিবে। কিন্তু একজন মগ তাহাকে ডুব দিতে দেখিয়া ভাবিল, স্ত্রীলোক বোধহয় আত্মহত্যার জন্য ডুব দিয়াছে ; অমনি সে ছুটিয়া গিয়া জল হইতে চুল ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ডাঙ্গায় আনিল, পরে জীবিত দেখিয়া ব্যাপার বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সেই স্পর্শদোষে চিরজীবনের জন্য চিহ্নিত ও কলঙ্কিত হইয়া থাকিল।" সামান্য সামান্য কারণে নারীদের এইভাবে সমাজে নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। এইরূপ কলঙ্ককে সমাজে 'ফিরিঙ্গি বা মগো পরীবাদ' বলা হইত।

সেই সময় হইতে দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করিয়া বাকেরগঞ্জ জেলায় মগবসতি স্থাপিত হইয়াছিল। অন্যমতে ধান্য আবাদের জন্য ইংরেজ সরকার এইসব অঞ্চলে রামু হইতে মগদের আনিয়া বসতি স্থাপন করাইয়াছিল। খেপুপাড়া ও বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে মগবসতির কথা অন্যত্র বলিয়াছি।

সুলতান নসরত শাহের সৈন্যদের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পুর্তগীজ শাসক নুনোদাকানহা ১৫২৮ খৃস্টাব্দে মার্টিন আলফানসোকে এদেশে প্রেরণ করেন। জাহাজডুবি হওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে নসরত শাহের সৈন্যদের হস্তে বন্দী হওয়ায় যুদ্ধ বাধিয়া যায়। নসরত শাহের আদেশে বহু পর্তুগীজ নিহত ও দেশান্তরিত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে পর্তুগীজরা পাল্টা আক্রমণ করিয়া চট্টগ্রাম শহর ভষ্মীভূত করিয়া দেয়। ইহার পর নসরত শাহ তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে পর্তুগীজগণ অশেষ দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

মগফিরিঙ্গিরা নসরত শাহের পর বাকলারাজ কন্দর্পনারায়ণের হস্তেও লাঞ্ছিত হয়। তাহাদের সহিত এই সময় দেশীয় ভুএগ্রাদের সন্ধি, যুদ্ধবিগ্রহ, সখ্যতা ও গোলযোগের কথাও বর্ণনা করিয়াছি। শায়েস্তা খাঁর আমল পর্যন্ত ইহাদের দৌরাত্ম সমানভাবে চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ইহারা দমিত হইলেও আবার ইহাদের পুনরুত্থান ঘটিত। যুবরাজ শাহশুজা মগদের হস্তে নির্মমভাবে নিহত হইয়াছিলেন সে মর্মন্তুদ কাহিনী অনত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁর নেতৃত্বে তিনশত রণতরী নির্মিত হইয়া সমরসাজে সজ্জিত হয়। নৌ-সেনাপতি আবুল হুসায়েন সন্দ্বীপ অধিকার করেন। মগরাজার সহিত ফিরিঙ্গিদস্যুদের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় বহু পর্তুগীজ মুঘল নৌ-বিভাগে যোগদান করে। সুবাদার-তনয় বোজর্গ-উমিদ খাঁর নেতৃত্বে প্রায় তিনশত রণতরী ও ছয় হাজার পাঁচশত নৌ-সৈনা চট্টগ্রাম অধিকারার্থে প্রেরিত হয়। পর্তুগীজদের চল্লিশটি রণতরী মোগল বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে সম্মিলিত সৈন্যদল স্থল ও জলপথে চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। কুমরীয়ানামক স্থানের জল-যুদ্ধে আরাকান নৌবাহিনী পরাজিত হইয়া কর্ণফুলী নদীর মোহনায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পুনর্বার জলযুদ্ধে শত-সহস্র মগসৈন্য নির্ধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের নৌবহর মুঘল বাহিনীর হস্তগত হয়। সেনাপতি বোজর্গ-উমিদ খাঁর সহস্রাধিক কামান, অসংখ্য বন্দুক ও প্রচুর রণ সম্ভার হস্তগত করিয়া .দুই সহস্র মগকে বন্দী করেন।

মগ ফিরিঙ্গি দমনের জন্য শায়েস্তা খাঁর নামে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রোজর্গ উমেদ খাঁ সেনাপতি শাহবাজ খাঁ অসামান্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাকেরগঞ্জ অঞ্চল হইতে মগফিরিঙ্গিদের উৎখাত করেন। দস্যুগণ যেভাবে অত্যাচার চালাইয়াছিল শায়েস্তা খাঁর কঠোর হস্ত তদপেক্ষা অধিক নির্মমভাবে তাহাদিগকে দমন করায় দেশব্যাপী পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তদবধি কাহাকে দমন করিতে হইলে 'শায়েস্তা' করা হইবে বলা হয়।

আঠারো

বৃটিশ আমলে দেশের হাল-হকিকত—জমিদার তালুকদার ও প্রজার কথা এবং কৃষক বিদ্রোহ

পৌনে দুইশত বৎসর এদেশে ইংরেজ শাসন স্থায়ী হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে এ শাসনের চিরঅবসান ঘটে। নানা প্রকারে প্রজা সাধারণ এই আমলে নিগ্রহ ভোগ করিত। কবি গাহিয়াছেন ঃ "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?"

বৃটিশ শাসনে দেশের মানুষ চরম অর্থ সংকটের মধ্যে দিন গুজরান করিত। সরকার পুষ্ট জমিদার, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা দেশের অর্থ আত্মসাৎ করিত নিরংকুশভাবে। এ লুণ্ঠন পূর্বের কাহিনী বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের এক সকরুণ অধ্যায়। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় ঃ

"মোদের উঠান ভরা শস্য ছিল হাস্যভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ।"

দ্বৈত শাসনের কুফল ঃ দ্বৈত শাসন কার্যকরী হইল। বিচার ক্ষমতা দারোগার হাতে। ম্যাজিস্ট্রেট আসামী ধরিয়া চালান দিলে দারোগা বিচার করিতেন। দারোগার নিকট জনসাধারণ সুবিচার পাইত না। দ্বৈত শাসনের কুফলে প্রজাগণ দিশেহারা হইয়া পড়িত। মৃত্যুদন্ড, বেত্রাঘাত, অঙ্গহানি, কারাযন্ত্রণা—এই চারি প্রকার শাস্তি দেওয়া হইত।

তখন যেখানে সেখানে ডাকাতি হইত। জোর যার মুল্লুক তার—এই নীতি প্রবল ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং স্থানীয় জমিদার প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন। জমিদারেরা কোন কোন সময় ডাকাত পুষিয়া প্রজাদের নির্যাতন করিতেন এবং তাহাদের দ্বারা অর্থ উপার্জনও করিতেন। নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় লাঠিয়াল লইয়া একখানি চাউলের নৌকা লুণ্ঠন করেন। বহুপরে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গ্রেফতার করিয়া মুড়লীর জেলখানায় আটক রাখা হয়। কিন্তু দারোগার বিচারে তিনি খালাস পান।

হেংকেল যশোরের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি জজ হিসাবে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে দেওয়ানী বিচারের জন্য মুন্সেফ নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন হন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেশ শাসনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। সুন্দরবন অঞ্চলের কাপড় ও লবণের ব্যবসাই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিরা দেশের আইন কানুন মানিয়া চলিত না।

হেংকেল সুবিচারক ছিলেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। সুন্দরবনের লবণ ব্যবসায়ের দ্বারা কোম্পানী বিশেষ লাভবান হইত। রায়মঙ্গল এজেন্সীর সদর অফিস খুলনায় অবস্থিত ছিল। তখন খুলনা মহকুমার সৃষ্টি হয় নাই।

লবণ ব্যবসায়ঃ সুন্দরবনের মধ্যে নদী তীরবর্তী স্থানে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত। লবণ প্রস্তুতের জন্য যাহারা মজুর সংগ্রহ করিয়া দিত তাহাদিগকে মোলঙ্গী বলা হইত। সুন্দরবনের লবণাক্ত জায়গার মাটিতে লবণ পাওয়া যাইত। ঐ লোনা মাটি অল্প অল্প কোপাইয়া রাখিয়া উহার উপর লোনা পানি ভর্তি করিয়া চারিপাশ বাঁধিয়া রাখা হইত। পানি স্বচ্ছ হইলে নিম্নে গিয়া লবণ জমিত। তখন আস্তে আস্তে পানি সরাইয়া দেওয়া হইত। যে খোলা মাটি রহিল, তাহা উপর উপর তুলিয়া লইয়া কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইত এবং উহার নীচে মাটির বড় বড় চাড়ী রাখা হইত। চাড়ার মধ্যে পানি জমিলে সেই পানি মোলঙ্গা বা ভাঁড়ে করিয়া প্রকাণ্ড উনানে জ্বালাইয়া লবণ পাওয়া যাইত। সুন্দরবন ভ্রমণকালে গহীন অরণ্যে বা নদীতীরে আমরা অসংখ্য নেমক খালাড়ী দেখিয়াছি। এখনও জঙ্গলের যত্রতত্র বহু মোলঙ্গা বা ভাঁড় দেখিতে পাওয়া যায়।

মোলঙ্গীরা জোর করিয়া দরিদ্র লোকদের লইয়া লবণ প্রস্তুতের কাজে খাটাইত। এই অত্যাচারেব বিরুদ্ধে নালিশ করিলে নেমকের সাহেবদের সঙ্গে বিরোধ বাধিত। সদাশয় হেংকেল সর্বদা ন্যায় বিচারের খাতিরে দরিদ্র প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এই বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, (১) কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় মজুর লইবার জন্য টাকা দাদন দেওয়া হইবে, (২) কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন দেওয়া হইবে না, (৩) এক বৎসরের দাদনের জন্য পর বৎসর উহা কার্যকরী হইবে না, (৪) প্রজারা স্বেচ্ছায় কার্য না করিলে লবণের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

ভোলার কৃষকগণ লবণ উৎপাদন করিয়া মীর্জাকালু, ভোলাহাট প্রভৃতি বাজারে বিক্রয় করিত। বৃটিশ সরকারের লবণ আইন কার্যকরী করার জন্য মীর্জাকালুতে তিনশত গুর্খা সৈন্য প্রেরণ করা হয়। সৈন্যদের অবস্থিতি সত্ত্বেও জনসাধারণ তাহাদের দাবী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলন না। ফলে নিরীহ লোকদের উপর গুলি বর্ষিত হয়। কয়েকজন নিহত ও বহুলোক আহত হয়।

ইংরেজের শোষণ নীতির ফলে দেশীয় লবণ শিল্পের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। কিভাবে অত্যাচারমূলক শাসনের মাধ্যমে এদেশ হইতে লবণ শিল্প ধ্বংস করা হয় সে সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খন্ডে কিঞ্চিত বর্ণনা করিয়াছি।

বস্ত্রশিল্প ঃ তাঁত শিল্প এদেশের নিজস্ব এবং প্রাচীন। এতদঞ্চলে দুইটি স্থানে কাপড় প্রস্তুতের কারখানা ছিল। একটি বুড়ন ও অন্যটি সোনাবাড়িয়া। উভয় স্থান এখন সাতক্ষীরা মহকুমাধীন। কোম্পানীর আমলে প্রচুর তুলা উৎপাদিত হইত। যশোরের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি ছিল।

চাষীর নিকট হইতে তুলা খরিদ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা চরকায় সূতা কাটা হইত। উহা দ্বারা তাঁতীরা শাড়ী, ধুতি, চাদর, গামছা প্রভৃতি বস্ত্র প্রস্তুত করিত। গ্রামে গ্রামে

তাঁত শিল্পের প্রসার হইয়াছিল। বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য বড় বড় হাট ছিল। গুড়, চিনি বস্ত্র এই তিনটি ছিল সে যুগের প্রধান শিল্প। চিনি প্রস্তুত কারখানা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু অন্য দুইটি এখনও বিদ্যমান। এখনও অসখ্য তাঁতী গ্রামাঞ্চলের কারখানায় কাপড় বুনিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করে।

সাতক্ষীরার বুড়ন ও সোনাবাড়িয়ায় কোম্পানীর অফিস ছিল। কর্মচারীরা দাদন দিয়া তাঁতীদের নিকট হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিত এবং এই বস্ত্র পাইকারী বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় চালান যাইত। কর্মচারীরা দরিদ্র তাঁতীদের নানাভাবে ফাঁকি দিত। ইহাতে অতিষ্ঠ হইয়া হেংকেল উহার প্রতিবিধান করেন। তাঁহার চেষ্টায় যশোরে পৃথক জেলা সৃষ্টি হয়।

ইংরেজ আমলে চরকার প্রচলন ছিল। চরকায় প্রচুর সূতা কাটা হইত। লোকে আনন্দে চরকার গান গাহিত। কালক্রমে এই চবকার সর্বনাশ সাধিত হইল এবং লোকের সুখময় দিনগুলি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। বহু বাঙালী সৌখিন বস্ত্র খুঁজিতে লাগিল। ফলে বিলাত হইতে তাহাদের পছন্দ মাফিক কাপড় এদেশে আসিতে লাগিল। বিলাসিতার দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হওয়ার ফলে মোটা তাঁতের কাপড়ের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে মানুষের খাওয়া পরার খরচা বাড়িয়া গেল। বিলাতের পণ্য সস্তার এদেশে আসায় মজুদের কাজ পাওয়া মুশ্‌কিল হইল। কুটির শিল্পীর মাথায় হাত দিয়া বসিল। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হা অন্ন হা অন্ন চিৎকার শুনা যাইতে লাগিল।

কালক্রমে বিলাতের বস্ত্র ছাড়া দেশেও কলকারখানা স্থাপিত হইল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁতীদের অধ্যবসায় ও শিল্প নিপুণতাগুণে তাহারা অত্যাচারের ঝোঁক সামলাইয়া আবার স্ব স্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা কবিল। তাহারা এখনকার ন্যায় তখনও কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ব্যবসায় চালাইত।

সুন্দরবন ও কলিকাতার সম্পর্ক ঃ ব্যবসা বণিজ্যে, কৃষ্টি ও সভ্যতায় এতদঞ্চলের সহিত আস্তে আস্তে কলিকাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল। এখনকার ন্যায় তৎকালে আসাম ও পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় যাইবার একমাত্র নদীপথ ছিল সুন্দরবনের মধ্য দিয়া। সে যুগে জঙ্গলে জলদস্যুদের আড্ডা ছিল এবং তাহারা ব্যবসায়ীদের মালপত্র মধ্যে মধ্যে লুটতরাজ করিত। এই জলদস্যুদের উৎখাত করার জন্য এবং সুন্দরবনস্থ অনাবাদী ও জঙ্গলময় স্থান আবাদ করার জন্য এখানে দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদীদের উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গভর্ণরের অনুমোদন লইয়া হেংকেল বলেশ্বর ও কালিন্দীর মধ্যবর্তী সুন্দরবন এলাকা নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে জরিপ জমাবন্দী করেন। ইহারই ফলে ৬৪,৯২৮ বিঘা জমি বিলি হওয়ায় ১৪৪টি তালুকের সৃষ্টি হয়। এই সম্পত্তি হেংকেলের তালুক বলিয়া পরিচিত। সুন্দরবন আবাদ ও হেংকেলের প্রশংসনীয় উদ্যম সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

কলিকাতার সঙ্গে এতদঞ্চলের নিকটতম সম্পর্ক ছিল। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে আমেরিকান ধনকুবের রথ চাইল্ডের অর্থে খুলনা-কলিকাতা রেল লাইন নির্মিত হয়। ইহার পূর্বে যখন খুলনা জেলা স্থাপিত হয় নাই তখন মোল্লাহাট, মোরেলগঞ্জ ও বাগেরহাট অঞ্চলের লোকেরা চিড়া মুড়ি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে করিয়া ২/৩ দিন পথ হাঁটিয়া যশোরে গিয়া কোর্ট কাচারি করিত। বাগেরহাট-খুলনা রেল লাইনের সৃষ্টি হয় ১৯১৮ খৃস্টাব্দে। পূর্বে রেলওয়ে একটি কোম্পানীর অধীন পরিচালিত হইত।

ইংরেজ আমলে অসংখ্য নৌকা ও জাহাজ নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া কলিকাতা-আসাম-পূর্ববঙ্গ যাতায়াত করিত। বেলেঘাটায় পূর্ববঙ্গের কাঁচামাল, যথা— চাউল, ডাউল, মৎস্য, কাঠ, চামড়া, ছাগ. মুরগী, ডিম, পানসুপারি, নারিকেল, লাউ, কুমড়া, প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় হইত। পাট ও তুলা কলিকাতায় রপ্তানি হইত। কলিকাতা হইতে বস্ত্র, সূতা, লৌহ-লক্কড়, এলুমিনিয়াম, লোহাজাত দ্রব্য, কাঁচের বাসন-কোসন, খাগড়াই পিতল, কাঁসা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য আমদানী হইত। এদেশের কারখানায় নৌকা তৈয়ার হইয়া কলিকাতায় চালান যাইত। বাগেরহাট, মোরেলগঞ্জ, বড়দল, ঝালকাটি প্রভৃতি বাজারের সঙ্গে কলিকাতার সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

নড়াইল ও সাতক্ষীরার জমিদার ঃ ইতিপূর্বে কয়েকটি রাজবংশ ও জমিদারীর পরিচয় দিয়াছি। এখন সুন্দরবন বনাঞ্চলের জমিদারীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এতদঞ্চলে ইংরেজ আমলে অধিকাংশ জমিজমা জমিদার, তালুকদার, জোতদার, গাতীদার প্রভৃতির অধীন ছিল। এই সমস্ত জমিদারের মধ্যে নড়াইলের জমিদারই প্রধান ছিলেন। সাতক্ষীরা ও নড়াইল জমিদারেব কথা সংক্ষেপে বলিব;

নড়াইল রাজবংশের পূর্বপুরুষ রূপরাম দত্ত। তিনি নাটোর রাজসরকারে চাকুরী করিতেন। রূপরাম এই সময় বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক হইয়া বসেন। তিনি নড়াইলে চিত্রা নদীর তীরে যে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন উহার নাম হয় রূপগঞ্জ।

রূপরামের পুত্র কালীশঙ্করই নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ কালীশঙ্করের নিকট কাদিহাটি পরগণা বিক্রয় করেন এবং ভূষণা জমিদারীর একাংশ তাঁহাকে ইজারা দেন। কালীশঙ্কর পিতার ন্যায় নাটোর সরকারে চাকুরী করিতেন। নাটোর রাজের পতনকালে কালীশঙ্কর তাহার বহু সম্পত্তি নিজ নামে খরিদ করেন। তিনি দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং একবার ডাকাতির মোকদ্দমায় গ্রেফতার হন তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

কালীশঙ্করের পুত্র জয়নারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র রামরতন। রতনগঞ্জ নাম এখনও আছে। রামরতন এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার। নড়াইল জমিদার প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া এই বংশের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিতেছে।

জমিদারদের প্রজাপীড়ন সেদিনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু কোন কোন জমিদার তনয় প্রজাপীড়নের বিরোধী ছিলেন। নড়াইল

জমিদার তনয় খগেন্দ্রনাথ রায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি রাজবাড়ীর হলগৃহে একটি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার বাড়ীতে প্রাক-বিভাগ পর্যন্ত বিপুলায়তন এই ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরীর অস্তিত্ব ছিল। অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থ ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি এই প্রতিষ্ঠানের শোভাবর্ধন করিত। পরম পরিতাপের বিষয় যে, উহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থ ওজন দরে কর্মচারীরা বিক্রয় করিয়া রাজবাড়ী পরিষ্কার করিয়া ফেলে। এখানে বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী র‍্যাফেলের একখানি দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র ছিল। এখন অন্যান্য কয়েকখানি সাধারণ তৈলচিত্র ব্যতীত আর কিছুই নাই। মূল রাজবাড়ীর বহু হর্মের ধ্বংসাবশেষ এখনও কালের স্বাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান।

নড়াইল জমিদার প্রতিষ্ঠিত বিরাটকায় ঘাট এখনও চিত্রাতীরের শোভা বর্ধন করিতেছে। নড়াইল জমিদারীর অন্যতম শরীক হাট বাড়ীতে কয়েকটি হর্ম ও নদীতীরে পাকা ঘাট নির্মাণ করিয়া শাহী হালে বাস করিতেন।

নড়াইল বংশের সন্তানেরা রাজার হালে চলিতেন। তাঁহারা পাল্কিতে এক স্থানে হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিতেন। নদীপথের জন্য সুসজ্জিত নৌকা আসা যাওয়া করিতেন। এখনও নড়াইল জমিদারের চকমিলান অট্টালিকা আছে তাহা যে কোন দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। জমিদারী ছাড়া তাঁহারা নীলের ব্যবসায়ও করিতেন। খুলনা শহর নড়াইল জমিদারীর অধীন ছিল।

সুন্দরবনাঞ্চলের অন্যান্য জমিদারদের মধ্যে সাতক্ষীরার জমিদারী সবিশেষ বিখ্যাত। এই বংশীয় বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী নদীয়া মহারাজের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন পতন ঘনাইয়া আসে সেই সময় কর্মচারী বিষ্ণুরাম বুড়ন পরগণা খরিদ করেন। প্রাচীন বুড়ন রাজ্যের ইতিহাস অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। এই বুড়ন রাজ্যের পরবর্তীকালে বুড়ন পরগনায় পরিণত হয়। বিষ্ণুরাম জমিদারী খরিদ করার পর সাতঘরিয়া বা সাতক্ষীরা নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। বিষ্ণুরামের সুযোগ্য পুত্র প্রাণনাথ। মলই পরগণার স্বত্ব দখল লইয়া তাঁহার সহিত চাঁচড়া রাজের যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে বিষ্ণুরাম জয়লাভ করেন। প্রাণসায়র নামক খাল খনন করিয়া তিনি সাতক্ষীরা শহরের সহিত বেতনা নদীর যোগাযোগ করিয়া দেন। সাতক্ষীরা শহরের বিশালকায় পাঁচটি ঘাট বিশিষ্ট দীঘি প্রাণসাগর নামে পরিচিত। প্রাণনাথ হাইস্কুল আজিও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ঃ জমিদারেরা চিরদিন প্রজার রক্ত শুষিয়া ফাঁপিয়া উঠিত। প্রজাপীড়ন, জোড়পূর্বক খাজনা আদায় জমিদারীর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি জমিদারীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। জমিদারের খাজনা পরিশোধ না করিলে প্রজাদের দুই স্কন্ধে ভারী ইট দিয়া খররৌদ্রে দাঁড় করিয়া রাখা হইত। অনেক সময় তহশীলদারেরা প্রজাকে চৌকির নীচে আটকাইয়া রাখিত। শীতকালে পানির মধ্যে বিদ্রোহী প্রজাকে বান্ধিয়া শাস্তি দেওয়া হইত এবং খাজনা পরিশোধ করিলে ছাড়িয়া

দেওয়া হইত। খাজনা ব্যতীত প্রজাকে আবওয়াব, তহুরী, মহুরী প্রভৃতি খাতে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত খরচা আদায় দিতে হইত। তহশীলদারের বেতন ২ বা ৩ মাসে ধার্য ছিল। কিন্তু এই সমস্ত তহশীলদারেরা গ্রামের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তহশীলদারেরা চালচলনে জমিদারের অনুকরণ করিতেন।

কোন কোন জমিদার দরিদ্র প্রজার খাজনা মওকুব করিয়া বদান্যতার পরিচয় দিতেন। সেই সমস্ত মহান হৃদয় জমিদারদেব দয়ার কথা স্মরণ করিয়া এখনও প্রজারা অশ্রু বিসর্জন করে। কোন ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত উদার হৃদয় জমিদার ঘরবাড়ী নীলামে খাশ হওয়ার পরও পুরাতন প্রজাকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বা বিনাঅর্থে প্রত্যার্পণ করিতেন। আবার অত্যাচারী জমিদারেরা নানা প্রকার আবওয়াব, বর্ধিত খাজনা, সুদ, তস্যসুদ, তহুরী মহুরী প্রভৃতি নানাপ্রকার কর জোর জুলুম করিয়া আদায় করিতেন। প্রজা খাজনা দিতে অপারগ হইলে তহশীলদার তাহার ভিটায় "ঘুঘু চড়াইয়া দিব" বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিত। এবম্প্রকার জুলুমের কোন প্রতিকার ছিল না।

জেমস ওমাইজ তৎকালীন জমিদারদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রায়তদের হস্তপদ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া নাকে শুকনা মরিচের গুড়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। নির্মমভাবে তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করা হইত। গভীর আবর্জনাপূর্ণ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। নাভির উপর গরম পেয়ালা রাখিয়া উহার মধ্যে পোকা ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এমন ধরণের আরও বহুপ্রকার লোমহর্ষক নিপীড়ন পদ্ধতি চালু ছিল বলিয়া জেমস ওয়াইজ বর্ণনা করিয়াছেন।

জমিদার ও কর্মচারীদিগকে প্রজাদের সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। গাভীর খাঁটি দুগ্ধ, টাটকা মাখন, ঘৃত, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, পটল প্রভৃতি তরি-তরকারী ঝাকা ভরিয়া জমিদার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। পূজা-পার্বন, শ্রাদ্ধ, জন্মোৎসব, 'জামাই খরচা' বিবাহ পুন্যাহে হিন্দু-মুসলিম প্রজাদিগকে জমিদার বাড়ীর উৎসবের জন্য পাঠা ছাগল ও অন্যান্য তৈজসপত্র যোগাড় করিয়া জমিদারের মনস্তুষ্টি করিতে হইত। অত্যাচারী মুসলমান জমিদারেরা পর্যন্ত হিন্দু প্রজাব নিকট হইতে 'পূজাই' আদায় করিতেন। কোন প্রজা কার্যে অবহেলা করিলে তাঁহার ভিটামাটি নিলামে উঠিত।

এইত গেল জমিদারদের কথা। তাঁহাদের অধীন ম্যানেজার, ইনসপেকটর, নায়েব, তহশীলদার, কেরানী, মুহুরী, পাইক ও বরকন্দাজ থাকিত। ইহাদের দাপটে প্রজাসাধারণের জীবন অতিষ্ট হইয়া উঠিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই জমিদার ছিলেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার উপর কটাক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন;

"এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।"

জমিদার হুকুম করিলে আর রক্ষা নাই। কোন কোন সময় প্রজার মান ইজ্জত রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। বিদ্রোহী প্রজাদের ধরিয়া নানা প্রকারে নির্যাতন করা হইত।

রাজা বা জমিদারের হুকুম পাইবামাত্র দেশওয়ালী বরকন্দাজেরা ধরিয়া আনার পরিবর্তে বাঁধিয়া আনিত। জমিদারের ইশারা পাইলে তাহাকে শায়েস্তা করা হইত।

বড় বড় জমিদারের বাড়ীতে জেলখানা বা কয়েদখানা থাকিত। বিদ্রোহী প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া এখানে আটক রাখা হইত। লোকে ভয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ পর্যন্ত করিতে পারিত না। ইহার প্রেক্ষিতে ইংরেজ রাজত্বের শেষদিকে প্রজা আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছিল। ওহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনও জমিদারদের বিরুদ্ধে চালিত হয়।

নড়াইল জমিদারদের বাড়ীর সংলগ্ন কয়েদখানা ছিল। এই রাজবাড়ী পরিদর্শনকালে উহার কয়েদখানাও আমাদের দেখান হয়। এই কয়েদখানা সম্পর্কে অনেক সত্যমিথ্যা গল্প এদেশে প্রচলিত আছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের জমিদারদের মধ্যে জানবাজারের জমিদারের রাণী রাশমনির সুখ্যাতি ছিল। মকিমপুর পরগনায় তাঁহার জমিদারী ছিল। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী নির্মাণ করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এই মহিলার কাছে কোন প্রজা সাক্ষাৎ করিয়া নিজের দুঃখের কথা বিবৃত করিতে পারিলে তিনি তাহার খাজনা মওকুব করিয়া দিতেন। কথিত আছে যে, রাণী রাশমনির পিতা তাঁহাকে এক নিঃশ্বাসে যতগুলি ডিহির নাম করিবেন উহার জমিদারী তাঁহাকে দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। রাশমনি কয়েকটি ডিহির নাম করিলে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরা হয় যাহাতে আর নাম উচ্চারণ না করিতে পারেন। গ্রাম্য লোকে ছড়ায় এখনও সে কথা বলিয়া থাকে;

"টাবরা টুবরা,
ছাইভাঙ্গা ছাতুকপুর
মাথা ভাঙ্গা মল্লিকপুর
ক্যাক্যাক কিহানে
ঐ দেখা যায় যোগানে
ধরতি ধরতি ধরলাম গলা,
তবু না ছাড়ে ধোলইতলা।" ইত্যাদি

একজন মহান ব্যক্তির সঙ্গে একজন হীন ব্যক্তির তুলনা করিলে লোকে বলিয়া থাকে; "কোথায় রাণী রাশমনি, আর কোথায় পাঁচী ধোপানী।"

যশোরাঞ্চলে রাণী ভবানীর সুনাম ছিল। কিন্তু অধিকাংশ জমিদার প্রজাপীড়ন করিতেন। জমি বন্দোবস্তের সময় নানা প্রকার শর্ত প্রয়োগ করা হইত। জমিদারের হুকুম ব্যতীত পুকুর খনন ও হর্ম নির্মাণ করা যাইত না। ইট কাটিয়া দালান গাঁথিতে হইলে পূর্বাহ্নে আদেশপত্র লইতে হইত। সর্ত থাকিত "প্রজা বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিবে, কিন্তু ছেদন করিতে পারিবে না।" ইত্যাদি।

তুসখালী মঠবাড়ীর জমিদার ছিলেন টাকীর কালীনাথ মুন্সি। এখানকার প্রজারা তাঁহাকে জমিদার স্বীকার না করিয়া জোরপূর্বক জমি ভোগ দখল করিত। জমিদার চেষ্টা করিয়াও যখন প্রজাদের বশীভূত করিতে পারিলেন না তখন এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। প্রচার করা হইল যে, বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য বহু সৈনিক আমদানী করা হইতেছে। সৈন্যদের রান্না খাওয়ার জন্য অসংখ্য থালা-বাটি, বদনা-গাড়ু, হাঁড়ি-পাতিল, কলস ইত্যাদি জমা করা হইল। নৌকা বোঝাই চাউল ও তৈল আনা হইল। এইরূপ বিপুল আয়োজন দেখিয়া প্রজারা বিশ্বাস করিল যে, নিশ্চয়ই সৈন্যসামন্ত আসিয়া তাহাদের উপর অকথ্য জুলুম করিবে। সমগ্র এলাকা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া একে একে সকলে কবুলতি দিয়া জমিদারের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

প্রতি বৎসর পহেলা বৈশাখ পুণ্যাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই সময় জমিদারকে খাজনার একাংশ ও তহশীলদারকে নজরানা দিতে হইত। যে প্রজা পুন্যাহে আসিত না তাহার প্রতি তহশীলদারদের আক্রোশ পড়িত। পুন্যাহের দিন হিন্দু জমিদারের মুসলমান তহশীলদার ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে ব্রাহ্মণ আনাইয়া পূজার ব্যবস্থা করিতে হইত। কাছারিতে পুন্যাহের দিন প্রজাসাধারণ ও আগত শিশুও জনসাধারণকে মিষ্টান্ন দেওয়া হইত। প্রত্যেক কাছারিতে বাদ্য বাজাইয়া উৎসব চলিত।

জমিদারেরা ঐশ্বর্যের অহমিকায় প্রজাদের তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াতের সময় সুন্দর পোশাক পরিহিত দেশওয়ালী পাঠান চাপরাশিরা তাহাদের জাঁকজমক বৃদ্ধি করিত। সাধারণ মানুষ হইতে জমিদারগণ কর্তৃক একটি পৃথক শ্রেণী সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। অধিকাংশ জমিদার বিলাসিতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তৎকালে প্যারিস হইতে কাপড় ধোয়াইয়া আনার গুজবও ছড়াইত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বহু পূর্ব হইতে জমিদারী উচ্ছেদ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। সর্বত্র জমিদারের অত্যাচার কাহিনী প্রচার করা হইত। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জমিদার বিরোধী প্রচার চলিত। মরহুম শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক প্রজাদের পক্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ায় প্রজার উপর জুলুমের মাত্রা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অত্যাচারমূলক আবওয়াব ও বাজে খরচা উঠিয়া যায়।

পাকিস্তান হাসিলের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে আইনের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটে। যে সমস্ত জমিদারীর খাসদখল অবশিষ্ট ছিল-তাহা ১৯৫৬ সালের মধ্যে সরকার কর্তৃক পাইকারীভাবে Wholesale (acquisition) দখলিকৃত হয়। এইভাবে চিরদিনের জন্য জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটে।

এতদঞ্চলের অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হিন্দু। বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে ঢাকার নবাবদের জমিদারী ছিল এবং তথায় অন্যান্য কয়েকটি ছোট খাট মুসলিম জমিদারও ছিলেন।

খুলনা অঞ্চলে একমাত্র হাজি মহসীনের জমিদারী ব্যতীত প্রায় সমস্ত জমিদারই ছিলেন হিন্দু। জমিদারীর অর্থের আধিক্যে তাহাদের মধ্যে ভোগ বিলাসের মাত্রা বাড়িয়া

যায়। অধিকাংশ জমিদার এবং তাঁহাদের সন্তানেরা কেহ বিদ্যাশিক্ষা কেহ বিলাস বাসনের জন্য মহানগরী কলিকাতায় গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। চাচড়ার রাজগণের বহু পূর্বে পতন হইয়াছিল। নড়াইল জমিদারগণ কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে সুরম্য হর্ম নির্মাণ করিয়া পূর্ব হইতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেশ বিভাগের পর যে কয়েকজন জমিদার এদেশে ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ জমিদার বাড়ী এখন সরকারী অফিস বা খাজনা আদায়ের কাছারি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আবার বহু অট্টালিকা মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জমিদারের কাছারি বাড়ী পূর্ববৎ কাছারি বাড়ী আছে।

সুন্দরবনে কৃষক বিদ্রোহ : ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে সুন্দরবন আবাদের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইত। সরকার অধুনা মোরেলগঞ্জ থানাধীন বারুইখালি গ্রাম ও সুন্দরবনের কয়েকটি 'লট' টাকীর জমিদার কাশীনাথ মুন্সির সঙ্গে ৯৯ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেন। তিনি এই বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদ করিতে অসমর্থ হইলে মিসেস মোরেল নাম্নী এক ইংরেজ মহিলা পুত্রদের নামে একাংশ ইজারা গ্রহণ করেন। তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে রবার্ট মোরেল জ্যেষ্ঠ।

সুন্দরবন প্রান্তে সরালিয়া নামক স্থানে রবার্ট মোরেল আসিয়া জঙ্গল আবাদ করিয়া বসতি স্থাপন করেন। অন্য দুই ভ্রাতাও রবার্টের সঙ্গে এই কার্যে যোগদান করেন। যথাসত্বর স্থানীয় কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মোরেল ভ্রাতৃত্রয় দশ বৎসরের মধ্যে ষাট হাজার বিঘার অধিক জমি কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করেন। যাহার মূল্য দশ লক্ষ টাকা। তাঁহারা বরিশাল অঞ্চল হইতে বহু কৃষক পরিবারকে এখানে জঙ্গল কাটার কার্যে নিয়োজিত করেন এবং তাঁহাদের বসবাসের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এই সময় ঐ অঞ্চল হইতে বহু লোক আসিয়া মোরেলের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া বসতবাটী নির্মাণ ও চাষাবাদ আরম্ভ করে। মোরেলগঞ্জ ও শরণ-খোলার অধিকাংশ অধিবাসী তাঁহাদেরই বংশধর।

মোরেল ভ্রাতৃত্রয় জমি আবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে বসতবাটীর জন্য ইষ্টক নির্মিত কোঠাবাড়ীরও ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন যে, একই লাইনে রাস্তার দুইধারে ৩৬০টি নারিকেল বৃক্ষ মোরেল কুঠির শোভা বর্ধন করিত। সে বাগিচা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

মোরেল নির্মিত বাসগৃহ কুঠিবাড়ী নামে পরিচিত। ইহা সেই সময়কার স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় বহন করে। এখন ইহা রাজস্ব বিভাগের অফিস। সরালিয়ায় রবার্ট মোরেল একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। উহা মোরেলগঞ্জ নামে খ্যাতি লাভ করে। ক্রমে ক্রমে এই বাজার একটি বন্দরে পরিণত হয়। এখন উহা একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র।

বারুইখালি গ্রাম মোরেলদের জমিদারীর অধীন ছিল। ইহার অন্য নাম ছিল ফকিরেরতকিয়া। দরবেশ কালাচাঁদ ফকিরের নামানুসারে এইরূপ নামকরণ হয়। ঐ সময় এখানে বহু নতুন বসতি স্থাপিত হয়। পূর্বে ফকিরদের নামে এখানে মেলা বসিত।

মোরেলও রেনীর ন্যায় প্রজাপীড়ন করিতেন। একে শ্বেতাঙ্গ, তদুপরি জমিদার, তাঁহার প্রাধান্যে কে বাধা দেয়? তাহার অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রজাদের উপর নানা প্রকার উৎপাত শুরু করে। সময় সময় এই অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া যাইত। জেমস হেলী নামক একজন ইংরেজ মোরালের ম্যানেজার ছিলেন। প্রজা দমনের জন্য তাঁহার অধীনে বহু লাঠিয়াল থাকিত। হেলী প্রথম জীবনে সৈনিক ছিলেন। সে জন্য তাঁহার মেজাজ ও দাপট ছিল। তাঁহার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রজাগণ মারমুখো হইয়া উঠে। ফলে মোরেল বংশের সহিত প্রজাবৃন্দের এক ভয়াবহ দাঙ্গার সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহার নিষ্ঠুরতা কৃষকদের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে।

রোহিমুল্লা নামে এক কৃষক নেতা মোরেলের প্রজা ছিলেন। তিনি সর্বদা অত্যাচারিত প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করিতেন। ইহাতে হেলী ও মোরেল তাঁহাকে বিষ নজরে দেখিতেন। ন্যায় ও সত্যের জন্য প্রতিবাদমুখর হইলে চিরদিনই মানুষকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সে দৃষ্টান্ত এখনও বিরল নহে। রোহিমুল্লারও এজন্য বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল।

১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে রোহিমুল্লার সঙ্গে তদীয় প্রতিবেশী গণি মাহমুদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। আপোষ করিতে গিয়া ম্যানেজার হেলী গণি মাহমুদের পক্ষাবলম্বন করেন। রোহিমুল্লা এজন্য হেলীর প্রতি ক্রুদ্ধ হন। উভয় দিকে সাজসাজ রব পড়িয়া যায়।

গোরা হেলী বহু লাঠিয়ালসহ কৃষক নেতা রোহিমুল্লাকে আক্রমণ করেন। প্রথমদিন ইংরেজ পক্ষে রামধন মালো নামক একব্যক্তি খুন হইয়া গেলে সেদিনকার মত দাঙ্গা বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিন অসংখ্য লাঠিয়ালসহ সাহেবদল বারুইখালি গ্রামে রোহিমুল্লার গড় বেষ্টিত বাড়ী হানা দেয়। নছরুদ্দি নামক একজন স্থানীয় নেতা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হেলীর পক্ষে যোগ দেয়। রোহিমুল্লা আক্রান্ত হন। অনোন্যপায় হইয়া তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনসহ সদলবলে জান ও মান রক্ষার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়েন। রোহিমুল্লা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দেশী বন্দুকেব সাহায্যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কৃষক নেতা বাড়ীর সদর দরজায় ভিজা কাঁথা টাংগাইয়া বীরবিক্রমে আড়াল হইতে শত্রুর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে থাকেন।

কৃষক বীর রোহিমুল্লা গুলি চালনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে গুলি নিঃশেষ হইয়া যায়। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকদের হস্তের রৌপ্য নির্মিত গহনা ভাঙ্গিয়া উহার অংশ গোলারূপে ব্যবহার করেন। তাঁহার মরণ-পণ যুদ্ধ দর্শণে বিরোধীদল পর্যন্ত হতবাক হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত গুলি বারুদ সবই নিঃশেষ হইয়া যায়।

উভয় পক্ষ সমগ্র রাত্রি ধরিয়া যুদ্ধ করে। নিশাবসানে রোহিমুল্লা ঢাল, বল্লম, লেজা, রামদা, ইত্যাদি সহ সদলবলে পাল্টা আক্রমণের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি যুদ্ধের নেশায় এবং শত্রু ধ্বংসের জন্য পাগলপ্রায়। নিজের জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এইবার শত্রুপক্ষের একটি গুলি বিদ্ধ হইয়া রোহিমুল্লার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

বিদেশী শাসক জমিদারের অত্যাচারে বারুইখালির বীর সন্তান রোহিমুল্লার পতন ঘটে। লোকে এই কাহিনী জানে এবং রোহিমুল্লার বীরত্ব কাহিনী শ্রবণে শ্রোতারা স্তম্ভিত হইয়া যায়। নছরুদ্দির বিশ্বাসঘাতকতার কথাও জানা যায়। যুদ্ধে মোরেল পক্ষের অধিকাংশ লোক হতাহত হয়। উভয় পক্ষে মোট ১৭ জন লোক নিহত এবং বহু লোক আহত হয়।

এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর কতকগুলি মৃতদেহ সুন্দরবনে লইয়া গিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। রোহিমুল্লার মৃত্যুতে গ্রামের অধিবাসীরা ভয়ে পৈতৃক ভিটাবাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে মোরেল পক্ষের লোক-লস্কর গ্রামে ঢুকিয়া লুটপাট করিয়া বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয়।

অত্যাচারের ফলে সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়। গুণ্ডা লাঠিয়ালরা বহু নিরীহ অধিবাসীর যাহা কিছু ছিল আত্মসাৎ করিয়া লয়।

পরবর্তীকালে গুজব রটিয়াছিল যে, মোরেলগণ রোহিমুল্লার সন্তান-সন্ততিদের ধরিয়া লইয়া জঙ্গলাভ্যন্তরের খরস্রোতা নদীতে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে। ইহা সঠিক নহে। রোহিমুল্লার বংশধরেরা এখন হীন অবস্থায় বারুই খালিতে বসবাস করিতেছে।

সুসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময় খুলনার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি চাকুরী উপলক্ষে এখানে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। দাঙ্গার সময় কার্যোপলক্ষ্যে তিনি ফকিরহাটে অবস্থান করিতেছিলেন। ঘটনার দুইদিন পর বঙ্কিমবাবুর নিকট খুনের এজাহার দেয়া হয়। তিনি সামান্য কয়েকজন পুলিশের কর্মচারীসহ নৌকাযোগে যাত্রা করেন এবং ৫ জন বিশেষ পুলিশ মোরেলগঞ্জে প্রেরণের জন্য জেলার হেড কোয়ার্টার যশোরে লিখিয়া পাঠান।

বারুইখালি পৌঁছিয়া বঙ্কিমবাবু দাঙ্গার স্থান ও সাহেবদের কুঠি পরিদর্শন করেন। সাহেবরা তখনও পুলিশ বাহিনী আসার সংবাদ পায় নাই। এ দিকে হেলী ও অন্য শ্বেতাঙ্গরা পুলিশ বাহিনী দর্শনে ভীত হইয়া পড়ে। গোরা হইলে কি হয়! কৃতকর্মের জন্য প্রত্যেক পাপীর মনে ভীতির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। ইহাই অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব। তাঁহারা নিশাবসানের পূর্বে মোরেলগঞ্জ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট যে সমস্ত আসামী পাওয়া গেল। বঙ্কিমবাবু তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া চালান দিলেন।

বঙ্কিমবাবু মামলার তদন্ত করিয়া উহার রিপোর্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্রেনবীজের সমীপে পেশ করেন। অতঃপর মোরেল, হেলী ও অন্যান্য আসামীর নামে কোর্ট হইতে ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া তাহাদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

দুর্গাচরণ সাহা নামক মোরেলের অন্যতম কর্মচারী পলায়ন করিয়া ছদ্মনামে বৃন্দাবন গিয়া বাস করিতে থাকেন। গ্রেফতারী পরওয়ানা সেখানে হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনে। হেলী ছদ্মনামে জাহাজযোগে বোম্বে হইতে পালাইয়া বিলাত যাইবার পথে ধরা পড়েন।

বঙ্কিমবাবু নিজে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট সে জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৫৬ ধারা বলে তিনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিলেন না। বঙ্কিম জীবনী লেখক লিখিয়াছেন

যে, আসামী পক্ষ তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে সাহেবরা তাঁহাকে গোপনে শেষ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এ কাজে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাহেব ঘেঁষা আমলে যে নিরপেক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশসংনীয়।

যশোরের দায়রা জজ মামলার বিচার করেন। খুলনা বারের প্রসিদ্ধ উকিল উপেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এই লেখককে বলিয়াছেন যে, ইংরেজ ও দেশী আসামীদের সনাক্তকরণের জন্য খুলনায় প্যারেড (T.I Parade) হইয়াছিল। বিচারে একজনের ফাঁসি এবং ৩৪ জন আসামীর যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। দুর্গাচরণেরও জেল হইয়াছিল।

তখন বিলাতে নাগরিকদের বিশেষ আইন বলে হাইকোর্টের দায়রায় সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা ছিল। মাননীয় হাইকোর্টের জজ হেলী ও অন্য গোরাদের বিচার কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু হেলীকে কেহ সনাক্ত করিতে না পারায় তিনি খালাস পান।

রবার্ট মোরেল ঘটনার সময় বরিশাল ছিলেন, তিনি সেজন্য আসামী শ্রেণীভুক্ত হন নাই। তাঁহার ভ্রাতা হেনরী মোরেল বোম্বে হইয়া জাহাজযোগে বিলাত পলায়ন করেন। জাহাজ ছাড়িবার পর ওয়ারেন্ট বোম্বাই পৌঁছায় তাঁহাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই।

দ্বাদশ বর্ষের অধিককাল ধরিয়া এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। ইহাতে সাহেব দল একেবারেই নাজেহাল ও সর্বসান্ত হইয়া পড়ে। মামলা চলাকালে রর্বাট মোরেল মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দাঙ্গার পর লাইটফুট নামে একজন ইংরেজ মোরেল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি সৎলোক ছিলেন এবং প্রজাপীড়ন কবিতেন না। ইহার কয়েক বৎসর পরে মোরেলদের জমিদারী নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। এইভাবে মোরেলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা অত্যাচারী ইংরেজ জমিদার পরিবারের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। মোরেলগঞ্জের প্রাচীন অট্টালিকা 'কুঠিবাড়ী' আজিও তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

মোরেলদের কর্মচারী স্থানীয় মোহন খাঁ মুনিবের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। মোরেল স্বয়ং জমিদারীর একাংশ এই প্রিয়পাত্রকে দান করেন। মোরেল জমিদারী পরে সাহা ষ্টেটভুক্ত হয়। মোহন খাঁ ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত সাহা জমিদারদের বিরুদ্ধে বহুদিন যাবৎ মামলা পরিচালনা করেন। সম্পত্তির ভোগদখল লইয়া মোহন খাঁ বিলেতে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত এবং পরে বৃটিশ ক্যাবিনেটেও দরবার করেন। মোহন খাঁ'র মোকদ্দমার কথা এখনও লোকমুখে শ্রুত হয়।

উনিশ

নদ-নদী ও চরভূমির দেশ

গ্রন্থের প্রথম খন্ডে নদ-নদী চরভূমির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের চরভূমি গঠন ও জঙ্গল সৃষ্টির ইতিহাসও সেই সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। কোন একটি এলাকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে পার্শ্ববর্তী জেলার ইতিহাসও কিছু কিছু আসিয়া পড়ে। তেমনই সুন্দরবনের ইতিহাস শুধু বনজঙ্গলের ইতিহাস নহে। রাজা, মহারাজা ও শাসক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্তরের মানুষের সহিত এই সুন্দরবনের নিবিড় সম্পর্ক। অতীত ও বর্তমানে এসম্পর্ক একই প্রকার। সেজন্য সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-দ্বীপ বা চরভূমি ও নদীনালা বেষ্টিত দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের কথা বলিতে হইতেছে।

এক অজানা অতীতকালে এই সমস্ত এলাকায় সামুদ্রিক বারিরাশি আপন মনে ঢেউ খেলিত। সেই স্মরণাতীত যুগের ইতিহাস উদ্ধার হয নাই। যশোর-খুলনার ন্যায় এ অঞ্চল প্রাচীন ইতিহাসের আকর নহে। বাকেরগঞ্জের ইতিহাস লেখক বিভারীজ সাহেব বলিযাছেন যে, বরিশালের সর্বত্র এককালে জঙ্গলাকীর্ণ ও নদ-নদী বিধৌত প্রদেশ ছিল। গৌরনদী, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি নাম নদী ও দ্বীপের পরিচয় বহন করে।

আমরা যে অঞ্চলের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি উহাই প্রাচীন বাকলা রাজ্য। চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা একই অর্থবোধক। ইহার বর্তমান নাম বরিশাল বা বাকেরগঞ্জ। জেলার নাম বাকেরগঞ্জ হইলেও সাধারণে ইহাকে বরিশাল জেলা বলে।

অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, অবারিত নীল আসমানের নীচে ষড়ঋতুর শোভায় সুশোভিত, সাগর সৈকতে অবস্থিত এবং শ্যাময়মান বৃক্ষলতা বেষ্টিত এই বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। আশ্চর্য ইহার জনবসতি গড়িয়া উঠার ইতিহাস। প্রাচ্যের প্রধান নদী মেঘনা ইহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য প্রধান নদীগুলির নাম যথাক্রমে মধুমতী, বলেশ্বর, তুর্কি, আড়িয়াল খাঁ, তেতুলিয়া, নয়াভাঙ্গানী, সফীপুর, বিষখালি, বিঘাই, লোহালীয়া প্রভৃতি। সুন্ধা ও সুগন্ধা এ জেলার অতি প্রাচীন নদী। জালের ন্যায় বিস্তৃত ইহার নদী-নালা, যাহার জোয়ার জলে দৈনিক সিক্ত হয় শহর, গ্রাম ও ধান ক্ষেত। নদীই এ অঞ্চলের প্রাণ সেজন্য বরিশালকে নদ-নদীর জেলা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নদ-নদীর আধিক্যের জন্য এখানে কোন রেল লাইন নাই।

নদী ও সামুদ্রিক জলে সৃষ্টি হইয়াছিল অসংখ্য দ্বীপ বা চরভূমি। আবুল ফজল প্রাচীন বাকলা রাজ্যের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, 'সরকার বাকলা' সমুদ্র তীরবর্তী স্থান। এখানে বৃক্ষলতা বেষ্টিত একটি দুর্গ ছিল। নদী ও সমুদ্রে ঘেরা বিধায় আরব নাবিকেরা আসিয়াছিল ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে। এ অঞ্চল তাই আরবদের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।

বাকলা অর্থ শষ্য ব্যবসায়ী। কে বা কাহারা ঐ নাম দিয়াছিল জানা যায় না। ঐ সময় বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে এখানকার ন্যায় জলোচ্ছ্বাস হইত। সরকার বাকলা অপেক্ষা প্রাচীন বাকলা রাজ্যের আয়তন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাকলা নামে কোন শহরের সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। থাকিলেও ১৫৮৪ খৃস্টাব্দের প্লাবনে তাহা বিধৌত হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন বাকলা নামক প্রাচীন স্থান মেঘনা গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বাকেরগঞ্জ অঞ্চল চরভূমির দেশ। অসংখ্য চর উত্থিত হইয়াছে বঙ্গোপসাগরের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া। উত্তরাঞ্চল হইতে দক্ষিণ দিক সাগরকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে অসংখ্য দ্বীপ ও চর। নদী ও সাগর বেষ্টিত চরসমূহই শ্যাম সবুজের লীলাভূমি।

সমস্ত দ্বীপ ও চরভূমির নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নহে। আমরা মাত্র কতকগুলি চরের নাম এখানে দিতেছি। যথাঃ—চর কুকরী মুকরী, চর মমতাজ, চর আন্ডা, চরগাঁ, চর কাউয়া, চর মনপুরা, চর জব্বার, কৃষ্ণপ্রসাদ, রাংগাবালী, চর কেওড়া, চর সাঙ্গর, চর জাহাজপুর, চর বদনা, চর করমজী, চরামদ্দি, চরশ্যামরায়, চর খাগকাটা, চর কলমী, চরগাজী প্রভৃতি।

এই সমস্ত চরে অসংখ্য মানুষ বাস করে। চরাঞ্চলে সুন্দর ধান্য ফসল ফলে। শাহবাজপুর, মনপুরা, চর কুকরী মুকরী প্রভৃতি দ্বীপে অসংখ্য মনুষ্য বসতি বিদ্যমান। অন্যান্য চরনামীয় স্থান হইতেছে চর বিশ্বাস, চর অগস্তি, চর ইলসা, চর সীতারাম, চর ফ্যাসন, চর লর্ডহার্ডিঞ্জ, চর বিভারাজী, চর মোল্লাজি, চর কালি, চর আগুন মুখী, বুড়ির চর, চর দিদারুল্লা, চর চন্দ্রপ্রসাদ, চর হিজলা, চর উদয়কালী এবং দেবীর চর। চর ফজলুল হক ও চর আশ্বিনীকুমার দুইটি নাম থাকিলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলের বহু অধিবাসী জমি বন্দোবস্ত লইয়া এই সমস্ত চর ও দীপাঞ্চলে বসবাস স্থাপন করিয়াছে। বরিশালের আদি বাসিন্দা অপেক্ষা বহিরাগতদেরই এখানে সংখ্যাধিক্য।

এ জেলার সুন্দরবন, বিখ্যাত 'বরিশাল কামান' চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী কচুয়া ও মাধব পাশা, বারভুঞার রাজা কন্দর্প নারায়ণ ও রামচন্দ্র, মগ-ফিরিঙ্গি অত্যাচার প্রভৃতির ঐতিহাসিক বিবরণী অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সেজন্য উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

এখানে জঙ্গল কাটিয়া অসংখ্য গ্রামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেইজন্য বহু গ্রামের নামের সহিত কাটিযুক্ত শব্দ আছে। যেমন কলস কাটি, শ্রী রাম কাটি. মধুর কাটি, চাঁদ কাটি, সমুদয় কাটি, শিয়াল কাটি, ভরত কাটি, কুলকাটি, ঝালকাটি, শরূপকাটি, কানাইদাস কাটি, বর্ষাকাটি, সুতিয়া কাটি, ব্রাহ্মণ কাটি, রাজকাটি, দেবর কাটি, কচুয়া কাটি, জেন্দা কাটি, যাদব কাটি, ভীম কাটি, ঘাঘর কাটি, সিদ্ধ কাটি প্রভৃতি।

এই কাটি ও দীপাঞ্চলের সহিত বুজর্গ উমেদ খাঁ, শাহরাজ খাঁ, শাহশূজা প্রমুখ শাসক ও সেনাপতিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে ইতিহাস অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁর সময় সংগ্রাম সিংহ নামক একজন সেনানায়ক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মগ ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে তিনি ঢাকা শহর রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের রাজাপুর ও ইন্দ্রপাশায় দুইটি মৃন্ময় দুর্গ নির্মাণ করেন। উত্তর শাহবাজপুরে গান্ধিয়া গ্রামের পার্শ্বে, একটি সংগ্রাম গড় ছিল। ঝালকাটি থানার "সংগ্রাম নীল" গ্রাম ও সংগ্রাম নীলের খাল সংগ্রাম সিংহের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

যুবরাজ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) নামে সেলিমাবাদ পরগণার নামকরণ হয়। খুলনা জেলার একাংশ লইয়া এই পরগণা গঠিত হইয়াছিল। অন্যান্য পরগণার মধ্যে ইদিলপুর, বোজর্গ উমেদপুর, আড়ংপুর প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বাকেরগঞ্জ জেলায় কতিপয় দীঘি আজিও ইহার অতীত দিনের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সেকালে সর্বত্র লবণাক্ত জল ছিল। তখন পানীয় জলের জন্য নিম্নবঙ্গে শুধু দীঘিই খনিত হইত। বরিশাল শহরের পরেশ সাগর ও বিবির পুকুর বিশেষ প্রসিদ্ধ। বোরহান খাঁ ও রুস্ম খাঁর দীঘির কথা পরে বলিয়াছি।

কচুয়ার কমলাসাগর, মাধবপাশার রামসাগর, সুকসাগর ও দুর্গাসাগর দীঘির খ্যাতি ছিল। অন্যান্য দীঘির মধ্যে গজনীর দীঘি, আন্ধি, ফুলমনির দীঘি, কন্দর্পনারায়ণের দীঘি, কবিরাজের দীঘি, সীতারামবসুর দীঘি, কাউলাদী, দোলইরাজা প্রভৃতি দীঘি প্রসিদ্ধ।

বড় বড় বিলের মধ্যে কালারাজা, ধলারাজা, আস্কর, জল্লা, শৈমাহর পাড়, কালবিল, কাজলা, কুড়ালিয়া, বিশারকান্দী, হরতা কাঁচাবালিয়া, চরনারানদি, বাগদা, দেহেরগতি, প্রতাপপুর, বড়াইয়া, দোবরা, ধলাবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, ধরনদি, খাজুরিয়া, সামসপুর, ডুমরীয়া প্রভৃতি অতীত ঐতিহ্যের অধিকারী। মরানদীর খাতের মধ্যে অধিকাংশ বিলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আগা বাকের ঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় আগা বাকের সেলিমাবাদ ও বোজর্গ উমেদপুর পরগণার শাসনভার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একটি বাজারের পত্তন করেন। তাঁহার নামানুসারে উহার নাম হয় বাকেরগঞ্জ। ইহার আদি নাম রত্নদ্বীপ। এই স্থান বোজর্গ উমেদপুর পরগণার মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে এখানে জেলার হেডকোয়ার্টার ছিল এবং তখন হইতে জেলার নাম বাকেরগঞ্জ। ১৮০১ খৃস্টাব্দে শাসন কার্যের সুবিধার্থে হেডকোয়ার্টার বরিশালে উঠিয়া যায়। কৃষ্ণকাটি ও খয়েরাবাদ নদীর সঙ্গমস্থলে এবং কীর্তনখোলা নদীতীরে অবস্থিত বরিশাল শহর।

পলাশী যুদ্ধের পর বাকেরগঞ্জে নবাবের অধীন একটি শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে আলীবর্দী খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় হোসেনউদ্দীনকে ঢাকার শাসক করিয়া পাঠান হয়। সিরাজের রাজত্বকালে ক্ষমতালিপ্সু আগা বাকেরের সহিত হোসেনউদ্দীনের গোলযোগ উপস্থিত হয়। আগা বাকের ও তৎপুত্র আগা সাদেক মিলিয়া একযোগে হোসেনউদ্দীনকে হত্যা করেন।

হোসেনউদ্দীন ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু শাসক ছিলেন। ঢাকার অধিবাসীরা তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার নৃশংস হত্যার পর ক্রোধান্বিত অধিবাসীরা আগা বাকেরের নিকট নবাবের লিখিত ফরমান দেখিতে চাহিল। মোহরযুক্ত পরওয়ানা না পাওয়ায় তাহারা একযোগে আগা বাকেরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া বসিল। শেষ পর্যন্ত ক্রোধান্বিত ঢাকাবাসীরা উলঙ্গ অসি হস্তে পিতা-পুত্রকে আক্রমণ করিল। আগা বাকের নিহত হইলেন, কিন্তু আগা সাদেক পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। ১১৬০ বঙ্গাব্দে (১৭৯৩ খৃঃ) আগা বাকের নিহত হন। কেহ কেহ বলেন যে, পুত্রও পিতার সঙ্গে নিহত হইয়াছিলেন।

মুঘল আমলে 'নিমক মহল' নামে এক প্রকার সম্পত্তি ছিল। উহা হইতে প্রচুর রাজস্ব আদায় হইত। আগা বাকের যাবতীয় নেমকের কারখানার উপর এক নূতন কর স্থাপন করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রজাদের ভূমি জোর পূর্বক দখল করাইয়া স্বীয় অনুচরদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। আবার কতক জমির কর বৃদ্ধি করিয়া মালিককে ভোগ দখল করিতে দিতেন। ইহাতে প্রজাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইত।

দয়াল চৌধুরী নামক এক শক্তিশালী প্রজা জঙ্গল আবাদ করিয়া বোজর্গ উমেদপুর পরগণায় বসতি স্থাপন করেন। আগা বাকের ও পুত্র আগা সাদেকের রিপোর্টে তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত শাসক শক্তির নিকট দয়াল চৌধুরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। দয়াল চৌধুরীর বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও দীঘি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়াটিক রিসার্চে আগা বাকের সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহারই নামানুসারে একটি গ্রামের নাম হয় বাকরকাটি। আগা বাকের সম্পর্কে জনৈক লেখক বলিয়াছেন ঃ "তিনি খুব দাম্ভিক, ক্রুদ্ধপরায়ণ এবং অত্যাচারী শাসক ছিলেন।" সর্বপ্রথমে তিনি বোজর্গ উমেদপুর ও সেলিমাবাদ পরগণার সাড়ে এগার আনি অধিকার পূর্বক স্বনামে গঞ্জ স্থাপন করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। রোহিনী কুমার সেন তাঁহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া লিখিয়াছেন ; "আগা বাকের কোন প্রজার সুন্দরী যুবতীর খবর পাইলে তাহাকে আনিবার জন্য কর্মচারী পাঠাইতেন। কেহ আপত্তি করিলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না। তৎক্ষণাৎ আগা বাকেরের ফৌজ আসিয়া ঐ প্রজার যথাসর্বস্ব লুটপাট করিয়া লইত এবং তাঁহাকে 'নিমকের জ্বালে চালান দেওয়া হইত।" সমসাময়িক কোন লেখক এইরূপ কিছু লিখিয়া যান নাই। সেজন্য একথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

রাজা রাজবল্লভ ঃ আগা বাকের ও আগা সাদেকের পতনের পর ইদিলপুর পরগণাসহ সমস্ত মহল রাজা রাজবল্লভের অধীনে আসে। আলীবর্দী খাঁর আমলের রাজবল্লভ। তিনি অচিরাৎ রাজ্যমধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। মীরজাফর, উমিচাঁদ রায় দুলর্ভ,

জগৎশেঠ প্রমুখের সঙ্গে রাজা রাজবল্লভ ও সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের পক্ষে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় তিনি কুখ্যাত হইয়া আছেন।

রাজবল্লভ অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। তিনি এদেশে পর্তুগীজ পাদরী আমদানী করেন। প্রজাদের দমন করিবার জন্য তিনি পর্তুগীজ পাইক নিযুক্ত করিতেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ শাসনকেন্দ্র বাকেরগঞ্জ হইতে নলচিঠিতে স্থানান্তরিত করেন। রাজবল্লভের সময় এবং তাঁহার পরেও মধ্যে মধ্যে মগ ফিরিঙ্গি অত্যাচার চলিত। মীরজাফরের পর তাঁহার জামাতা মীরকাশিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি তেজস্বী নবাব ছিলেন। তাঁহার আদেশে রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভকে নদীতে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলা হয়।

দেশের অবস্থা : তুর্ক-আফগান আমলে এ জেলার ধান্যের খ্যাতি ছিল। পর্তুগীজ মিশনারীরা বরিশাল অঞ্চলের ধন-ধান্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ আমলে এ জেলা বাংলার শয্যাগার (grenery of Bengal) বলিয়া অভিহিত হইত।

ইংরেজ আমলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বিদেশীদের করায়ত্ত হইল। ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষের ছায়া আসিয়া করাঘাত করিল। নবাবী আমলে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত। সাত সমুদ্র তেব নদী পারে চালান যাইত না।

ইংরেজ আমলের পূর্বে এদেশে বস্ত্র শিল্প ও লবণ শিল্পের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সমগ্র বাকেরগঞ্জের লবণ এক সময় বঙ্গ দেশের চাহিদা মিটাইত। এ জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু লবণের কারখানা ছিল। লবণ শিল্পে সরকার ও বণিকদের প্রচুর আয় হইত। এই জন্য মুঘল আমলে 'নিমক মহল' নামে একপ্রকার সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। মীর কাশিমের নবাবী আমলে বরিশালে লবণের কারখানা ছিল। আইনী আকবরী হইতে জানা যায় যে, 'হাসিলনেমক' নামে একপ্রকার কর লবণ প্রস্তুত কারকদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। সেলিমাবাদ পরগণা, লোহালিয়া, শাহ্বাজপুর ও মনপুরায় প্রচুর লবণ পাওয়া যাইত।

সে যুগে এদেশের তাঁতীরা সুন্দর বস্ত্র বয়ন করিত। অন্নবস্ত্রের জন্য তখন বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হইত না।

বাকেরগঞ্জ জেলার নদীবাহী নৌকা নির্মাণ প্রণালীর বর্ণনাও পাওয়া যায়। এই জেলার নৌকা নির্মাণ একটি চমৎকার শিল্প। মেহেন্দিগঞ্জ থানার এলাকায় দেবাইখালি ও শ্যামপুর গ্রামে উৎকৃষ্ট কোষা নৌকা তৈয়ার হইত। আগরপুরের নিকট ঘন্টেশ্বরে এবং বর্ষাকাঠি গ্রামে ভাল পানসী নৌকা তৈয়ার হইত। সুন্দরবনে মগেরা কেরুয়া গাছের গুড়ি হইতে ডিঙ্গি নৌকা তৈয়ার করিত। ঝালকাটি, কালিগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, কলসকাটি নৌকা তৈয়ারীর জন্য বিখ্যাত ছিল। বরিশাল জেলা শীতলপাটীর জন্য চিরদিন বিখ্যাত। শীতলপাটী শিল্প বরিশালের এক বিশেষ সম্পদ।

ভৌগোলিক বিবরণী ঃ এ জেলার উত্তরে ফরিদপুর জেলা, পূর্বে মেঘনা নদ, পশ্চিমে বলেশ্বর নদী ও খুলনা জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বাকেরগঞ্জ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎকায় জেলা। ইহার এলাকা ৪২০০ বর্গমাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ইহার লোক সংখ্য ৪২,৬১,৭৬৭। প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যার হার ১০০৫ জন। শতকরা শিক্ষিতের হার ২৪.৮। আবহাওয়া মধ্যম, আর্দ্র ও লবণাক্ত। প্রধান ফসল ধান, পাট, মরিচ, ইক্ষু ও নারিকেল-সুপারি। সুন্দর বালাম চাউল ও নারিকেল সুপারির জন্য এ জেলা প্রসিদ্ধ।

বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাংশে খেপুপাড়া অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপে মগজাতীয় লোকেরা বসবাস করে। ইহারা আরাকানের জলদস্যু বা অত্যাচারী 'মগের মুল্লুকের' মগদের বংশধর নহে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জঙ্গল আবাদ ও ধান্য উৎপন্নের জন্য এই সমস্ত মগের পূর্বপুরুষদিগকে রামু ও চট্টগ্রাম হইতে এখানে আনয়ন করেন।

কথিত আছে যে, সুগন্ধা বা সুন্ধা নদীর চর পড়িয়া এ জেলার দক্ষিণাংশ সৃষ্টি হইয়াছে। সেলিমাবাদ এবং চন্দ্রদ্বীপ এই নদীর চরে সৃষ্টি হইয়াছিল। বাকেরগঞ্জের সুন্দরবনে ব্যাঘ্র, ডোরা হরিণ, বন্য বরাহ, বানর ইত্যাদি পাওয়া যায়। মেঘনা দ্বীপ ও ভাণ্ডারিয়া বিলে এখনও বন্য মহিষ পাওয়া যায়। শাহ্‌বাজপুর পূর্বে নোয়াখালিরর মধ্যে ছিল। ১৮৫৯ খৃঃ ইহা বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। শাহ্‌বাজপুর দ্বীপে ডোরা হরিণ পাওয়া যায়। চিতা বাঘ ও বন্য মহিষ বাকেরগঞ্জের জঙ্গলে পাওয়া যায়।

শুধু বাকেরগঞ্জ খুলনা বা দক্ষিণ বঙ্গ নহে, এককালে ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্তমান সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ ইত্যাদি জানোয়ার কোথা হইতে আসিয়াছে? জঙ্গলে আপনা আপনি জন্তু সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি। বঙ্গদেশের উত্তরভাগে ছিল জঙ্গল এবং দক্ষিণ ভাগ সমুদ্র প্লাবিত। সম্ভবত হিমালয়ের গিরিমালা হইতে বন্যজন্তু দক্ষিণ দিকে জঙ্গল অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আবাসভূমি পরিবর্তন করিতে থাকে। উত্তর দিক হইতে মানব বসতি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কার হইতে থাকে। দক্ষিণে সমুদ্রের চর পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেখানে জঙ্গল সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক দ্রুততার সহিত। ব্যাঘ্র, বন্য বরাহ, অজগর, হরিণ, বানর ইত্যাদি জীবজন্তুও দক্ষিণে সরিতে থাকে। সেজন্য অধুনা সুন্দরবনের জানোয়ারসমূহ হিমালয় হইতে আবহমান কাল ধরিয়া আগত জীব জন্তুর বংশধর।

বাকেরগঞ্জ জেলার মহকুমা ৫টি, যথা : সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, পিরোজপুর, ভোলা ও পটুয়াখালী। থানার মোট সংখ্যা ৩৪, ইউনিয়নের সংখ্যা ৩২৭, মিউনিসিপ্যাল কমিটি ১ এবং শহর কমিটি ৫। এ ছাড়া অন্যান্য জেলার ন্যায় একটি জেলা কাউন্সিল আছে। এ জেলার সর্বমোট গ্রামের সংখ্যা ৩৭২৩।

প্রবাদ আছে যে, কৈবর্ত জেলেরা এ জেলার আদি বাসিন্দা। আদিম অধিবাসী এবং বৌদ্ধরাও এদেশের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সম্রাট আকবরের

সময় বাকেরগঞ্জ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার পূর্বে পাঠান ও দেশীয় হিন্দু মুসলিম অধিবাসী বারভূঞাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মুঘলদের প্রতিরোধ করিয়াছিল।

ঢাকা কালেক্টরের অধীন ছিল এ জেলা। উক্ত কালেক্টরের নাম ছিল ঢাকা জালালপুর। তখন ফরিদপুর ও নোয়াখালী জেলার সৃষ্টি হয় নাই। ফরিদপুর ও ঢাকা জালালপুরের অধীন ছিল। ঢাকার কালেক্টর উইলিয়াম ডগলাসের সময় বাকেরগঞ্জ জেলার স্থায়ী জরিপ হয় এবং বাকেরগঞ্জের রাজস্ব আদালত ঢাকায় থাকিয়া যায়। শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার্থে ১৭৯৭ সালে রেগুলেশান অনুযায়ী ঐ বৎসর বাকেরগঞ্জ জেলার সৃষ্টি হয়।

বৃটিশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাকেরগঞ্জের শষ্যশ্যামল ক্ষেত ও ধন-ধান্যের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। নলচিঠি থানাধীন বারইকরণ নামক স্থানে ১৭৮১ সালে একজন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। তখন বিচার ও শাসন একই ব্যক্তির দ্বারা পরিচালতি হইত। ১৭৮৪ সালে জলদস্যু দমনের জন্য সুন্দরবনাঞ্চলে একজন কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৭৯২ সালে বারইকরণ হইতে শাসনকেন্দ্র বাকেরগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৮১ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আদায় ঢাকা কালেক্টরের অধীন ছিল। ঐ বৎসর হইতে বাকেরগঞ্জের রাজস্ব বিভাগ স্থাপিত হয় এবং এই সমস্ত দলিল দস্তাবেদ এখানে আনীত হয়। ১৮০১ সালে গেদে বন্দরে (গ্রেদ বন্দর) শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। এই বন্দরই পরে বরিশাল নামে অভিহিত হয়।

১৮৭২-৭৩ সালের বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশান রিপোর্টে বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার নাম দেখা যায়। পরে এই মহকুমা বাকেরগঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪৫ সালে ভোলা, ১৮৫৯ সালে পিরোজপুর এবং ১৮৮১ সালে পিরোজপুর এবং ১৮৮১ সালে পটুয়াখালী মহকুমার সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝটিকা ও জলোচ্ছ্বাস : আবহমান কাল হইতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা শ্রুত হয়। নুহনবীর সময় যে প্লাবন হয় উহার কথা সকলের জানা আছে। ভূমিকম্প প্রলয় ঝটিকা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা আমরা জানি। আমাদের দেশে উহার অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই কমবেশী জানা আছে।

বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাস, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবনাঞ্চল মধ্যে মধ্যে ডুবাইয়া অশেষ ক্ষতি সাধন করে। ইহাতে দ্বীপাঞ্চল ও সমুদ্র তটবর্তী লোকের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। ইহার পশ্চাতে প্রাকৃতিক কারণসমূহ বিদ্যমান।

জলোচ্ছ্বাসের সহিত প্রলয় ঝটিকার কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। এই ঝড় সমুদ্রবুকে বায়ুমণ্ডলের প্রবল উষ্ণতার চাপে সৃষ্টি হয়। বায়ু মণ্ডলের নিম্নচাপ সৃষ্টি হইলেই ঝড়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রবল ঝড়ের বেগে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভীষণ রুদ্র মূর্তিতে উপকূলের দিকে ধাবিত হয় এবং তথাকার সমস্ত লোকালয় হঠাৎ ইহার করালগ্রাসে নিপতিত হয়। গ্রীষ্ম মণ্ডলের দেশগুলিতেই বিশেষ করিয়া সামুদ্রিক ঝড় হইয়া থাকে।

ইউরোপ, কানাডা প্রভৃতি হিমমণ্ডলে এইরূপ ঝড়ের আশঙ্কা কম। এমনকি আমাদের এদেশেও শীতকালে ঝড় হয় না।

গ্রীষ্ম মণ্ডলীর দেশগুলির মধ্যে জাপান ও ইন্দোনেশীয় উপকূলে সামুদ্রিক ঝড় অত্যধিক হয়। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে এই দেশগুলি অবস্থিত। সুতরাং বায়ু স্বাভাবিক গতিতেই এই মহাসাগর হইতে অন্য মহাসাগরে ধাবিত হয় এবং পথিমধ্যে এই সমস্ত দেশের উপকুল ভূমিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়।

বঙ্গোপসাগরে যে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়, উহা সাধারণত খুলনা বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের উপকুলে ধাবিত হয় এবং সুন্দরবন ও আরাকান চট্টগ্রামের পাহাড় জঙ্গলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সাগরের অন্যান্য তীরভূমিও মেঘনার মোহনায় উপস্থিত হয়। সেইজন্য বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চল, ভোলা, সন্দ্বীপ ও হাতিয়ায় এই ঝড় প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। সুন্দরবনের বিশাল অরণ্য খুলনা, ২৪ পরগণা ও বাকেরগঞ্জের একাংশকে রক্ষা করে। এই জন্য অধুনাকালে ও বৈজ্ঞানিকেরা দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রতীরে জঙ্গল সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ঝড় ও জলোচ্ছাসের ইতিহাস দক্ষিণবঙ্গের মানুষের নিকট আতঙ্কস্বরূপ। আবুল ফজলের এক বর্ণনায় জানা যায় যে, ১৫৮৩ বা ১৫৮৪ খৃস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে এক প্রলয় ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। ৫ ঘন্টাব্যাপী প্রলয় ঝটিকা, মুহুর্মুহু বজ্রপাত ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয় কাণ্ড চলিতে থাকে। সমুদ্রের বারিরাশি ও তরঙ্গমালা প্রলয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাণ-রক্ষার্থে তৎকালীন বাকলারাজ জগদানন্দ রায় নৌকায় আরোহণ করেন এবং তৎপুত্র পরমানন্দ রায় বহু লোকজন সমভিব্যাহারে মন্দিরের উপরিভাগে আরোহণ করেন। ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে সুউচ্চ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা সদলবলে নৌকা ডুবিয়া নিধন প্রাপ্ত হন। একমাত্র সুউচ্চ মন্দির ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই জলোচ্ছ্বাসে দুইলক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। প্লাবনে জেলার অধিকাংশ স্থান নিমজ্জিত হয়। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভীষণকায় বজ্র-বিদ্যুৎ পতিত হইয়াছিল।

১৭০৭ খৃস্টাব্দে ঝড়ে সুন্দরবনের বৃক্ষাদি ও জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। সুন্দরবনের নিকটস্থ লোকেরা ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিয়াছিল। ১৭৩৭ খৃস্টাব্দের ভীষণ জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্পে সুন্দরবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই ঝড়ে সুন্দরবনের মনুষ্যবসতির চিহ্ন লোপ পায়। ৩০ সহস্র লোক ঝড়ে অকাল মৃত্যু বরণ করে।

১৭৬৯ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) খৃস্টাব্দের এক ঝড়ের কথা উইলিয়াম হান্টার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে এই ঝড়ের প্রচণ্ডতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই তুমুল ঝড়বৃষ্টি ও তৎসহ সমুদ্রের জল ও উদ্বেলিত হইয়া

বহুস্থান প্রায় উৎসাদিত করিয়াছিল। ১৮২৫ সালে কলেরা মহামারীতে এই জেলার ২৫০০০ লোক মারা যায়।

বাকেরগঞ্জ অঞ্চলের উপর দিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিরদিনই লাগিয়া আছে। প্রলয় ঝটিকা ও জলপ্লাবনে মানুষ, গবাদি পশু ও ধনসম্পদের ক্ষতি অপূরণীয়।

১৮২২ খৃস্টাব্দের (১২২৯ বঙ্গাব্দ) ৬ই জুন ভয়াবহ বন্যা হয়। ৬ই জুন হইতে ৯ই জুন পর্যন্ত ৩৯৯৪০ জন লোক মারা যায়। একমাত্র কলসকাটি থানায় ২২৪২২ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বাউফল থানায় ১০৯৮৪ জন। ৯৮,৮৩৪ টি গবাদি পশু এবং তের লক্ষ টাকার উপর সম্পত্তি বিনিষ্ট হয়। তদানীন্তন বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীর রিপোর্ট এখানে উদ্ধৃত করা গেল ;

"৬ই জুন দুপুর বেলা ঝড় আরম্ভ হয় এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাত্রি ৯ টার সময় ঝড় এইরূপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, মানুষ, গরু ও মালামাল ভাসাইয়া লইয়া যায়। বহু লোক ডুবিয়া মারা যায় এবং অনেকে ঘরের ছাদে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে চলিয়া যায়। রাত্রিতে লোক সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করে। পরদিন বন্যার পানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঝড় আরও ৭/৮ দিন স্থায়ী থাকে। থানার পূর্বাঞ্চল এবং ৬৩ গ্রামের (বড় বড় নদী তীরের) লোকেরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পশ্চিমদিকে বন্যার ভয়াবহতা কম ছিল। এই থানায় ১০,৯৮৪ জন মানুষ এবং ৯৭০০ গবাদি পশু প্রাণ হারাইয়াছে। মালামালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজে বলা যায় না।" এই ঝড়ে জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে এক ভয়াবহ জলপ্লাবন ও ঝটিকায় দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। এই দুর্বিপাকে বহু নরনারী, পশু ও বৃক্ষলতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১৮৭৬ খৃস্টাব্দে (১২৮৩ বঙ্গাব্দ) ৩১ শে অক্টোবর বাংলা ১৬ই কার্তিকের মহাঝড় বাকেরগঞ্জ বাসীর স্মৃতিপটে চিরদিন জাগরুক থাকিবে। এইরূপ মারাত্মক ও প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের কথা আর শ্রুত হয় নাই। এই দুর্বিপাকে বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের তিনলক্ষ লোকের প্রাণ হানি ঘটে। এই মহাঝড়ে দৌলত খাঁ নামক স্থান এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় এক লক্ষ নরনারী ও গবাদি পশু এই অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৮৮২ খৃস্টাব্দের ৬ই জুনের প্লাবন ঝড়ে সমুদ্র তটবর্তী শাহবাজপুর, বাউফল, মঠবাড়িয়া, গলাচিপা প্রভৃতি স্থান জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উর্মিমালা মস্তকে ধারণ করিয়া ভীষণ জলরাশি সমুদ্রের গর্ভ হইতে উদ্বেলিত হইয়া অতি ভীষণ-বেগে তটাভিমুখে ধাবিত হয়। এই মহাপ্রলয়ে এতদঞ্চলের ১০ সহস্র নরনারী এবং অন্যূন দশ সহস্র গবাদি পশু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন ইতিহাস : বাকেরগঞ্জ জেলায় অন্যান্য জেলার ন্যায় প্রাচীন কীর্তিরাজি বিরল। বিভারীজ বলিয়াছেন যে, বাকেরগঞ্জের প্রাচীনত্ব বলিতে বিশেষ কিছুই নাই। প্রাচীন

ও মধ্যযুগে এ জেলায় কয়েকটি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। আমরা এখানে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি ;

বাঙলাবাদের অন্য নাম রামসিদ্ধি, গৌরনদী থানার মধ্যে অবস্থিত। ইহা বাংলাদেশের অতীব প্রাচীন স্থান। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া, বাকেরগঞ্জের গৌরনদী এবং ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চল চিরদিনই প্রাচীন বঙ্গের মণি-স্বরূপ ছিল। এখানকার প্রাচীন ইতিহাস এবং বঙ্গের আদি ইতিহাস এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ইতিহাস আজও উদ্ধার হয় নাই। রামসিদ্ধি বা বাংলাবাদে একটি প্রাচীনকালীন মসজিদ দৃষ্ট হয়।

বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ—একই রাজ্যের দুই প্রাচীন নাম। ইহার বিস্তারিত ইতিহাস যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। কচুয়া এই রাজ্যের রাজধানী। রাজা জয়নারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপে নীলকুঠি ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজা শিবনারায়ণের আমলে ১১৭৬ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয় উহা ইতিহাসের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত।

মসজিদ বাড়ী—তুর্ক আফগান আমলে দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গলমধ্যে মসজিদ ও বসতবাটী নির্মিত হইয়াছিল। পরে এই সমস্ত এলাকা প্লাবন বা প্রাকৃতিক বিপ্লবের পর জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। পটুয়াখালী জিলার অন্তর্গত মীর্জাগঞ্জ থানার সন্নিকটে জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় একটি মসজিদ আবিষ্কৃত হয়। তখন ঐ গ্রামের নামকরণ হয় মসজিদবাড়ী। সমসাময়িককালে খুলনার দক্ষিণে অনুরূপ একটি বৃহৎকায় মসজিদ জঙ্গল ও মৃত্তিকার তলে আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য তথাকার নাম হয় মসজিদকুড়।

গৌড় সুলতান বরবক শাহের রাজত্বকালে এক গুম্বজবিশিষ্ট একটি মসজিদ ১৪৬৫ খৃস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত মসজিদ গাত্রে একখানি আরবী শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এখন কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। আরবী ভাষায় লিখিত আলোচ্য শিলালিপির বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :

"আল্লার রসুল বলিয়াছেন, যিনি এই জগতে মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিবেন, আল্লাহ্ বেহেশতে তাঁহার জন্য ৭০টি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন। এই মসজিদ সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র, ধর্ম ও রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ আবুল মোজাফফর বরবক শাহের রাজত্বকালে ৮৭০ হিজরীতে মোয়াজ্জম উজিল খাঁর দ্বারা নির্মিত হয়। বিভারীজ সাহেব ইংরেজী ১৮৭৪ সালে এই মসজিদ অভগ্ন অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাকেরগঞ্জ জিলার ইহাই একমাত্র প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন। কেহ কেহ বলেন ইহাই এই জেলার প্রথম ইষ্টক নির্মিত অট্টালিকা।

বাংলাদেশের সন্নিকটে প্রাচীন কসবা গ্রাম অবস্থিত। কসবা ফার্সি শব্দ, উহার অর্থ শহর। কথিত আছে যে, সাবী খান নামক জনৈক পাঠান ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে কসবা অঞ্চলে আগমন করেন। তিনি সর্বপ্রথম এখানে একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে সাবীখান একটি নবগুম্বজ বিশিষ্ট বৃহৎকায় মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইহা খানজাহানের সময় নির্মিত। মসজিদের স্তম্ভগুলি

প্রস্তর নির্মিত। ইহা সর্বদিক দিয়া মসজিদ কুড মসজিদের ন্যায়। বাকেরগঞ্জের এই প্রাচীন কীর্তিটি সরকারী তত্ত্বাবধানে আসিয়া উহার মেরামতকার্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

জনহিতকর কার্যের জন্য সাবীখান খ্যাতি লাভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি কোন পাঠান শাসকের কোতয়াল ছিলেন এবং তদনুসারে পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম হয় কোতয়ালিপাড়া বা কোটালিপাড়া। 'সাবী খাঁর জাঙ্গাল' বলিলে তাঁহারই সময় নির্মিত প্রাচীন রাস্তা বুঝায়। সাবী খাঁ খনিত একটি প্রাচীন দীঘির তীরে সাবী খাঁর পাড় নামে একটি গ্রাম আছে।

বিভারীজ তদীয় বাকেরগঞ্জের ইতিহাসে সাবীখাঁ সম্পর্কে একটি অত্যদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত গল্পের বর্ণনায় জানা যায় যে, সাবী খাঁ একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। আরও কথিত আছে যে, তাঁহার মাতা পিতা কর্তৃক সুন্দরবনের জঙ্গলে বিতাড়িত হন বা তাঁহাকে বনবাস দেওয়া হয়। জঙ্গলের মধ্যে অপরিচিত মাতা ও পুত্রের মধ্যে প্রণয় মিলন ঘটে এবং তাঁহারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহুকাল যাবৎ স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বসবাস করেন। পরে মাতা স্বীয় সন্তানের গাত্রে একটি চিহ্ন দেখিতে পাইয়া পূর্ব পরিচয় প্রকাশ করিয়া দেন। এহেন মারাত্মক ভুলের জন্য সাবী খাঁর অনুশোচনা হয় এবং তিনি মসজিদ প্রতিষ্ঠা, রাস্তা নির্মাণ এবং দীঘি খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আদিষ্ট হন। বিভারীজ বর্ণিত গল্পটি কল্পনাপ্রসূত।

বাকেরগঞ্জ থানার শিয়ালগুনি গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। কথিত আছে যে গাজী নসরত এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এককালে উহা সুন্দর কারুকার্য শোভিত ছিল। এখনও উহার কিছু কিছু নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এখানে একখানি শিলালিপি ছিল বলিয়া জানা যায়। বহু কাল পূর্বে উহা অপসারিত হইয়াছিল। ইহার সন্নিকটে পিলখানা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। সম্ভবত এখানে এককালে কোন স্থানীয় শাসনকর্তার হস্তীশালা ছিল।

নিয়ামতীর সন্নিকটে বিবিচিনি গ্রাম অবস্থিত। কথিত আছে যে, নিয়ামতের ভগ্নী চিনি বিবি নামক জনৈক মহিলা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুউচ্চ বৃহৎকায় ঢিপির উপর এই মসজিদ নির্মিত হয়। মেহেন্দীগঞ্জ বা মেন্দীগঞ্জে একটি পুরাতন মসজিদ আছে। উহার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১৭৫৩ সালে মোহাম্মদ সফি কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়।

শুজাবাদ নলচিঠি নদীতীরে অবস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা একটি ঐতিহাসিক স্থান। বরিশাল শহর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহশুজা মগ-পর্তুজীগ আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গটি চারি সমকোণ বিশিষ্ট চতুর্ভুজ। মৃণ্ময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এই দুর্গের প্রতি কোণে একটি করিয়া ঢিপি স্থাপিত হইয়াছিল। দুর্গ মধ্যে চারিটি ক্ষুদ্র পুকুর রাস্তার দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছিল। চৌরাস্তার সঙ্গমস্থলে শাহশুজার আবাসবাটী ছিল। দুর্গের কোন চিহ্ন নাই। দীঘিটি নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বাকেরগঞ্জ কালেক্টরেটের এক দলিলে জানা যায় যে, জনৈক পাঠান মগদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পরিবারবর্গকে শুজাবাদ গ্রাম দান করা হয়। আসমান সিং এই বংশের শেষ প্রদীপ। ইংরেজ আমলে নরহত্যার অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইলে এই বংশের ধারা লয়প্রাপ্ত হয়।

ঝালকাটি থানায় বর্তমান গুরুধামের নিকট সুতালরী গ্রামে একটি প্রাচীন হিন্দু মঠ নির্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন এই মঠ চারিশত বৎসরের পুরাতন। ইহার উচ্চতা ১৫০ ফুট। কথিত আছে যে, জনৈক প্রতিপত্তিশালী হিন্দু স্বীয় মাতার সমাধির উপর একটি মঠ নির্মাণ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি মায়ের দুগ্ধদানের প্রতিদান স্বরূপ এই সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করিয়া গর্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার দম্ভোক্তি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মন্দিরের চূড়া ধসিয়া যায়। তখন ঐ ব্যক্তির চৈতন্য হয় এবং তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। সম্প্রতিকালে মঠটি কীর্তনখোলা নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

১৭৩৮ খৃস্টাব্দে (১১৫১ বঙ্গাব্দ) জনৈক গোলাম মুহম্মদ কর্তৃক সুতালরীতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। উক্ত মসজিদের একখানি প্রস্তর লেখনীসহ ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

গৌরনদী থানার মহিলারা গ্রামে একটি সুউচ্চ মঠ অভগ্ন অবস্থায় আজিও বিদ্যমান। এই মঠ সরকারের মঠ বলিয়া পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক বিবরণীতে জানা যায় যে, ১৭৪৬-৫৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে উহা হিন্দু সমাজ কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহা নিঃসন্দেহে একটি হিন্দু মঠ।

গোবিন্দগঞ্জ গ্রামে আরও একটি প্রাচীন হিন্দু মঠ নির্মিত হইয়াছিল। সরকার মঠ অপেক্ষা ইহার উচ্চতা কিছু কম। এই মঠের উপর আগাছা জন্মিয়া উহার বংশ ত্বরান্বিত করিতেছে।

শিকারপুর গ্রাম অতীবপ্রাচীন। এখানে সুগন্ধা দেবীর প্রাচীন মঠসহ পাষাণময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর আদি বাসস্থান। 'শুম্ভ নিশুম্ভ' 'সংস্কৃত' মহাকাব্যের প্রণেতা কালীকান্ত শিরমনির জন্মভূমি।

পোনাবালিয়ার উপকণ্ঠে শ্যামরাইল নামক পল্লীতে অতি প্রাচীন পাষাণময় শিবলিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সুগন্ধা নদী পূর্বে এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইংরেজ আমলে মিঃ গ্যারেট সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। এই জেলায় ১৮২৪ সালে ২৩ টি, ১৮২৫ সনে ৬৩ টি, ১৮২৬ সনে ৪৫ টি ও ১৮২৭ সনে ২৯ টি, সহমরণ ঘটনা সংঘটিত হয়।

১৮১২ খৃঃ জেলখানায় কয়েদীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল।

ইসলাম প্রচার ঃ উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা অঞ্চলে আগত দরবেশদের অব্যবহিত পরে অন্যান্য জেলার ন্যায় বাকেরগঞ্জেও ইসলাম প্রচারের ঢেউ জাগিয়াছিল। মসজিদ বাড়ী, কসবা, কালীশুড়ি এবং পিরোজপুর অঞ্চলে সম্ভবত প্রথমেই এই ঢেউয়ের দোলা লাগে।

সৈয়দুল আরেফীন এ জেলার বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও সুফী দরবেশ। প্রবাদ আছে যে, দিগ্বিজয়ী তৈমুর লঙের সময় এই দরবেশ মধ্য এশিয়া হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। এই সাধকের চরিত্র মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া ভাটি অঞ্চলের বহু অধিবাসী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। বাউফল থানার কালীশুড়ি গ্রামে তাঁহার আস্তানা আছে। পূর্বে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে এক মাইলব্যাপী মেলা বসিত। তথায় লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হইত। ১৯৪৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে এই মেলা উঠিয়া যায়।

কথিত আছে যে, সৈয়দুল আরেফীন সিলেটের মাহাত্মা শাহ্জালালের একজন শিষ্য। তাঁহার কোন বংশধর নাই। তবে তাঁহার খাঁদেমদের বংশধরেরা বিভিন্নস্থানে বসবাস করিতেছে।

প্রবাদ কালী নাম্নী এক শুড়ি শ্রেণীর বালিকা তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইলসাম গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে এতদঞ্চলে অনেক কিংবদন্তী শ্রুত হয়। এই বালিকার নামানুসারে গ্রামের নাম হয় কালীশুড়ি।

সাতুরিয়া গ্রামে শাহ্সাজেন্দ নামক এক আউলীয়া ধর্ম প্রচারের জন্য এখানে আগমন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে, তিনি হযরত খানজাহান আলীর সহিত দিল্লী হইতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

এই জেলার আউলিয়াপুর গ্রামের একটি দরগাহকে বার আউলিয়ার দরগাহ বলা হয়। কথিত আছে যে, ১২ জন আউলিয়া ধর্ম প্রচারার্থে এখানে প্রথমে আস্তানা স্থাপন করেন। এই গ্রামে একটি প্রাচীন কালীন দীঘি আছে, উহা ব্রুম খাঁর দীঘি নামে প্রসিদ্ধ।

তিনশত বৎসর পূর্বে ইমন হইতে ওয়াজির আলী শাহ্ ইসলাম প্রচারকল্পে ভোলায় আসেন। তিনি একজন সাধক ও দরবেশ। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তাহার সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হয়। প্রতি বৎসর ২৭ শে ফাল্গুন তারিখে এই দরবেশের স্মৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উরসে বহু লোক সমাগম হয়।

ঝালকাটি থানার সওগানদিয়া গ্রামে হযরত দায়ুদ শাহ নামক দরবেশের মাজার অবস্থিত। তুর্ক-আফগান আমলে তিনি এখানে শুভাগমন করেন। তিনি পূর্ববর্ণিত দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার পূণ্য নামের সহিত বহু অসম্ভব কিংবদন্তী ও কেচ্ছা-কাহিনী জড়িত আছে। তাঁহার প্রস্তর নির্মিত কবরগাত্রে পবিত্র কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ। প্রতি বৎসর সেখানে উরস হয়।

নলচিঠি থানার পাঁচ মাইল উত্তরে শাহ্ বাঙ্গাল নামক স্থানে হযরত শাহ্ চেরাগ আলমের সমাধি আছে। এখানে তিনি একটি মসজিদ ও পুস্করিণী খনন করেন। এই অঞ্চলের বহু নর-নারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার কাহিনী শ্রবণে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে ৩৬০ বিঘা জমি যৌতুক দিয়াছিলেন।

ইয়ার উদ্দীন খান নামে আর একজন সুফী সাধক মীর্জাগঞ্জ হাটের মধ্যে ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার কবরগাহ সর্বজন সম্মানিত।

মওলানা নফিসুর রহমান এ জেলার অন্যতম দরবেশ। তিনি সংসার ধর্মে বিরাগী ছিলেন। তাঁহার কথায়;

অসার অসার হায়! সকলি অসার।
অসার সাধের গেহ, অসার মানব দেহ,
অসার সংসার, দারাপুত্র পরিবার-।

তিনি চট্টগ্রামের বিখ্যাত পীর গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারীর দরগায় কিছুদিন অবস্থান করেন। তথা হইতে চট্টগ্রামের নানা স্থান, বন জঙ্গল পরিভ্রমণ করিয়া কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি আবার গাহিলেন;

কে বলে এ ধরাধামে নাহি কিছু সার।
আছে দিব্য সার রত্ন
করিলে আদর যত্ন
অবশ্য মিলিবে তাহা ঘুচিবে আঁধার।

অসংখ্য লোক বিপদে আপদে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণ করিতে তাঁহার সমীপে হাজির হইত। তিনি শরিয়তের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। প্রতি বৎসর বসন্ত সমাগমে ফাল্গুন মাসে প্রথম বৃহস্পতিবার হইতে রবিবার পর্যন্ত এখানে বার্ষিক উরস উদযাপিত হয়।

নলচিড়া গ্রামে খানাবাড়ী নামক স্থানে মীর কুতুব শাহের দরগাহ্ অবস্থিত। মীর কুতুব ছিলেন গাজীপুরের সৈয়দ উলফত গাজীর বংশধর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় তিনি ঢাকায় আসেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে তাঁহার স্মৃতি বার্ষিকীতে উরস অনুষ্ঠিত হয়।

মরহুম মওলানা কেরামত আলী যৌনপুরী এবং ফরিদপুরের পীর দুদুমিঞা ও পীর বাদশাহ মিঞা এ জেলার সম্মানিত পীর। তাঁহাদের অসংখ্য শিষ্য এখানে আছেন।

উদচাঁড়া নামক স্থানের মরহুম দরবেশ মীর মোশায়েখ সাহেব। তাঁহার নামে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সাবী খাঁ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ঃ নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর এ জেলার একদল লোক ইংরেজদিগকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এখানকার লোক স্বাধীনতা প্রিয় এবং আন্দোলন বিশ্বাসী। এ জেলার মানুষ কখনও পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে, কখনও আরাকানী মগদের সঙ্গে কখনও বা বৃটিশ সৃষ্ট মগদের সঙ্গে আজাদী ও অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। নলচিঠি থানার সুগন্ধিয়া অঞ্চলের জনগণ বালকি খানের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া উঠে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে। কোম্পানীর সৈন্যদল দুর্গ প্রাচীর ধ্বংস করিয়া বালকি খানকে বন্দী করেন।

ওহাবী আন্দোলনের ঢেউ এ জেলায় পতিত হইয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীর মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলামের স্বপ্ন প্রথম আজাদী সংগ্রামের পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। বাকেরগঞ্জ জেলার বহু মুজাহিদ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে মিতানায় গিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন।

খেলাফত আন্দোলনে বাকেরগঞ্জের বহু কৃতি সন্তান যোগদান করিয়া ছিলেন। ফরায়েজী আন্দোলন আজাদী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। বাহাদুরপুরেব হাজি শরিয়াতুল্যা ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮১৮ খৃস্টাব্দ হইতে এই আন্দোলন শুরু হয়। এই গণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কারের মুলোৎপাটন, বৃটিশ সৃষ্টি ও পোষিত জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের জুলুম, শোষণ ও অত্যাচার হইতে দবিদ্র সমাজকে রক্ষা করার সংগ্রাম। ইহা মূলত বৃটিশ বিরোধী ও স্বাধীনতা কামী ব্যক্তিদের সংগ্রাম ছিল।

জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন দুদু মিঞা। এই সমস্ত আন্দোলনের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ দুদু মিঞার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও এ জেলায় দুদু মিঞার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের শেষে বাংলার প্রজা আন্দোলনের ঢেউ এ জেলার উপর দিয়া বহিয়া যায়। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে সত্যগ্রহ আন্দোলন ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল। মহাত্মাগান্ধীর সহকর্মী সাধক ও দেশপ্রেমিক অশ্বিনী কুমার দত্ত ইহার পুরোভাগে ছিলেন।

ঐতিহাসিক স্থানের পরিচয় বরিশাল ঃ পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম বাক্‌লায় একটি ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া উহার নামকরণ করেন 'গ্রেদ বন্দর' (Great Port)। সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে এই বন্দর স্থাপিত হইয়াছিল। পর্তুগীজ বা ইটালিয়ানরা ট বা ড কে দ উচ্চারণ করে। বরিশাল শহরের গোড়া পত্তনের পূর্বে পর্তুগীজরা এই স্থানকেও 'গ্রেদবন্দর' নামে আখ্যায়িত করিয়াছিল। এই 'গেদ বন্দর' রূপান্তরিত হইয়া গ্রের্দে বন্দর বা গিরিধি বন্দরে পরিণত হয়। বরিশাল, বগুরা-আলীকান্দা, কাউনিয়া, ও আমানতগঞ্জ এই চারটি গ্রাম লইয়া বরিশাল শহরের ভিত্তি পতন হয়। ১৮১৯ সালে রিচার্ড হান্টার নামক এক ইংরেজের নিকট হইতে বর্তমান বাকেরগঞ্জ কালেক্টরীর জায়গা ৫ (সিকা) টাকায় গর্ভণর জেনারেল মার্কুইস অব হেষ্টিংসের নামে খরিদ করা হয়। এই হস্তান্তর সম্পর্কীয় দলিলে দেখা যায় যে, ঐ জমির পরিমাণ ছিল ৩ কাণি বা ২০, ৭৩, ৬০ বর্গফুট।

কথিত আছে যে, বর্তমান বরিশালে বড় বড় লবণ গোলা ছিল এবং ঐ গোলা সমুহকে 'বড়িসল্ট' বলা হইত এবং এই 'বড়িসল্ট' শব্দ হইতে বরিশাল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যমতে বড় বড় শাল বৃক্ষ বা বরিয়া বরিয়া শাল হইতে বরিশাল নাম হইয়াছে। এই দুই মতের কোন সঠিক ভিত্তি না থাকায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে। কেহ কেহ বলেন

বরিশালের পূর্বনাম ছিল সাগরদি, অর্থাৎ সাগরতীরে এককালে ইহা একটি দ্বীপ ছিল। বরিশাল নদী তীরবর্তী সৌন্দর্যশালী শহর। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এই শহরের মনোরম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া বরিশালকে বাংলার ভেনিস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সরূপকাটি থানার সঙ্গে সুন্দরবনের সম্পর্ক নিবিড়। এখানকার অসংখ্য লোক সুন্দরবনের কাঠের ব্যবসায়ে লিপ্ত। বহু বাওয়ালী কাঠ সংগ্রহ কার্যে বারমাস সুন্দরবনে অবস্থান করে। এখানকার নারিকেল ছোবড়ায় বহু কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সেহানগলে পীর শাহ্ কামালের দরগা ও একটি পুরাতন মসজিদ আছে। নাজিরপুরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ছিল। পোনাবালিয়া গ্রামের রামভদ্র রায় ১৭৪৮ সালে মহারাষ্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। এখানে কালাচাঁদের মন্দির আছে।

কীর্তিপাশা এ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রামের সন্নিকটে মঠবাড়ী নামক স্থানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। নথুল্লাবাদের দেবমন্দির 'দক্ষিণচক্র' নামে খ্যাত। প্রতি বৎসর বহুযাত্রী তথায় গমন করে। মাধবপাশার রাজাদের ছত্রী সৈন্যেরা এখানে অবস্থান করিত।

মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ মগ-ফিরিঙ্গিদের সহিত যুদ্ধে কৃতিত্ব অর্জন করেন। শাহবাজপুর আজিও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। উত্তর শাহবাজপুর মেন্দিগঞ্জ থানার এবং দক্ষিণ শাহবাজপুর ভোলা মহকুমাধীন। ভোলা গাজী ও মীর্জাসাহেব এখানকার ভূম্যাধিকারী ছিলেন। দক্ষিণ-শাহবাজপুর ৮০০ বর্গমাইল ব্যাপী জেলার বৃহত্তম দ্বীপ।

উজিরপুর প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু স্থান। ইহা বহু পণ্ডিত ব্যক্তির আবাসস্থল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরু দার্শনিক পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বাচষ্পতি এই গ্রামের অধিবাসী। শায়েস্তা খাঁর নামানুসারে শায়েস্তাবাদ গ্রামের নামকরণ হয়। এখানে হার্মাদ জলদস্যুদের মোকাবেলা করার জন্য শায়েস্তা খাঁ একটি নৌঘাটি স্থাপন করিয়া ছিলেন। বাকেরগঞ্জের কৃতিসন্তান নবাব মোয়াজ্জেম হোসেন প্রতিষ্ঠিত এখানকার বিপুলায়তন পুস্তগারের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যপ্ত ছিল।

পাদ্রী শিবপুর রোমাণ ক্যাথলিক মিশনারীদের প্রচার কেন্দ্র। এখানে পর্তুগীজ মিশনারী কর্তৃক সর্বপ্রথম একটি গীর্জা নির্মিত হয়। তথায় কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি হাসপাতাল আছে।

পটুয়াখালী মহকুমার খেপুপাড়ায় মগদের বসতি আছে। ইহা একটি ব্যবসায়কেন্দ্র। এখানকার শুটকি মৎসের ব্যবসায়ের খ্যাতি আছে। কুয়াকাটা সুন্দরবনের পার্শ্বে একটি মনোরম স্থান। ইহা খেপুপাড়া হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পদ্মাপুরাণ ও মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত বাকেরগঞ্জের গৌরবে ধন্য তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম "মনসামঙ্গল"। কবি নিজ পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

'পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘন্টেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পন্ডিত নগর
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়'।

মুকুন্দদাস বরিশালের বিশেষ জনপ্রিয় চারণ কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। ঢাকা জেলার বাসিন্দা হইয়াও তিনি আজীবন বরিশালে অতিবাহিত করেন। মানবসেবাই ছিল তাঁর পরমধর্ম। স্বরচিত স্বদেশী আন্দোলনের গান গাহিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কবি বিজয়গুপ্তের পরেই তাঁহার স্থান।

কবি মোজাম্মেল হক ভোলার অধিবাসী। তিনি এ জেলার প্রখ্যাত কবিদের অন্যতম।

মুন্সি মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন কাউনীয়া গ্রামের অধিবাসী। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'সুধাকর' জাগবণীদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্র নব সুধাকর ও সুলতান। কৃষক বন্ধু, গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ, তোহফাতুল মোসলেমীন প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

বাকেরগঞ্জ নানাপ্রকার সঙ্গীতের দেশ। এ জেলার সবুজ বনানীর পাতায় পাতায় যেন আবির ছড়ানো আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, পাঠান, মোঘল, ইংরেজ-পর্তুগীজ মিলিত হইয়াছিল এককালে এই জেলায়। গায়কের কোকিল কণ্ঠে সর্বত্র শ্রুত হয় জারি, ভাটিয়ালী, মারফতী, মুর্শিদী, ভাষান-বয়ানী, বাউল-কীর্তন, মাইজ-ভান্ডারী গানের অপূর্ব ঝংকার। নৌকায় নদীপথে শ্রুত হয় সারি, সয়লা ভোজের রাণী, আসমান সিং, গুনাই বিবি ও কমলারাণীর গাথাও কাহিনী। কৃষ্ণলীলা, মনসামঙ্গল, কবিয়াল, টপ্পা, নিমাই সন্ন্যাস, বেহুলা-লক্ষিন্দর হিন্দু সমাজের প্রিয় সঙ্গীত। মুসলমানদের মধ্যে দেহতত্ব, আমীর-সাধু, ইমাম যাত্রা, গাজীর গান, আসমান সিং, প্রভৃতি নানাপ্রকারের গান আজিও প্রচলিত আছে।

নদীর কলতান, বাগিচায় বসন্তের কোকিলের কুহু কুহু রব, সবুজ ধান ক্ষেত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-নদীও চরভূমির এই দেশকে করিয়াছে গৌরবান্বিত ও মাধুর্যমন্ডিত।

কুড়ি

সুন্দরবনের সুন্দর দেশ

সুন্দরবনের সুন্দর দেশ হিসাবে খুলনা জেলার খ্যাতি আছে। সমগ্র খুলনা জেলার ধানক্ষেত, বাড়ীঘর ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়াছিল সুন্দরবনের জঙ্গল আবাদের পর। এ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুন্দরবন দিয়ে ঘেরা, তেমনই সুন্দরবনও খুলনা জেলার দ্বারা বেষ্টিত। তাই খুলনা জেলার ইতিহাস এ গ্রন্থের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

বাকেরগঞ্জের ন্যায় এ জেলারও অসংখ্য নদনদী আছে। তবে উত্তরদিকে রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহু নদী-নালার গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেজন্য অধিকাংশ নদী আপন মনে স্রোত বহন করিতে পারে না।

শ্যাম সবুজের খেলা সর্বত্র পরিদৃষ্ট। বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁর সময় খুলনা জেলাধীন যশোর রাজ্য আক্রান্ত হয়। প্রতাপাদিত্যের পতনে সেনাপতি মীর্জা নাথন এখানে থাকিয়া যান। সুন্দরবন সংলগ্ন প্রদেশে অবস্থান কালে তিনি 'বাহ্‌রিস্তানই গাইবী' নাম দিয়া এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাহরিস্তান শব্দের অর্থ 'বসন্তের দেশ' এবং গাইবী হইতেছে ছদ্মনাম।

সবুজ ধানক্ষেত, গোচারণ ভূমি, সবুজ ঘাসের সুখদায়ক গালিচা সুন্দরবনের অপরূপ রূপশোভা মীর্জা নাথনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁর কাছে এ অঞ্চল ছিল চির বসন্তের দেশ। এদেশের কোকিল ও পাপিয়ার তান তাঁকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করিয়াছিল। বাছিয়া বাছিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাঁর যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী বিষয়ক পুস্তকের নামকরণ করেন বসন্তের দেশ। আমরা অবশ্য খুলনাকে বসন্তের দেশ না বলিয়া সুন্দরবনের সুন্দর দেশ বলিয়া আখ্যায়িত করিতেছি।

জেলার জন্ম কথা ঃ এখানকার অধিকাংশ এলাকা পূর্বে ২৪ পরগনা ও যশোরের অধীন ছিল। খুলনা সদর ও বাগেরহাট, যশোর এবং সাতক্ষীরা মহকুমা ২৪ পরগনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খুলনা জেলার সৃষ্টি হয়। আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে, যশোরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এবং খুলনার উত্তরাংশে সরকার খলিফাতাদের অধীন ছিল। ইহারই লাগ্ দক্ষিণে সুন্দরবন অবস্থিত ছিল।

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে খুলনা শহরের পূর্বপাড়ে উইলিয়াম রেনী নামে একজন কুঠিয়াল বাস করিতেন। স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার শিবনাথ ঘোষের সঙ্গে তাঁহার প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। এই দাঙ্গা হাঙ্গামা নিরোধের জন্য উভয়ের বসত বাটীর মধ্যবর্তী স্থানে ১৮৩৬ সালে নয়াবাদ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তালিমপুর ও শ্রীরামপুর গ্রামের মাঝখানে একটি ভিটা ও 'থানার পুকুর' আছে। ঐ স্থানেই নয়াবাদের থানা ছিল।

১৮৪২ সালে যশোর জেলাধীন খুলনা মহকুমাব সৃষ্টি হয়। নয়াবাদের সন্নিকটেই এই মহকুমার অফিস স্থাপিত হয়। তাবু খাটাইয়া প্রথম এস, ডি, ও মিঃ শোর এখানে অফিসাদি পরিচালনা করিতেন। বাড়ীর পার্শ্বে থানা ও মহকুমা অফিস স্থাপিত হওয়ায় শিবনাথ ও রেনী উভয়ে অশ্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। রেনীর পবামর্শে শেষ পর্যন্ত ভৈরব তীরে মীর্জাপুরের মাঠে বর্তমান ডেপুটি কমিশনারের কুঠিতে মহকুমার দপ্তর স্থানান্তরিত হয়। উহা তখন গোলপাতার ছাউনিযুক্ত ঘর ছিল। বর্তমান খুলনা শহর তখন মীর্জাপুরের মাঠ বলিয়া চিহ্নিত ছিল।

মহকুমা অফিস স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে মীর্জাপুরের মধ্যে বর্তমান কয়লাঘাটা নেমককর আদায়ের জন্য রায়মঙ্গল এজেন্সির অফিস ছিল। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে খুলনাকে জেলায় পরিণত করা হয়।

খুলনা নামের উৎপত্তি ঃ খুলনা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, কবি কঙ্কন বিরচিত চণ্ডীকাব্যের নায়ক ধনপতি। এই ধনপতির লহনা ও খুল্লনা নামে দুই স্ত্রী ছিলেন। কপিলমুনি অঞ্চলে তাঁহাদের নাম লহনা খুল্লনার পুল আছে। খুল্লনা পতিগতপ্রাণা আদর্শ নারী, তন্নিমিত্ত স্থানের নাম হইয়াছে খুলনা।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, খুলনা শহরের বর্তমান স্থান সুন্দরবনে পূর্ণ ছিল। জঙ্গলের উত্তর প্রান্তে এই স্থানে কাঠুরিয়াগণ ঝড় তুফানের সময় নৌকা নঙ্গর করিত। একদা ভয়সঙ্কুল ঝটিকার সময় নৌকার মাঝিরা নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য গভীর নিশীথে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিলে জঙ্গলাভ্যন্তর হইতে "খুলোনা খুলোনা-" গায়েবী আওয়াজ শ্রুত হয়। এই মতে এই 'খুলোনা' হইতে খুলনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

অন্য মতবাদীরা বলেন যে, খুলনা শহরের পূর্বপারে প্রাচীন "খুলনেশ্বরী" কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠত ছিল। এই স্থানের পার্শ্বে প্রচুর উলুখড় জন্মিত, তজ্জন্য সাধারণে উহাকে উলুবনের কালী বলিত। প্রাচীন কালীবাড়ী ভৈরব গর্ভে বিলীন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই খুলনেশ্বরী হইতে খুলনা নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম ঢাকেশ্বরী, যশোরে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যশোরেশ্বরী, তদ্রূপ খুলনায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে খুলনেশ্বরী। স্থানের নামানুসারে লোকে মন্দিরের নামকরণ করিয়াছে, মন্দিরের নাম হইতে স্থানের নাম হয় নাই।

ভৌগলিক বিবরণ ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে এই জেলা অবস্থিত। সুন্দরবন সহ এই জেলার আয়তন ৪৬৫২ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ২৩১৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া সুন্দরবন। সুন্দরবনের এক পঞ্চমাংশ আবার নদী নালায় ভরপুর।

খুলনা জেলার বর্তমান লোক সংখ্যা ২৪,৪৮,৭২০। প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ৫২৬ জন। শিক্ষিত লোকের সংখ্যার হার শতকরা ২৭.২ জন। আবহাওয়া মাঝারী ধরণের, আর্দ্র ও লবণাক্ত।

এ জেলার প্রধান ফসল ধান্য, পাট, নারিকেল, সুপারী, পান ও তামাক। বনাঞ্চলে হোগলা ও মালিয়া জন্মে। মালিয়ার দ্বারা মাদুর প্রস্তুত হয়। মৎস ও একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। জঙ্গলে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলপাতা ও কাঠ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের সম্পদই দেশের গৌরব।

এ জেলায় অসংখ্য নদনদী আছে। জেলার উত্তরাংশের পানি মিষ্ট এবং দক্ষিণাংশের পানি লবনাক্ত। লোনা পানি জমিতে প্রবেশ করিলে ধান্য ফসল উৎপন্ন হয় না, সেজন্য সমগ্র লবণাক্ত এলাকায় বাঁধবন্দী করিতে হয়। এই বান্ধ বা ভেড়ী খুলনার ধান্য ফসলের প্রাণ। ভৈরব, কপোতাক্ষী, শিবসা, পরশ, ইছামতি, রায়মঙ্গল, রূপসা, হরিণভাঙ্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নদী। অধিকাংশ নদীই সরাসরি সমুদ্রে পড়িয়াছে।

খুলনা জেলায় ৩ টি মহকুমা—খুলনা সদর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট। থানার সংখ্যা ২২, ইউনিয়নের সংখ্যা মোট ২০৬। খুলনা শহরে ১ টি পৌর কমিটি এবং বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায় দুইটি শহর কমিটি আছে। সর্বমোট গ্রামের সংখ্যা ২৭৬০। খুলনা শহরের বর্তমান লোকসংখ্যা খালিশপুর শিল্প এলাকা ও দৌলতপুরসহ তিন লক্ষাধিক।

স্থানিক পুরাতত্ত্ব ঃ খালিফাতাবাদ, ঈশ্বরীপুর, বাবুলীয়া, ধানদিয়া, কপিলমুনি, আমাদি প্রভৃতি অতীব প্রাচীন স্থান এবং প্রাচীন ইতিহাসের আকর। সেই সমস্ত প্রাচীন স্থানের ইতিহাস আমরা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। খানজাহান আলীর ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশ করিয়াছি এখন আমরা স্থানিক পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে অবশিষ্ট ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিব।

ডুমরিয়া থানার মাগুরা ঘোনা ছালামত খাঁ নামীয় একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। সতীশবাবু বলিয়াছেন যে, এই গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। অনুসন্ধানেব পর জানিয়াছি উহা ঠিক নহে। আরশ নগরে কয়েকশত বৎসর ধরিয়া একটি একগুম্বজ বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদ ইষ্টক ও মৃত্তিকার ঢিপির মধ্যে আবৃত ছিল। ১৩৬৫ সালের ২৯শে চৈত্র স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিরা খনন কার্য চালাইয়া ঢিপির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি স্তম্ভ আবিষ্কার করে। পরে ইহার পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীর ভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। মাত্র দুই হাত উঁচু প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ভগ্ন মসজিদের সংলগ্ন এক খন্ড প্রস্তরের উপর আরবী ভাষায় লিখিত আছে ;

"কালা রসুলুল্লাহ্ ম়ান বানায়া মাসজেদান, বানা আল্লাহো লাহু বায়তান ফিল জান্নাতে—ইত্যাদি।" অবশিষ্ট অংশের পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। উহার অর্থ এইরূপ—রসুলল্লাহ্ বলিয়াছেন, এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করিবেন আল্লাহ আখেরাতে তাঁহার জন্য অনুরূপ একখানি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন।" ১৩৬৬ সালের ১৪ই ফাল্গুন তারিখে মওলানা মঈজউদ্দীন হামিদী উহার ঐ অংশের পঙ্কোদ্ধার করেন। ঐ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতে এখানে ওক্তিয়া নামাজ এবং পরে জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের পূর্বদিকের তিনটি দরজার পাঁচখানি প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলে খানজাহানের অন্যতম শিষ্য সৈয়দ মুহম্মদ আফজাল এখানে বসতি স্থাপন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মসজিদ খানজাহান বা তাঁহার কোন শিষ্যের দ্বারা নির্মিত হয় নাই। খানজাহান নির্মিত মসজিদে এই ধরণের লেখনী পাওয়া যায় না। বাকেরগঞ্জের মসজিদবাড়ীতে অনুরূপভাবে আবিষ্কৃত মসজিদে এইরূপ বাণী লিখিত আছে। অবশিষ্ট লিপিগুলির পঙ্কোদ্ধার হইলে আরও অজানা তথ্যের সন্ধান মিলিবে। সম্ভবত গৌড় সুলতানের অধীনস্থ কোন কর্মচারী এই মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বিগত সেটেলমেন্টের পরচায় ৭ একর জমি এই মসজিদের জন্য শাহ্‌আফজাল শেখের চেরাগী নিস্কর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আরশ নগর নাম শাহ্‌ফাফজাল কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মসজিদের পূর্বপার্শ্বের জলাশয়ের নাম মসজিদ পুকুর এবং উত্তর দিকের পুকুরকে বিড়কীর পুকুর বলা হইত। উভয় পুকুর ভরাট হইয়া গিয়াছে। মসজিদ পুকুর সংস্কারের সময় প্রাচীন কালীন ইট, মৃন্ময় পাত্র এবং পশ্চিম পার্শ্বে ৩৯ ফুট প্রশস্ত পাকা ঘাট পাওয়া গিয়াছে।

মসজিদের দক্ষিণে বহু কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাকা কবরটি সৈয়দ আফজালের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্ভবত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এস্থান মনুষ্যহীন হইয়া পড়ে। বহু পরে আবার মনুষ্য বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। সেজন্য মধ্যবর্তীকালে কেহ এই প্রাচীন মসজিদের খোঁজ পায় নাই।

আরশ নগরে একখানি প্রাচীন কালীন প্রস্তর পড়িয়া আছে। সতীশবাবু বলিয়াছেন যে, কয়েকজন মুসলমান "পুরুষানুক্রমে দুগ্ধাদি দিয়া পাথরখানি পূজা করিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধানের পর জানিয়াছি মুসলমান কর্তৃক পাথর পূজার কথা ঠিক নহে। এখানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় লবণের কারখানা ছিল। এই গ্রামের ধানশায়ের নামক স্থানে ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে পর্যাপ্ত পরিমান ধানের ক্রয় বিক্রয় চলিত।

তালা থানার অন্তর্গত মাগুরা প্রাচীন স্থান। এখানে পীর জঈনউদ্দীন শাহ্ (পীর জয়ন্তী বিকৃত নাম) নামক এক সাধকের দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি খানজাহানের অনুচর নহেন। পীর জইনউদ্দীন শাহ্ এতদঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত সুফী সাধক। লোকে তাঁহাকে বড়পীর বলিয়া অভিহিত করে। ইনি বহু অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার দরগায় অম্বুবাচীর সময় মেলা বসিয়া থাকে।

মাগুরা ছাড়িয়া কপোতাক্ষী বাহিয়া আরও কিছু অগ্রসর হইলে সুজনশাহ গ্রামে সুজনশাহ্ ফকিরের আস্তানা দৃষ্টি পথে পতিত হয়। এই গ্রামে তাঁহার বসতবাটীর চিহ্ন ও বিরাটকায় দীঘি অদ্যপি বিদ্যমান। তিনি খানজাহানের পরে সম্ভবত এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম শাহ্ সুজাউদ্দীন।

কেহ কেহ বলেন প্রতাপাদিত্যের পরভাজ খাঁ নামক জনৈক পাঠান সেনাপতি একটি

মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম হইয়াছে পরভাজপুর। পরভাজ খাঁ নামীয় কোন সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তুর্ক আফগান আমলে সুন্দরবন প্রান্তে সম্ভবত এখানে একটি নৌঘাটি ছিল এবং সেখানেই তৎকালে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

এই মসজিদের সম্পত্তি লইয়া খুলনা জজ কোর্টে মোকদ্দমা হয়, তখন উহার এক দলিল বাহির হইয়া পড়ে। উক্ত দলিল হইতে জানা যায় যে, মুঘল ফৌজদার নুরুল্লা খান পরভাজপুর নিবাসী সৈয়দ কাসিমকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া বাদশাহী জরিপের ৫০ বিঘা জমি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১১০৪ হিজরী ১৯শে রমজান তারিখে দান করেন।

প্রাচীন বুড়ন দ্বীপ ও ঐশ্বর্য মন্ডিত বুড়ন রাজ্যের বর্ধিষ্ণু স্থান ছিল লাবশা। সিলেট ও সোনার গাঁর ন্যায় এখানেও পাঁচপীরের খ্যাতি আছে। তন্মধ্যে মাই চম্পার দরগা সুপ্রসিদ্ধ মোচড়াদাম সাহেবের দরগা, কাজী সাহেবের দরগা এবং থানা ঘাটে বড় মিঞা সাহেব ও তাব সুযোগ্য পুত্রের দরগা উল্লেখযোগ্য।

সম্ভবত বুড়ন রাজ্য ও বাবুলিয়ার পতনের পর তুর্ক আফগান আমলের প্রথম দিকে এখানে ইসলাম প্রচার হয়। লাবশাহ (লবে+শাহ) ফার্সি শব্দ, ইহার অর্থ বাদশার ঠোঁট। কেহ কেহ বলেন এই লবেশাহ হইতে লাবসা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যমতে লবাদশাহ নামক জনৈক ইসলাম প্রচারকের নামানুসারে লাবসা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে এককালে ইসলাম প্রচারের ঢেউ উঠিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

লাবসায় একটি সমৃদ্ধশালী শহর ছিল বলিয়া জানা যায়। এখানে প্রাচীন কালীন বহু অট্টালিকা, কয়েকটি মসজিদ, মাদ্রাসা ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। এখনও থানা ঘাটায় একটি প্রাচীন দীঘি ও মসজিদ আছে। লাবসা, বাবুলিয়া, বাঁশদহ, বাঁকাল, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থান বুড়ন রাজ্যাধীন ছিল। লাবসা গ্রামে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রাস্তা খননের সময় একটি বৃহৎকায় ইমারতের ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকা গর্ভে আবিষ্কৃত হয়। থানাঘাটায় এককালে শাসন কেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায়।

পলাশপোল ও রসুলপুর পীরালী মুসলমানদের বাসস্থান। ১৯৬৬ ইং সালে পলাশপোল গ্রামে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া যায়। এই সমস্ত নিদর্শন এতদঞ্চলে প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে।

শাহ সুলতান বাগদাদীর নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। শাহ মনোয়ার, শাহ আনোয়ার প্রমুখ ইসলাম প্রচারগণ দাস বংশের রাজত্বকালে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বসতবাটীর চিহ্ন লোপ পায়। বহুকাল পরে আবার জঙ্গল আবাদ করার পর এখানে মনুষ্য বসতি স্থাপিত হয়। জঙ্গল অপসারণের পর এই গ্রামের মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়।

প্রবাদ আছে যে, শাহ সুলতান বাগদাদী এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার দেওয়ালের বেষ্টন ৫০'' ইঞ্চি এবং এবং ভিতরকার মাপ ৩৬' স্কোয়ার ফুট। এক কালের মনোরম কারুকার্য খচিত মসজিদ আজিও সেদিনের স্মৃতি বহন করিতেছে।

সুলতানপুর মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক কাজী গয়েশউদ্দীন ইংরেজ আমলে তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। সেকালে বাবুলীয়া, লাবশাহ্, সুলতানপুর ও ধানদিয়ার মধ্যে যাতায়াতের সুন্দর রাস্তা ছিল বলিয়া জানা যায়।

কলারোয়া থানার অন্তর্গত সোনাবাড়ীয়া গ্রামে ৬০' ফুট উচ্চ একটি প্রাচীন মঠ আছে। ইহার ইতিহাস পাওয়া দুস্কর। গোলাকৃতি তিনতলাবিশিষ্ট এই মঠের ভিতর ঘুরানো সিড়ি আছে। সে যুগের ক্ষুদ্রাকৃতি ইষ্টক ও টালি দ্বারা এই মঠ নির্মিত হইয়াছিল। মঠের মধ্যে একটি শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় লিখনী আছে। প্রবাদ মঠের আর একটি তলা মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত আছে। ইহা একটি হিন্দু মঠ। একে শ্যামসুন্দর মন্দির বলা হয়।

খুলনা জেলার তুর্ক-আফগান আমলে বহু হিন্দু-বৌদ্ধ মঠ ছিল বলিয়া জানা যায়। পাইকগাছা থানায় মঠবাড়ী নামে একাধিক গ্রাম আছে। তেরখাদা থানায়ও মঠবাড়ী নামে একটি মৌজা আছে। উহা এখন জয়সেনা গ্রাম নামে পরিচিত। তুর্ক-আফগান আমলের শেষদিকে বৌদ্ধ বা হিন্দুরা এই মঠ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিলে লেখকের পূর্ব পুরুষেরা এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। কিছুদিন পূর্বে ঐ স্থানে খনন কার্য চালাইয়া প্রাচীনকালীন ইট পাওয়া যায়। খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বহু মঠ ছিল। উহার কোন চিহ্ন নাই বলিলে, চলে।

অযোধ্যার মঠ ঃ সুন্দরবনাঞ্চলের পুরাকীর্তি সমূহের মধ্যে অযোধ্যার মঠ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া অছে। এই মঠ কবে কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহার কোন ইতিহাস নাই। এই স্থান এককালে দ্বীপাকৃতি ছিল, উহার নাম ছিল অজুদ্বীপ বা অজুদিয়া এবং এই অজুদিয়া নাম হইতে পরবর্তীকালে অযোধ্যা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা নগরীর সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। এই গগনচুম্বী মঠের উচ্চতা ৬৪'৬'' ফুট বা ৪৩ হাত। ইহার নিম্ন দিকের দৈর্ঘ ও প্রস্থ ২৫'৫'' করিয়া। মঠের ব্যবহৃত ইষ্টকের মাপ ৬''× ২''× ৩''। মঠে ব্যবহৃত ইষ্টক ও টালি সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত এবং এখনও উহা রৌদ্রালোকে ঝক্ ঝক্ করে। এক স্থানে হস্তী পৃষ্ঠে ও পশ্চাতে ধনুক ধারীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। দক্ষিণ প্রাচীরের কার্ণিশের অগ্রভাগে মকরাঙ্কিত আছে। মঠের পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করিয়া ক্ষুদ্রকায় দরজা আছে। স্থানীয় লোকেরা জঙ্গল মধ্য হইতে মঠটি আবিষ্কার করিয়া সরকারের গোচরীভূত করে এবং ১৯০৪ সালের ৭ আইনের (পুরকীর্তি রক্ষা আইন) অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে মঠের জঙ্গলময় ভগ্ন স্থানসমূহ পরিষ্কার করিয়া ২২০০০্ ব্যয়ে উহার মেরামত করা হয়। অযোধ্যা গ্রামের একটি জমি খনন কালে অসংখ্য কারুকার্য খচিত ইট পাওয়া যায় সেইজন্য ঐ জমিকে লোকে ইটের ভই বলে।

মঠের দক্ষিণ দিকের উপরিভাগে পালী ভাষায় 'উদ্দেশ্য তারক নাথ' লিখিত আছে। মঠের ভিতর একটি লম্বাকৃতি গুম্বজ, ১২ ফুট/ ১৩ ফুট উঁচু হইবে। উহার উপরিভাগ ফাঁকা এবং উহার চারিদিকে দেওয়াল বেষ্টিত। সেজন্য উহার ভিতর কি আছে দেখা যায় না। কোদলা গ্রামের পার্শ্বে বলিয়া ইহাকে কোদলার মঠও বলা হয়।

ভৈরব নদী এই স্থানের দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল। এখন উহা একরূপ মজিয়া গিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই স্থানের সন্নিকটে আখাই নগর গ্রামে ভৈরব গর্ভে একখানি জাহাজ ডুবিয়া যায়। অযোধ্যার পার্শ্ববর্তী কাটাখালি গ্রামে একটি বিশালাকৃতি গাব গাছ ও একটি তেতুল গাছ আছে। গাব গাছের বেড় ২০' ফুট শাখা প্রশাখা ১ বিঘা জমি জুড়িয়া বিস্তৃত। তেঁতুল বৃক্ষটির বেড় ৩২' ফুট। এগুলি প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়া আছে।

স্যার মর্টিমার হুইলার প্রণীত গ্রন্থে (Five thousand years of Pakistan) লিখিত আছে "খুলনা-বাগেরহাট রেললাইনের যাত্রাপুর ষ্টেশান হইতে ২$\frac{১}{২}$ মাইল দূরে একটি স্মৃতি মিনার বা মঠ আছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত অংশ বিশেষ হইতে জানা যায় যে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বীয় দেবতা তারক বা ত্রাণকর্তা সম্ভবত ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে ইহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।" "প্রবাদ এই মঠটি প্রতাপাদিত্যের ব্যয়ে তাঁহার দ্বারা পন্ডিত অবিলম্ব সরস্বতীর স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ নির্মিত (সতীশচন্দ্র)।" প্রকৃতপক্ষে এইরূপ কোন প্রবাদের সূত্র পাওয়া যায় নাই।

২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণে বনাঞ্চলে অযোধ্যার মঠের আকৃতি বিশিষ্ট ১০০' ফুট সুউচ্চ "জটার দেউল" অবস্থিত। হান্টার সাহেব তদীয় বিবরণীতে ইহাকে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সতীশবাবু ইহাকে প্রতাপাদিত্যের বিজয় স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করিতে কোশেশ করিয়াছেন। জটার দেউল পাল রাজগণের সময় নির্মিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। মিঃ সুইনহো জটার দেউলকে বৌদ্ধমঠ বলিয়াছেন। বর্ধমান জেলার মেমারীর সন্নিকটে অবস্থিত মন্দির, ২৪ পরগনার জটার দেউল, বাহুলাবার (বাঁকুড়া) সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তূপ, ফরিদপুর জেলার মথুরাপুরের দেউল প্রভৃতি প্রায় একই প্রকার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। ৯৭৫ খৃঃ রাজা জয়চন্দ্র কর্তৃক জটার দেউল নির্মিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদের সূত্র হইতে আরও বলা হইয়াছে যে জটার দেউল বহুলাংশে নষ্ট হওয়ায় এ বিষয় সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরকে কেহ কেহ জৈন মন্দির বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অযোধ্যার মঠ ও জটার দেউল শিখর জাতীয় মন্দির গোষ্ঠির পর্যায়ভুক্ত। উভয়ই বৌদ্ধ মন্দির বা মঠ হইতে পারে।

ভৈরব নদীর আশে পাশে ঃ ভৈরব নদীর আশে পাশে বহু বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ও শহর ছিল। এখনও আছে। এইসব ইতিহাসের টুকিটাকি বর্ণনা করিতেছি।

খুলনা জিলার দক্ষিণাডিহি—পয়োগ্রাম গ্রামে সম্ভবত তুর্ক-আফগান আমলে বর্ণ হিন্দুদের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। খান জাহানের সময় এই গ্রামের জয়দেব ও কামদেব ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান পীরেলী হন। রতিদেব ও শুকদেব এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন সংশ্রব দোষে হিন্দু পীরালী নামে অভিহিত হন। এই খানেই সর্ব প্রথম পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পীরালী ব্রাহ্মণ। তিনি দক্ষিণ-ডিহি গ্রামের মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

শুকদেবের পুত্র কালাচাঁদ ও গৌরদাস। কালাচাঁদ দক্ষিণ-ডিহিতে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাচীন মন্দিরটি এখনও ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। মন্দিরের উপর আগাছা জন্মিয়া যাওয়ায় আমরা উহার ফটো লইতে পারি নাই। গৌরদাসের প্রপৌত্র মনোহর বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি গৌড় সুলতান দায়ুদ খাঁর নিকট হইতে 'লশ্‌কর খাঁ চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোহরের বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি গড়ে একই সঙ্গে এক মণ ভোজ্য দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন। সেই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল 'মুণকে মনোহর'।

সেনহাটি ও মহেশ্বর পাশা প্রাচীন স্থান। তুর্ক-আফগান আমলে এখানে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমাজের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। ভৈরব ও কপোতাক্ষী তীরের অধিকাংশ বর্ণহিন্দুর বসতি স্থাপিত হইয়াছিল মুঘল যুগে। রাজা মানসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বর্ণহিন্দু পরিবার নৈহাটি, মৌভোগ, মূলঘর প্রভৃতি গ্রামে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। মহেশ্বর পাশার প্রাচীন মন্দিরটি অন্যূন ৩০০ বৎসর পুরাতন। সেনহাটীতেও একাধিক মন্দির ও প্রাচীনকালীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেনহাটী বৈদ্য প্রধান স্থান এবং তথায় নিমরায় প্রতিষ্ঠিত বাজার অবস্থিত।

আলাইপুর খুলনা শহরের অদূরে ভৈরব ও আঠারবাকী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাচীন শহর। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এখানে চাঁদের বাজার নামে একটি বাজার ছিল। ইংরেজ আমলের মধ্যভাগে এখানকার একটি ছাপাখানা হইতে মোল্লাআফাতাবউদ্দীন প্রণীত 'আজহার বধ কাব্য' ছাপা হয়। পিঠাভোগ আলাইপুরের সংলগ্ন প্রাচীন গ্রাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ কুশরীগণ এখানে বসবাস করিতেন।

আলাইপুরের সন্নিকটে সামন্তসেনা, খোজাডাঙ্গা, তালিমপুর প্রভৃতি প্রাচীন স্থান। সামন্তসেনা গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন গৌড়ের হিন্দুরাজা সামন্তসেন হইতে ইহার উৎপত্তি। অন্যমতে এই স্থান প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রাম এবং এখানে সীমান্তরক্ষী সেনানিবাস ছিল। এই মতে সীমান্ত সেনা হইতে সামন্ত সেনা হইয়াছে। সামন্তসেনা গ্রামের বিরাটকায় দীঘিটি নদীগর্ভে বিলীন হইয়া অলাইপুরের চরভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই গড় ও দীঘি হোসেন বংশীয় কীর্তি।

তালিমপুর গ্রামে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী বাসিন্দা সুবিখাঁর গড় ছিল। প্রাচীন মানচিত্রে সুবি খাঁর গড়ের কথা আছে। জনৈক ফতে আলীর নামানুসারে ফতেপুর নামকরণ হইয়াছিল। পাঁচ-আনী কাছারী বাড়ীর স্থানে কারবালা নামক স্থান ছিল। সম্ভবত স্থানীয় পাঠান মুসলমানের মহরমের উৎসবের জন্য এই স্থানের নাম কারবালা রাখিয়াছিলেন।

খোজাডাঙ্গা, বা খোঁজাডাঙ্গায় কয়েকটি প্রাচীন কবর পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে একটি শেখপাড়ের বলিয়া লোকের বিশ্বাস। খোজা অর্থ সম্মানী নিকটেই পাথরঘাটা— পাথর অবতরণের স্থান বুঝায়। এখানে হাতী দাঁড়ার রাস্তা এবং দেওয়ান জাঙ্গাল নামে দুইটি প্রাচীন রাস্তার নাম পাওয়া যায়।

লখপুর, পিলজঙ্গ, নোয়াপাড়া, বল্লভপুর প্রাচীন স্থান। এখানে প্রতাপশালী জমিদারেরা বাস করিতেন। এখানে একটি নীলকুঠি ছিল। ইংরেজ লেখকেরা এইজন্য এই স্থানকে লাক্‌পুর (Luck) বা সৌভাগ্যের স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

লখপুরের অদূরে খাজুরা ও জাবুসা (নবীনগর) গ্রামের মধ্যে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের জাহাজ ঘাটা ছিল। ইহা খুলনা শহর সৃষ্টির বহু পুর্বের কথা। তুর্ক-অফগান আমলে এ অঞ্চল বর্ধিষ্ণু এলাকা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বোলতলী ও পিলজঙ্গ গ্রামের মধ্যে একটি স্থানের নাম রণ-খোলার মাঠ। এখানে অতীতে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া থাকিবে।

স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন যে, বোলতলী, পিলজঙ্গ, নোয়াপাড়া, খাজাডাঙ্গা, সামন্তসেনা, কোররী, সুগন্ধী, মধুদিয়া, খানপুর প্রভৃতি স্থান হোসেন শাহের আমলের উন্নত পল্লী। হোসেন শাহের আলাইপুর অবস্থান এবং বাল্যজীবন অতিবাহিত হওয়া সম্পর্কে তাঁহারা একেবারেই নিঃসন্দেহ।

ফুলতলায় মিশর হইতে আগত মিছ্রী দেওয়ান শাহের মাজার অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে মুক্তেশ্বরী গ্রামে একটি বিরাটকায় দীঘি আছে। দীঘির পাড়ে বুড়ো ফকিরের মাজার। লোকে বলে তিনি একজন পীর ছিলেন।

শিল্প এলাকা ও বাগের হাট ঃ খুলনা, দৌলতপুর, খালিশপুর, ফুলতলা, এ জেলার শিল্প এলাকা। খুলনা জেলার প্রধান শহর, ভৈরব তীরে অবস্থিত। এই শহরের প্রাচীনত্ব বলিয়া কিছুই নাই। চার্লি নামক জনৈক ইংরেজ নীল কুঠিয়াল এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। উহা পূর্বে চার্লিগঞ্জ বা সাহেবের বাজার নামে খ্যাত ছিল। খুলনা ষ্টীমার ঘাটের পুর্ব পার্শ্বে চার্লি নির্মিত একতলা বাড়ীটি খুলনা শহরের প্রথম ইষ্টক নির্মিত ইমারত। পরবর্তী বাড়ী সম্ভবত ডেপুটি কমিশনারের বাসভবন।

রেণেলের ডাইরীতে খুলনাকে কুলনা (Culna) বলা হইয়াছে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভৈরবতীরে অবস্থিত এই উন্নতিশীল গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের লোক।

ইংরেজ আমলের একটি কাহিনী এখানে বলিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তখন কোর্ট কাছারীতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও প্রায় সকলেই ইংরেজ ছিলেন। ইংরেজ এস,

ডি, ও বাংলা জানিতেন না। তাঁহাদিগকে পেশকার ও আইনজীবিদের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। খুলনায় একজন ইংরেজ এস,ডি, ও ছিলেন। তিনি কোর্টে আসিয়া সমস্ত দরখাস্ত একদিক দিয়া খাবিজ করিয়া যাইতেন। কোন আইনজীবি নিকটে যাইয়া কিছু বলিলে তিনি তাহার প্রতি দোয়াত নিক্ষেপ করিতেন। খুলনার বিশিষ্ট মোক্তার গদাধরবাবু শেষ পর্য্যন্ত প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন কবিলেন। তিনি এক লম্বা বাঁশ কোর্টে আনিয়া উহার মাথায় দরখাস্ত বাঁধিয়া বাঁশের মাথা উক্ত এস,ডি, ওর এজলাসে উঠাইয়া দিলেন। সাহেব তখন ভীত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলে গদাধরবাবু বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আপনি দরখাস্ত খারিজ করেন এবং দোয়াত নিক্ষেপ করেন তজ্জন্য দূর হইতে বাঁশের সাহায্যে এই দরখাস্ত দাখিল হইল। যাহাতে আইনজীবিদের হাতের কাছে না পান সেইজন্য এই অভিনব উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।" এস, ডি, ও তদবধি কোন খারাপ ব্যবহার করেন নাই।

কে, ডি, ঘোষ খুলনার সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি পৌরসভার প্রথম জনপ্রিয় চেয়ারম্যান। তাহার স্বনামধন্য পুত্র শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আহসান আহম্মদ সাহেব খুলনার করোনেশন হল নির্মাণ করেন।

ডাব্লু, এম, ক্লে খুলনার প্রথম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। খুলনা শহরের ক্লে ট্যাঙ্ক আজিও তাঁর রীর্তি রক্ষা করিতেছে।

খুলনা এখন প্রদেশের প্রধান শিল্প এলাকা বিভাগীয় প্রধান শহর। বিভাগীয় কমিশনারের অফিস বয়রা নামক স্থানে অবস্থিত। খুলনার শিপইয়ার্ড বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠান ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়।

জনৈক দৌলত খাঁর নামানুসারে দৌলতপরের নামকরণ হইয়াছে। দৌলতপুর পাট ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর প্রাচীন কলেজ বিদ্যমান।

১৯৫৪ হইতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে গোয়াল পাড়া-খালিশপুরে নিউজ প্রিন্ট, গোয়ালপাড়া বিদ্যুতকেন্দ্র, পিপলস ও ক্রিসেন্ট জুটমিল ও অন্যান্য বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। খুলনার মধ্যে খালিশপুরই প্রধান শিল্প এলাকা। দৌলতপুর ও খালিশপুর ভৈরব নদীতীরে অবস্থিত।

খালিশপুর শিল্প শহর বিভাগ পূর্বকালে হালকা জনবসতি ও পানের বরজ আম কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বাগিচা ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল। কলসী কাঁখে গৃহ বধূরা ভৈরবতীরে স্থানের ঘাটের সৌন্দর্য বর্ধন করিত। এখন উহা ধুম নগরীতে পরিতন হইয়াছে।

বাগেরহাট নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এখানে খানজাহানের বৃক্ষলতা শোভিত বাগিচা ছিল। বাগ ফার্সি শব্দ উহার অর্থ বাগিচা এবং এই বাগের মধ্যে হাট বসিত বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে বাগেরহাট। খানজাহানের নিজস্ব কোন বাগিচার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেইজন্য এই মত গ্রহণ যোগ্য নহে।

খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা ওমালী আরও দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন। বাকেরগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা আগা বাকেরের জমিদারী বাগেরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগা বাকের প্রতিষ্ঠিত শহর বলিয়া উহার নাম হয় বাকেরহাট এবং তাহা হইতে বাগের হাটে রূপান্তরিত হইয়াছে। ওমালী সাহেব বর্ণিত অন্যমতটি হাস্যাস্পদ। কথিত আছে যে, এই অঞ্চল সুন্দরবন অধ্যুষিত স্থান এবং ব্যাঘ্রের আনাগোনায় ভরপুর ছিল। ব্যাঘ্রাধিক্যের জন্য এই স্থানের নামকরণ হইয়াছিল বাঘেরহাট এবং উহা হইতে বাগেরহাটে দাঁড়াইয়াছে। ইহার কোনটিই ঠিক নহে।

অন্যমতাবলম্বীরা বলেন যে, এই স্থানের পার্শ্বদিয়া চিরদিন নদী প্রবাহিত ছিল। নদীর একটানা পথকে বাঁক বলা হয়। স্থলপথে যেমন মাইল বা ক্রোশ হিসেবে পথের হিসাব করা হয় তেমনই নৌকার মাঝিরা বাঁক হিসাবে নদীপথে যাতায়াতের হিসাব রাখে। দূরবর্তী স্থানের লোকেরা বাঁকের মাথায় বা শেষপ্রান্তে আসিয়া হাট করিত এবং সেইজন্য এই হাটকে বাঁকের হাট বলা হইত। বাঁক হইতে বাঁকেরহাট এবং তাহা হইতে বাগেরহাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

বাগেরহাট খুলনার অন্যতম মহকুমা শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। খুলনা শহর হইতে এই স্থান ২০ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

ইতিহাসের টুকিটাকি ঃ সাতক্ষীরার পূর্বনাম ছিল সাতঘরিয়া। ইহা মহকুমা শহর। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি এবং একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ অবস্থিত। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের শেষ দিনে এখানে বিরাট মেলা হয়। ইহা গুড়পুকুরের নামে প্রসিদ্ধ।

বড়দল সুন্দরবন অঞ্চলের বৃহত্তম বাজার। সপ্তাহের প্রতি রবিবার ভোর হইতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত হাট বসে। ইহা কপোতাক্ষী নদী তীরে অবস্থিত। চাঁদখালি যশোরের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হেংকেল প্রতিষ্ঠিত সুন্দরবনস্থ শহর। আশাশুনী-শোভানালী ও আশাশুনী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। এখানে একটি থানা, বাজার ও হাই স্কুল আছে। গুণকরকাটি গ্রামে সুফীসাধক পীর মওলানা আবদুল আজিজ সাহেবের মাজার অবস্থিত। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে এখানে উরস হয়। তালায় থানা ও বাজার অবস্থিত। এখানে মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট মস্‌জিদ আছে। ইহার অদূরে তেতুলিয়া গ্রামের প্রাচীন মস্‌জিদ সুন্দর কারুকার্য খচিত এবং চমৎকার স্থাপত্যশিল্পেরে নিদর্শন। পাটকেলঘাটা একটি ব্যবসায় কেন্দ্র। চুকনগর পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র। ১৮৭৬ সালে দেবহাটায় একটি মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের পূর্ব নিবাস এই গ্রামে।

কালীগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জ ব্যবসায় কেন্দ্র। ইহার অদূরে সীমান্ত চেকপোষ্ট বসন্তপুর। পারুলীয়া গ্রামে সাগর শাহের প্রকান্ড দীঘি অবস্থিত। নলতাপীর খান বাহাদুর আহসানউল্লা সাহেবের জন্মস্থান। এখানে তাঁহার মাজার অবস্থিত। দুদলী গ্রামের তারার বাঁশতলা ঐতিহাসিক স্থান। বাড়ুলী বৈজ্ঞানিক আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি।

এ জেলার বাগেরহাট কলেজ খুলনা কটন মিল প্রভৃতির সহিত বাংলার এই কৃতি সন্তানের পুন্য স্মৃতি বিজড়িত আছে। খুলনা পৌরপার্কে তাঁর চিতাভস্ম রক্ষিত আছে।

সাধু কপিলেশ্বরের নামে স্থানের নামকরণ হয় কপিলমুনি। কপোতাক্ষী নদীতীরে একটি বটবৃক্ষের নীচে এবং কালীবাড়ীর সামনে কপিলমুনির আশ্রম আছে। ইহা সুন্দর বনাঞ্চলের অতীব প্রচীন কালী মন্দির।

ইংরেজ আমলে বিনোদ সাধু নামে এক বৈশ্য জাতীয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বহু অর্থব্যয়ে শ্বেত প্রস্তর দ্বারা এক দেবমন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহার ছেলেরা বোম্বে হইতে ভাস্কর আনাইয়া ৮০০০ মূল্যের মাত্র একখন্ড প্রস্তর দ্বারা তাঁহার মূর্তি নির্মাণ করেন। বিনোদ সাধুর দানে কপিলমুনি শহর ধন্য। তিনি বিনোদগঞ্জ স্থাপন করিয়া উহার আয় সাধারণের জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন;

গ্রহ নেত্র নেত্র চন্দ্র (১৩৩৯)
পৌষের অর্ক (রবিবার) দিবসে

× × × ×

ভাবী বংশধর মোর কেহ না পাইবে ইহার ভবিষ্য আয়-হইবে ব্যয়িত পল্লীমঙ্গল তরে যে সদানুষ্ঠান পিতৃ স্মৃতি হেতু করেছি স্থাপন আর প্রতিবেশী থাকিবেক সুখে,যদি উন্নতি কামনা ইহা করে অহরহ।"

পাইকগাছায় থানা ও কলেজ আছে। এখানকার মেহের মুছল্লী নামক একজন ডাকবাংলার চৌকিদার ঝাটার কাঁটি বিক্রয় করিয়া ৪০০০ চারি হাজার টাকা সঞ্চয় করে। সে আজীবন সঞ্চিত এই অর্থ শিক্ষাভান্ডারে দান করিয়া দেয়। তাহার দানশীলতার উল্লেখ করিয়া স্যার পি, সি, রায় (লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াও) আপসোস করিয়া বলিতেন, "মেহের মুছল্লীর মত দাতা আমি নহি, সে তাহার সঞ্চিত যথাসর্বস্ব দান করিয়াছে আর তদরূপ দান করিতে পারি নাই।" সত্যই মেহের মুছল্লী মহৎ।

আজোগাড়া ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান ছিল। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে পরাস্ত হইয়া শাহ শুজা যখন আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তাঁহার দলীয় পাঠান মুহম্মদ এনায়েত খান বহুদিন এই গ্রামের জঙ্গলময় স্থানে আত্মগোপন করিয়া বসবাস করেন। তেরখাদায় থানা ও একটি কলেজ আছে। মোল্লাহাট মধুমতি নদীতীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান। গণিত শাস্ত্রবিদ ডক্টর আজিজুল হকের জন্মভূমি। চিতলমারী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের কাছারী বাড়ী অবস্থিত। যাত্রাপুর রথের মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। ফকিরহাট পূর্বে চিনি প্রস্তুতের কারখানা ছিল। ইহা খুলনা-বাগেরহাট রেললাইনের পার্শ্বে একটি প্রসিদ্ধ বাজার। একজন দরবেশ ফকিরের নামনুসারে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। মৌভোগে প্রাচীন কালীন একটি দীঘি আছে। দীঘির পাকাঘাটে লিখনী আছে। এই পল্লীতে একসময় বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মোরেলগঞ্জে প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র অবস্থিত। কদম রসুলের

পাড় চিংড়ীখালির সন্নিকটে সেলিমাবাদ পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন দীঘি ছিল, উহা মজিয়া গিয়াছে। ফকিরের তকিয়ায় কালাচাঁদ ফকির নামে একজন দরবেশ ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় ফকিরের তকিয়া। বর্তমান নাম বারুইখালি।

কুশুলিয়ায় বিরাটকায় গোহাট অবস্থিত। কুশুলিয়া ও গোবিন্দপুরের চৌরাস্তায় একটি বিশালকায় বটগাছ আছে। এই বুড়ো বটগাই যেন দ্বাপর যুগের সাক্ষীস্বরূপ দন্ডায়মান। এমন স্নিগ্ধ ও আরামদায়ক বিশ্রামস্থল আর কোথাও নাই। লোকে সেজন্য উহার নাম দিয়াছে জিরনগাছা বা জিরনতলা। বৃক্ষটি এত সুপ্রাচীন যে, উহার কোন মূল কান্ড দৃষ্ট হয় না। শিকড়ের উপরই গাছ দাঁড়াইয়া আছে। ইহার সঙ্গে জড়িত আছে অসংখ্য কিংবদন্তী।

সুন্দরবনাঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ বাজার নওবেকী। ইহা সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। চালনায় একটি বড় বাজার অবস্থিত। এই সমস্ত বাজারে ধান্য চাউল ও সুন্দরবনের পণ্য সম্ভার বিক্রয় হয়। সুন্দরবনের পার্শ্বে ভাসমান বন্দর মংলা, রামপাল থানার মধ্যে পশর নদীতীরে অবস্থিত। এখানে একটি আধুনিক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিল অঞ্চলের কথা ঃ বাকেরগঞ্জ ও যশোরের ন্যায় খুলনায়ও অসংখ্য বিল আছে। পূর্বে এই সমস্ত বিলে বারমাস পানি ভর্তি থাকিত। সেজন্য মৎস্য ভিন্ন সেখানে অন্য কোন ফসল পাওয়া যাইত না। এখন বহু বিল আবাদ হইয়াছে। ঐ সমস্ত বিল ফাল্গুন চৈত্র মাসে শুকাইয়া গেলে ধান্য ফসল উৎপন্ন করার পক্ষে সুবিধা হয়। উত্তর খুলনার এই ধরণের বিলে মৎস্য ও ধান্য দুইই পাওয়া যায়।

ভূতের বিলে এখন বোরো ও রায়দা ধান ফলে। বিল বাসুয়াখালির মধ্যে আমি পুর্বে নলখাগড়ার জঙ্গল দেখিয়াছি। উহা এখন আবাদ হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বিলে পুকুর খনন করিলে বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া যায়। এই সব স্থানে সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক কারণেও বিলের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে।

উত্তর খুলনায় পাস্থামারী ও ভূতের বিলে কুমীর থাকিত। স্থানীয় লোকের নিকট কুমীর ধরার গল্প শুনিয়াছি। একদিন কানু নামক একটি লোককে পাস্থামারীর বিলে হাত কামড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। লোকটির অন্য হাতে দা ছিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া দা দিয়া নিজের হাত কাটিয়া জীবন রক্ষা করে। লোকে তাঁহাকে হাতকাটা কানু বলিত।

বিল ডাকাতিয়া এ জেলার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিল। এখানে এককালে একটি বড়নদী ছিল। নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা নলখাগড়া ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সুন্দরবন যাত্রীদের নৌকায় প্রায়ই এখানে রূপসা নদীর ন্যায় ডাকাত পড়িত। এই জন্য বিলের নামকরণ হইয়াছে 'ডাকাতিয়ার বিল'। এখনও মধ্যে মধ্যে মরানদীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ডাকাতিয়া নামে একটি গ্রাম আছে।

ডাকাতিয়ার বিলের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে ব্যাঘ্র ও বুনো মহিষ বাস করিত। নদীতে কুমীর থাকিত। নিকটবর্তী গ্রামের গরু মাঠে গেলে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল হইতে ব্যাঘ্র আসিয়া কোন কোন সময় গরু ধরিত। একদিন মশিয়ালী গ্রামের একটি শক্তিশালী গরুকে একটি ছোট ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিলে গরুটি বাঘের পেটে শিং ঢুকাইয়া উক্ত বাঘকে বাড়ী লইয়া আসে। ডাকাতিয়ার বিলের জঙ্গল হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে বয়ার (বুনো মহিষ) আসিয়া ফসল নষ্ট করিত। গ্রামের লোকে দলবদ্ধভাবে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বুনো মহিষ তাড়া করিত।

ডাকাতিয়া বিলের মধ্যে দুইটি বড় পুকুর ও একটি বাড়ী আছে। লোকে উহাকে 'গোরা ডাকাতের বাড়ী' বলিয়া থাকে।

দক্ষিণ খুলনার বিল অঞ্চলে ফাল্গুন চৈত্র মাসে জোয়ারের সময় নোনাপানি প্রবেশ করিলে সে বৎসর সেখানে আর ধান্য জন্মিবে না। দক্ষিণ খুলনার জমিতে বৎসরে একবার মাত্র আমন ধান্য ফলে। পক্ষান্তরে উত্তর খুলনার একই জমিতে একাধিক ফসল ফলিয়া থাকে। উন্মুক্ত বিলে ধান্য না হইলে মালিয়া নামক এক প্রকার পাতা জন্মে। উহার দ্বারা মাদুর প্রস্তুত হয়। মালিয়া দ্বারা দক্ষিণ-খুলনার বহু দরিদ্র পরিবার জীবিকা অর্জন করে। আবাদানীব বিল, দাঁত-ভাঙ্গার বিল, বল্লী বিল এবং সুন্দরবনের সন্নিকটে আবাদ চণ্ডিপুরের বিল প্রসিদ্ধ। পূর্বাঞ্চলে কেন্দুয়া ও ভুটে মারীর বিল খুব বড়।

কাব্য ও সাহিত্য ঃ বাকেরগঞ্জের ন্যায় খুলনায়ও ধান্যের খ্যতি ছিল। এখানকার শ্যামযমান কুঞ্জকানন কবি সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এ জেলা কত কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের—সূতিকাগার তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

কবিদের মধ্যে সেনহাটীর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ফার্সি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইরানের মরমী কবি হাফেজ ও শেখ সা'দীর কাব্যের ভাবধারা লইয়া তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'সদ্ভাব শতক' প্রকাশ করেন। বাংলার ঘরে ঘরে এক সময় এ কাব্যের আদর ছিল।

কাজী ইমদাদুল হক পাইকগাছা থানায় গদাইপুর গ্রামের অধিবাসী। আবদুলল্লাহ্ এবং নবী কাহিনী তাঁর দুইখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। সাহিত্যের তুলাদণ্ডে 'আবদুল্লাহ' শরৎচন্দ্রের "পল্লী সমাজের" সঙ্গে একই আসনে সমাসীন করা যাইতে পারে।

যশোরের মুন্সি মেহেরুল্লাহ, মুন্সি জমিরুদ্দীন প্রমুখ যে জাগরণী বাণী প্রচার করেন তাহারই আদর্শে 'সুধাকর দলের' সৃষ্টি হয়। এই দলের অন্যতম প্রধান ছিলেন বাঁশদোহার মেয়রাজউদ্দীন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান ভুলিবার নহে। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

নাট্যজগতে সচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁব বিখ্যাত নাটক নবাব সিরাজউদ্দৌলা। সফিউদ্দীন এককালের আর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাঁর দেবগণের মর্তে আগমন, দু'টি ভগ্নি ও হযরত আলীর জীবনী গ্রন্থত্রয় প্রসিদ্ধ।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও একজন সুসাহিত্যিক। তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে পুরামাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কয়েকখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জীবন সায়াহ্নে খুলনার এক সুধি সমাবেশে তিনি বলিয়াছিলেন;

"আমি আজ জীবন নদীর তীরে বসিয়া খেয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমরা সত্যকে বরণ করিয়া লও, জীবনের যাত্রাপথ কোন দেশে কোন কালেই কুসুমাস্তীর্ণ নহে, উপবন্ধুল বন্ধুর জীবন পথে কত বাধাবিঘ্ন আসিবে তাহাতে বিচলিত হইওনা, সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে একদিন না একদিন জীবনের লক্ষস্থলে পৌঁছিতে পারিবে।"

আলহাজ্জ্ব আহসানউল্লা কর্মবীর ও ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ ইসলাম ও আদর্শ পুরুষ, হেজাজ ভ্রমণ History of the Muslim world ইত্যাদি। কাজী আনোয়ারুল কাদির ও অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন ও জেলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক। কাজী আকরক হোসেন কবি ছিলেন। তাঁর 'ইলামের ইতিহাস বিখ্যাত গ্রন্থ।

সতীশচন্দ্র মিত্র এ জেলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। যশোর খুলনার ইতিহাস (দুই খন্ডে সমাপ্ত) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী খুলনায় তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। লায়লা মজনু, সিরি ফরহাদ, শহীদ তিতুমীর, প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। অনুসন্ধান বিশারদ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

বাঁশদোহা নিবাসী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এ জেলার স্বনামধন্য সাহিত্যিক। সাহিত্য সাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। ছোটদের হযরত মোহাম্মদ, মরুভাষ্কর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার লেখনী আদর্শ ভিত্তিক এবং সৃষ্টিধর্মী।

সরুলীয়া নিবাসী মৌলভী আবদুল ওয়ালী কয়েকখানি বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। কলিকাতায় তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হয়। ১৯২৫ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

খুলনার পাকিস্তান ভুক্তি ঃ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস পার্টি বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ মানিয়া লয়। বঙ্গদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ঐ সালের ৩রা জুনের ঐতিহাসিক ঘোষণায় পাকিস্তানভুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাকে সাময়িক বিভাগ (National Division) বলা হয়। খুলনা জেলা সামান্য মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য হিন্দুস্থানভুক্ত হইল। মুসলীম জনসংখ্যা ছিল শকতকরা ৪৯ । এই সংবাদে খুলনার মুসলিম সমাজে নিদারুণ আঘাত লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ আশায় বুক বাঁধিয়া সম্মিলিতভাবে অচিরাৎ প্রত্যেকেই কর্মতৎপর হইয়া উঠিল।

জুন ঘোষণার অব্যবহিত পরে বাউন্ডারী কমিশনে মোকদ্দমার তদবীর করার জন্য এখানে বাউন্ডারী কমিটি গঠিত হইল। লেখক ঐ কমিটির সম্পাদক হিসেবে এ ব্যাপারে

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক স্মারকলিপি খুলনাকে পাকিস্তান ভুক্তির দাবী জানাইয়া কমিশন সমীপে দাখিল করা হয়। উহাতে খুলনার ভূ-তত্ত্ব, সুন্দরবন, নদ-নদী এবং যশোর জেলার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া ইহাকে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে জোর দাবী করা হয়।

কলিকাতার প্রাসাদোপম ঐতিহাসিক অট্টালিকা বেলভেডিয়ার হাউস। পাকিস্তানের সপক্ষে দুইজন মুসলিম ও ভারতের পক্ষে দুইজন হিন্দু জজ বিচারে বসিলেন। স্যার সাইবিল র‍্যাডক্লিফ এই কমিশনের চেয়ারম্যান। খুলনার পক্ষে এডভোকেট ওয়াসিম, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও হামিদুল হক চৌধুরী সওয়াল জবাব করিলেন। ১৫ই আগষ্টের মধ্যে রায় বাহির হইল না। ফলে সমগ্র খুলনা জেলায় হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা দিবস পালিত হইল। খুলনার বুকে হিন্দুস্থানী পতাকা উড্ডীন হইল ১৫ই আগষ্টে।

এদিকে খুলনার জাগ্রত মুসলিম সমাজ কায়েদে আজম, র‍্যাডক্লিফ ও মাউন্টব্যাটেন সমীপে অসংখ্য টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। একমাত্র দাবী খুলনার পাকিস্তানভুক্তি। শুনানী শেষে শেরে বাংলা একদিন বরিশাল পথে আমাদের গোপনে বলিয়া গেলেন যে, উভয় পক্ষের ৪ জন জজই খুলনাকে পাকিস্তানভুক্তির সোপারিশ করিয়াছেন। উক্ত ৪ জন হাইকোর্টের জজ হইলেন বিচারপতি এ, এস, এম, আকরম, বিচারপতি এস, এ, রহমান, বিচারপতি বিজন মুখার্জি ও বিচারপতি সি, সি, বিশ্বাস।

খুলনার ছাত্রযুবক জনতা এই সময় অতিমাত্রায় কর্মতৎপর ছিলেন। মসজিদে মসজিদে ঘরে ঘরে সর্বত্র প্রার্থনা, দোয়াদরূদ পাঠ চলিত। মুসলমানদের ঘাড়ে যেন রোজকিয়ামত। এদিকে হিন্দু সমাজ আমাদের প্রচেষ্টার কোনই গুরুত্ব দিলনা। ১৮ই আগষ্ট ঈদের দিন ভোরবেলা র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে জানা গেল সমগ্র খুলনা জেলা পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে। খুলনার হিন্দুসমাজ বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইল। মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। ইহাই খুলনার পাকিস্তানভুক্তির সার কথা।

ইংরাজি গ্রন্থপঞ্জি

প্রমাণ-পঞ্জি (Bibliography)

1. *Imperial Gazetteer of India*—(Jessore, Khulna and Bakerganj portion)—W. W. Hunter
2. *Ancient Geography of India*—Cunninghum, 1924.
3. *The Indian people*—Hurlton.
4. *Murrays Handbook*—India. Burmah and Ceylon—10th Edn. 1918.
5. *Man Eaters of Sundarbans*—Tahwar Ali-1961.
6. *History of Bengal,* Charles Stewart M.A.S—1903.
7. *History of Bengal,* vol, I —R. C. Majumder (Dhaka University)
8. *History of Bengal*, vol, II —sir Jadunath Sarker (Dhaka University).
9. *Geography and History of Bengal*—H. Blockman.
10. *History of Bakerganj*—H Beverege B.C.S-1876.
11 *Revnue History of Sundarbans*—F. E. Pergitter.
12. *Khulna Settlement*—L. R. Faucus I. C. S—1927.
13 *Report on Jessore*—James Westland.
14. *Khulna Gezetteer*—L S. S. O Mally [I. C S —1914.
15. *Jessore Gezetteer*—L. S. S. O Mally [I. C. S —1912.
16. *24 Parganas Gezetteer*—L. S. S O Mally [I. C. S —1914.
17. *Dhaka Gezetteer*—B. C. Allen I. C. S 1922.
18. *Nadia Gezetteer* I H. E. Garrett I. C. S.1910.
19. *Bekerganj Gezetteer*, J. A. Jack I C. S 1918.
20. *Report on Jessore, Faridpur & Bakerganj*—Col. Gastril.
21 *Antiquities of Sundarbans—1929,* (Varendra Research Society).
22 *Antiquities of Sundarbans—1930,* (Varendra Research Society)
23. *Antiquities of Sundarbans—1931,* (Varendra Research Society).
24. *A Short History & Ethnography of Cultivating Pods* (Bengali)—Mahendranath Karan, 1919
25. *Social History of the Muslims in Bengal*—Dr. M A. Kareem (Asiatic Society of Pak)—1959.
26. *Hussain Shahi Bengel*—Dr. M. R. Tarafder 1965.
27. *Social & Cultural. History of Bengal*—Dr. M. A. Rahim
28. *Reaz-us Salatin, Ghulam Hussain Salim* (Tr. A. Salam).
29. *Tabakat-i-Nasiri*, Minhaj-i-Seraj (Tr. Raverty).
30. *Muntakhab-ut-Tawarikh*—Badauni, Abdul Quader.
31. *Ain-i-Akbari*—Abul Fazal— (Tr. Gladwine).
32. *Travels of Ibn Batuta* (Rehala) —H. A. R. Gibb.
33. *Tarikh-i-Ferozshahi*—Zia barani (Edt. S. A. Khan Saheb).
34. *Palas of Bengal*—R. D. Banerjee.

35. *Hinduism & Buddism*—vol. II—Elliot.
36. *On Yuan Chwang*—Watters.
37. *Baharistan-i-Ghaibi*—Mirza Nathan (Tr. M. I Borah).
38. *Tarikh-i-Firishta*—Firishta—(Tr. Jonn Briggs).
39 *Studies in Indian History*—Elliot.
40. *Advanced History of India*—Majumder, Roy Choudhury & Dutt.
41 *Muslim rule in India*—Dr. A. B. M. Habibullah.
42 *History of Muslim Rule in India*—Iswari Prosad.
43. *Cambridge History of India*—Edt by Sir Woolsay Haigg—1928
44. *Inscriptions of Bengal*—vul IV—Shamsuddin Ahmed.
45. *Dhaka—A Record of Changed Fortune*—A H Dani.
46. *Five Thousand Years of Pakistan*—Sir Mortimur Whiller.
47. *Muslim Architecture in Bengal*—A. H. Dani.
48 *Gour—Its runis & Inscriptions*—I. H. Ravenshaw.
49. *Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*—Nalini Kanta Bhattasali.
50 *Census Report*—Edt. by Mr. Porte 1931.
51. *Census of Pakistan* (Jessore) 1961.
52. *Census of Pakistan* (Bakerganj) 1961.
53. *Census of Pakistan* (Khulna) 1961
54. *Life and Conditions of the People of Hindustan (A. D. 1200-1550)*—Kunwar Muhammad Ashraf.
55. *Indian Mussalmans*—W. W. Hunter.
56. *Sufism*—Margarett Smith.
57. *Preaching of Islam*—T. W. Arnold.
58. *Influence of Islam on Indian Culture*—Tarachand.
59. *History of Ethnology, I. A. S B. New Series. vol. XVII*—Stepleton
60. *Historiee—Des—Indes Orientales—Chap. XXV (1610)*—Lep pierre Du—Jarric.
61. *Relatio Historica De—Rebus in India Orientaies (1598)*—A. R. P. Nicalao.
62. *Portugeese in Bengal*—I. I. A. Campos—1919.
63. *Magh Raids in Bengal*—J. M. Ghosh.
64. *East India Chronicle*—(1758).
65 *Indian Affairs Bernier.*
66. *Good Old Days of Hon'ble John Company.* Vol II.
67. *Studies in Mughal India—Sir Jadunath Sarker.*
68. *The Muslim Rule in India*—V. D. Mohajan M. A.
69. *On the Bara Bhuyas of Eastern Bengal*—James Wise.
70. *Annals of Rural Bengal*—W. W. Hunter.
71. *Tawarikh-i-Bangla* (Tr, Gladwine, 1888).
72. *Romance of an Eastern Capital*—Bradly Bart—(Tr.Rahimuddin Siddiqui).
73. *Early Revenue History of Bengal.* —F. D. Ascoli.
74. *The Tribes and Castes of Bengal*—H. H. Rizvi.
75. *Social History of East Pakistan*—Kamruddin Ahmed.

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি

১। *যশোর খুলনার ইতিহাস ১ম খন্ড*—সতীশ চন্দ্র মিত্র—১৩২১
২। *যশোর খুলনার ইতিহাস ২য় খন্ড*—সতীশ চন্দ্র মিত্র—১৩২৯
৩। *বাংলার ইতিহাস—(আদি পর্ব)*—নীহার রঞ্জন রায়
৪। *বাংলার ইতিহাস ১ম ভাগ*— রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস*—নগেন্দ্র নাথ বসু
৬। *বঙ্গের ইতিহাস—পীরালীকান্ড*—ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান* (এম, এন, রায়)—অনুবাদক,—অধ্যক্ষ আবদুল হাই
৮। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*—অচ্যুৎ চরণ চৌধুরী
৯। *বাংলার পুরাবৃত্ত*—পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। *বিশ্বকোষ*—নগেন্দ্রনাথ বসু
১১। *স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*—সুখময় মুখোপাধ্যায়
১২। *হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*—মুর্তজা আলী
১৩। *মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*—মওলানা আকরম খাঁ
১৪। *বাংলা সাহিত্যের কথা*—দ্বিতীয় খন্ড—ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
১৫। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*—প্রথম ভাগ—গোপাল হালদার
১৬। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*—দ্বিতীয় ভাগ—গোপাল হালদার
১৭। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*—ডক্টর আনিসুজ্জামান
১৮। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*—দীনেশ চন্দ্র সেন
১৯। *বঙ্গে সুফী প্রভাব*—ডক্টর এনামুল হক
২০। *পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো*—চৌধুরী সামসুর রহমান
২১। *পূর্ব-পাকিস্তানের সুফী সাধক*—গোলাম সাকলায়েন
২২। *কাব্যে আমপারা*—কাজী নজরুল ইসলাম
২৩। *পীর খানজাহান আলী*—শেখ আবদুল আজিজ
২৪। *পীর খানজাহান আলী*—পশুপতি ভট্টাচার্য
২৫। *তাজকিরাতুল আউলিয়া*—মোহাম্মদ সামসুল হক
২৬। *বায়জিদ বোস্তামির সংক্ষিপ্ত জীবনী*—মৌলবী নুরুল কবীর নদভী
২৭। *সুফী কাহিনী*—এ, এফ, এম, আবদুল জলিল, ৬ষ্ঠ সংস্করণ
২৮। *মুসলিম সংস্কৃতি*—এ, এফ, এম, আবদুল জলিল, ৬ষ্ঠ সংস্করণ
২৯। *হযরত খানজাহান আলী*—এ, এফ, এম, আবদুল জলিল, ৬ষ্ঠ সংস্করণ
৩০। *ভোলগা থেকে গঙ্গা*—রাহুল সাংকৃত্যায়ন—১ম সংস্করণ
৩১। *বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ*—জহরলাল নেহেরু
৩২। *ভারতের দেব দেউল*—জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ—১৯৪১ প্রকাশক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৩। *সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী*—হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন

৩৪। *সুন্দরবনে আরজান সরদার*—শিবশঙ্কর মিত্র
৩৫। *বাংলার ভ্রমণ—প্রথম খন্ড*—রেলওয়ে প্রচার বিভাগ
৩৬। *বাংলার ভ্রমণ—দ্বিতীয় খন্ড*—রেলওয়ে প্রচার বিভাগ
৩৭। *বার ভুইঞা*—মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী
৩৮। *প্রতাপাদিত্য*—নিখিল নাথ রায়
৩৯। *গাজী কালু চম্পাবতী কন্যার পুঁথি*—১৯৫০
৪০। *বোনবিবি জোহরা*—পুঁথি
৪১। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*—দীনেশ চন্দ্র সেন
৪২। *চৈতন্য মঙ্গল*—বৃন্দাবন দাস
৪৩। *চৈতন্য ভাগবৎ*—ঐ
৪৪। *চৈতন্য মঙ্গল*—জয়ানন্দ
৪৫। *চৈতন্য চরিতামৃত*—শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ
৪৬। *মনসা মঙ্গল*—বিজয় গুপ্ত
৪৭। *আত্মচরিত*—আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
৪৮। *বাংলা ইতিহাস*—২য় ভাগ—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—
৪৯। *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*—নিখিল নাথ রায়
৫০। *ভারতচন্দ্র-শ্রী মদনমোহন গোস্বামী, সাহিত্য একাদেমী, নিউ দিল্লী-১৯৬১*
৫১। *অন্নদামঙ্গল*—ভারতচন্দ্র
৫২। *প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত*—শ্রী সত্যচরণ শাস্ত্রী—১৩০৩
৫৩। *রাজা প্রতাপাদিত্য*—হরিশ চন্দ্র তর্কালঙ্কার—১৮৫৬
৫৪। *বউ ঠাকুরাণীর হাট*—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৯৫৭ (পুনর্মুদ্রন)
৫৫। *পীব খাঞ্জা*—এম, কে, আলী—১সং; সাতগড়া, রংপুর
৫৬। *বাকলা*—রোহিনী কুমার সেন—১৯১৫
৫৭। *চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস*—বৃন্দাবন চন্দ্র পুততুন্ড—১৩২০
৫৮। *চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস*—বাবু ব্রজ সুন্দর মিত্র
৫৯। *পাগলা কানাই*—ডক্টর মজহারুল ইসলাম
৬০। *সিরাজউদ্দৌলা*—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—১৩৬৫
৬১। *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—১৯৬৫
৬২। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*—শিবনাথ শাস্ত্রী
৬৩। *নীল দর্পণ*—দীনবন্ধু মিত্র—পঞ্চম মুদ্রণ—১৩৬৬
৬৪। *কবি কঙ্কন*—চণ্ডি (চণ্ডি কাব্য)—কবি কঙ্কন
৬৫। *নোয়াখালীর অবদান*—অধ্যাপক খায়রুল বাশার
৬৬। *বাংলার ইতিহাস*—নবাবী আমল—কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৭। *সিয়ারউল-মুতাক্ষেরিণ*—গোলাম হোসেন তবতবাই, অনুবাজ-হাজী মোস্তফা

৬৮। *হকিকাতে মুসলমানে বাংলা*—দেওয়ান ফজলে রাব্বি, অনুবাদক—আবদুর রাজ্জাক

৬৯। *প্রবন্ধ বিচিত্রা*—সৈয়দ মুর্তজা আলী—১৯৬৭

৭০। *নীল বিদ্রোহ*—প্রমোদ সেনগুপ্ত

৭১। *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১ম খন্ড*—সুপ্রকাশ রায়—১৯৬৬

৭২। *ঐতিহাসিক অভিধান*—মোহাম্মদ মতিওর রহমান

৭৩। *মহাস্তান, ময়নামতি, পাহাড়পুর*—ডক্টর নাজিম উদ্দীন

৭৪। *পূর্ব পাকিস্তানের স্থাপত্য*—ঐ

৭৫। *পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ*—এ, এফ, এম আবদুল জলিল

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে ঃ

1. *B. L. College Library, Daulatpore,* Khulna.
2. *Dist. Bar Association Library*, Khulna.
3. *Collectorate Library*, Khulna.
4. *Library of the Archeological Dept.* Lalbag Fort, Dhaka.
5. *Dhaka Museum & Library*, Dhaka.
6. *Varendra Research Society & Library*, Rajshahi
7. *Library of the Royal Asiatic Society of Bengal*, Calcutta.
8. *Bengali Academy Library*, Dhaka.
9. *Girls' College Library*, Khulna.
10. *Library of Jessore Institute*, Jessore.
11. *Personal Library of Late Principal A. D. Sinha, Begati*, Khulna
12. *Public Library of Khulna.*
13. *Library of Haji Mohsin High School*, Daulatpur, Khulna.
14. *Collectorate Library*, Bakerganj.
15. *Judges' Court Library*, Khulna.
16. Personal Library of the Author at Noor Manzil, Khulna.

পত্র পত্রিকা

1. *Pakistan Observer*
2. *Pakistan Times*
3. *The Statesman*
4. *Morning News*
5. *The Wave*
6. *Journal of the Asiatic society of Bengal.*
7. *Modern Review*

১। *দৈনিক পাকিস্তান*
২। *দৈনিক আজাদ*
৩। *পূর্বদেশ*
৪। *দৈনিক ইত্তেফাক*
৫। *দেশের ডাক (খুলনা)*
৬। *খাদেম (বরিশাল)*
৭। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*
৮। *মাসিক মোহাম্মদী*
৯। *মাসিক সওগাত*
১০। *'ইতিহাস' পত্রিকা*
১১। *'বই' (মাসিক পত্রিকা)*
১২। *আল ইসলাহ (সিলেট)*
১৩। *খুলনা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*